জলধর সেনের নির্বাচিত গল্প

সংকলন ও সম্পাদনা

ড. সুবিমল মিশ্র

ভূমিকা

ড. বিজিতকুমার দত্ত

পরিবেশক

বাণী প্রকাশন

৭, নবীন কুণ্ডু লেন

কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারি ২০০২

প্রকাশিকা
পৃথা মিশ্র
৭৯৭ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রোড
কলকাতা-৭০০ ০৭৭

মুদ্রক ঃ
এস. সি সরকার এন্ড সন্স
১.০৬এ, রাজা রামমোহন সরণি
কলকাতা-৭০০ ০০৯

শ্রীযুত রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
শ্রীযুত নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পরমআত্মীয়দ্বয়
শ্রদ্ধাভাজনেষু

মুখবন্ধ

জলধর সেনের জন্ম ১৮৬০, ১৩ মার্চ। কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালি গ্রামে জলধরের জন্ম। কুমারখালি গ্রামের সাংস্কৃতিক পরিবেশ ছিল খুবই উচ্চমানের। লালন শাহের জন্ম এই গ্রামে। বিখ্যাত কাঙাল হরিনাথ এই গ্রামেরই সন্তান। কুমারখালি ও তৎসংলগ্ন আশেপাশের গ্রামে গঞ্জের আবহাওয়ায় বাউলমনের বিকাশ ও বাউল ধর্মের চর্চার কথা সকলেরই জানা। এই গ্রামেরই অদূরে ঠাকুরবাড়ির জমিদারি। ঠাকুরবাড়ির সাংস্কৃতিক পরিবেশও নিশ্চয়ই এই অঞ্চলের পরিবেশকে কিছুটা প্রভাবিত করেছিল।

জলধরের পিতা হলধর সেন, মাতা কালিকুমারী। জলধরের তিন বছরের সময় তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। মৃত্যু হয়েছিল বসন্ত রোগে। ১৮৮৭ সালে জলধরের মাতৃবিয়োগ হয়। জলধরের এক বোনেব ছয় মাস বয়সে মৃত্যু। জ্যেষ্ঠা ভগিনী সুসারসুন্দরী দীর্ঘজীবী ছিলেন। ছোট ভাই বি. এ পাশ কবে সরকারি স্কুলে চাকরি করেন। মাত্র চুয়াল্লিশ বছর বয়সে বসন্তরোগে মারা যান। জ্যেষ্ঠা ভগিনীবও ১৩১৩ বঙ্গাব্দে বসন্তরোগে মৃত্যু হয়। এই মৃত্যুর মিছিল জলধরের জীবনে বারবার উঁকি দিয়েছে।

জলধরের পিতা সামান্য অবস্থা থেকে কলকাতায় এসে প্রচুর বিত্ত সংগ্রহ করেন। সেকালের অনেকেব মতো তিনি রক্ষিতাও রেখেছিলেন। গ্রামে দানধর্মের জন্য তিনি সম্মানও পেয়েছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর নানা কারণে জলধরের পরিবার নিঃস্ব হয়ে পড়েন। জলধবরা দুই পিসতুতো ভাই ও পিতামহের আশ্রিত হয়ে পড়েন। দারিদ্রের মধ্য দিয়েই জলধররা মানুষ হন।

জলধরের স্কুল জীবন মোটামুটি ভালোভাবেই অতিবাহিত হয়। কিন্তু এল. এ.* পরীক্ষায় ফেল করে জলধর হতাশ হন। যাই হোক-কলকাতায় তিনি বিদ্যাসাগরের সঙ্গে পরিচিত হন। বিদ্যাসাগর তাঁকে পড়াশোনার ব্যাপারে সাহায্য করতে চেয়েছিলেন। জলধর আর্থিক সাহায্য নেন নি। এতে বিদ্যাসাগর খুশি হন। জলধব ধর্ম সম্পর্কে উদার ছিলেন। ব্রাহ্ম পরিবেশে জলধর স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছেন। বিবেকানন্দেরও তিনি সান্নিধ্য পেয়েছিলেন।

কিন্তু সর্বাপেক্ষা প্রভাবিত হয়েছিলেন জলধর হরিনাথ মজুমদারের সাহচর্য, স্নেহ ভালোবাসা পেয়ে। জলধর নামটিও কাঙাল হরিনাথেরই দেওয়া। কুমারখালিতেই কাঙালের দল গঠিত হয়েছিল। জলধর এই দলের উৎসাহী সদস্য। কাঙাল হরিনাথের দেশসেবা এবং কৃষককুলের জন্য জমিদারদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা আর 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা'য় তার অনবদ্য ভাষায় নিরন্ন মানুষের দুঃখ যন্ত্রণা প্রকাশ করে তিনি দেশের মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। দেশসেবা কাঙালের অন্যতম ধ্যান ছিল। যদিও পরবর্তী জীবনে কাঙাল ধর্মকর্মেই নিজেকে নিয়োজিত করেন। কিন্তু তাঁর প্রথম জীবনে দেশের জন্য ত্যাগ এবং সংগ্রাম উনিশ শতকে তাঁকে বিশিষ্ট একটি স্থান করে দিয়েছিল। জলধরের গল্পে কাঙাল হরিনাথের প্রভাবের কথা উল্লেখ করা যায়।

জলধর ছোট ভাইয়ের পড়াশোনাকে বেশি মূল্য দিয়েছিলেন। ছোটভাইয়ের পড়ার খরচ জোগাড় করার জন্য তিনি স্কুল মাস্টারি গ্রহণ করেন, পরে মহিষাদলে তিনি দীর্ঘকাল মাস্টারি জীবন অতিবাহিত করেন। এই শিক্ষকতা জীবনের সুখ আহ্লাদের কথা তাঁর ছোটগল্পে আছে। সমাজে শিক্ষকদের মানমর্যাদার কথা উত্থাপন করেছেন তাঁর ছোটগল্পে। জলধর এও দেখিয়েছেন একজন শিক্ষকের বেতন যা তাতে সংসার চালানো প্রায় দুঃসাধ্য ছিল। শিক্ষকরা দুটি তিনটি

* লিটারেচার অফ্ আর্টস্

টিউশনিও নিতেন। মহিষাদলে শিক্ষকতা করার সময়ে জলধর নিজেও এইভাবে টিউশনির দ্বারা আয় বাড়াবার চেষ্টা করেছিলেন। জলধরের অধিকাংশ গল্পে শিক্ষক চরিত্রের অবতারণা আছে, যৌথ পরিবারের কথা আছে। বিধবাদের প্রসঙ্গও আছে—একি কেবল বিদ্যাসাগরের প্রভাব? নাকি জ্যেষ্ঠা ভগিনীর প্রভাব। জ্যেষ্ঠা ভগিনীর বিস্তৃত পরিচয় অবশ্য পাইনি। তিনি কি বিধবা ছিলেন?

নদিয়ার বিখ্যাত দেওয়ান বংশের কন্যা সুকুমারীর সঙ্গে জলধরের বিবাহ হয়। কাঙাল হরিনাথ ছিলেন এই বিবাহের উদ্যোক্তা, তিনিই বরকর্তা। স্ত্রীর ভরণপোষণের জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষ জলধরের বেতন পাঁচ টাকা বাড়িয়ে দেন। বিবাহের আড়াই বছর পর সুকুমারী কলেরা রোগে মারা যান। একটি কন্যা হয়েছিল তাঁদের। বারো দিন থেকে ওই কন্যা মারা যায়। স্ত্রীর মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে 'সন্ধ্যার ট্রেনে (জলধর) যখন বাড়ী আসিলেন তখন সব শেষ। জলধরবাবুকে ষ্টেশন হইতেই শ্মশানঘাটে লইয়া যাওয়া হইল'। জলধরের গল্পে প্রিয়তম, প্রিয়া, পিতা, মাতার মৃত্যুর পর তার শেষ যাত্রা দেখা অথবা একেবারে শূন্যতায় ভরিয়ে দিয়ে নিকটজনের মৃত্যুর কথা পাওয়া যায়। এই অভিজ্ঞতা তাঁর গল্পে। জলধর বোধ হয় শোকের তীব্রতা সঞ্চারের জন্য এই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে গল্পে প্রয়োগ করেছিলেন। ১৮৮৭ সালে প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যু আর ১৮৯৪ সালে দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন জলধর ডায়মন্ডহারবারের উস্তি গ্রামের হরগোবিন্দ দত্তের কন্যা হরিদাসীকে। এই অন্তর্বর্তী সময়ে জলধর প্রায় সন্ন্যাসীর জীবনযাপন করেছেন। সংসার বৈরাগ্য দেখা দেয় জলধরের। জলধরের সাত পুত্র ও ছয় কন্যা। জলধরের মৃত্যু হয় ১৯৩৯ সালে।

জলধর দীর্ঘকাল সাংবাদিকতা করেছেন। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন তিনি। সম্পাদনা সূত্রে বাংলার বরেণ্য সাহিত্যিকদের সাহচর্য তিনি পেয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অনেক লেখাই তিনি 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রকাশ করেছেন। শরৎচন্দ্রের লেখার তিনি অতীব গুণগ্রাহী ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ শোকবার্তা পাঠিয়েছিলেন। এইখানে তা উল্লেখ করি—

> 'বাঙালীর প্রীতি অর্ঘ্যে তব দীর্ঘ জীবনের তরী
> স্নিগ্ধ শ্রদ্ধাসুধারস নিঃশেষে লয়েছে পূর্ণ করি।'

এবারে জলধরের গল্পগুলির সামান্য পরিচয় দিই।

জলধর সেনের সাহিত্যসাধনার হাতেখড়ি হরিনাথ মজুমদারের 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা'য়। এই পত্রিকার সম্পাদনায়ও তিনি সক্রিয় ছিলেন। হরিনাথের কর্মযজ্ঞের প্রথম পর্বে গ্রামের সমাজবিন্যাস কৃষকদের দুরবস্থা, জমিদারের অত্যাচার এবং নিরসনের উপায়—এ সবই ছিল প্রধান। জলধরের রচনায় এবং ভাবনায়ও গ্রামীণ সমাজব্যবস্থার চিত্র প্রাধান্য পেয়েছিল। হরিনাথের জীবনের দ্বিতীয় পর্ব অধ্যাত্ম সাধনায় নিয়োজিত। জলধরের রচনায় হরিনাথের দ্বিতীয় পর্বের স্পর্শও দুর্লক্ষ্য নয়। জলধর অনেকগুলি উপন্যাসও রচনা করেছিলেন। তাঁর গল্পগ্রন্থের সংখ্যা এগারোটি। নব্বইটি গল্প এ গ্রন্থগুলিতে স্থান পেয়েছে। জলধরের ভ্রমণকথা খুবই জনপ্রিয় ছিল।

প্রস্তুত সংকলন তথা 'নৈবেদ্য' গল্পগ্রন্থের প্রথম গল্পটির নাম 'অন্ধের কাহিনী'। গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণে 'অন্ধের কাহিনী' একটি ইংরেজি গল্পের অনুসরণে রচিত বলে জানানো হয়েছে। আসলে গল্পটি ফরাসী গল্পকার মপাসাঁর 'নেকলেস' গল্পটির অনুসরণে লিখিত। এ থেকে আমরা বুঝে নিতে পারি জলধর গল্পপাঠের চৌহদ্দি দেশের সীমানা পেরিয়ে গিয়েছিল। উনিশ শতকে ফরাসী সাহিত্যের চর্চা খুব বেশি ছিল না। জলধর অবশ্য ইংরেজি অনুবাদেই পড়েছিলেন গল্পটি।

ফরাসী বুর্জোয়া সমাজের চিত্রচরিত্র অঙ্কনে মপাসাঁর খ্যাতির কথা সর্বজনবিদিত। 'নেকলেস' গল্পেও বুর্জোয়া সমাজের শৌখিন আভিজাত্য, কৃত্রিম প্রসাধনকলার অন্তঃসারশূন্যতার চিত্র আমরা পাই। নিম্নবিত্তদের ঐ বুর্জোয়া স্তরে পৌছানোর করুণ প্রয়াসের মর্মান্তিক ঘটনা এই গল্পে পাই। মাদাম লয়সেল (Madame Loisel) সামান্য কেরানির স্ত্রী। তিনি অসামান্য সুন্দরী ছিলেন। মপাসাঁ বলছেন 'ভোগবিলাসের উপর তার একটা সহজাত অধিকার আছে এ বিষয়ে একটা দৃঢ় প্রত্যয় ছিল, তার মনে আর এই প্রত্যয়ের জন্য সব সময় অসন্তোষজনিত একটা তীব্র চঞ্চলতা অনুভব করত।' তার বাড়ির পরিবেশ ভালো লাগত না। ময়লা দেওয়াল, পুরনো আসবাবপত্র, কমদামী বিছানা কিছুই ভালো লাগত না মাদাম লয়সেলের। ব্রোঞ্জের বাতিদান, উজ্জ্বল আলো, দামী কার্পেট, অমূল্য গয়না, সেজেগুজে পটের বিবি হয়ে থাকা, আর অনেক অনেক পুরুষ বন্ধু এসবই তার কামনার বস্তু ছিল। এহেন লয়সেল দম্পতি মন্ত্রীর আসরে নিমন্ত্রণ পেলেন। মাদাম লয়সেলের জোরাজুরিতে শ্রীযুক্ত লয়সেলের পরামর্শে তার বান্ধবীর কাছ থেকে একটি অমূল্য হার ধার করে, সেজেগুজে মাদাম নিমন্ত্রণের আসর কাঁপিয়ে দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে টের পেলেন তার হারটি খোয়া গেছে। বহু খোঁজার পরেও হারটি পাওয়া গেল না। তারা ঠিক করলেন ঠিক সেইরকম একটি হার বাজার থেকে কিনে বন্ধুর ধার শোধ করতে হবে। না খেয়ে, না বিলাসে মগ্ন হয়ে দুজনে একটি হার সংগ্রহ করলেন ছত্রিশ হাজার ফ্রাঁ দিয়ে। ধারও করলেন প্রচুর। এবারে এই টাকার জন্য দম্পতির কৃচ্ছ্রসাধনার ইতিহাস। ঋণশোধের পালা। বহু বৎসর কেটে যাওয়ার পর তারা ঋণমুক্ত হলেন। এবং সুন্দরী তখন প্রায় বুড়িয়ে গেছে। হঠাৎ-ই একদিন বান্ধবীর সঙ্গে দেখা। বান্ধবীর হারের কথা বলতে বান্ধবী মাদাম লয়সেলের হাত দুটো দুঃখের আবেগে জড়িয়ে ধরে সকরুণ কণ্ঠে বলল, হায়, প্রিয় বেচারি মাথিলদে, (মাদাম লয়সেল) আমার নেকলেসটা ছিল নকল, তার দাম বড় জোর পাঁচ হাজার ফ্রাঁ।' গল্পের শেষ এইখানে। একটা চমক সৃষ্টি করে গল্পটি প্রান্তে এসে। আমাদের চিত্ত আলোড়িত হয়। বুর্জোয়া সমাজের বহিরঙ্গ জৌলুসের অন্তরালে রয়েছে নকলের বাহার। জলধর প্রথমেই গল্পকথনে নেমে পড়েননি। নায়কের শৈশব, দারিদ্র এবং গ্লানির বিবরণ দিলেন লেখক। তারপর বিবাহ এবং সামান্য বেতনের চাকরিলাভের কথা। এর আগে পিতার মৃত্যু, মাতার মৃত্যু, গ্রাম্য পরিবেশ, নিষ্ঠুর জমিদারের কথা বিবৃত। আরম্ভ হয়েছে দৃষ্টিহীন নায়কের বঙ্কিমচন্দ্রের 'রজনী' উপন্যাসের দৃষ্টিহীন রজনীর আত্মকথার আদলে নায়কের অন্ধত্বের কারুণ্যকে দিয়ে। জলধরের গল্পেও স্ত্রী'র গয়না ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে। কিন্তু মপাসাঁর গল্পের মতো জলধরের সুলোচনা আত্মসচেতন নয়। বাঙালি নারীর গহনাপ্রীতি বিদেশিনী লয়সেলের মতো নয়। তাছাড়া, জলধর গল্পের নায়িকাকে বড়লোকের বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে পাঠিয়েছেন, কিন্তু তার বিস্তারিত বিবরণ নেই। মপাসাঁ নায়িকাকে উৎসবে পাঠিয়ে উৎসবের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ে মাদাম লয়সেলের উল্লাস ও আত্মপরিতৃপ্তির কথা বলেছেন। জলধরের এই অংশটি অতি-সংক্ষেপ করার ব্যাপারটি ইচ্ছাকৃত। জলধরের নীতিবোধ এখানে প্রবল। গল্পের শেষটাও মপাসাঁর মতো চমকে শেষ হয়নি। ঋণদাতা ঝুটা তাগা দেওয়ার কথা বলে তারপর ললিত (গল্পের নায়ক) কে বললেন, তার দেওয়া গহনাগুলো কেমিকেল সোনার। ঋণদাতা বসুর ভাষায় 'আমি তোমাকে প্রবঞ্চিত করিয়াছি, কিন্তু তুমি অগাধ বিশ্বাসে আমার সেই প্রবঞ্চনার কি কঠোর প্রতিফল (ললিতের অন্ধত্ব) দান করিলে! তোমার চক্ষু ফিরাইয়া দেওয়ার সাধ্য আমার নাই, কিন্তু যতদিন বসু-বংশে কেহ অভুক্ত না রহিবে ততদিন তোমার ও তোমার স্ত্রীর অন্নের অভাব হইবে না—তুমি আমাকে ক্ষমা কর।' ভারতীয় ঐতিহ্যকে যেন জলধর স্মরণ করেছেন।

চরম পরিহাসের দিনেও সান্ত্বনার এই প্রলেপ নায়ককে কতটা শান্তি দিতে পারল তা আমাদের জানা নেই। ললিত বোধ হয় পরাশ্রিত হওয়া থেকে মৃত্যুই চাইল ভগবানের কাছে। মপাসাঁর গল্পের অনুসরণ হলেও জলধরের বর্ণনা কিঞ্চিৎ নিরুত্তাপ, মপাসাঁর গল্পে মাদাম লয়সেলের ভূমিকাই প্রধান, জলধরের গল্পে ললিতের।

'পাগল' নামটিই ইঙ্গিত দেয় সংসার সম্পর্কে ধারণাহীন উদ্ভ্রান্ত কোন মানুষ। আবার বাউল সঙ্গীতে বারবার উচ্চারিত হয়েছে সংসারবিরাগী মানুষ তার মনের মানুষের খোঁজে পাগল হয়েছেন। কৃষ্ণপ্রেমে রাধিকা পাগলিনী।

জলধর সেন নিরক্ষর বসিরদ্দিব ছেলে আমির মণ্ডলের রূপতৃষ্ণার কথা বলেছেন এবং রূপের পাথারে তার আঁখি ডুবে আছে—তা দেখিয়েছেন। ওই একটি ভাবকে আশ্রয় করেই বিধবা ইন্দুর রূপলাবণ্যে আমিরের প্রায় পাগল হয়ে যাওয়ার বিবরণ দিয়েছেন। গল্পের বস্তু খুবই সাদামাঠা। কিন্তু গৃহী মানুষ কী করে মনের মানুষের নাগাল পাবার জন্য সংসার ছেড়ে বেরিয়ে আসে তার আবেগের যতদূর সম্ভব বিস্তারিত বর্ণনা এ গল্পে পাই। গল্পের আরম্ভে ইন্দুর বাবার শোক, ইন্দুর বৈধব্য এবং বাবার মৃত্যুর ঘটনা দ্রুত সেরে নেওয়া হয়েছে। বৈধব্যের যন্ত্রণাও জলধর বিস্তৃত করেছেন। গল্পটি জলধরের বর্ণনাতেই সীমাবদ্ধ। কারোই সক্রিয় ভূমিকা বিশেষ নেই। হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক আছে কিন্তু সাম্প্রদায়িক বুদ্ধির চিহ্ন নেই।

'ছোটকাকী' গল্পটিতে নারীর নিষ্ঠুর রূপের চিত্র। ছোটকাকির কাছে আশ্রয় পেতে এসেছিল অমর। ছোট কাকি জজের মেয়ে উকিলের স্ত্রী। বড়ো দেমাক। বিশেষত বাপের বাড়ি সম্পর্কে। অমরের উপর সে বিরূপ। মোটা চাল, ছেঁড়া লেপ, ছেঁড়া বালিশের বরাদ্দ হল অমরের। নিজেদের জন্য সরু চাল আর চাকরবাকর এবং অমরের জন্য নির্ধারিত হল মোটা চাল। মাতৃহারা অমর এরই মধ্যে পড়াশোনা করতে লাগল। উকিল কৃষ্ণদয়ালের মুহুরি হরেকৃষ্ণ অমরকে স্নেহ করত। সেটা সহ্য হত না ছোটকাকির। একদিন ছোটকাকি নিদারুণ শাস্তি দিল অমরকে। অমর অসুখে পড়ল। জ্বরে সে মারা গেল। বাপ রামদয়াল দেশ থেকে এসে মৃত্যু-পথযাত্রী অমরকে কোলে নিল। তখন অমর অজ্ঞান। কৃতকর্মের জন্য একবার চিৎকার করে উঠল, 'কাকীমা আমি আর বিছানা খারাপ করব না'। তারপর অমরের প্রাণবায়ু নিঃশেষ। করুণ বিষয়। কারুণ্যকে টেনেও এনেছেন জলধর। নারীর নিষ্ঠুরতাকেও প্রকট করেছেন।

স্পষ্টত শরৎচন্দ্রের 'মেজদিদি' গল্পের কথা মনে করিয়ে দেয়। কেষ্টর প্রতি বড়দিদির নিষ্ঠুর আচরণ সহজেই মনে পড়বে। শরৎচন্দ্র কী এই গল্পটি পড়েছিলেন এবং প্রভাবিত হয়েছিলেন?

'মোহ' গল্পে বৈধব্যের আব এক চিত্র। হিন্দু সমাজের চেহারা। বিদ্যাসাগরের সান্নিধ্য জলধরকে প্রভাবিত করেছে। পিসিমার বেশবাস সাজগোজের পরিবর্তন দেখে ভাইপো অনুযোগ করলে পিসিমার ভাবনা 'কুমারী ছিলাম, হঠাৎ একদিন বাদ্যভাণ্ড করিয়া আমাকে যাহারা সধবা সাজাইয়াছিল, আবার ছয় মাস পরে তাহারাই ঘোর কান্নাকাটি করিয়া আমার সিঁথির সিন্দূর মুছিয়া দিল—বলিল, আমি বিধবা। নিজের ইচ্ছায় সধবাও সাজি নাই, নিজের ইচ্ছায় বিধবাও সাজিলাম না'—জলধরের ভাষা প্রতিবাদী। সমাজের নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে এরকম উচ্চারণে নিঃসন্দেহে জলধরের উদারচিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। দৈবলাঞ্ছিত হিন্দুনারীর এই জীবনকে ভিতর ও বাইরে থেকে দেখেছেন। নারীর ভাষাকে সজোরে সমাজের বুকে নিক্ষেপ করেছেন জলধর।

পিসিমা কমলের দিনগুলি ভালোভাবেই কেটে যাচ্ছিল। মধ্যবিত্ত সমাজে উদারপন্থীরা মেয়েদের লেখাপড়ায় উৎসাহী ছিলেন। কমলের বাবা দাদা কমলকে ইংরেজি, সংস্কৃত ভালো

করে পড়িয়েছেন। কমল রীতিমত শিক্ষিতা। সুতরাং শিক্ষিত নারীর সংসারের বিধি-বিধানের প্রতি ক্ষোভ জাগছে আমরা দেখতে পাই। দাদা কমলের জন্যই বিয়ে করতে চায়নি। কমল প্রায় জোর করেই দাদার বিয়ে দিল। কমল খুশি, দাদাও খুশি। খোকা হল। কমল খোকার মানুষ হবার ভার নিল। কিন্তু এরই মধ্যে বিপর্যয় দেখা দিল।

'এমন সময়ে হঠাৎ চাহিয়া দেখি, ঘরের মধ্যে দাদা আর বউদিদি। দাদা আদর করিয়া বউদিদির চিবুক ধরিয়া চুম্বন করিতেছেন।' ভূমিকম্প হয়ে গেল। 'আমার সমস্ত হৃদয়ের নির্বাপিতপ্রায় ক্ষুধা তৃষ্ণা যেন জাগিয়া উঠিল।...সান্ধ্য পবনহিল্লোল যেন কোথা হইতে যৌবনের অতৃপ্তি আনিয়া আমার গায়ে ঢালিয়া দিতে লাগিল।...মনে হইল;—বোধ হইল, জীবন বৃথায় গেল, কোন সাধ, কোন বাসনাই পূর্ণ হইল না। আমি জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপাইয়া পড়িলাম।'

লালসায় বহ্নিময়ী তখন কমল। যৌন আবেগদীপ্ত এই নারীর বাস্তব রূপ অঙ্কনে দক্ষ জলধরকে আমরা দেখতে পাই। এর আগের গল্পে বিধবা ইন্দুর বেদনা আছে। কিন্তু কামনার চিহ্ন ছিল না। প্রতিবাদও ছিল না।

বিধবা-বিবাহ সমস্যা রূপে নাটকে উপন্যাসে নানারকম লেখা বেরিয়েছিল। গান, ছড়া, কবিতা, প্রবন্ধের তো কথাই নেই। কেউ এই বিবাহ সমর্থন করেছেন, কেউ করেননি। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর মতামত দিয়েছেন 'সাম্য' প্রবন্ধে এবং উপন্যাসে এর সাহিত্যরূপ দিয়েছেন। এসব কথা বলার কারণ জলধর ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। উনবিংশ শতাব্দের শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলের মতামত তাঁর জানবার কথা। আমরা যেভাবে উনিশ শতকের চিন্তাধারার পরিচয় পাই তাতে বুঝি বাঙালি সমাজে এ বিবাহ আইনসিদ্ধ হলেও তেমন সাড়া মেলেনি। বিধবারা প্রায় তিমিরেই ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপন্যাসে বিধবা সমস্যার খুঁটিনাটি লক্ষ করেছিলেন। তাঁর যে বিবাহে সমর্থন ছিল তা কেবল উপন্যাসেই লভ্য নয়। তিনি পুত্র রথীন্দ্রনাথকে বিধবা-বিবাহই দিয়েছিলেন। এ সমস্যাটির ব্যাপক আলোচনার অবকাশ নেই। আমরা জলধরের মতামত-ই দেখতে পারি। জলধর অন্তত নারীর দৃষ্টিকোণ থেকে বিধবার সাধ-আশার স্বরূপটি দেখিয়েছেন। এবং এই গল্পে বিধবাব তীব্র ক্লেশ যেমন একদিকে প্রকাশ করেছেন তেমনি তার দেহের পিপাসার কথাও অকপটে এবং আন্তরিকভাবে দেখিয়েছেন। জলধরের সমাজচিন্তার এই প্রগতি আমাদের বিস্মিত করে। কিন্তু তারপরেই জলধর গল্পের গতি উজানে চালিয়ে দিলেন। উল্টো দিকে নৌকা ঘুরিয়ে দিলেন। কমল নরেন্দ্রকে ভালোবাসল। একদিন রাত্রে দুঃসাহসে দুজনে পালাল। কিন্তু গাড়িতে নরেন্দ্রের চুম্বন বিষের মতো মনে হল। পাপের জ্বালায় কমল দগ্ধ হতে লাগল। বাড়ি পালিয়ে এল। এবং সেই রাত্রেই স্থির করল সে বিধবার বেশ ধারণ করবে। উপোস করে কৃচ্ছ্রসাধন করবে। বঙ্কিমের রোহিণীর মৃত্যু হল, কুন্দকুসুম ফুটল না। রবীন্দ্রনাথের বিনোদিনী আদর্শের পথে নিজেকে নিবেদন করল। জলধরও এ পথেই কমলকে বৈধব্যের আসনে বসিয়ে দিলেন। এক পা এগিয়ে দু-পা পিছিয়ে এলেন। স্পষ্ট বুঝতে পারি তাঁদের সীমাবদ্ধতা। সমাজের শেকলবাঁধা জলধর।

আগের গল্পটি নারীর দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা, 'রমণী' গল্পটি পুরুষের দৃষ্টিকোণ থেকে। Love at first sight এই মোটিফ (?)টি জলধর খুবই ব্যবহার করেন। নারী প্রেমে জেগে ওঠে অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা না করেই, পুরুষও তাই। হাল আমলের Date-এর ব্যবস্থা নেই। পরীক্ষা করার চেষ্টা নেই। একে অপরকে বোঝার প্রয়োজন নেই। নারী এবং নর উভয়ে রূপে গুণে মুগ্ধ হয়ে নীরবে বাগদত্ত অথবা বাগদত্তা হয়ে যায়। এই প্রেক্ষিত রচনাতেই গল্পের অনেকটা অংশ ব্যয় করা হয়। জলধর থেকে উদাহরণ দিই 'কিন্তু কি দেখিলাম ! এমন আর কখন দেখিয়াছি বলিয়া

মনে হইল না। দেখিয়া বোধ হইল, ঘনকৃষ্ণ মেঘের ভিতর বিজলী খেলিয়া গেল; সেই চকিত বিদ্যুতের আলোকে আমার বোধ হইল, আমার সতের বৎসরের আলোকহীন উজ্জ্বলতাহীন যৌবনের রুদ্ধ কক্ষে কে যেন বাতি জ্বালিয়া আলোকিত করিয়া গেল।' এর পর বারবার সে নায়িকাকে দেখবার তীব্র বাসনা, পরিচিত হবার আকাঙ্ক্ষা এবং পরিশেষে ব্যর্থতা জলধর দেখিয়েছেন। যে রমণীকে ভালোবাসা নিবেদন করেছিলেন তারই মৃত্যুতে 'চরাচর ধ্বনিত করিয়া আমার হৃদয় মথিত করিয়া কেবল একটা কথা আমার কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল, "আর সময় নাই, আমি চলিলাম।" যেন রাত্রি ঊষার রক্তিম অঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া বলিতেছে, "আর সময় নাই, আমি চলিলাম।" আকাশের চন্দ্র পশ্চিমগগনে ঝুঁকিয়া পড়িয়া ম্লানদৃষ্টিতে ধরণীর দিকে চাহিয়া বলিতেছে, "আর সময় নাই, আমি চলিলাম।" নৈশ বায়ু বৃক্ষপত্র কম্পিত করিয়া শুষ্কপত্র উড়াইয়া খোলা মাঠের উপর দিয়া ছুটিয়া চলিতে চলিতে বলিতেছে, "আর সময় নাই, আমি চলিলাম।" জীবজগতের সুপ্তি যেন পূর্ব দিকে অঙ্গুলি প্রসারণ করিয়া অস্ফুট স্বরে বলিতেছে "আর সময় নাই, আমি চলিলাম। আমার জীবনের দিন কবে ফুরাইবে? কবে আমি এ কথা বলিতে পারিব?" জলধরের বিধবার প্রেম অথবা বিধবার প্রতি প্রেম এমনই আবেগ থরোথরো। এমনই হা-হুতাশে ভরা। বিধবার জীবনের চিত্র অবশ্যই উজ্জ্বল। জলধরের লেখা গল্পগুলি সাক্ষ্য দেয় বিশ শতকের গোড়ায় বিধবার গ্লানি, লাঞ্ছনা, মর্মান্তিক যাতনা শিক্ষিত বাঙালিকে বিচলিত করেছিল। মধ্যবিত্তের এই সমস্যা এখনও যে তলানিতে নেমে আসেনি তারও প্রমাণ পাই একালের কিছু গল্পে, উপন্যাসে। জলধরের প্রেমবিকৃতিতে বঙ্কিমচন্দ্রের অনুসরণ আছে। বেশি আছে বৈষ্ণব পদাবলীর আদর্শ। দেবেন্দ্রনাথ সেন, কামিনী রায় প্রমুখের কবিতার অনুসরণ অথবা অনুরূপ ভাবনায় দীপিত।

এই বৈষ্ণব (অন্যভাবে বাউল রুচি ওরফে কাঙাল হরিনাথ) ভাব জলধরের 'সুষমা' গল্পেও বিস্তৃত হয়েছে। বিধবার যন্ত্রণা, প্রধানত কামনাকেন্দ্রিক। তার সাধ-আহ্লাদের অচরিতার্থতা গল্পে কিছুটা তাপের সৃষ্টি করে। বিধবা যেন তার ক্ষোভ-দুঃখ কাতর চিৎকার ছুঁড়ে দেয় সমাজের কাছে। গুরুপুত্রের প্রতি প্রেম জলধর লুকিয়ে রাখেন নি। সেও পালিয়ে গিয়ে 'অবৈধ' ভালোবাসাকে ফলপ্রসূ করে তুলতে চেয়েছিল। কিন্তু যে মুহূর্তে বিধবারা তাদের পাপ চিনে ফেলে তখন তারা নিজেদের বৈধব্যকে সযত্নে রক্ষা করবার জন্য প্রেমিককে আঘাত করে, অন্যায়ভাবে তারা ত্রাতাকে গালিগালাজ করে এবং হয় নিজে সরে আসে, না হয় প্রেমিককে তাড়িয়ে দেয়। গুরুপুত্রের প্রতি সুষমার প্রেম এবং গুরুপুত্রের তাতে সাড়া দেওয়ার বিবরণে রবীন্দ্রনাথের 'বোষ্টমী' গল্পের কথা মনে পড়তে পারে। অথচ বোষ্টমীর প্রত্যাখ্যান কী আশ্চর্য বৈষ্ণবীয় মাধুর্যে সিক্ত। বোষ্টমীর সংসারত্যাগ কেমনভাবে অনিবার্য হয়ে উঠেছিল তার ভূমিকা এবং পটভূমিকা রচনা রবীন্দ্রনাথের শিল্পদক্ষতার পরিচয়।

গল্পগুলিতে নায়কের পারিবারিক স্বাচ্ছন্দ্যের বর্ণনা যেমন আছে, তেমনি আছে দারিদ্রের চরম গ্লানির কথা। জলধরের নিজের জীবনেরই যেন পরিচয়। কিছুকাল সংসারত্যাগী হয়ে ঘুরে বেড়ানো জলধরের হিমালয় বাসের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মৃত্যুর বর্ণনায় জলধর অতর্কিত। জ্বর অথবা বিকারে মৃত্যু জলধরের পত্নী, কন্যা, মা বাবার মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। জলধরের আত্মীয়রা কেউ মারা গিয়েছেন বসন্তরোগে, কেউ কলেরায়, কেউ অকালে। এই মৃত্যুর ছায়া জলধরের ছোটগল্পে। জলধরের গল্পে এই নিয়ে দু ফোঁটা অশ্রু থাকেই। উকিল, মুনসেফ, মুহুরিদের রমরমা জলধরের গল্পে। ওকালতি ব্যবসা যে রীতিমত স্বাচ্ছন্দ্য এনে দেয় এসব গল্পগুলি তার উদাহরণ। দাদা-ভাইয়ের সংসারযাত্রা এবং কোনো কারণে পরে কিঞ্চিৎ

মনকষাকষির উদাহরণও লক্ষণীয় জলধরের গল্পে। এও জলধরের অভিজ্ঞতার কাহিনি। বঙ্কিমচন্দ্র থেকেই পাচ্ছি বাঙালিদের কেউ কেউ প্রবাসী বাঙালি হয়ে যেতেন চাকরির সূত্রে। এবং বিস্তর রোজগার করতেন। কিন্তু দেশের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে সকলে চাইতেন না। অবসর গ্রহণের পর দেশেই ফিরে আসতেন। টাকা জমানোর একটা রাস্তা ছিল কোম্পানির কাগজ কেনা। আমরা দেখি ব্যাঙ্কের পরিবর্তে কোম্পানির কাগজে টাকা জমাতে ভালোবাসতেন রোজগেরে কর্তা। জলধরের লেখায় সেকালের পাঠশালা, স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত মানুষের আনাগোনা বেশি। এম. এ., বি. এল. নায়ক আছে, শিক্ষকতার চাকরি আছে, ফেল করা বাঙালি ছোটখাটো চাকরি জুটিয়ে নিতে পারতেন। জমিদারের তহশিলদার, নায়েবের পর শিক্ষিত বাঙালির চাকরিমুখিতা সামান্য হলেও বাঙালি মানসিকতার লক্ষণ। যদিও এ ব্যাপার উনিশ শতকের শেষের দিকে শুরু হয়েছিল। মনে রাখতে হবে জলধর উনিশ শতক এবং বিশ শতকের মানুষ। তিনিও মোটামুটি দীর্ঘজীবী ছিলেন। বাঙালির পারিবারিক জীবনের খুঁটিনাটি অবশ্য জলধরের গল্পে তেমন স্থান পায়নি। যেমন 'রাধারাণীর ইচ্ছা' গল্পে অদ্বৈত-মহেশ বড় এবং ছোট ভাইয়ের অন্তঃপুরকে আশ্রয় করে একটা জটিলতা নিয়ে আসতে পারতেন জলধর। কিন্তু বড় বউয়ের ভবিষ্যতের চিন্তা এবং ছোট বউয়ের মৃদু আস্ফালনেই গল্পটি শেষ হয়ে গেল অদ্বৈতেব ইচ্ছায়। আবার জলধর কাঙাল হরিনাথের দৃষ্টান্ত অনুসবণ করে সংসার বৈরাগী অদ্বৈতের ছবি আঁকলেন। অদ্বৈত তার সম্পত্তির অংশ মহাপ্রভুর সম্পত্তি রূপে আদালতে লিখিয়ে দিয়ে স্বামী-স্ত্রী দুজনে সংসার ত্যাগ করে চলে গেল। 'পাগল' গল্পেও নায়ক সংসারত্যাগী হয়ে গেল। যাই হোক অদ্বৈত-মহেশের টাইপ চরিত্র জলধরের অন্যান্য গল্পে আছে। রবীন্দ্রনাথে আছে, শরৎচন্দ্রেও আছে। 'বৈকুণ্ঠের উইল' এবং 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা' গল্প দুটি জলধরেরও টাইপ চরিত্র, কিন্তু বলা বাহুল্য জলধরের গল্প তার থেকে শিল্প হিসাবে অনেক দূরে।

'শিবনাথের অধিকার' গল্পটিতে গল্পের একটা কাঠামো রচিত হয়েছিল সুন্দরভাবে। ধর্ম এবং লোকাচার এই দুইয়ের দ্বন্দ্ব ফুটিয়ে তোলবার অবকাশ ছিল, কিন্তু জলধর এক তরফা একটি ব্যক্তিজীবনের ইতিবৃত্ত রচনায় নিয়োজিত রইলেন। শিবনাথের পিতার হয়ে যজমানি করতে গিয়ে কালীপূজা করলেন। ভালোই করলেন। কিন্তু পূজা শেষে নিদ্রিত শিবনাথকে এক সন্ন্যাসী স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন পূজায় তারই অধিকার যে সমস্ত মনপ্রাণ সঁপে দিয়ে দেবীধ্যান করতে পারে। শিবনাথের চৈতন্যোদয় হল। পিতার মৃত্যুর পর সে শ্রাদ্ধ করতে নারাজ হল, কেননা তার অধিকার নেই। সন্ন্যাসীর বাক্য শিরোধার্য করে শিবনাথ পূজা-আচ্চা বিসর্জন দিয়ে স্বদেশসেবায় মন দিল। এতো কাঙাল হরিনাথের জীবনী। এই গল্পে হরিনাথের বাউলধর্মী গানও সন্নিবেশিত। শ্রাদ্ধের দিনে কাঙালিভোজন করানোর ইচ্ছাও কাঙাল হরিনাথের কথাই স্মরণ করায়।

'বাতাসী' গল্পে মৃত্যুর মিছিল। একের পর এক মৃত্যু। জলধর নিজের বাড়িতে বসন্ত কলেরার গ্রাস দেখেছিলেন। আর 'বাতাসী' গল্পে দেখালেন ওলাবিবির নিষ্ঠুরতা। কয়েকদিনের মধ্যেই বাতাসীর পিতামাতা কলেরায় মরে গেল। গ্রামে আজ এ মরে, কাল সে মরে। হরিশপুর গ্রামের ১৩৯ জন মরে গেল। কলেরার মহামারীর সর্বনাশা রূপ আমাদের উপন্যাসে কিছুটা স্থান করে নিয়েছিল। শরৎচন্দ্রের 'দত্তা'য় আছে বসন্ত, আর 'পণ্ডিতমশাই'-তে পাই কলেরার প্রকোপ। এসব রোগের ভয়ংকরতা গ্রামের জীর্ণ, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের প্রতিরূপ। এইভাবেই ঢুকে যায় ম্যালেরিয়ার বৃত্তান্ত। জলধরের ১৩৯ জন সংখ্যাটি বাস্তবের নির্মম দিকটি জানিয়ে দেয়।

'বাতাসী'-রূপকথা। নরনারীর অপ্রেম-প্রেমের কাহিনী। প্রকৃতির রুদ্র রূপের বর্ণনায়

জলধর কিঞ্চিৎ সফল। 'শেফালিকার দুঃখ'—শিউলি ফুলের আত্মকথা। এই শিউলিফুলের শিহরণ, আনন্দমূলক রোমাঞ্চ জাগত বালিকা চারুর স্পর্শে। চারুর বিবাহ হল। শেফালিকার দুঃখের শুরু। একদিন চারু ফিরে এল বিধবা হয়ে। চারু ফিরে এল শেফালিকার কাছে। শেফালিকার অনন্ত দুঃখের কাহিনি চারুকে নিয়ে। রবীন্দ্রনাথের 'ঘাটের কথা' গল্পের নাম অবশ্যই মনে পড়বে। উচ্ছ্বাস এবং আবেগে গল্পটি সহজসুন্দর।

গল্প হিসাবে 'বিবাহের ফর্দ' অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু এই গল্পে মধ্যবিত্তের জীবনযাপনের একটা ছবি পাওয়া যায়। সে ছবিটি বাস্তবের চমৎকার নিদর্শন। গ্রামের পাঠশালা অথবা স্কুলের পাঠ শেষ করে পড়াশোনার জন্য মধ্যবিত্তের আকাঙ্ক্ষা ছিল তখন প্রবল। কলকাতায় যেমন মুরুব্বির জোরে অথবা টাকার বিনিময়ে মূর্খও মুচিরাম গুড় (বঙ্কিমচন্দ্র) হয়ে যেত তেমনি চাকরির বাজার ছিল খুবই কঠিন। বিশেষত বি. এ., এম. এ-র চাকরি সংগ্রহ করা দুরূহ ব্যাপার ছিল। গৃহশিক্ষকতা একটা উপায়ের রাস্তা ছিল। বড়লোক (ধনী) বলতে উকিল, অ্যাটর্নি হওয়া। বিলাত ফেরতের তো কথাই নেই। বিয়ের বাজারে বিলাতফেরতের কদর ছিল খুবই। গ্রামের ছেলের আদর্শের সঙ্গে শহুরে ছেলের আদর্শের দুস্তর ব্যবধান। মোটা ভাত মোটা কাপড় হলেই গ্রামে চলে যেত। বিবাহের বয়স বারো-তেরো হলেই ভালো। বাল্যবিবাহ তখনও ছিল। কিন্তু শহরে বারো-তেরো'র গণ্ডি ছিল না। ইংরেজি বুকনি চালু হয়েছিল। ধনী মধ্যবিত্তেব স্বাধীন হবার প্রবণতা দেখা দিয়েছে। জলধরের গল্প পড়েই বুঝতে পারি শহরে যৌথ পরিবারের আদর্শে ঘা লেগেছে। কিন্তু গ্রামের মানুষকে যৌথ পরিবারের দায়িত্ব নিতে হত। এবং সেই দায়িত্ব নিয়েই তারা সুখ-দুঃখকে সমান ভাগ করে নিত। শরৎচন্দ্রের সমসাময়িক নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের কোনো কোনো উপন্যাসে এই বিলাতিয়ানাকে চাবকানো হয়েছে। শরৎচন্দ্রও 'বিপ্রদাস' উপন্যাসে বিলাতিয়ানাকে ব্যঙ্গ করেছেন। জলধরও এই গল্পে বিলাতিয়ানাকে প্রশ্রয় দেননি। সাধারণ মধ্যবিত্তের মধ্যে সততা ও দৃঢ়তা ছিল। ফর্দগুলোতে নায়কের সেই সততা দেখি। অভাবে দুঃখ কষ্ট গ্রহণ-বরণ করে এক জাতীয় আত্মপ্রসাদ লাভ করত গ্রাম থেকে শহরে এসেও। এতে বোঝা যায় শহর মানেই বিলাতিয়ানার বিস্তৃত রূপ নয়। অ্যাটর্নির পাশে গৃহশিক্ষক, স্কুলশিক্ষকেরও মান-মর্যাদা ছিল। অ্যাটর্নি, উকিল আর কতজন? কোটিকে গুটিক। 'চিতার আগুন' গল্পে জলধর বলেছেন 'তোমাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে এতকাল পরে আমি কিছুতেই "জি. মিটার" বলে আত্মপরিচয় দিতে পারব না।' 'পরাণ মণ্ডল' জাতিতে মুসলমান। ভাই নয়ান। ঘরে স্ত্রী। পরান মণ্ডলের মা-বাপ কলেরায় মারা গেল। নয়ান পরানের স্ত্রীর হাতে মার খেল। বাড়ি থেকে নয়ানকে বার করে দিল। নয়ান সারাদিন অভুক্ত থেকে গাছতলায় শুয়ে রইল। সারাদিন খেটে বাড়ি ফেরবার সময় পরান নয়ানকে দেখতে পেল। সব শুনে পরান রাগে অন্ধ হয়ে বাড়িতে এসে স্ত্রীকে খুন করল। বিচারে তার এক বছরের শাস্তি হল। জজের প্রশংসা হল। গল্পটি রূপকথার মতো। হ্যামসেল আর গ্রেটেলের গল্প যেন। জজের রায় প্রায় অবাস্তবের কোঠায় যায়। জলধরের ইচ্ছাপূরণের গল্প। ভ্রাতৃপ্রেমের আদর্শ। রবীন্দ্রনাথের 'শাস্তি' গল্পের ক্ষীণ আভাস আছে এই গল্পে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন ১৩০০ সালে গল্পটি। জলধর মুসলমানি পরিবেশ ফোটাতে এবং সেই সমাজকে চিহ্নিত করতে এই শব্দগুলি ব্যবহার করেছেন—আরজ, কবর, নসিব, আল্লা, লবাবজাদা, হারামখোর, বেইমান, জান, গোস্ত, ভাইজি (দাদাগো), তামাম, গোস্তাকি, লাশ, হাকিম, সেলাম, মেয়াদ। কিন্তু ব্যক্তি নামগুলি কিঞ্চিৎ হিন্দুঘেঁসা পরান, নয়ান, হারু। গ্রামের চাষিদের দারিদ্র, মজুরি খাটা, সামান্য মজুরিতে সংসারের অনটনের কথা আছে এই গল্পে। গ্রাম সম্বন্ধে জলধর যে খুব উৎসাহী ছিলেন এমন নয় কিন্তু পল্লির আদর্শকে তাঁর চরম বলে মনে হয়েছিল।

'নসীবের লেখা' গল্পে সাধু খাঁর স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুর পর নিকে করল জমিরকে। জমিরের দুর্ব্যবহারে স্ত্রীর সতী-সাধ্বীত্বের পরিচয় জ্ঞাপক রূপ। স্ত্রীর স্বাতন্ত্র্যের পরিচয়। একটু দুঃসাহসী গল্প।

'জল—একটু জল—' বিধবার কথা। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের যে করুণা এ গল্পে তার প্রকাশ। বিদ্যাসাগর অল্পবয়সি বিধবাদের একাদশী পালনের দারুণ যন্ত্রণা দেখে বিধবা-বিবাহে উদ্যোগী হন। জলধরের অভিপ্রায়ও তাই। এই কারুণ্য অবশ্যই কঠোর শাস্ত্রবিধির বিরুদ্ধে জলধরের বিদ্রোহ। পূর্বের ধারণা বজায় রেখেও এ গল্পে যেন জলধর এগিয়ে গেলেন খানিকটা। জলধরের বিধবাদের প্রতি সহানুভূতি তাঁর গল্পের একটি অতি প্রিয় বিষয়।

'না' হিমালয় ভ্রমণ কাহিনির একটি নূতন অধ্যায়। বিশেষত্বহীন। নারীর যৌবনমদসত্তার রূপান্তর, ইন্দ্রিয়জ থেকে অতীন্দ্রিয় জগতে নারীর প্রায় দেবীত্বে আরোহণ।

'ভীষণ প্রায়শ্চিত্ত' বিধবা-কে নিয়ে পালিয়ে যাওয়া। বিধবার গর্ভ-ধারণ। নায়কের দারিদ্র, অনুতাপ। বিষ খেয়ে মরবার সঙ্কল্প। বিষ স্ত্রী-কে খাওয়াল, নিজে খেতে সাহস পেল না। বিধবাকে ফেলে নায়ক বিবাগী হল। দশ বৎসর পরে দেখা গেল নায়ক সাধু হয়ে হিমালয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হিমালয়ে প্রায় অর্ধ উন্মাদ নায়ককে সান্ত্বনা দিল বন্ধু। কিন্তু নায়ক অদৃশ্য হয়ে গেল। জলধরকে হিমালয়ের স্মৃতি তখনও আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। দেরাদুনের টপকেশ্বর পাহাড়ের ধারে থাকবার সময়ের স্মৃতিকথা এটি। এখানেও বিধবার পরিণাম দেখানো হয়েছে। কাশীর বিধবার আড্ডায় নায়কের বাস বিধবার পরিণামকে বুঝিয়ে দেয়। লেখক বিধবার জ্বালা যন্ত্রণা বোঝেন। সেই জ্বালা নিবারণের জন্য কাতরও হন। কিন্তু সমাজকে বড় সমীহ করেন লেখক। 'না' গল্পটিও বিধবার কাহিনি নয় বটে, কিন্তু নারীর আত্মদহনে করুণ। সেই দহনের বিবৃতিমাত্র। একটি গল্পের নামই 'বিধবা'। শ্বশুরের মৃত্যুর পর স্বামীর মৃত্যু। বিধবার অবলম্বন স্বামীর ভিটে আর দেওর এবং দেওরের স্ত্রী। দেওরের একটি কন্যা। হঠাৎ কন্যার চিৎকার, তড়কা জাতীয় রোগ। বিধবার স্বামী স্বপ্নে দেখা দিলেন। দৈব ওষুধ দিলেন। বেঁচে গেল দেওর কন্যা। বিধবার স্বামীভক্তি প্রদর্শিত এ গল্পে। স্বামীর ভিটের প্রতি মায়াও স্বামী ভক্তিরই নিদর্শন। 'বিচার' গল্পটিতে হরিনাথের ছায়া। নায়কের নামও হরিনাথ। বিধবাও উঁকি দিয়েছে। কিন্তু গল্পটি মানবিকতা বোধে দীপ্ত। হিন্দু-মুসলমানের অসাম্প্রদায়িক মনোভাব প্রকাশে গল্পটির নূতন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। কাঙাল হরিনাথের অসাম্প্রদায়িক ধর্মের প্রচারের কথা সকলেরই জানা। লেখক ভক্তের দৃষ্টিতে দেখেছেন মানুষকে। মানুষের অন্যায়ও ভগবান-আল্লা ক্ষমা করে দেন। ঈশ্বরের এই সার্বভৌম সাম্যভাব প্রকাশ করেছেন লেখক। বাউল সঙ্গীতের ব্যবহার লক্ষণীয়।

'ঘরজামাই' ব্যাপারটা সমস্যা কিনা জানি না। কিন্তু শ্বশুরের পয়সায় বিলেতফেরতের কাহিনি গল্পে উপন্যাসে নয়, সমাজে এ ব্যাপার খুব চালু ছিল। জামাই বিলেত থেকে এলে তার দেশগ্রামপাত্রকে ভুলে গিয়ে শ্বশুরের দাক্ষিণ্যেই জীবন অতিবাহিত করত। জলধর সমাজের এ প্রবণতাকে ধিক্কার দিয়েছেন এই গল্পে। সাধারণত মোটামুটি লেখাপড়ায় ভালো অথচ দারিদ্রের জন্য উচ্চশিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়ে আছে এমন ছেলের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিয়ে জামাইকে ব্যারিস্টারি পড়তে বিলেতে পাঠিয়ে দিতেন। রোজগারের এই ব্যবস্থা অনেককাল ধরেই চলেছে। বরের বাড়ির যে দুরবস্থা তাও চলছে সমানে সমানে। স্ট্যাটাস সচেতনা কিছু উচ্চবিত্ত বাড়ির মানুষের ছিল। আমাদের মানমর্যাদার মানদণ্ড ছিল এই ঘর-জামাই ব্যবস্থা। গ্রামে গ্রামে ছিল কুলীনের পো-কে মেয়ে দিয়ে জামাইকে গ্রামে থিতু করে দেওয়া। এতেও মান মর্যাদা বেড়ে যেত, যিনি জামাইকে বসাতে পেরেছেন। কৌলীন্যও বহুকাল সজীব ছিল। জলধর অবশ্য দেখিয়েছেন

কোন ধনীকন্যা এভাবে জীবনযাপনকে গ্রহণ করতে পারেনি। তারা শ্বশুরবাড়িতে ঘরকন্না করতেই অধিক আগ্রহী ছিল। পৌরাণিক সতীর উপাখ্যান, দক্ষযজ্ঞ কাহিনি আমাদের সংস্কারে বাসা বেঁধে আছে। স্বামী যখন অপমানিত হয়ে শ্বশুরের ধাক্কায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল, তখন ধনীকন্যার সম্মানে ঘা লাগল। সে নিজেকেও অভাগা মনে করল। তখন ধন নয়, মান নয়, তার মধ্যে জেগে উঠল সতীর দেহত্যাগের স্মৃতি। জলধর দেখালেন নারীর স্বাতন্ত্র্য, মর্যাদা সম্মান কোথায়? স্ত্রী এসে স্বামীর সঙ্গে মিলিত হল। সাধ্বী রমণীর আদর্শই ছিল সাধারণ শিক্ষিত মধ্যবিত্তের আদর্শ। উটকো আধুনিকতায় তারা বিশ্বাসী ছিল না।

'মায়ের নাম' গল্পের নায়ক যেন জলধর সেনই। এল. এ. ফেল নায়ক। জলধরও তাই। ত্রিশ টাকার বেতনে শিক্ষকতা, ছেলে পড়িয়ে দশ টাকা যথেষ্ট বলে বিবেচিত হত সেকালে। এভাবে জলধরের নায়কের ভাষায় শুনি 'একরকম বাড়ীতে থাকিয়াই মাসে চল্লিশ টাকা উপার্জন—এল্-এ. ফেল ভদ্রলোকের পক্ষে যথেষ্ট; তাহার অধিক আশা করিতে গেলে মুরুব্বীর জোর চাই। আমার তাহা ছিল না।—নিজের কুলেও নয়ই, শ্বশুরকুলে বা মাতামহ-কুলেও তেমন কেহ ছিলেন না—সকলেই আমার মত গরিব;—আমারই মত কেহ বা স্কুলের মাষ্টার, কেহ বা পণ্ডিত, কেহ বা সামান্য কেরাণী।' 'মায়ের নাম' গল্পে মধ্যবিত্তের গ্রাসাচ্ছাদনের এই রোজগার বা জীবিকা জলধরের অনেক লেখায় পাই। কলকাতায় ছিল চাকরির বাজার, মফস্‌সলে চাকরির সংস্থান বলতে নায়েব তহশিলদার ইত্যাদি। সবই জমিদারকে কেন্দ্র করে। পাঠশালা, বঙ্গবিদ্যালয় বা ইংরেজি বিদ্যালয়ের সাক্ষাৎ ছিলই। সেখানেও মাস্টারের চাকরি। জলধরের দুইরকম অভিজ্ঞতার সাক্ষাৎ মেলে—এক-প্রাক্ বিশ শতকের, দুই-উত্তর উনিশ শতকের অর্থাৎ বিশ শতকের। জলধর বলছেন লাখ টাকা আয়েব জমিদার কেউ কেউ ছিলেন। জলধর নিজেই তো দেখেছেন ঠাকুর বাড়ির জমিদারি। কাঙাল হরিনাথের সঙ্গে যাদের বিরোধ হয়েছিল। উত্তরবঙ্গের কিছু কিছু জমিদারির পরিচয় জানতেন জলধর। এবারে জলধরের নিজের কথা 'পাড়াগাঁয়ে লাখ টাকা আয়ের জমিদার রাজার হালে থাকে। হরিহর বাবুর খুব নামডাক; প্রতাপও কম নয়;—তবে এখন এই সুশাসিত ইংরেজের মুল্লুকে তাঁহার প্রতাপে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খায় না;—জমিদারদের আর সে দিন নাই—পিনাল কোড সব সমান করিয়া দিয়াছে। তবে টাকার কল্যাণে জমিদার মহাশয়েরা এখনও পল্লীগ্রামে একটু আদটুকু বাদশাগিরি করিয়া থাকেন; তাহাতেই গরিব প্রজাদের হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়।'

অন্যদিকে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মাস্টারিই ভরসা। শহরে অথবা মফস্‌সলে মাস্টার একটা গোষ্ঠীতে রূপান্তরিত হচ্ছে। বাপ পিতামহ নায়েব তহশিলদার ছিল, পরের প্রজন্ম কেরানি অথবা মাস্টার। জলধর দুই সম্প্রদায়কেই দেখেছেন। বিলীয়মান জমিদারিতে সামান্য চাকরি নিয়ে খুব খুশি হত না মধ্যবিত্ত। লক্ষণীয় জলধর উপনিবেশের ইংরেজপ্রভুদের খুবই প্রশংসা করেছেন। অনুগত রাজভক্ত জলধর। সমাজে স্বদেশী কতজন? প্রজাভক্ত সহস্র সহস্র। ইংরেজ অসন্তোষ সত্ত্বেও। সমাজে বহুবিবাহ, কৌলীন্য, নারীনির্যাতন কিন্তু তখনও চলছে। তবে সংস্কারের একটা সুপ্ত ইচ্ছে, কখনও কখনও প্রতিবাদী মনোভাব ছিল। জলধরের শ্লেষ এখানে লক্ষণীয়। তিনি বিদ্যাসাগরেরও শিষ্য। 'মায়ের নাম' ('মায়ের নাম' গ্রন্থের ১৯২১ প্রথম গল্প) গল্পটি সম্ভাবনার দিকে ঠেলে দিয়েই হোঁচট খেলেন। স্কুলের মাস্টারকে প্রলোভিত করেছিল জমিদারের তন্বী গৃহিণী। প্রথম পক্ষের ছেলের জন্য দ্বিতীয় পক্ষের বুড়ো জমিদারের সুন্দরী গিন্নি মাস্টারকে ভালো বেতন দিয়ে নিযুক্ত করেছিল গৃহশিক্ষক হিসাবে। সুন্দরী নৈশবিহারের জন্য মাস্টারকে গোপনে আমন্ত্রণ জানাল। মাস্টারের অস্থিরতা বাড়ল। বুক জ্বলে যায়, কিংকর্তব্য

বিমূঢ়। সেই সুরভিত নিমন্ত্রণ পত্র মাস্টারকে মাতাল করে দিয়েছিল প্রায়। পত্র লেখিকা সুন্দরী স্ত্রী'র নাম মাস্টারের মায়ের নাম একই। মাস্টার মুহূর্তে পালটে গেলেন। মায়ের কথা মনে হতেই সম্বিত ফিরে এল। অভিসারিকাকে মাস্টার প্রত্যাখ্যান করল। আমরা ভেবে অবাক হই মাস্টারের বুক জ্বলে যাওয়া এবং মায়ের নামের সাদৃশ্যে মাতৃভক্তি জেগে ওঠা দুইই কেমন অঘটন-ঘটন-পটীয়সী। সমাজ যে আমাদের গল্পের প্যাটার্নকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণে রেখেছিল জলধরের এই গল্প তার প্রমাণ। শরৎচন্দ্রের 'বড়দিদি' কিন্তু আর এক ধাপ এগিয়ে গিয়েছিল। শরৎচন্দ্রেরও সমাজভাঙার তাগিদ ছিল না। কিন্তু তিনি ভেবেছেন, থমকেছেন, এগিয়েছেন। জলধর সেন অনেক পিছিয়ে। জলধরের স্নেহভাজন শরৎচন্দ্র আর এক পা এগিয়েছিলেন। এ গল্প যখন প্রকাশিত হয় তখন 'কল্লোল' প্রকাশ আসন্ন। 'কল্লোলে'র বিদ্রোহ কেবল রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে নয়, এই জাতীয় রচনার প্রতিও। প্রেম, ভালোবাসা, 'কল্লোলে'র কোলাহলকে নানা বৈচিত্র্যে উচ্চগ্রামে তুলে দিয়েছিল। আর জলধর দেখিয়েছেন তন্বী গিন্নির পত্র যেন অদেহিনী সুরা। 'আমার মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়া আমায় পাগল করিয়া, মাতাল করিয়া তুলিল—সুখের আবেশে আমি বিভোর হইয়া পড়িলাম।' ওই পর্যন্ত, কোনো কোলাহলই ক্রিয়াতে পরিণত হবার সুযোগ পায় না। আত্মকণ্ডুয়নে ফুরিয়ে যায় মদের নেশা। এ এক কঠিন প্রায়শ্চিত্তের বেদনা নব্য বাঙালি যুবকের।

লক্ষ করবার মতো ব্যাপার হল জলধরের নারীরা কিঞ্চিৎ সচল। প্রায় প্রতিটি গল্পে নারীই প্রেমাপিপাসায় অস্থির হয়েছে, দুঃসাহসে ভরপুর হয়েছে, যদিও শিল্পের দিক থেকে শেষ রক্ষা করতে পারেনি। পুরুষ নিস্ক্রিয়। অবশ্য জেলেনি খেয়াঘাটের মাঝিকে প্রত্যাখ্যান করলেও ব্যর্থ প্রণয়ী খেয়াঘাটের মাঝির দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়েছিল জেলের কন্যাই। সেখানে প্রকৃতির মাতন আর নরনারীর উত্তাল প্রেমপিপাসা জয়ী হয়েছিল। সেক্ষেত্রে জলধরের কোনো অসুবিধে হয়নি এই কারণে যে জেলের কন্যা আর খেয়াঘাটের মাঝির মিলন বৈধ, সমাজ অনুমোদিত। এখানেও নারীর ভূমিকাই মুখ্য। জলধরের বিধবারা প্রেমিকা, বঞ্চিতা, কর্তৃত্বময়ী, প্রগলভা। সজীবতার স্পর্শ পাওয়া যায় নারীর চরিত্র অঙ্কনে।

'ন্যায়বাগীশের মন্ত্রদান' গল্প নয়—স্মৃতিকথা। হিমালয়ের স্মৃতি। 'এবং' গল্পটিতে লেখকের ন্যায়নিষ্ঠা, ধর্মবোধ আর কিঞ্চিৎ সন্ন্যাসীর ধর্মের পবিত্রতা মিলে মিশে আছে। জলধরের সততা, সত্যপালনের দৃষ্টান্ত এই গল্পটি। সংসার থেকে কোনো কারণে আঘাত পেয়ে কিছুদিন বিবাগী হয়ে যাওয়ার ঘটনাও জলধরের গল্পে পাওয়া যায়। এ তো তাঁর ব্যক্তিজীবনের কথা। অতএব বস্তু অপেক্ষা আদর্শের প্রতি ঝোঁক, ব্যক্তিগত ধর্মাচরণের জিজ্ঞাসা গল্পকে সাধারণ ব্যক্তিকথায় পরিণত করেছে এই গল্পে। 'কাঙ্গালের ঠাকুর' জগন্নাথ মহিমার দৃষ্টান্ত। কেমন করে জগন্নাথ মৃতপ্রায় নারীকে বাঁচিয়ে দিলেন তার কথামৃত। জলধর প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছে ক্রমশই ধর্মের দিকে ঝুঁকছেন—এ গল্প থেকে তা বোঝা যায়। এ ধর্ম অবশ্য মানবিকতাবোধে উদ্বুদ্ধ। প্রেরণাজাত এসব গল্পে বিশ্বাসের সরলগতিও লক্ষণীয়। অন্যদিকে সে মৃতপ্রায় মহিলার দেওর কীভাবে বৌদির গোঁজ থেকে টাকা সরিয়েছিল, এবং দেশে এসে বৌদির মৃত্যুর কথা রটিয়ে দিয়েছিল তারও কথা জুড়ে দিয়েছেন। একদিকে পাপ অন্যদিকে পুণ্য। পাপের পরাজয় ঘটল বৌদি বেঁচে ফিরে এলে দেওরের গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যার কাহিনিতে। 'মহামায়ার মায়া'ও ভক্তিরসের গল্প। মহামায়ার কৃপায় গোপীনাথ মণ্ডলের পূজা বন্ধ হবার জোগাড়। মেয়ে ইন্দিরা বাবাকে বলল পূজা করতেই হবে। বাবা রাজি হলেন। ইন্দিরা মহামায়ার রূপ ধরে এক সময়ে গোপীনাথের পিতামহের আশ্রিত সর্বেশ্বরকে দেখা দিল। সর্বেশ্বর প্রভুঋণ শোধ করার জন্য

গোপীনাথের বাড়ি এসে হাজির। ইন্দিরাকে দেখে অভিভূত। মহামায়া বলে জড়িয়ে ধরলেন। জলধর একেবারে অলৌকিক গল্প লিখতে শুরু করলেন। ভগবানের মহিমাকীর্তনই গল্পের লক্ষ্য। 'আনন্দময়ী' দেবীমাহাত্ম্য বর্ণনা। বলতে পারি দুর্গামঙ্গল গল্প। শীতল মল্লিক কৃপণ শ্রেষ্ঠ। গ্রামে লোকেরা তার নাম পর্যন্ত নিত না। বলত ঠাণ্ডা মল্লিক। জলধর এই কৃপণের স্বভাব, কৃপণতা সম্পর্কে কথকতা করে এগিয়ে গেলেন। এই শীতল মল্লিকের বাড়িতে হঠাৎ পাড়ার ছেলেরা দুর্গার মূর্তি গোপনে রেখে চলে গেল। সকালে এই কাণ্ড দেখে শীতল স্তম্ভিত। পাড়ার লোকেরা পরামর্শ দিল শীতলকে দেবীর পূজা করতেই হবে, খুব কম করে হলেও একশ' টাকা খরচ। কৃপণ শীতল রেগে আগুন। একশো টাকা খরচ করবার ঔদার্য তার ছিল না। ভক্তিও ছিল না। টাকার বিনিময়ে পুণ্যার্জন সে করতে চায় না। পূজা সে করবেই না।

হঠাৎ শীতল ঠিক করল মা যখন এসেছেন তখন পূজা ছাড়াই সে মা-কে আশ্রয় করে কাঙাল ভোজন করাবে। শীতল কৃপণ কিন্তু শরৎচন্দ্রের একাদশীর বৈরাগীর মতোই, সে ঠকায় না। নিজের পাওনা কড়ায় গণ্ডায় বুঝে নেয়, আবার অন্যের পাওনা কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়ে দেয়। এহেন শীতল মায়ের উৎসবে কাঙাল ভোজন করাবে। শীতল বিশ্বাস করে কাঙালের দলকে, কাঙালের গানকে—

"কাঙ্গাল কয় কাতরে, জাত-বিচারে শক্তিপূজা হয় না;
সকল 'বর্ণ' এক হয়ে, ডাক মা বলিয়ে,
নইলে মায়ের দয়া কভু হবে না।"—

কাঙাল হরিনাথের শিষ্যদের কাঙালের দল বলা হত। এ গল্পে তারই পরিচয়। শীতল পূজা করলে না। কিন্তু পাড়ার ছেলেরা পূজাও করল ঐ মূর্তিকেই। শীতল মা (দেবী) কে বলেছিল 'মা, তোর কাঙ্গাল ছেলেরা তোর পূজা করবে, সেই পূজোই তোকে নিতে হবে। বল্ মা, পুরুতের পূজো নিবি—না কাঙ্গাল ছেলেদেরই পূজো নিবি?" দেবী সম্মতি দিয়ে বললেন কাঙালের পুজো তিনি নেবেন। পাড়ার ছেলেদের বঞ্চিত করলেন না দেবী। দেবীর আপ্তকাব্য 'সবাই আমার ছেলে। যে যেভাবে আমার পূজো করে। প্রাণ দিয়ে করলে আমি তাই গ্রহণ করি।' শীতল মা আনন্দময়ীর চরণে নিজেকে সঁপে দিলেন। এ যেন পরমহংস রামকৃষ্ণের মতবাদকে স্বীক্যর করে নেওয়া। কাঙাল হরিনাথের ধর্মেও এই অর্চনাকে মান্য করা হয়েছে। এ গল্পেও ভক্তিরসের প্লাবন। ভক্তের প্রথমে বিরোধিতা তারপর দেবীকে পূজা করা। বিশ শতকেও এরকম গল্প পড়ার উৎসাহ এবং আগ্রহ ছিল ভাবতে অবাক লাগে।

'পোষ্টমাষ্টার' গল্পটি সমসাময়িক কালের দলিলরূপে গৃহীত হতে পাবে। আগে বলেছি মধ্যবিত্তের উনিশ শতক থেকেই যে সমাজসংস্কার এবং পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল তা বিশ শতকের প্রথমার্ধ জুড়েই ছিল। যদিও সমাজের উপরিতলে সংস্কার-পরিবর্তনের কিছুটা ছোঁয়া লেগেছিল। পণপ্রথা নিয়ে রবীন্দ্রনাথও গল্প লিখেছেন 'দান প্রতিদান'। শরৎচন্দ্রও অরক্ষণীয়ার কথা বলেছেন। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসেও পণপ্রথার বলি নারীসমাজের চিত্র আছে। বলাবাহুল্য বাঙালি মধ্যবিত্তের কথায় ও কাজে অনেকটাই ফাঁক থেকে যেত। ১৯১৪ সালে স্নেহলতা মুখোপাধ্যায়ের শোচনীয় মৃত্যু নিয়ে তখন খুবই চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল সমাজ মানসে। স্নেহলতার মৃত্যুতে সমাজের কুৎসিত দিকটি প্রকাশ পেল। জলধরও প্রগতিশীল আন্দোলনে যোগ দিলেন এই মানসিকতার বিরুদ্ধে। দলে দলে স্বেচ্ছাসেবী যোগ দিয়েছিল স্নেহলতার মৃত্যুকে উপলক্ষ করে। তারা পণ নিয়ে বিয়ে করবেনা এই আবেদনে সই করল। আন্দোলন এতটা গড়ালেও সমাজ তখনও যেই তিমিরে সেই তিমিরে। রামেন্দ্রসুন্দর এজন্য বলেছিলেন

'বিদ্যাসাগর অগ্রবর্তী কালের মানুষ'। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সমান তালে চলার শক্তি এবং সাহস সমাজমানসে দেখা দেয়নি। বুদ্ধি দিয়ে, আবেগ দিয়ে মেনে নিলেও কজন বিধবার উদ্ধার করতে পেরেছিল বাঙালি? তেমনি পণপ্রথা বোধ করি আজও নিশ্চিহ্ন হয়নি। ভোল পালটে সে নূতন সাজে অন্যরূপ নিয়েছে মাত্র।

কুড়ি টাকা বেতনের পোস্টমাস্টারের দুটি কন্যাকে কেউ গ্রহণ করতে রাজি নয়, পণছাড়া। লক্ষণীয় উদারচেতা বলে চিহ্নিত কোনো কোনো যুবক দোহাই দিল বাবা-মা রাজি হবেন না পণ না নিলে। স্বেচ্ছাসেবীরাও তখন বেপাত্তা। স্নেহলতার ভাই নিজেই স্নেহলতার মৃত্যুর এক বৎসর পরে পণ নিয়ে বিবাহ করল। একে পরিহাস ছাড়া আর কী বলতে পারি। জলধরের গল্পে দেখি কন্যা দুটির বয়স মাত্র বারো আর তেরো। এও বাল্যবিবাহ। সারদা আইন তখন অনেক দূরে। জলধর বাপের দুঃখ গল্পে এভাবে নিবেদন করেছেন পত্রাকারে, চরম দারিদ্রে পর্যুদস্ত বাপ রজনীবাবু লিখেছেন 'এখন ঘোর বিপদে পড়িয়াছি, তাহা হইতে কিরূপে উদ্ধার হই। বড় মেয়েটি তের বৎসর পার হইযা চোদ্দয় পড়িয়াছে। মেজ মেয়েটিও বার বৎসরে পা দিযাছে। মেয়ে যে আর ঘরে রাখিতে পারি না। তুমি ত জান, আমার হাতে একটা পয়সাও নাই, এমন আত্মীয় নাই, যাহার কাছে এ দুঃসময়ে সাহায্য চাহিয়া কিছু পাইবার আশা করিতে পারি; স্ত্রীর গায়ে এমন একখানিও গহনা নাই যাহা বিক্রয় করিয়া দু পয়সা সংগ্রহ করি; এখন উপায় কি? আমার যে জাতি যায়।' রজনীবাবু বিজয়বাবুকে এ পত্র দিয়েছেন। এ পত্র-আসলে জলধর সমাজের বিরুদ্ধে নালিশরূপে উপস্থিত করেছেন। বিজয়বাবুর চেষ্টায় মেয়ে দুটির অযোগ্য পাত্রে বিবাহের স্থির হল। তাতেও আটশো টাকার প্রয়োজন। চারশো টাকার জোগাড় হল না। অগত্যা রজনীবাবু পোস্ট অফিসের ক্যাশ তছরূপ করে কন্যা পাত্রস্থ করলেন। এবং কন্যারা বিদায় হবার সঙ্গে সঙ্গেই গলায় দড়ি দিলেন। স্নেহলতা পুড়ে মরেছিল, রজনীবাবু গলায় দড়ি দিয়ে তহবিল তছরূপের দায় থেকে মুক্তি চেয়েছিল। জলধর বুঝেছিলেন স্বেচ্ছাসেবীদের হঠকারিতা এবং শিক্ষিত মধ্যবিত্তের দ্বিচারিতা। এই গল্পে বারবার ধ্বনিত হয়েছে সমাজের নিষ্ঠুরতার দিকটি।

'আমার মাষ্টার জীবন' গল্পটি-তে জলধরের গল্প সম্বন্ধে কিছু ধারণার ইঙ্গিত পাই। সে ধারণা থেকে বুঝতে পারি তিনি রহস্য খুন অথবা প্রেমের রোমান্সকে গল্পের লক্ষ্য বলে মনে করেন না। বস্তুত বিষয়কে তিনি মুখ্য করতে চেয়েছেন। সেই বিষয়ের বিবরণই গল্প হওয়া উচিত। বিষয়ের দেহে অলংকরণ যথাসম্ভব কমিয়ে আনা উচিত। কিন্তু ভাষা ব্যবহারের সতর্কতা অবশ্যই প্রয়োজন। গল্পটির গোড়ায় পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ, উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গ সম্পর্কে যে সরস মন্তব্য করা হয়েছে তা হয়ত এ কারণেই। জলধর একান্নবর্তী ঘরের কথা বলেছেন। মধ্যবিত্ত সংসারের অধিকাংশ ক্ষেত্রে একজন একাধিক বিধবার বাপের বাড়ির আশ্রয় নেবার কথা বলেছেন। মাস্টারি জীবনের দৈন্য দুঃখের কথা বলেছেন। কিন্তু অবাক হই গ্রামের সংস্কার থাকা সত্ত্বেও জলধর কৃষক জীবনের নিদারুণ সংগ্রাম, দারিদ্রের কথা বিশেষ বলেননি। সেই সব চরিত্র একেবারে নেই এমন বলি না, কিন্তু তাদের জীবনযাপনের ছবি জলধরের গল্পে কদাচিৎ পাওয়া যায়। গ্রাম এবং নগর আছে কিন্তু এই দুইয়ের ছবি থাকা সত্ত্বেও দ্বন্দ্বের গভীরতা লক্ষ করা যায় কদাচিৎ। প্রায় ব্যতিক্রমী কৃষক জীবনের কথা উঠে এসেছে তাঁর 'ভাতারমারীর মাঠ' গল্পে। পাল্কি, বেহারা, বিশাল মরুভূমি তুল্য প্রান্তর এ গল্পে আছে। চাষি এবং চাষি বউয়ের ঘর গেরস্থালি সামান্য হলেও স্থান পেয়েছে এ গল্পে। এবং কৃষক জীবনের কারুণ্যকেও জলধর ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন তাঁর গল্পে। কিন্তু 'আমার মাষ্টার জীবন' আমাদের বুঝিয়ে দেয় সরলভাবে কাহিনিটি বলা হলেই গল্পটি সার্থক হয়ে উঠবে। এই গল্পেও যৌথপরিবারে দাদার নিষ্ঠুরতা,

ভাইয়ে ভাইয়ে তর-তম দাক্ষিণ্য বিতরণ অথবা বাড়ির কোনো বউয়ের প্ররোচনায় সংসারে অশান্তি এমন গল্পই পাই জলধরের রচনা থেকে। এ গল্পে পাই দাদাবৌদির আচরণে বিক্ষুব্ধ হয়েই মাস্টারি জীবন কাটিয়ে দিয়ে বিবাহ করলেনা নায়ক। সে মাস্টারের ধারণা হল বিবাহ করলেই স্ত্রী'র প্ররোচনায় বিগড়ে যাবে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজচিন্তার স্পর্শও পাই এ গল্পে। পিতার মৃত্যুর পর যিনিই ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সংসারের হাল ধরেন তিনিই পিতার অভিনয়ে থাকেন।

জলধরের শ্রেষ্ঠ রচনা 'হিমালয়' কাহিনি। এই স্মৃতিকথা বাংলা সাহিত্যের সম্পদ। 'ভারতী' পত্রিকায় তিনি তাঁর ভ্রমণ কথা প্রথমে প্রকাশ করেন। 'ভারতী' পত্রিকার সে সময়ের সম্পাদিকা জলধরকে উৎসাহ দিয়েছিলেন। তিনি অন্যান্য পত্রিকায়ও এই হিমালয় ভ্রমণের স্মৃতিকথা লিখেছিলেন। তাঁর ছোটগল্পেও হিমালয়ের কিছু শৈত্যপ্রবাহ লক্ষ করি। জলধরের গল্প রচনার সূত্রপাত ১৯০০ সালে। তাঁর শেষ গল্প গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯২৯ সালে। এই সংকলনে জলধরের দুষ্প্রাপ্য নির্বাচিত গল্প সংগৃহীত।

জলধরকে প্রবাসী বাঙালিরা একটি সম্মিলনে সংবর্ধনা উপলক্ষে লিখেছিলেন নূতন কিছু করার পরিবর্তে সহজ সরল ভাষায় গ্রামজীবনের কথা বলেছেন। এই শ্রদ্ধানিবেদন যথার্থ। জলধবের গল্পলেখার সময় যদি উনত্রিশ বছর পর্যন্ত ধরে নিই, তবে দেখব কোনো নূতনত্বের প্রতি তাঁর প্রবণতা ছিল না। তিনি যখন গল্প লেখেন তখন পল্লিগ্রামের বিবর্তন ঘটছে। জমিদারি প্রথার অন্তিম কাল ঘনিয়ে আসছে এটা তিনি অনুভব করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ গ্রামবাংলার যে দৈন্যদশা আব হৃতশ্রীর কথা তাঁর প্রবন্ধ সমুচ্চয়ে বলেছিলেন জলধর সেই গ্রামকে দেখেছেন। পল্লিজীবনেও যে একটা বিবর্তন ঘটছে জলধর তা বুঝতে পারছিলেন। শহরের কথা যথেষ্টই পাই জলধরের লেখায়। চাকরির সন্ধানে গ্রামের পাশকরা যুবকবৃন্দ ঘোরাফেরা করছে তা তিনি নিজের জীবন দিয়েই বুঝেছিলেন। কিন্তু শহর থেকে দূরে পল্লিজীবনের প্রতিই তাঁর টান ছিল বেশি। অন্যদিকে মধ্যবিত্ত জীবনের আর্থিক অনটন, দারিদ্র যে গ্রামবাসীকে উৎখাত করে কলকাতামুখী করে তুলছে, জলধরের গল্পে তা সরলভাবে ফুটে উঠেছে। যে মধ্যবিত্তের কথা তিনি বলেছেন তারা এক ধরনের নীতিবোধ, শাস্ত্রবোধ, ন্যায়বোধ, ধর্মকর্ম নিয়ে আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ ছিল—এইরকমই দেখি জলধরের গল্পে। মাঝে মাঝে অবশ্য এই সব চরিত্রে অসন্তোষের ঢেউ ওঠে, কিন্তু সেই ঢেউয়ের সর্বগ্রাসী রূপ নেই। নেহাতই মৃদু এবং মন্দ। আমাদের অধিকাংশ গল্পে (এই সময়ের) এই রকম মধ্যবিত্তের ভূমিকা রচিত হয়েছে। জলধর এই সমাজব্যবস্থাকে মেনে দিয়েছেন। অনেকটা মডারেটপন্থী এই গল্পের লেখক।

জলধরের গল্পে বর্ণনাবিবরণের প্রাচুর্য। ফলে গল্পগুলিতে নাটকীয়তার অভাব। আন্তরিকতার অভাব না থাকলেও তাঁর গল্পগুলি একঘেয়ে, গতানুগতিক। তাঁরই সময়ে 'নূতন' রচনায় যে কিছু কিছু পরিবর্তন এসেছিল জলধরের গল্পে তার স্পর্শমাত্র নেই। জলধর যেন উনিশ শতকের ধ্যানধারণাগুলির বিবৃতি দিচ্ছেন এবং দৃষ্টান্ত হিসাবে গল্পগুলি রচনা করছেন।

জলধর সেনের গল্পের বই এখন দুষ্প্রাপ্য। প্রসিদ্ধ গ্রন্থাগারেও সব কটি গ্রন্থ পাওয়া যায় না। শ্রী সুবিমল মিশ্র বিপুল শ্রম স্বীকার করে গল্পগুলি সংগ্রহ করেছেন। সাহিত্যের জগতে একদা এই খ্যাতিমান পুরুষটিকে আমরা কয়জন এখন স্মরণ করি? সুবিমলবাবু ইতিহাসের লুপ্ত রত্ন উদ্ধার করলেন। আমরা শ্রীযুক্ত মিশ্রকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এই নষ্টকোষ্ঠীর উদ্ধারের জন্য।

বিজিতকুমার দত্ত

নিবেদন

এটা আমাদের কাছে খুবই আক্ষেপের ব্যাপার যে, বিশিষ্ট সাহিত্যসাধক জলধর সেন (১৩.৩.১৮৬০—১৫.৩.১৯৩৯) বাংলাসাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় সার্থক পরিক্রমা করেও, বাংলা পাঠক সমাজের কাছে শুধু 'হিমালয়' ভ্রমণ কাহিনির লেখক হিসেবে পরিচিত হয়ে রইলেন। অথচ এক সময় তিনি একজন কথাশিল্পী, শিশুসাহিত্যিক, ভ্রমণকাহিনিকার, জীবনচরিতলেখক, সাময়িকপত্রের সফল সম্পাদক ও তরুণ লেখকদের পৃষ্ঠপোষকরূপে সমকালীন বাংলাদেশে যথেষ্ট শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু বর্তমানে তিনি একজন বিস্মৃতপ্রায় ব্যক্তিত্ব। গবেষক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত সাহিত্য-সাধক চরিতমালায় (৬ষ্ঠ খণ্ড) জলধর সেনের জীবন ও সাহিত্য আলোচনা করে এবং বাংলাদেশের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, কুষ্টিয়া ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবুল আহসান চৌধুরী জলধর সম্পর্কিত একটি গ্রন্থ রচনা করে জাতীয় কর্তব্য সম্পাদন করেছেন।

জলধর সেনের জন্ম বর্তমান কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালি গ্রামে। পরে ১৮৭১ সালে এটি নদিয়া জেলাভুক্ত হয়। জলধর সেন তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, "আমাদের বাড়ি নদিয়া জেলার অন্তর্গত কুমারখালি গ্রামে। আমি যখন জন্মাই তখন আমাদের গ্রাম নদিয়া জেলার মধ্যে ছিলনা, পাবনা জেলায় ছিল।" তিনি ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ মার্চ (১ চৈত্র, ১২৬৬) মঙ্গলবার এক মধ্যবিত্ত কায়স্থ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাবার নাম ছিল হলধর সেন ও মায়ের নাম কালিকুমারী দাসী। পিতামহ ও পিতামহীর নাম ছিল যথাক্রমে গদাধর সেন ও ভগবতী দাসী।

জলধরের তিন বছর বয়সকালে বসন্তরোগে তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। তাঁর পিতা সামান্য লেখাপড়া শিখে গ্রামের রামমোহন প্রামাণিকের কাপড়ের দোকানে গোমস্তার কাজ করতেন। পরে তাঁকে ব্যবসাসূত্রে কলকাতায় চলে আসতে হয়। এখানে তিনি আপন বুদ্ধি ও পরিশ্রমের জোরে যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করেন। কিন্তু মৃত্যুর পর এক নিকট আত্মীয়ের বিশ্বাসঘাতকতায় তাঁকে সর্বস্বান্ত হতে হয়। তাই জলধর তাঁর আত্মজীবনীর একস্থানে লিখেছেন, "আমার পিতার মৃত্যুর পর আমরা শুধু পিতৃহীন হলাম না, পথের ভিখারী হয়ে পড়লুম।"

১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে জলধর প্রবেশিকা (এনট্রান্স) পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করে মাসিক দশটাকা থার্ডগ্রেড জুনিয়ার স্কলারশিপ লাভ করেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় তিনি বাংলা বিষয়ে সর্বোচ্চ নম্বর লাভ করেন। একই বছরে একই পরীক্ষাকেন্দ্রে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (পরে বিশিষ্ট কবি ও নাট্যকার) পরীক্ষা দিয়েছিলেন।

এরপর তিনি কলকাতায় জেনারেল এসেমব্লিজ ইনস্টিটিউসনে (বর্তমান স্কটিশচার্চ কলেজ) প্রথম বর্ষে ভর্তি হন। গ্রামসুবাদে পরিচিত এক মহাজনের আড়তে থেকে কলকাতায় পড়াশোনা চালিয়ে যান। তাঁর এ সময়ের কষ্টের জীবনের কথা পরবর্তীকালে রচিত 'হরিশভাণ্ডারী' উপন্যাসে ও কয়েকটি গল্পে প্রকাশ পেয়েছে। জলধর সংস্কৃতে কাঁচা ছিলেন

এবং এল. এ. পরীক্ষায় সংস্কৃতে মাত্র তিন নম্বরের জন্য অকৃতকার্য হন। এখানেই তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সমাপ্তি ঘটে।

ঠিক এ বছরেই তাঁর ছোটভাই শশধর প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ও ভাইয়ের লেখাপড়া চালিয়ে নিয়ে যাবার জন্য তাঁকে বাধ্য হয়ে চাকরির চেষ্টা করতে হয়।

১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে তিনি গোয়ালন্দে শিক্ষকতা কার্যে নিযুক্ত হন। শিক্ষাগুরু ও সাহিত্যগুরু কাঙাল হরিনাথের (হরিনাথ মজুমদার) নির্দেশে তাঁকে সংসারী হতে হয়। বিয়ের প্রায় আড়াই বছর পর স্ত্রী সুকুমারীদেবী একটি কন্যা সন্তানের জন্ম দেন। জন্মের বারোদিন পরেই মেয়েটি মারা যায়। মেয়ের মৃত্যুর বারোদিন পরেই মা সুকুমারী দেবী কলেরায় মৃত্যুবরণ করেন। স্ত্রী ও কন্যার মৃত্যুর প্রায় তিন মাস পরেই জলধর তাঁর মাকে হারান। এভাবে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে মেয়ে, স্ত্রী ও মাকে হারিয়ে জলধর সংসার ব্যাপারে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন ও মানসিক শান্তি লাভের উদ্দেশ্যে হিমালয় যাত্রা করেন।

প্রায় বছর তিনেক প্রবাস জীবন যাপনের পর ছাত্রপ্রতিম ও সুহৃদ দীনেন্দ্রকুমার রায়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৮৯১ সালে মেদিনীপুর জেলার মহিষাদল রাজস্কুলে মাসিক ৪০ টাকা বেতনে তৃতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। তাঁর এই মাস্টারি জীবনের নানা অভিজ্ঞতার কথা পরবর্তী কালে লেখা অনেক গল্প-উপন্যাসে প্রকাশ পেয়েছে। বন্ধু-বান্ধবদের চেষ্টায় ১৮৯৪ সালে ডায়মণ্ডহারবারের কাছাকাছি উস্তি গ্রামে দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন। দ্বিতীয় পত্নীর নাম ছিল হরিদাসী। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁদের প্রথম পুত্র অজয়কুমার জন্মগ্রহণ করেন।

জলধর এবার শিক্ষকতা ছেড়ে 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার সহকারি সম্পাদক নিযুক্ত হন। কিছুদিন সেখানে কাজ করার পর ১৮৯৮ তে 'বসুমতী'র সহকারি সম্পাদক ও প্রায় একবছর পর এই পত্রিকার সম্পাদকের পদে ব্রতী হন। ঠিক এই বছরেই তাঁর অনুজ শশধর বসন্তরোগে প্রাণ হারান। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে 'হিতবাদী'র সম্পাদক নিযুক্ত হন। 'সুলভ সমাচার' পত্রিকার সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেনের মৃত্যু হলে তিনি এই পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন। ঠিক এ সময় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সম্পাদনায় 'ভারতবর্ষ' প্রকাশের কাজ পুরোদমে চলছে। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের আকস্মিক প্রয়াণে তাঁকে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা থেকেই অর্থাৎ ১৩২০ থেকে সম্পাদনার দায়িত্ব নিতে হয়। সহযোগী সম্পাদক ছিলেন অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়। ১৩২২ থেকে তিনি একাই আমৃত্যু অর্থাৎ ১৩৪৫ পর্যন্ত দীর্ঘ ২৬ বছর 'ভারতবর্ষে'র মত এমন একটি পত্রিকার সম্পাদনার গুরু দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছিলেন। 'সবুজপত্রে'র সম্পাদক সমালোচক প্রথম চৌধুরী মহাশয় জলধরের মৃত্যুর পর তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে গিয়ে লিখেছিলেন—"যিনি বহুকাল ধরে 'ভারতবর্ষ' এর ন্যায় প্রকাণ্ড মাসিক পত্রের ভার বহন করেছেন এবং তার উন্নতি সাধন করেছেন—তাঁর এ কৃতিত্বের জন্য আমি তাঁকে বাহবা দিতে বাধ্য, কারণ এর জন্য যে কি পরিমাণ অধ্যবসায় প্রয়োজন—তা আমি অনুমান করতে পারি। আমি ও এক সময় একখানি স্বল্পকায় মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করি, কিন্তু বেশিদিন সেটিকে বাঁচিয়ে রাখতে পারিনি যদিও স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সে পত্রের সহায় ছিলেন।"

১৩৪৫ সালের ৮ মাঘ দ্বিতীয়া পত্নী হরিদাসীর মৃত্যু হয়। স্ত্রীর মৃত্যুতে তিনি মানসিক দিক দিয়ে ভীষণভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। স্ত্রীর মৃত্যুর প্রায় আড়াই মাস পর অর্থাৎ ১৩৪৫ সালের ২৬ চৈত্র (১৫ মার্চ, ১৯৩৯) রবিবার কলকাতার বাগবাজারের নন্দলাল বসু লেনের বাসাবাড়িতে তাঁর লোকান্তর প্রাপ্তি ঘটে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর ২৫ দিন।

জীবিতকালেই তিনি বহু সম্মান, শ্রদ্ধা লাভ করেছিলেন। বহুবার তিনি বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন। ১৩২৯-৩০ এ তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন।

জলধর সেনের পরলোকগমনের পর সুসাহিত্যিক খগেন্দ্রনাথ মিত্র লিখেছেন, "জলধর সেনের সহিত যাঁহারা মিশিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন, তাঁহারা জানেন জলধর কেমন মানুষ ছিলেন। বর্ষার জলধরের মতই স্নিগ্ধ কোমল, শান্ত শ্যামল ছিল তাঁহার হৃদয়টি। তিনি সংসারের মধ্যে থাকিয়াও যেন এক সুন্দর জগতে বাস করিতেন। এই জগতের ধূলিমলিন স্পর্শ যেন তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারিতনা। তাঁহাকে কখনও সাংসারিক সুখদুঃখের কথা কহিতে শুনি নাই, পরচর্চায় তাঁহার উৎসাহ কখনও দেখি নাই।···পরিব্রাজক হইয়া হিমালয়ের শৃঙ্গে শৃঙ্গে ঘুরিয়া ছিলেন, তাহারই ছোপ পড়িয়াছিল তাঁহার প্রাণে। জলধরবাবুর প্রাণ ছিল বড় সাদা, বড় উচ্চ।"

'জলধর প্রয়াণে' শীর্ষক রচনায় লেখক অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় জলধরের উদারতার কথা বলতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন, "তাঁহার ব্যক্তিত্ব ছিল, কিন্তু তাহা পরের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ অভিব্যক্তির বিরোধী ছিলনা। সেইজন্যই তিনি হইতে পারিয়াছিলেন অজাতশত্রু। তাঁহার ব্যক্তিত্ব অপরকে আকর্ষণ করিত, কিন্তু কাহারও কাহারও তীব্র ব্যক্তিত্ব যেভাবে পরের ব্যক্তিত্বকে একেবারে গ্রাস করিয়া নিজে বড় হইতে চায়, সে রকম কোন ভাব জলধর সেন মহাশয়ের ছিলনা। তিনি অপরকে গ্রাস করিতেন না, তিনি আপনাকে দান করিতেন।···তিনি অতি সহজেই প্রত্যেককে একেবারে আপনার মত করিয়া লইতে পারিয়াছিলেন, সত্যসত্যই যে স্নেহে, যত্নে, সহানুভূতিতে ও সহচিত্ততায় প্রত্যেকের 'দাদা' হইতে পারিয়াছিলেন, ইহাতেই তাঁহার অপরিসীম ঔদার্য ও আধ্যাত্মিক প্রসারের প্রমাণ পাওয়া যায়।···যাহার আনন্দ সৃষ্টি করার ক্ষমতা আছে, যাহার আত্মবিলোপের ও আত্মদানের ক্ষমতা আছে, যাহার মনে উদারতা ও প্রাণের গভীরতা আছে, তাহারই 'দাদা' হওয়া সম্ভব। এই প্রবৃত্তি আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিপরীত প্রবৃত্তি; তাই আজকাল হয়ত অনেক সুপণ্ডিত, সুরসিক সাহিত্যিকের নাম করিতে পারি, কিন্তু তাহাদের কাহাকেও যে 'দাদা' বলিতে পারিব তাহা কল্পনা করিতে পারিনা। ···'বিশ্বমানব' বলিয়া একটা কথা আছে, সেই নামের যোগ্য কে আছেন, জানিনা। মনে হয়, যে মানব নিজের সঙ্কীর্ণ স্বার্থ বা জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার মধ্যে আবদ্ধ নয়, বিশ্বের লোক যাহার কাছে আপন হইয়া গিয়াছে, যাহার মানবত্বে সকলের ভাব ও অনুভূতি আসিয়া মিশিয়াছে, তিনিই বিশ্বমানব; কতকগুলি সূক্ষ্ম চিন্তার সমষ্টিকে আমরা বিশ্বমানব বলিতে পারিনা। এই সংজ্ঞা অনুসারে জলধর সেন মহাশয় যে পরিমাণে বিশ্বমানব আখ্যা পাইবার যোগ্য, তেমন কেহ এ যুগের সাহিত্যে আছেন কিনা সন্দেহ।"

২

সারস্বত সাধনাই ছিল তাঁর সারা জীবনের ব্রত। পত্রিকা সম্পাদনা, সভা-সমিতিতে যোগদান ও ভ্রমণের অবসরে তিনি সাহিত্য-সাধনা করেছেন। তবে তাঁর খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার মূলে ছিল তাঁর ভ্রমণ কাহিনিগুলো। 'হিমালয়' প্রকাশ করে তিনি 'ভারতী' পত্রিকায় এক সময় সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন। তাঁর ভ্রমণ কাহিনির সংখ্যা ১১টি। উপন্যাস লিখেছেন ১৮টি। এর মধ্যে অনুবাদ ২টি ও বাকি ১৬টি মৌলিক রচনা। ছোটগল্প গ্রন্থের সংখ্যা ১১টি। অবশ্য একটি গল্পগ্রন্থে কয়েকটি ভ্রমণবৃত্তান্ত আছে। প্রবন্ধ/নক্সা জাতীয় গ্রন্থ ১টি। দুইখণ্ডে তিনি তাঁর সাহিত্যগুরু কাঙাল হরিনাথের জীবনী রচনা করেছেন। বন্ধুদের অনুরোধে একটি আত্মজীবনীও প্রকাশ করেছিলেন। কিশোরদের জন্য লিখেছেন ১১টি মধুর স্বাদের বই। বিদ্যালয় পাঠ্য-পুস্তকের সংখ্যা ৭। সম্পাদনা করেছেন দুটি গ্রন্থ—একটি কাঙাল হরিনাথের সমগ্র রচনা, অপরটি তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু সন্তোষের (ময়মনসিংহ) জমিদার প্রমথনাথ রায়চৌধুরীর কাব্যগ্রন্থ। তিনখণ্ডে তিনি এই কাব্যগ্রন্থগুলি সম্পাদনা করেছিলেন। নিজের রচনা 'জলধর গ্রন্থাবলী' তিনটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল। এছাড়া 'জাতীয় উচ্ছ্বাস' নামে একটি স্বদেশী সঙ্গীত সংগ্রহ গ্রন্থও প্রকাশ করেছিলেন।

দেখা যায়, সাহিত্যের প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই তাঁর অবাধ বিচরণ ছিল। তাঁর রচিত বহু প্রবন্ধ ও সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় ছড়িয়ে আছে। তবে আমার আলোচনা তাঁর রচিত গল্পগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। এখন জলধরের গল্পগ্রন্থগুলি ও গ্রন্থধৃত গল্পগুলির উল্লেখ করছি।

১. **নৈবেদ্য।** *প্রকাশকাল ঃ-* ১ আশ্বিন ১৩০৭ (ইং ১৩ অক্টোবর, ১৯০০)। গল্পসংখ্যা—৭। অন্ধের কাহিনী, পাগল, প্রতীক্ষা, মা-কোথায়?, অদৃষ্ট, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারিণী।

২. **ছোটকাকী ও অন্যান্য গল্প।** *প্রকাশকাল ঃ-* ১০ অক্টোবর, ১৯০৪। গল্পসংখ্যা—৯। ছোটকাকী, মোহ, ডিপুটিবাবু, প্রায়শ্চিত্ত, রমণী, সমাজচিত্র, কবি, মৃতের মৃত্যু মামাবাবু, শেষোক্ত গল্পদুটি দীনেন্দ্রকুমার রায়ের রচনা।

৩. **নূতনগিন্নী ও অন্যান্য গল্প।** *প্রকাশকাল ঃ-* ১ আশ্বিন ১৩১৪ (ইং ১ অক্টোবর, ১৯০৭)। গল্পসংখ্যা—৮। নূতন গিন্নী, জুনিয়র উকিল, কালোমেয়ে, মেয়েলাথি, সুষমা, ক্ষুদিরাম, রামঠাকুর, রঘুনাথ।

৪. **পুরাতন পঞ্জিকা।** *প্রকাশকাল ঃ-* ১৫ আশ্বিন ১৩১৬ (৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯০৯)। গল্পসংখ্যা—৩ ও অন্যান্য রচনা--৪। গল্প তিনটি হোল—শেফালিকার দুঃখ, বিবাহের ফর্দ্দ, চিতার আগুন।

৫. **আমার বর ও অন্যান্য গল্প।** *প্রকাশকাল ঃ-* ফাল্গুন ১৩১৯ (৫ মার্চ, ১৯১৩)। গল্পসংখ্যা—১১। আমার বর, রাধারাণীর ইচ্ছা, পূজার তত্ত্ব, পূজার ভ্রমণ, পিতাপুত্র, শিবনাথের অধিকার, কন্যাদায়, হরিনাথের পরাজয়, গল্পের মূল্য, মামাবাবু, বাতাসী।

৬. **পরাণ মণ্ডল ও অন্যান্য গল্প।** *প্রকাশকাল ঃ* ভাদ্র ১৩২১ (১ সেপ্টেম্বর ১৯১৪)। গল্পসংখ্যা—১০। পরাণ মণ্ডল, শান্তিরাম, পয়লা বৈশাখ, রঘু পাগলা, আর একদিন আগে, নসীবের লেখা, কোথায় আমরা যাই, জল—একটু জল—, জ্যা কাম করবিনে?, না।

৭. **আশীর্বাদ।** *প্রকাশকাল ঃ-* ভাদ্র ১৩২৩ (১০ আগস্ট ১৯১৬)। গল্পসংখ্যা—১১। আশীর্বাদ, অপমান, বেয়ারিং চিঠি, বিচার, ভীষণ প্রায়শ্চিত্ত, দিগম্বর, লেড়কী মর গেয়ী, কতদূরে, বিধবা, সতীর আসন, দীনের বন্ধু।

৮. **এক পেয়ালা চা।** *প্রকাশকাল ঃ-* ১ আশ্বিন, ১৩২৫ (৫ অক্টোবর ১৯১৮)। গল্পসংখ্যা—৭। এক পেয়ালা চা, আমার মাষ্টারী, কূপের কথা, নিয়তি, সমাজ-চিত্র, মহৌষধি, তুলসী।

৯. **কাঙ্গালের ঠাকুর।** *প্রকাশকাল ঃ* ভাদ্র ১৩২৭ (১৯ আগস্ট, ১৯২০)। গল্প সংখ্যা—৫। কাঙ্গালের ঠাকুর, মহামায়ার মায়া, কতদূর!, আনন্দময়ী, মায়ের অভিমান।

১০. **মায়ের নাম।** *প্রকাশকাল ঃ* ১ শ্রাবণ ১৩২৮ (ইং ২০ জুলাই, ১৯২১)। গল্পসংখ্যা—৯। মাযের নাম, মায়ের কোলে, উৎসর্গ, ন্যায়বাগীশের মন্ত্রদান, প্রায়শ্চিত্ত, প্রবাসের কথা, এবং, মোহিতের পরিণাম, বড়দিদি, অন্তিম প্রার্থনা।

১১. **বড় মানুষ।** *প্রকাশকাল ঃ* আশ্বিন ১৩৩৬ (অক্টোবর ১৯২৯) গল্পসংখ্যা—১২। বড় মানুষ, স্মৃতি, কবিব্যাধি, অদৃষ্টলিপি, সন্ন্যাস, জাতিস্মর, গৃহিণীরোগ, অধঃপতন, ব্রাহ্মণভোজন, রামলাল, গুরুগিরি, শেষ আদেশ।

৩

জলধর সেনের ছোটগল্পের সমালোচনা সম্ভবত প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল সরযূবালা দত্ত সম্পাদিত 'ভারতমহিলা' পত্রিকায় ১৩১৭ সালের ১০ম সংখ্যায়। সমালোচক ছিলেন নলিনীকান্ত ভট্টশালী। 'বাংলা সাহিত্যে ক্ষুদ্র গল্প' এই শীর্ষনামে তিনি কয়েকটি সংখ্যায় (অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র) বাংলা ছোটগল্পের ধারাবাহিক সমালোচনা লিখেছিলেন। তৃতীয় কিস্তিতে অর্থাৎ মাঘ সংখ্যায় জলধর সেনের গল্পগুলির সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। তখন জলধরের মাত্র চারটি গল্পগ্রন্থ ('নৈবেদ্য', 'ছোট কাকী ও অন্যান্য গল্প', 'নূতন গিন্নী ও অন্যান্য গল্প' ও 'পুরাতন পঞ্জিকা'*) প্রকাশ পেয়েছে। তখন সমালোচক নলিনীকান্তের বয়স মাত্র ২১/২২ বছর। তবুও জলধর সেন তাঁর সমালোচনার প্রশংসা করেছিলেন। সমালোচনায় তিনি লিখেছিলেন, "নৈবেদ্যের প্রত্যেকটি গল্পই সুলিখিত তার মধ্যে 'পাগল' 'প্রতীক্ষা' এবং 'মা কোথায়?'—এই গল্প তিনটি অতুলনীয়। 'পাগল' গল্পটি বঙ্গসাহিত্যের

*ছোটগল্প ও ভ্রমণকাহিনির সংকলন।

একটি শ্রেষ্ঠ গল্প। ইহা না পড়িলে গল্পপ্রিয় পাঠক মাত্রেরই গল্পপাঠ অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে। 'প্রতীক্ষা' গল্পটি পড়িয়া মনে হয় ইহার প্রত্যেক অক্ষর যেন লেখকের হৃদয়-রক্ত দিয়া লেখা হইয়াছে। ইহার সহানুভূতি উদ্রেক করিবার ক্ষমতা এরূপ অসাধারণ যে পড়িতে পড়িতে মনে হয় যেন কোন প্রিয়তম আত্মীয় গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে বসিয়া তাঁহার চরম দুর্ভাগ্যের হৃদয় বিদারক কাহিনী বলিতেছেন; আর আমরা নয়নজলে ভাসিতে ভাসিতে নির্বাক হইয়া শুনিতেছি! 'মা কোথায়?' গল্পেও এই গুণ প্রচুর পরিমাণে আছে। গল্প পাঠকালে ভৈরবের ভৈরব গর্জন, এবং সেই হৃৎকম্পকারী 'মা কোথায়?' প্রশ্ন, যেন কর্ণে অনবরত প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে।........'ছোটকাকী', 'ডিপুটিবাবু' এবং 'প্রায়শ্চিত্তে' জলধরবাবুর ভাষার ধার অতিশয় উপভোগ্য। সমাজসংস্কারকগণ বড় বড় গুরুভার বিশিষ্ট প্রবন্ধ লিখিয়া সমাজের যে উপকার করিতে না পারেন, এই রকম ক্ষুদ্র গল্পের সুতীক্ষ্ণ অঙ্কুশাঘাতে সমাজের তাহার চেয়ে ঢের বেশি উপকার হয়। 'ডিপুটিবাবু' পড়িতে পড়িতে পত্নী-তর্জনী পরিচালিত অকৃতজ্ঞ ডিপুটিবাবুর উপর ক্রোধে আত্মসংবরণ অসাধ্য হইয়া পড়ে। আধুনিক সমাজে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসাদে এরূপ আত্মকেন্দ্রীভূত হৃদয় 'শিক্ষিত' নরপশু বিরল নহে।........'প্রায়শ্চিত্ত' গল্পটিব মত তৃপ্তিদায়ক গল্প জলধরবাবুব আর নাই।''

প্রবন্ধের সূচনায় সমালোচক জলধবের গল্পেব সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গল্পের তুলনামূলক আলোচনা কবছেন। সমালোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, ''শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশযের শ্রেষ্ঠ গল্পগুলি এত কবিত্বপূর্ণ, এত করুণরসমণ্ডিত যে পড়িয়া উঠিয়া বিচার ভুলিয়া আলোড়িত হৃদযে স্তব্ধ হইযা থাকিতে হয়। এ বিষযে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা রবীন্দ্রনাথের সহিত তুল্য। তাঁহার নিখুঁত শ্রেষ্ঠ গল্প খুব বেশি নাই তবে যাহা আছে তাহা গভীর অন্তর্দৃষ্টিতে, সহানুভূতি উদ্রেক করিবার ক্ষমতায় এবং সর্বপ্রকারেই রবীন্দ্রবাবুর সর্বোৎকৃষ্ট গল্পগুলির তুল্য আসন পাইবার উপযুক্ত। দুই একটি এমন হৃদয় আলোড়নকারী যে অল্পের মধ্যে রবীন্দ্রবাবুরও এ রকম গল্প আছে কিনা সন্দেহ।''

প্রবন্ধটির শেষাংশে তিনি জলধরের গল্পরচনার দোষগুণও বিচার করেছেন এভাবে— ''জলধরবাবুর গল্পের প্রধান উৎকর্ষ তাহাদের নিপুণ করুণরস সৃষ্টিতে। তাঁহার প্রায় প্রত্যেকটি গল্পেই জলধববাবুর ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়া গল্পটিকে লেখকের প্রাণেব গল্প করিয়া তুলিয়াছে।···ব্যক্তিত্ব প্রকাশে রচনা একঘেয়ে হইয়া পড়ে এবং জলধরবাবুর ও স্থানে স্থানে সেই দোষ যে বর্তে নাই এমন নহে। কিন্তু বিচিত্র, কোমল, স্বাভাবিক করুণ রসের প্রবাহে সমস্ত দোষ ধুইয়া গিয়াছে। আমরা 'প্রায়শ্চিত্ত' গল্পে জলধরবাবুর তীক্ষ্ণতার প্রশংসা করিয়াছি; কিন্তু জলধরবাবুর ভাষা সমস্ত গল্পে সমান নহে। কয়েকটি গল্পে জলধরবাবুর ভাষা নিতান্ত মন্থর গতি, শৈবালদল সমাচ্ছন্ন শীর্ণকায়া তটিনীর মত। কিন্তু এই ভাষাতেই যেন করুণরস আরও প্রগাঢ়ত্ব লাভ করিযাছে। মন্থর, অকোমল, অনিচ্ছুক ভাষার নীচ দিয়া যে ভাবফল্গু প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে তাহার স্পর্শে সমস্ত হৃদয় যেন শীতল হইয়া যায়।'' উদ্ধৃতিটি দীর্ঘ হলেও গল্পকারের ছোটগল্পের যথার্থ মূল্যায়নে এর যথেষ্ট প্রয়োজন ছিল বলে মনে করি।

১৩৪১ বঙ্গাব্দে জলধর সংবর্ধনা সমিতির উদ্যোগে জলধরের ৭৫ বছর বয়স পূর্তি

উপলক্ষে যে সংবর্ধনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তাতে রবীন্দ্রনাথ সহ প্রায় ৮০ জন সাহিত্যসেবী অভিনন্দন পত্র পাঠিয়ে তাঁর উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন ক্রেছিলেন। এগুলি এই সংবর্ধনা সমিতির সাধারণ সম্পাদক সাহিত্যসেবী ব্রজমোহন দাশের সম্পাদনায় 'জলধর কথা' নামে প্রকাশিত হয়। এই অভিনন্দন গ্রন্থে বিভিন্ন লেখক মানুষ জলধর সম্পর্কে যেমন বিশদ আলোচনা করেছেন, তেমনি তাঁর রচনা সম্পর্কেও অনেকে মূল্যবান মতামত দিয়েছেন।

সমকালীন বিশিষ্ট সমালোচক অবনীনাথ রায় মন্তব্য করেছেন, "কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে জলধরবাবুর সম্বন্ধে এই কথা বলা যায় যে, তাঁর লেখার মধ্যে Big-heart এর পরিচয় আছে। বাংলাদেশের দুঃখ-দারিদ্র্য, রোগ-শোক, সমাজের পীড়ন তাঁর বুকের মধ্যে দিয়ে তীরের মতো বেঁধে। তাতে কাতর হয়ে তিনি কাঁদতে জানেন, আর তাঁর পাঠকবর্গকেও কাঁদাতে জানেন। ...জলধরবাবুর গল্প বা উপন্যাসের মধ্যে আর একটি বস্তু চোখে পড়ে, সমাজের পুরাণো রীতিনীতির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা...।" সমালোচক চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ও মন্তব্য করেছেন, "তাঁর গল্পের মধ্যে বাংলার মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র গৃহস্থ ব্যক্তির ও সংসারের চিত্রগুলি মনোরম; বিশেষ একটি মমতা ও দরদভরা হৃদয়ের অনুভব দিয়ে লেখা।"

জলধরের রচনারীতি সম্পর্কে নানা সমালোচক মূল্যবান মন্তব্য করেছেন। জ্যোৎস্নানাথ চন্দ বলেছেন, "বঙ্কিমচন্দ্রের পরেই বাঙ্‌লাসাহিত্যে যিনি একটা নবযুগ সৃষ্টি করেছিলেন, তিনি আমাদের জলধর সেন।...যে পল্লীসমাজকে আজ শরৎচন্দ্র রূপে, রসে, বর্ণন ঐশ্বর্য্যে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন এবং চিনিয়েছেন, সেই পল্লীসমাজেরই বাঙ্‌লা সাহিত্যে প্রথম পরিচয় ঘটিয়েছিলেন আমাদের জলধরদা। চশারকে যদি Father of English Prose বলতে হয় তো জলধর সেনকেও বাঙ্‌লাসাহিত্যে ভ্রমণকাহিনীর সৃষ্টিকর্ত্তা বলতে আমার এতটুকু দ্বিধা নেই।" বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র তাঁর শ্রদ্ধাঞ্জলিতে জানিয়েছেন, "যাঁহারা বাঙ্‌লা সাহিত্যের কিছু সংবাদ রাখেন তাঁহারা জানেন যে জলধর সেন মহাশয়ের রচনার মাধুর্য্য কতখানি। জলধরবাবুর লেখার ভিতর দিয়া যে সংযম ও পারিপাট্য দেখা যায় তাহা তাঁহার জীবনের শান্ত সুন্দর ভাবটিকেই প্রকাশ করিয়া থাকে। এ যুগের কামকলুষিত সাহিত্যের আবহাওয়ায় তাঁহার প্রশান্ত ভাবধারা, সাহিত্যের অঙ্গনে কতখানি বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করে জানিনা, তবে এইটুকু জানি যে, বাঙ্‌লার সংস্কার ও বাঙালীর নিতান্ত ঘরোয়া জীবনের সুখদুঃখকে এরূপ বৈচিত্র্যময় করিয়া ফুটাইতে খুব অল্প কয়েকজন সাহিত্যিকই সমর্থ হইয়াছেন।"

তৎকালীন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কাশী শাখার সভাপতি যতীন্দ্রমোহন সিংহ অভিনন্দন পত্রে লিখেছিলেন, "তোমার সৃষ্ট সাহিত্যরাজি সমাজের সকল স্তরের নরনারীর সুখদুঃখের কাহিনীর মধ্য দিয়া চরিত্রের মাধুর্য্য, হৃদয়ের মহত্ত্ব ও উদারতা, পুণ্যের অপরাজেয় প্রভাব ও ঈশ্বর-বিশ্বাসের সফলতা অঙ্কিত করিয়া পাঠক পাঠিকাগণকে প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভের পথ প্রদর্শন করিয়াছে।"

বিশিষ্ট কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অভিনন্দন পত্রে লিখেছিলেন, "সাহিত্যব্রত গ্রহণ করিয়াছিলে তুমি আনন্দ বিতরণ করিতে। সে ব্রত তোমার সফল হইয়াছে। তোমার সৃষ্টি কাহাকেও আহত করে না, তোমার অন্তঃপ্রকৃতির মতোই সে সৃষ্টি স্বচ্ছন্দ সুন্দর ও অনাড়ম্বর।

তোমার দুঃখ-বেদনাভরা হৃদয় একান্ত সহজেই জগতের সকল দুঃখকে আপন করিয়াছে, তাই, ব্যথিত যে জন সে তোমারই সৃষ্টির মাঝে আপনার শান্তি ও সান্ত্বনার পথের সন্ধান পাইয়াছে।"

'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'কার ডঃ সুকুমার সেন জলধর সেনকে 'সংবাদপত্র সেবী সাহিত্যিক' আখ্যা দিয়েছেন। জলধরের রচনা সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য হোল—"জলধরের রচনার প্রধান গুণ সারল্য ও স্বচ্ছতা। পল্লীগ্রামের দরিদ্র ভদ্রজীবনের আর্থিক ও সামাজিক দুঃখবেদনা ইঁহার গল্প উপন্যাসের বিষয়বস্তু। নির্যাতিত ও নিপীড়িত নারীর পক্ষ লইয়া জলধর সাহিত্যের দরবারে নালিশ নহে, ক্ষীণ অনুযোগ তুলিয়াছিলেন।…পতিতা নারীর পক্ষ নেওয়াতে জলধরকে আমরা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যয়ের পূর্বগামী মনে করিলে ভুল করিবনা।" আশাকরি উপর্যুক্ত মন্তব্যগুলির সাহায্যে আমরা জলধরের অন্তঃপ্রকৃতি ও রচনাশৈলি সম্পর্কে অবহিত হতে পারব।

এবারে গল্পগুলির সংকলন প্রসঙ্গ। জলধরের ১১টি গল্পগ্রন্থে ধৃত গল্পের সংখ্যা ৯০। প্রতিটি গল্পগ্রন্থ থেকে প্রতিনিধিস্থানীয় ৩/৪টি গল্প নিয়ে ৩৬টি গল্প এবং অগ্রন্থিত ৪টি গল্প অর্থাৎ মোট ৪০টি নির্বাচিত গল্পের সংকলন প্রস্তুত করা হয়েছে। অবশ্য এ নির্বাচন একেবারেই ব্যক্তিনির্ভর। সুবিধার জন্য গল্পগুলিকে নিম্নোক্ত ভাবে বিন্যাস করে নিয়েছি।

১. **ব্যর্থপ্রেমের গল্প ঃ** পাগল, বাতাসী, রমণী, চিতার আগুন, স্মৃতি।
২. **অবৈধ প্রেমের গল্প ঃ** তুলসী।
৩. **মাতৃহীন কিশোরের প্রতি অবহেলা ঃ** ছোট কাকী, নূতন গিন্নী।
৪. **মায়ের প্রতি ভালোবাসা ঃ** মা কোথায়?
৫. **শিক্ষকজীবন ঃ** আমার মাষ্টার জীবন, আমার মাষ্টারী, মায়ের নাম।
৬. **সামাজিক সমস্যা ঃ** জল—একটু জল—।
৭ **আত্মকথামূলক গল্প ঃ** অন্ধের কাহিনী, কূপের কথা, শেফালিকার দুঃখ, না।
৮. **নারী প্রবঞ্চনার গল্প ঃ** নসীবের লেখা।
৯. **ভাইয়ের প্রতি ভালবাসা ঃ** পরাণ মণ্ডল, ঘরের কথা।
১০. **পাপের শাস্তি ঃ** ভীষণ প্রায়শ্চিত্ত।
১১. **নিয়তির পরিহাস ঃ** ভাতারমারীর মাঠ।
১২. **অতিপ্রাকৃত গল্প ঃ** বিধবা।
১৩. **হাস্যরসাশ্রিত গল্প বা ব্যঙ্গ গল্প ঃ** বিবাহের ফর্দ্দ, মহৌষধি, গৃহিণীরোগ, কবিব্যাধি।
১৪. **জীবনের উত্তরণের কাহিনী ঃ**
(ক) সমাজে নারীর উত্তরণ—মোহ, সুষমা।
সমাজে পুরুষের উত্তরণ—কালো মেয়ে।
(খ) আধ্যাত্মিক—শিবনাথের অধিকার, এবং, ন্যায়বাগীশের মন্ত্রদান।
১৫. **বৈষ্ণবরসাশ্রিত গল্প ঃ** রাধারাণীর ইচ্ছা, বিচার।
১৬. **ঈশ্বরের অহৈতুকী করুণা ঃ** কাঙ্গালের ঠাকুর, মহামায়ার মায়া।

৪

বিচিত্র স্বাদের গল্প লিখেছেন জলধর এবং প্রায় সবগুলি গল্পেই সাধারণ মানুষের ভিড়। জলধর প্রথম জীবনে শিক্ষকতা করতেন—তাই শিক্ষকদের জীবন নিয়ে তিনি বেশ কয়েকটি গল্প লিখেছেন। প্রস্তুত সংকলনে শিক্ষকজীবন নির্ভরং তিনটি গল্প (আমার মাষ্টারী, আমার মাষ্টার জীবন, মায়ের নাম) স্থান পেয়েছে। শিক্ষক জীবনের সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা যেমন তিনি দেখিয়েছেন, তেমনি শিক্ষকসুলভ চরিত্রধর্মকে সুদৃঢ় রাখার প্রয়াসকে তিনি খুব যত্ন করে দেখাবার চেষ্টা করেছেন। শিক্ষক সমাজের প্রতি তিনি যে কত শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন গল্পগুলির মধ্যে তাঁর সে পরিচয় ফুটে উঠেছে। তবে গল্পগুলির মধ্যে প্লটের তারতম্য খুব একটা বেশি ঘটেনি। 'ভাতারমারীর মাঠ' গল্পেও গৃহশিক্ষকদের সমস্যা দেখাবার চেষ্টা করেছেন।

'পাগল', 'বাতাসী', 'রমণী'—তিনটিই প্রেমের গল্প। সবগুলিই ব্যর্থ প্রেমের। ষোল বছরের ব্রাহ্মণ বিধবা ইন্দুর অপরূপ সৌন্দর্য দেখে পাগল হয়ে যায় বিশ বছরের মুসলমান যুবক আমির মণ্ডল। এ প্রেম তীব্র বিরহের অগ্নিদহনে ছারখার করে দিয়েছে আমিরকে। আমিরের প্রেমবুভুক্ষু হৃদয়ের পরিণতি আমাদের প্রত্যেককে ব্যথাতুর করে তোলে। 'বাতাসী' গল্পেও ট্র্যাজেডি। স্বরূপমাঝি ও বাতাসীর বহু আকাঙ্ক্ষিত মিলন ঘটলো ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ ইছামতীর গভীর গর্ভে। 'রমণী' গল্পেও রয়েছে আকাঙ্ক্ষিত মিলনে নানাবাধা। 'চিতার আগুন' গল্পেও না পাওয়ার বেদনা। 'স্মৃতি' গল্পেও তাই—এক সময়ে অস্ফুট, অব্যক্ত প্রেম পরবর্তী কালে অর্থাৎ বিবাহোত্তর জীবনেও যে কতটা মাধুর্য আনতে পারে, 'স্মৃতি' গল্পে জলধর তাই দেখিয়েছেন। প্রভাত ও প্রতিভা একে অপরকে ভালবাসে কিন্তু সে কথা কেউ কাউকে মুখ ফুটে প্রকাশ করতে পারেনি। অন্য জায়গায় বিয়ে হয়ে গেল প্রতিভার। অনেকদিন পরে প্রতিভা বাপের বাড়ি আসে, এখন তার কোলে একটি মেয়ে। প্রতিভার আসার খবর পেয়ে প্রভাত তার সঙ্গে দেখা করতে আসে ও কথায় কথায় প্রতিভা জানতে পারে আজও প্রভাতের বিয়ে হয়নি। প্রতিভা দাদার অনুমতি নিয়ে প্রভাতকে একদিন খাবার নিমন্ত্রণ জানায়। "সেদিন প্রভাত চলে যাওয়ার পর খুকীকে ঘুম পাড়াতে পাড়াতে সে (প্রভাত) যে আজও বিয়ে করেনি, এই কথাটা প্রতিভার মনে পড়ে মনকে এক অকারণ অনির্বচনীয় খুশিতে ভরে দিলে। সে আনন্দের রসে ঘুমন্ত খুকীর মুখে চুমা দিয়ে গভীর স্নেহে তাকে বিছানায় শুইয়ে দিলে।"—এ ধরনের গল্প জলধর খুব একটা বেশি লেখেননি।

'ছোটকাকী' ও 'নূতন গিন্নী'—এ দুটি গল্পে রবীন্দ্রপ্রভাব দুর্নিরীক্ষ্য নয়। রবীন্দ্রনাথের 'ছুটি' গল্পের প্রভাব এ-দুটি গল্পে স্পষ্ট। কবিগুরুর 'ছুটি' গল্পটি বেরিয়েছিল 'সাধনা' পত্রিকায় ১২৯৯ এর পৌষ সংখ্যায়। জলধরের 'ছোটকাকী' গল্পের প্রকাশ 'সাহিত্য' পত্রিকায় ১৩০৮ সালের কার্তিক সংখ্যায়। তবে রবীন্দ্রনাথের 'ছুটি' গল্পের মত এত সূক্ষ্মভাবে জলধরের গল্পদুটি গড়ে উঠতে পারেনি।

কয়েকটি সমকালীন প্রচলিত সামাজিক সমস্যা জলধরের মানসভুবনকে বড়ই নাড়া দিয়েছিল। বহুকালাগত স্মৃতিশাসিত সমাজে বাল্যবিধবাদের চরম দুর্গতির কথা জলধর নানা

গল্পে, উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। সমাজের কঠিন নিগড় ভাঙতে পারেননি ঠিকই তবে ভাঙবাব জন্য যে তাঁর হাত দুটি যে নিশপিশ করছিল তার প্রমাণ পাই। বারো বছরের বিধবা সুরমাকে একাদশীর দিন এক ফোঁটা জল দেওয়া গেলনা। তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে তার মৃত্যু ঘটল। এই অরুন্তুদ কাহিনি 'জল—একটু জল—' গল্পের বিষয়বস্তু। 'পোষ্টমাষ্টার' গল্পের বিষয়বস্তু পণপ্রথার মত এক দুর্নিবার অভিশাপ। গাঁয়ের মাসিক কুড়ি টাকা বেতনের পোস্টমাস্টারকে মেয়েব বিয়েব পণের টাকা জোগাড় করতে গিয়ে নিরুপায় হয়ে সরকারি তহবিল ভাঙতে হয়ও মেয়ের বিয়ের পর দিন তাকে উদ্বন্ধনে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়। এসব গল্প জলধর লিখেছেন; নিজে কেঁদেছেন, পাঠকদেরও কাঁদিয়েছেন।

'কূপের কথা', 'শেফালিকার দুঃখ' গল্প দুটি আত্মকাহিনির ঢঙে লেখা। এদুটি গল্পেও রবীন্দ্রছায়া স্পষ্ট। সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'জুতার কথা', গল্পটিও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। 'অন্ধের কাহিনী' গল্পটিকে গল্পকার ইংরেজি গল্পের অনুসরণ বললেও এটি আসলে মপাসাঁর বিখ্যাত গল্প 'নেকলেস' অবলম্বনে রচিত।

'লেখাপড়া পাগল', সংসারে একেবারে উদাসীন, সম্পূর্ণ নির্বিকার একটি মানুষ 'ঘরের কথা' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র। পরনির্ভরশীলতায় তার কোন ক্ষোভ নেই, আক্ষেপ নেই, বরং এই নির্ভরশীলতাই তার প্রাণের শক্তির উৎস। এ এক অদ্ভুত চরিত্র সৃষ্টি করেছেন জলধর— সাহিত্যে এই চবিত্রের জুড়ি মেলা ভার। অংশত হলেও শরৎচন্দ্রের 'স্বামী' গল্পের 'ঘনশ্যাম' চরিত্রের তিতিক্ষাকে মনে করিয়ে দেয়।

'মোহ' ও 'সুষমা' দুটি গল্পে দুটি বালবিধবার জাগ্রত রিরংসা ও বিবেকের দংশনে অনিবার্য স্খলন থেকে মুক্তি প্রকাশ পেয়েছে। 'মহৌষধি', 'গৃহিণীরোগ' 'কবিব্যাধি' গল্প তিনটিতে গল্পকার ব্যঙ্গের আড়ালে হাস্যরস পরিবেশন করেছেন। শেষোক্ত গল্পটি গল্পকারের একটি জানা ঘটনা অবলম্বনে লেখা। 'শিবনাথের অধিকার' ও 'এবং' এই দুটি গল্পে কোন সামান্য ঘটনা মানুষের জীবনে যে কি বিরাট পরিবর্তন আনতে পারে—তাই দেখানো হয়েছে।

'রাধারাণীর ইচ্ছা' ও 'বিচার'—দুটি বৈষ্ণবরসাশ্রিত গল্প। প্রথম গল্পে বিষয়বিবিক্ত, মহাপ্রভুগত প্রাণ এক পরম ভক্ত বৈষ্ণবের চিত্র অঙ্কিত। সংসার থেকে নিজেকে পুরোপুরি সরিয়ে নিয়ে তিনি মহাপ্রভু ও মহাপ্রভুর আখড়াকেই সার করেছিলেন। সংসারে শুধু এক ভাইঝি রাধারানির প্রতি তার টান ছিল। অদ্বৈত সংসার থেকে ছেড়ে যাবার আগে তার সব বিষয়আশয় গ্রামের মহাপ্রভুর আখড়ায় দান করে এসে পরম স্নেহে ভাইঝিটিকে কোলে তুলে নিয়ে বলল, "মা, আমি এখন আসি। নাবায়ণ তোমাকে সুখে রাখুন।···সংসারবন্ধন মুক্ত মহাপ্রভুগতপ্রাণ অদ্বৈতের চক্ষুও ছলছল করিতে লাগিল। সে তাড়াতাড়ি রাধারাণীকে কোল হইতে নামাইয়া দিয়া মাতৃচরণে প্রণাম করিয়া বাহিরে চলিয়া আসিল।" এ দৃশ্যটি বড়ই মর্ম্মস্পর্শী। পববর্তী গল্প 'বিচার'। এ গল্পেও হরিনাথ নামে ভক্ত বৈষ্ণবের চিত্র আছে। হরিনাথের জীবনসর্বস্ব নিমাই নিত্যানন্দের পথ। ক্ষমা যে বৈষ্ণবের প্রধান গুণ হরিনাথের চরিত্রে সেটির যে পূর্ণ প্রকাশ—গল্পকার সেটিই দেখাতে চেয়েছেন। তবে গল্পকার এ ধরনের গল্প খুব বেশি একটা লেখেননি।

'কাঙ্গালের ঠাকুর', 'মহামায়ার মায়া' গল্পে পরম করুণাময় ভগবানের ভক্তের প্রতি অহৈতুকী করুণার প্রকাশ আছে। জগন্নাথ দর্শন শেষে ফেরার পথে ওলাওঠা রোগে আক্রান্ত এক মৃত্যুপথযাত্রী ভক্তকে কিভাবে ভগবান জগন্নাথ তাঁর কৃপা দিয়ে বাঁচালেন—'কাঙ্গালের ঠাকুর' গল্পে তারই উল্লেখ রয়েছে। ভক্তের ডাকে ভগবান যে সাড়া না দিয়ে পারেন না—এই গল্পে তারই প্রকাশ। দেবী মহামায়া, কিভাবে মানুষের উপরে অযাচিত করুণা বর্ষণ করে তাকে সার্থক করে তোলেন 'মহামায়ার মায়া' গল্পে তাই ফুটে উঠেছে।

'বিবাহের ফর্দ্দ' গল্পে ধনীবন্ধুর ভগ্নী মিস বেলা পঞ্চাশ টাকার শিক্ষক হরিদাস মিত্রকে ভালবাসে। বন্ধু বিমল তার সঙ্গে তার বোন বেলার বিয়ের প্রস্তাব করলে সে তাকে এক দেনা-পাওনার ফর্দ দেয়। এই ফর্দের মধ্যেই রয়েছে গরিব শিক্ষকের ধনীর দুলালি কন্যাকে বিয়ে করার কয়েকটি মূল্যবান শর্ত। এর পরিণাম প্রসঙ্গে জলধর লিখেছেন, "আমার এই পত্র পাইয়া মিঃ দত্তের বাড়ীতে কি হইয়াছিল, সে সংবাদ আমি পাই নাই; কিন্তু সেইদিনই সন্ধ্যার সময় মিঃ দত্তের বাড়ী হইতে একজন বেহারা আসিয়া আমাকে সাতটি টাকা দিয়া বলিয়া গেল যে, পরদিন হইতে আমাকে আর পড়াইতে যাইতে হইবে না। তাহার পর এই তিনমাস যায়, বিমলের ভগিনীর বিবাহ হইয়াছে কিঁনা জানিনা। আমি কুড়ি টাকা বেতনের আর একটা প্রাইভেট টিউটারী পাইয়াছি, সে বাড়ীতে বিলাতী চাল নাই, অবিবাহিতা মেয়েও নাই। আমাব বেতন ও দশটাকা বাড়িয়াছে।" এই শেষটুকুর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'দেনা-পাওনা', 'পুত্রযজ্ঞ' প্রভৃতি গল্পগুলি স্মরণীয়।

'ভীষণ প্রায়শ্চিত্ত' গল্পে সতীশ পিতৃবন্ধুর বিধবা মেয়েকে ভালবাসে ও তাকে নিয়ে নিরুদ্দেশ হয়। পরে মেয়েটির সন্তান-সম্ভাবনা জেনে তাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করে এবং তারপর থেকে সে অসীম যন্ত্রণায় জীবন কাটাতে বাধ্য হয়।

জলধরের 'অপমান' ও 'পোষ্টমাষ্টার'-এ দুটি গল্পের গঠনরীতি স্বতন্ত্র। প্রথম গল্পটি দুটি ভাগে বিবৃত। প্রথমেই রয়েছে নায়ক অরুণকুমারের আত্মকথা। অল্পবয়সে তার পিতৃবিয়োগ থেকে শুরু করে মৃত্যুপথযাত্রী মাকে দেখাবার জন্য স্ত্রী-পুত্রকে নিজের দরিদ্রগৃহে আনতে জমিদার শ্বশুরের আপত্তি পর্যন্ত বর্ণিত। বাকি অংশ অরুণকুমারের স্ত্রী সুষমার উক্তি। পিতা কর্তৃক স্বামীকে অপমানের পর এক দাসীর সহায়তায় সে বহু ক্লেশে খোকাকে সঙ্গে করে স্বামীগৃহে ফিরে আসে ও কোনদিন আর বাপের বাড়িতে পা মাড়ায়নি। 'পোষ্টমাষ্টার' গল্পটি পুরোপুরি পত্রের আঙ্গিকে লেখা। এই আঙ্গিকে জলধর আর কোন গল্প লেখেনি।

আধুনিক সমালোচকদের বিচারে জলধরের গল্পগুলি সার্থক ছোটগল্প হতে পারে নি। ড. ভূদেব চৌধুরী মহাশয় জলধর সেনের গল্প সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, "জলধর সেনের গল্প-সাহিত্যকে ক্বচিৎ ছোট-গল্প ধর্মান্বিত হতে দেখা যায়। তাঁর গল্পগুলি প্রায়ই আখ্যানধর্মী—এদের Tale বা উপাখ্যান পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা চলে।" মন্তব্যটি আংশিক সত্য। তবে বহু গল্পের মধ্যে ছোটগল্প সুলভ Climaxও প্রকাশ পেয়েছে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, জলধরের গল্পে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষণীয়। ১. করুণরসের আধিক্য, ২. মৃত্যুর বাহুল্য ৩. অধিকাংশ গল্পই উত্তমপুরুষে বর্ণিত ৪. বিধবাদের প্রতি

সহানুভূতি ৫. আপন জীবনের প্রক্ষেপ ৬. সমাজচিত্রের তীক্ষ্মরূপায়ণ, ৭. কাঙাল হরিনাথের প্রভাব।

৫

যাইহোক, জলধরের প্রথম গল্পগ্রন্থ 'নৈবেদ্য' বেরিয়ে ছিল ১৩০৭ সালে। সে হিসেবে এই গল্পগ্রন্থটির প্রকাশের শতবর্ষ পূর্ণ হ'ল। এ দিক দিয়ে সংকলনটির গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। আর একটা ব্যাপার, জলধরের গল্পগুলির মধ্যে যে চিরন্তন আবেদন রয়েছে, মানবপ্রীতি রয়েছে, মানবিক মূল্যবোধ রয়েছে, আস্তিক্যবোধে বিশ্বাস রয়েছে—সর্বোপরি সমাজমানসকে উন্নত করার যে প্রয়াস রয়েছে—তা আজকের দিনেও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়। গল্পকার হিসেবে সমাজের প্রতি যে কর্তব্য আছে, দায়িত্ব আছে, দায়বদ্ধতা আছে—জলধর তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে গেছেন। ঠিক সেই কারণেই জলধর সেন আজও আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য, আজও আমাদের কাছে সমান ভাবে প্রাসঙ্গিক তা কিছুতেই বিস্মৃত হবার নয়। জলধরের গল্প সংকলনের মধ্য দিয়ে তাঁর মানসভুবনকে উদ্ভাসিত করে তোলার চেষ্টা করেছি। এক বিস্মৃতপ্রায় বরেণ্য গল্পকারকে বর্তমান পাঠক সমাজের কাছে তুলে ধরার যে প্রয়াস করেছি তা কতখানি সার্থক হয়েছে, সুধী পাঠক সমাজ তা বিচার করবেন।

এবারে সংকলন প্রসঙ্গ। কয়েকটি পর্যায়ে আমাকে সংকলনটি প্রস্তুত করতে হয়েছে। প্রথমে গল্প সংকলন, দ্বিতীয় নির্বাচন ও তৃতীয় পর্যায়ে মুদ্রণের জন্য কপি প্রস্তুতকরণ।গল্পগুলি সংকলন করতে গিয়ে আমাকে নানা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল কারণ কোন গ্রন্থাগারেই জলধরের সবগুলি গল্পগ্রন্থ পাওয়া যায়নি। সংকলনের জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ছাড়া চৈতন্য লাইব্রেরি, হিরণ লাইব্রেরি, কোন্নগর শিবচন্দ্রদেব স্মৃতি পাঠাগারে যেতে হয়েছে। কোন কোন লাইব্রেরিতে জেরক্সের ব্যবস্থা একেবারেই নেই, আবার ব্যবস্থা থাকলেও সেখানে নানা সীমাবদ্ধতা। তাই দিনের পর দিন গ্রন্থগারগুলিতে গিয়ে হাতে লিখে কপি প্রস্তুত করতে হয়েছে।

এবার আসি কপি প্রস্তুত প্রসঙ্গে। সুধীজনের মতামত নিয়ে সমস্ত পুরনো বানান একরকম বাদ দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির বানান ব্যবহার করতে গিয়ে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়েছে। তবে কয়েকটি ক্ষেত্রে মূলে ব্যবহৃত বানান ব্যবহার করা প্রয়োজন বলে মনে করেছি। যেমন—১. গল্পগ্রন্থ ও গল্পগুলির শিরোনামের ক্ষেত্রে ২. উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে ৩. সাময়িক পত্রিকার নামের ক্ষেত্রে। অন্য সব স্থলে আকাদেমি প্রচলিত বানান যথাসম্ভব মেনে চলার চেষ্টা করেছি। বানান ছাড়া মূলের আর কিছুই পরিবর্তন করা হয়নি। জলধরের রচনায় কোন কোন স্থলে সাধু-চলিতের মিশ্রণ রয়েছে এবং যতি চিহ্নের প্রয়োগও মাঝে মাঝে ত্রুটিপূর্ণ বলে মনে হয়েছে।

সংকলিত গল্পগুলির শেষে যে সাময়িক পত্রিকায় সংশ্লিষ্ট গল্পটির প্রক।শ ঘটেছিল সেই পত্রিকার প্রকাশকাল সহ নামোল্লেখ করা হয়েছে। পত্রিকার নামের ক্ষেত্রেও পুরনো বানান ব্যবহৃত হয়েছে। পাঠকদের সুবিধার জন্য মূলে প্রয়োজনে পাদটীকাও সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

৬

শেষে ঋণস্বীকার। সংকলনটিকে ত্রুটিমুক্ত করার জন্য বহু বিদ্বজ্জনের সাহায্য নিয়েছি। বিশিষ্ট অধ্যাপক ও গবেষক ড. স্বপন বসুর পরামর্শ সব সময় পেয়েছি। বন্ধুবর অশোক উপাধ্যায় জলধরের নানা রচনা ও গ্রন্থের সন্ধান দিয়েছেন। তাঁদের শ্রদ্ধা জানাই। যশস্বী অধ্যাপক শ্রদ্ধাভাজন ড. বিজিতকুমার দত্ত মহাশয় তাঁর মূল্যবান সময় ব্যয় করে প্রস্তুত সংকলনের একটি ভূমিকা লিখে দিয়ে আপন উদারতা ও মহত্ত্বের পরিচয় দিয়েছেন। নিঃসন্দেহে এটি গ্রন্থের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করি। বেলুড় রামকৃষ্ণমিশন শিক্ষণমন্দিরের (বি. এড. কলেজ) অধ্যক্ষ শ্রী সুবোধকুমার মণ্ডল মহাশয় সংকলনটি প্রস্তুতির শুরু থেকেই উৎসাহ দিয়ে এসেছেন—তাঁকেও শ্রদ্ধা জানাই। শিক্ষণমন্দিরেব শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মিবন্ধুগণও আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। এছাড়া ড. বাবিদবরণ ঘোষ, জলধর পৌত্র ড. কাজল সেন ও ড. আবুল আহসান চৌধুরী আমাকে নানা তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন—এঁদের প্রত্যেককে আমি আমার ঐকান্তিক কৃতজ্ঞতা জানাই। প্রুফ সংশোধন ও বানান প্রভৃতি ব্যাপারে সযত্ন দৃষ্টি দিয়ে সংকলনটিকে ত্রুটিমুক্ত করতে আন্তরিক সহযোগিতা করেছেন তরুণ গবেষিকা স্নেহাস্পদ বাসন্তী বিশ্বাস। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ও চৈতন্য লাইব্রেরির কর্মিবন্ধুগণ নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন—তাঁদের ধন্যবাদ জানাই।

সংকলনটি প্রস্তুতকালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কর্মী ও আমার যৌবনের বন্ধু শঙ্করলাল ভট্টাচার্যের অকাল প্রয়াণ ঘটেছে—তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানাই।

উপর্যুক্ত গ্রন্থাগারগুলি ছাড়া বেলুড় রামকৃষ্ণমিশন শিক্ষণমন্দির, বিদ্যামন্দির, জনশিক্ষা-মন্দির, বেলুড় পাবলিক লাইব্রেরি, বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরির প্রচুর সাহায্য পেয়েছি। বিশিষ্ট বন্ধু প্রমথনাথ সেনগুপ্ত, অগ্রজপ্রতিম বন্দিরাম চক্রবর্তী, আনন্দবাজার পত্রিকার ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী ও সুনীল দাস, প্রকাশক বন্ধুদ্বয় পরিতোষ ভট্টাচার্য ও অনুপ মাহিন্দার আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। শিক্ষণমন্দিরের শিক্ষার্থীবন্ধুরা নিরন্তর উৎসাহ দিয়েছেন—তাঁদের কাছে আমি ঋণী হয়ে রইলাম।

বাণী প্রকাশনের বিদ্যোৎসাহী, রুচিশীল ও সদালাপী কর্ণধার সমীরকুমার মজুমদারের আন্তরিক আগ্রহে বইটি প্রকাশিত হল। তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা রইল। নব গৌরাঙ্গপ্রেসের কর্মিবন্ধুরা আমার দুষ্পাঠ্য পাণ্ডুলিপি সযত্নে বৈদ্যুতিন যন্ত্রলিপিতে তুলে ধরেছেন। সুশোভন প্রচ্ছদ তৈরি করে দিয়েছেন শ্রদ্ধেয় সোমনাথ ঘোষ।

সহধর্মিণী পৃথা ও পুত্র পূষণের আন্তরিক সহযোগিতা বরাবর পেয়েছি। সংকলনটির প্রতি বাংলার সুধী পাঠক সমাজের দৃষ্টি আকর্ষিত হলে আমার দীর্ঘদিনের শ্রম সার্থক হবে। মুদ্রণ প্রমাদ ও অনবধানজনিত ত্রুটির জন্য ক্ষমাপ্রার্থী।

বিনীত

সুবিমল মিশ্র

কলকাতা পুস্তকমেলা, ২০০২

রামকৃষ্ণমিশন শিক্ষণমন্দির

বেলুড়মঠ, হাওড়া।

যেভাবে আছে

অন্ধের কাহিনী

আমি অন্ধ। জন্মান্ধ নহি, আজ একবৎসর মাত্র অন্ধ হইয়াছি; তাই চক্ষু না থাকার কি দুঃখ তাহা বুঝিতেছি। এই একটি বৎসর আমার নিকট শতবর্ষের ন্যায় দীর্ঘ বলিয়া মনে হইতেছে। স্মৃতি আজও পুরাতন হয় নাই; অন্ধের স্মৃতি সমধিক তীক্ষ্ণ, তাই এখনও সেই অতীত চক্ষুষ্মান জীবনের কথা মনে পড়িতেছে; সেই বিচিত্র সৌন্দর্যপর্ণা, শ্যামলা-ধরিত্রী, রক্তিম-রাগ-রঞ্জিত উষার বিমল-বিভা, চন্দ্রমাশালিনী শারদ-যামিনীর স্নিগ্ধ শোভা এবং সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সম্পদ নরনারীর প্রফুল্ল মুখ-বিশ্বের সকল সামগ্রীব উপর বিধাতা আজ একবৎসর পূর্বে যে যবনিকা প্রসারিত করিয়া দিয়াছেন, এ জীবনে তাহা আর উত্তোলিত হইবে না। অন্ধকার, চারিদিকে নিশীথের ঘন অন্ধকার পরিব্যাপ্ত! চক্ষুহীনের কি কষ্ট তাহা ভাষায় প্রকাশ করিবার ক্ষমতা নাই; কিন্তু কেন এমন হইল তাহা যাহাদের চক্ষু হারাইয়া জীবন ব্যর্থ হয় নাই, তাহাদের কি শুনিবার অবসর হইবে? শুনিলে তোমরা বুঝিতে পারিবে আমার মত হতভাগ্য পৃথিবীতে অধিক নাই।

আমি পল্লিগ্রামের গৃহস্থের সন্তান; পিতা সম্পন্ন অবস্থার লোক ছিলেন না, ভাল লেখাপড়া শিখিতে পারি নাই। ভদ্র কায়স্থ ঘরের মূর্খের অনন্ত বিপদ; ভদ্রলোকের উপযোগী কোন জীবিকা অবলম্বন করিবার ক্ষমতা নাই, কোন নীচ কাজ করাও বিশেষ অগৌরবের। পিতা সামান্য তহশিলদারি করিতেন; মা আমার লক্ষ্মী ছিলেন; তাঁহার গুণে পিতার সামান্য উপার্জনেও আমরা কোনদিন অন্নকষ্ট সহ্য করি নাই। পল্লিগ্রামের পিতার কুপোষ্য, নিষ্কর্মা, আড্ডাপ্রিয় লোকের মত আমিও নির্ভাবনায় আড্ডায় আড্ডায় ঘুরিয়া বেড়াইতাম, বৃদ্ধ পিতা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া পরিবার প্রতিপালন করিতেন। স্নেহাধিক্যবশত তিনি আমাকে কোনদিন তাঁহার দুঃখকষ্টের কথা বলেন নাই—ঘরে আমি একমাত্র সন্তান।

হতভাগ্যের সুখ বিধাতার সহ্য হয়না! একটি স্নেহমুগ্ধ, নির্বোধ বালকের অজ্ঞতাজনিত সুখ ও তাঁহার সহ্য হইলনা; বিধাতারই দোষ দিই কেন? নিজের অদৃষ্টের বিড়ম্বনা। ষোল বৎসর যখন বয়স তখন ওলাওঠায় মাতৃদেবী আমাদের ছাড়িয়া গেলেন; কষ্ট কি, সেই দিন প্রথম জানিতে পারিলাম। সেই কষ্টের আরম্ভ—তাহার পর নদী-তরঙ্গের মত কষ্টের উপর কষ্টের প্রবাহ আসিতেছে, শুষ্ক, জীর্ণ, লঘু তৃণের মত আমি ভাসিয়া চলিতেছি। জানিনা এ কষ্টের, এ নিদারুণ দুঃখ-দারিদ্রের অবসান কোথায়?

বলিয়াছি বাবার বয়স হইয়াছিল; এ দুর্ভাগ্য বাঙালাদেশে তাঁহার মত পক্ককেশ, জরাজীর্ণ বৃদ্ধের হস্তে কন্যা সম্প্রদান করিবার আগ্রহ রাখে এমন কায়স্থ সন্তানের অভাব নাই, আমার মাতৃবিয়োগে বাবা বড় কাতর হইয়াছিলেন, সংসারে বিরাগ জন্মিয়াছিল।

তাই শুভানুধ্যায়ী বন্ধুগণের পরামর্শ সত্ত্বেও একটি বালিকার ইহ-পরকাল নষ্ট করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইলনা; কিন্তু ঘরে একটিও স্ত্রীলোক না থাকায় সংসার প্রায় অচল হইয়া

উঠিল; সুতরাং সচল করিবার উদ্দেশ্যে তিনি এক একাদশবর্ষীয়া পুত্রবধূ অবিলম্বে গৃহে আনিলেন; তখন আমি সপ্তদশ বৎসর অতিক্রম করিয়াছি।

মানুষ এক ভাবিয়া কাজ করে, অনেক সময় তাহার ফল হয় বিপরীত। বিবাহের ছয় মাস পরে আমার পিতার কাল হইল। গৃহে আমরা স্বামী-স্ত্রী, কিন্তু কপর্দক মাত্র সম্বল নাই; গ্রামস্থ পাঁচজন সহৃদয় লোকের সাহায্যে কোন প্রকারে পিতৃদায় হইতে উদ্ধার হইলাম। তাহার পর একদিন কি খাইয়া কাটাইব তাহারও উপায় দেখিলাম না। ইহার উপর আর এক বিপদ উপস্থিত; বাবা যে জমিদারের চাকরি করিতেন, তাঁহার হৃদয় নামক পদার্থটা ছিল না। বাবা প্রাণপণে তাঁহার প্রভুর সেবা করিয়াছিলেন প্রত্যুপকার স্বরূপ ভৃত্যবৎসল মনিব হিসাব নিকাশ করিয়া অনেক টাকার জন্য বাবাকে দায়ি করিলেন। বাবা তখন স্বর্গে; দেনার দায় আমার ঘাড়েই পড়িল। সম্পত্তির মধ্যে একখানি খোড়ো বাড়ি, জমিদারের দৃষ্টিপাত মাত্র দেখিতে দেখিতে স্থাবর সম্পত্তিটুকু উড়িয়া গেল। এই বিস্তীর্ণ পৃথিবীতে আমাদের স্বামী-স্ত্রীর পরিধেয় বস্ত্র আবৃত, শোক-কাতর, দারিদ্র্য কষাহত অবসন্ন দুইটি দেহ ভিন্ন স্থাবরাস্থাবর আর কিছুই বর্তমান রহিলনা। অষ্টাদশ বৎসব বয়সে, প্রথম যৌবনে, যখন পৃথিবী স্বর্গ বলিয়া মনে হয়।—যখন মানুষ উত্তপ্ত শোণিতের উন্মত্ততায় মনে করে এ বিপুল জগতে সুখ অনন্ত, আশা অনন্ত, অনন্ত জীবন অনন্ত তৃপ্তির জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে,—সেই বিকাশোন্মুখ যৌবনে, দ্বাদশবর্ষীয়া পত্নী লইয়া, আমি সংসার সাগরে ভাসিলাম।

আপাতত শ্বশুরালয়েই আশ্রয় পাইলাম। আমার মত অক্ষম যুবককে যিনি কন্যাদানে বাধ্য হইযাছিলেন, তাঁহার আর্থিক অবস্থা যে শোচনীয, তাহা বলাই বাহুল্য; আমাদের স্বামী-স্ত্রীকে দীর্ঘকাল প্রতিপালন করিবার সাধ্য তাঁহার ছিল না।

তাঁহার কোন আত্মীয় কলিকাতায় একটি ছাপাখানার অধ্যক্ষ ছিলেন; শ্বশুর মহাশয় আমার জন্য তাঁহাকে ধরিলেন। ছাপাখানার কর্তা মহাশয় দয়াপরবশ হইয়া আমাকে কলিকাতায় লইয়া চলিলেন। আমার স্ত্রী তাহার পিত্রালয়েই রহিল।

আমার মত বিদ্যাবুদ্ধি সম্পন্ন যুবককে ছাপাখানার ম্যানেজার যে কর্ম দিতে পারেন অনুগ্রহ করিয়া তিনি আমাকে তাহাই জোগাড় করিয়া দিলেন। একটি ছাপাখানায় কিছুকাল শিক্ষানবিশি করিয়া আমি ছাপাখানার ভূতের দলে প্রবেশ করিলাম। সংসার সাগরে ভাসিতে ভাসিতে যে তৃণ পাইলাম, তাহাই অবলম্বন করিলাম। কিছুদিন পরে মাসিক পনেরো টাকা বেতনে সরকারি ছাপাখানায় একটি কম্পোজিটারের কাজ জুটিয়া গেল।

আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে পাশের মূল্য পনেরো টাকায় নামে নাই, আমার বাবা চিরদিন সাতটাকা বেতনে তহশিলদারি কর্ম করিয়া আসিতেছেন, আমি অল্পদিনের মধ্যে তাহার ডবল মূল্যের চাকরি লইয়া নিজের অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দিলাম। কখন কখন অতিরিক্ত দুই চারি ঘণ্টা খাটিতে হইত, কিন্তু সে জন্য আক্ষেপ ছিলনা, দুই পয়সা অতিরিক্ত আয়ের সম্ভাবনা দেখিলে মানুষ সকলরকম কষ্টই সহ্য করিতে পারে; আমিও সংসার সুখের আশায় মুগ্ধ হইয়া পরিশ্রমে কোনদিন পশ্চাৎপদ হই নাই।

স্ত্রীকে আর কতদিন বাপের বাড়িতে ফেলিয়া রাখিব? ভাবিলাম কষ্টেসৃষ্টে এই সামান্য

আয়েই আমাদের দুজনের চলিয়া যাইবে। সুলোচনাকে কলিকাতায় আনিলাম; কলিকাতায় তালতলায় একখানি ছোট খোলার বাড়ি ভাড়া লইয়া তাহাতেই দুজনে বাস করিতে লাগিলাম। অর্থকষ্টের অভাব ছিল না, কিন্তু সে জন্য আমাদের মনের সুখ নষ্ট হয় নাই,—চির অভাবের মধ্যেই ত আমরা প্রতিপালিত। পরমেশ্বর যতটুকু সুখ দিয়াছেন, তাহারই জন্য তাঁহাকে প্রাণ খুলিয়া ধন্যবাদ দিতাম, তখন মনে মনে বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, তিনি দয়াময়!

কিছুদিন পরে—কতদিন পরে ঠিক মনে নাই, আমার স্ত্রীর কলিকাতা আসিবার কয়েক বৎসর পরে বটে, একদিন জ্যৈষ্ঠ মাসে আমার কোন সহযোগী কম্পোজিটারের ছেলের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে আমরা সপরিবারে নিমন্ত্রিত হইলাম। এই কম্পোজিটারটি আমার মুরুব্বি মহাশয়েরই আত্মীয় এবং আমার পরম বন্ধু। তিনি বিশেষ জেদ করিয়া বলিলেন, আমার স্ত্রীকে যাইতেই হইবে, তাঁহাবা কিছুতেই ছাড়িবেন না।

তাঁহার অনুরোধ এই সকল কারণে অগ্রাহ্য করিতে পারিলাম না, সুলোচনাকে বন্ধুর অনুরোধ জ্ঞাপন করিলাম। বাঙলার স্ত্রীলোক সর্বত্র এক ছাঁচে ঢালা; তিনি প্রথমে অসম্মত জানাইয়া বিস্তর পীড়াপীড়ির পর বলিলেন, "আমার লজ্জা কবে, এমন খালি গায়ে কি মানুষের বাড়ি যাওয়া যায়? লোকে কি বলিবে?" আমি বলিলাম, "লোকে বলিবে ইহারা বড় গরিব, একখানা গহনাও নাই। তাহাতে ক্ষতি কি? সুলোচনা কিছুতে যাইবেন না। রমণীর অবাধ্যতা যখন প্রবল হয়, তখন পুরুষের কোন যুক্তি ফলপ্রদ হয়না। অগত্যা আমার হিতৈষী বন্ধু মহাশয়ের নিকট হইতে একজোড়া বালা, একজোড়া তাগা আর একছড়া হার আনিয়া দিলাম। আমার স্ত্রী নিমন্ত্রণ রাখিতে গেলেন, ঘণ্টাকতক সেখানে কাটাইয়া সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পূর্বেই তিনি বাসায় ফিরিয়া আসিলেন।

সন্ধ্যার পর বাসায় ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম আমার স্ত্রী পাগলিনির ন্যায় কাঁদিতেছেন; না জানি কি অনর্থ পাত হইয়াছে ভাবিয়া আমার বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠিল। তিনি আমাকে দেখিয়া অধিক বেগে কাঁদিয়া উঠিলেন, তাহার পর আমার পায়ের উপর আছড়াইয়া পড়িয়া বলিলেন—"সর্বনাশ হয়েছে গো, পরের তাগা হারিয়ে বসে আছি! এখন আমাদের কি উপায় হবে!" ছাতাটি হাতে করিয়াই আমি শানের উপর বসিয়া পড়িলাম।

পৃথিবী আমার চক্ষের উপর ঘুরিতে লাগিল; চতুর্দিক অন্ধকার দেখিলাম। পনেরো টাকা বেতনের কম্পোজিটার আমি, বসু মহাশয়ের দুইশত টাকা মূল্যের তাগা আমি কি রকম করিয়া তাঁহাকে ফিরাইয়া দিব! জগৎ শূন্যময় বোধ হইল।

অনেকক্ষণ ভাবিয়া যখন কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না, তখন অগত্যা নিরাশার সান্ত্বনায় বুক বাঁধিতে হইল। কিরূপে তাগা হারাইল, তাহার কারণানুসন্ধানে জানিতে পারিলাম, আমার স্ত্রীর তাগা দুগাছা ঢলঢল করায় তিনি তাহা খুলিয়া বালিশের নীচে রাখিয়া কলে হাতমুখ ধুইতে গিয়াছিলেন; সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া অন্য কার্যে ব্যস্ত ছিলেন; তাগার কথা মনে ছিল না। তাগার কথা মনে পড়ায়, তিনি তাগা জোড়াটা আঁচলে বাঁধিয়া রান্না করিতে যাইবেন ভাবিলেন এবং বালিশের নীচে হইতে তাহা আনিতে গেলেন। দরজা

খোলা ছিল, বালিশ তুলিয়াই দেখেন তাগা নাই। ঘরের সর্বস্থান অনুসন্ধান করিয়াও আর তাহা মিলিলনা। হৃদয়ের আগ্রহে যদি খোয়া জিনিষ পাওয়া যাইত, তাহা হইলে পুত্রহারা জননীর রোদন ব্যর্থ হইত না।

একটা চিন্তা আমার সর্বাপেক্ষা কষ্টকর হইয়াছিল। বসু মহাশয়কে যদি বলি তাগা জোড়াটা হারাইয়া গিয়াছে! কিন্তু তিনি কি বিশ্বাস করিবেন? আমি গরিব; তাঁহার এবং তাঁহার স্ত্রীর যদি মনে হয় আমি তাগা বিক্রয় করিয়া খাইয়াছি, তবে আমি কেমন করিয়া তাঁহাকে বিশ্বাস করাইব যে, সত্যই তাগা হারাইয়া গিয়াছে। পুলিশ আসিয়া বাড়ি খানাতল্লাশি করিলে অপমানের সীমা নাই। আমি গরিব, ন্যূনাধিক দুইশত টাকা ভাঙিয়া সোনার তাগা গড়াইয়া বসু মহাশয়কে দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব; কিন্তু আর উপায় নাই। আমার সুনাম ও কর্তব্য একদিকে, অন্যদিকে আমার জীবন। জীবনপণ করিয়া আমি আমার সুনাম ও কর্তব্য বজায় রাখিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলাম। আমার স্ত্রীকে বলিলাম, তিনি এই তাগা হারানো সম্বন্ধে যেন কাহারও নিকট কোন উচ্চবাচ্য না করেন।

কিন্তু পরদিন প্রভাতে অলংকার কোথায় পাইব? রাত্রি প্রভাত হইল; আমি ভাবনার সমুদ্রে ডুবিয়া রহিলাম। আমার স্ত্রী অপরাধিনীর মত এক কোণে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বেলা হইলে সেভিংস ব্যাঙ্কের খাতাখানি বাহির করিলাম; দেখিলাম তাহাতে বিয়াল্লিশ টাকা ছয় আনা মজুত। কখন কখন দুই এক টাকা বাঁচাইয়া ডাকঘরে সুদে আসলে এই টাকা সঞ্চিত ছিল। এটাকা দুভরি সোনার পক্ষে যথেষ্ট নহে; আমাকে আর একটি দিনের মধ্যেই আটভরি ওজনের তাগা দিতে হইবে। পরের গহনা দুদিনের বেশি কি বলিয়া ঘরে রাখিব?

অপরাহ্নে বাহির হইয়া পড়িলাম; তালতলায় এক স্বর্ণকারের জুয়েলারি ফার্ম ছিল; তাহার দোকানে গিয়া তাহাদের তৈয়ারি স্বর্ণালংকারগুলি দেখিতে চাহিলাম। তাহারা যে কয়েকজোড়া তাগা বাহির কবিল, তাহার মধ্যে একজোড়া ঠিক সেই হারানো তাগার মত; তত বড়, সেই রকম কাজ করা, ওজনের ও সেই রকম বলিয়া বোধ হইল। মূল্য জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম, এক শত আশি টাকা তাহার দাম। আমি এই রকমই মনে করিয়াছিলাম। পরদিন আসিব বলিয়া দোকান পরিত্যাগ করিলাম।

টাকা কোথায়! দেড়শত টাকার আবশ্যক; আমার মত সামান্য কম্পোজিটারকে কলিকাতা শহরের কোন লোক দেড়শত টাকা ধার দিতে পারে, একথা সম্ভব বলিয়া মনে হইল না। লোকেরও সেজন্য অপরাধ দেওয়া যায় না; আমার কি দেখিয়া তাহারা টাকা দিবে? কয়েকজন কম্পোজিটার বন্ধুর নিকট চেষ্টা করিলাম; তাহাদের অধিকাংশের অবস্থা আমার মত। শেষে জানিতে পারিলাম আমাদের প্রেসের যিনি বড়বাবু তিনি মহাজনি করেন; স্থির করিলাম, তাঁহার কাছেই ধার লইব। কিন্তু এত টাকা ধার লইবার কি কারণ দেখাইব? সত্য কথা বলা যায় না, মিথ্যাই বলিতে হইবে; শ্বশুরের কোন আসন্ন বিপদের কথা জানাইয়া টাকা লইব। পাঠক, আমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া ঘৃণা করিতেছেন, কিন্তু

সত্যমিথ্যা তখন আমার জ্ঞান ছিল না। আমার তখন একমাত্র কথা মনে জাগিতেছিল—তাগা পরদিনই ফেরত দিতে হইবে!

রাত্রে আর বড়বাবুর কাছে গেলাম না, বাসায় ফিরিয়া আসিলাম; আসিয়া দেখি আমার স্ত্রী একস্থানেই বসিয়া রহিয়াছেন। এই দুদিনে বেচারার শরীরে অর্ধেক রক্ত শুকাইয়া গিয়াছে। আমার নিজের মানসিক কষ্টের উপর তাহার অবস্থা দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছিল; আমি তাহার হাত ধরিয়া তুলিলাম, তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া, আমি যাহা মতলব করিয়াছিলাম তাহা সকলই খুলিয়া বলিলাম। সে বলিল, "এ টাকা শোধ হইবে কি করিয়া?"

আমি বলিলাম, সুলোচনা, কিছু চিন্তা করিওনা; যদি আমার চক্ষু দুটি বজায় থাকে ত আমি সম্বৎসরের মধ্যে এ ঋণ পরিশোধ করিব; তোমার মুখ যদি প্রফুল্ল দেখিতে পাই তাহা হইলে আমি পরিশ্রমকে পরিশ্রম বলিয়া মনে করিবনা। তুমি আর অধীরা হইওনা।"

সুলোচনা নিরাশার সুরে বলিল, "বুঝিয়াছি, মান বাঁচাইবার জন্য নিজের সুখ, নিজের শরীর সমস্ত নষ্ট করিবে স্থির করিয়াছ; আমিই তোমার সর্বনাশ করিলাম।"

পরদিন প্রাতঃকালে বড়বাবুর কাছে তমসুক লিখিয়া দিয়া একশত চল্লিশ টাকা কর্জ লইলাম। বড়বাবুর সুদ কিছু বেশী, কম্পোজিটারগণ অনেক সময় তাঁহাকে 'যাশু' বলিত। হউক, আমি তাঁহার নিন্দা করিবনা, অসময়ে তিনি আমার বড় উপকার করিলেন। মাসে শতকরা দুই টাকা সুদের কড়ারেই টাকা লইলাম। তমসুকের গোড়াতেই কিস্তিবন্দি ছিল, প্রতি মাসে পনর টাকা করিয়া শোধ করিতে হইবে। নিজের অবস্থার কথা না ভাবিয়া, কোন চিন্তা না করিয়া বড় বাবু যে সর্ত করিলেন তাহাতেই রাজি হইলাম; গহনা যে আজ ফেরত দিতে হইবে।

আফিস হইতে সকালে সকালে ফিরিয়া তাগা জোড়াটা ক্রয় করিলাম। তাহার পর সন্ধ্যার পূর্বে বাবু মহাশয়ের বাড়ি গিয়া বালা, তাগা আর হার ফেরত দিলাম। কার্যবশে অলংকার ফেরত দিতে দুদিন বিলম্ব হইয়াছে বলিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম। বসু মহাশয় উদার হাস্যে বলিলেন, "সেজন্য এত সঙ্কুচিত হইতেছ কেন? এ বিলম্বের জন্য ত আমার কোন ক্ষতি হয় নাই।" তিনি অলংকারগুলির দিকে না চাহিয়াই তাহা অন্তঃপুরে গৃহিণীর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। আমি নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

এইবার ঋণের ভাবনা মাথার মধ্যে উপস্থিত হইল। কি করিয়া মাসিক পনেরো টাকা ও টাকার সুদ যথানিয়মে বড়বাবুকে দিব? পনেরো টাকা মাসে উপার্জন করি, একস্ট্রা কাজে কোন মাসে দুই চারি টাকা হয়। দীর্ঘকাল স্বামী-স্ত্রীতে অনাহারে থাকিয়া ঋণ শোধ করা কখনই সম্ভব পর নহে। সুলোচনাকে শ্বশুরালয়ে পাঠাইয়া যে ব্যয় সংক্ষেপ করিব সে সম্ভাবনাও নাই; শ্বশুর মহাশয়ের অবস্থা এদিকে অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। অনাহারে মৃত্যুই যদি অনিবার্য হয়, কলিকাতায় একত্র থাকিয়া দুইজনে মরিব। সুলোচনা আমার সঙ্গে থাকিয়া সমদুঃখ ভোগ করিবার জন্য প্রস্তুত হইল, বলিল, 'আমার নির্বুদ্ধিতার জন্য তোমার এত জ্বালা, আর এ দুর্দিনে তোমাকে বিপদে ফেলিয়া কোন মুখে বাপের বাড়ি গিয়া বসিয়া থাকিব? দুঃখ সহিতে

পারিবনা ত হিন্দুর মেয়ে হইয়া জন্মিয়াছিলাম কেন?" মুহূর্তের জন্য মনে হইল জগতের মধ্যে আমি সর্বাপেক্ষা দুঃখী নহি, আমার সহিত অবস্থা পরিবর্তন করিতে চায় খুঁজিলে পৃথিবীতে এমন লোক ও মেলে। প্রিয়তমা পত্নীর সেই প্রণয়কে হৃদয়ের অক্ষয় কবচ স্বরূপ গ্রহণ করিয়া ভগবানের করুণায় নির্ভর করিয়া, আমার ত্রিশ বৎসরের যৌবনের সকল শক্তি, সকল দক্ষতা, সকল চিন্তা, ঋণ-শোধরূপ কঠোর ব্রত সাধনার অঙ্গ বিবেচনা করিয়া, অতি দুষ্কর কর্ম সাধনে রত হইলাম। যাহা করিলাম তাহার অধিক কেহ পারে, একথা আমি বিশ্বাস করিনা;—সকলে ততখানি পারে না, একথা নিশ্চয়।

যে খোলার বাড়িখানাতে এতদিন সপরিবারে বাস করিতেছিলাম, তাহার ভাড়া কিছু বেশি ছিল; তাহা ত্যাগ করিয়া আর একটি খোলার বাড়ির একখানা ঘর মাসিক পাঁচ শিকায় ভাড়া লইলাম; একবেলা আহার ত্যাগ করিলাম। সমস্তদিন পরে সন্ধ্যার সময় দুটি মোটা চাউলের ভাত কোনদিন বেগুন পোড়া দিয়া, কোনদিন বা আধ পয়সার চিংড়িমাছ দিয়া উদরস্থ করিতাম; তাহার পর অর্ধ-পূর্ণ উদরে বহুবাজারের 'বাসন্তীপ্রেসে' ঠিকা কাজ করিতে যাইতাম। সেখানে প্রত্যহ চারি পাঁচ ঘণ্টা কাজ করিয়া রাত্রি বারোটার সময় বাসায় ফিরিতাম।

অতি দুঃখের দিনও কাহারও পড়িয়া থাকে না; আমার দিনও পড়িয়া রহিলনা। কিন্তু বড় কষ্টে দিন কাটিতে লাগিল; আমার শরীর দিনদিন অবসন্ন হইয়া পড়িল; তথাপি আমার লক্ষপথ হইতে আমি বিচলিত হইলাম না। ছয়মাস পরে আমার মাথার অসুখ হইল; মধ্যে মধ্যে মাথা ঘুরিয়া উঠে, শরীর এত দুর্বল যে নিজের শরীর টানিবার সামর্থ্য পর্যন্ত ক্রমে কমিয়া আসিতে লাগিল। উপযুক্ত আহার নাই, চক্ষে ঘুম নাই, মনে শান্তি নাই, দুঃখময়, কষ্টময়, অসহনীয় জীবন প্রতিদিন অবিরাম পরিশ্রমে পাত করিতে লাগিলাম। জীবনের ভার এবং কর্তব্যের কঠোরতা কি দুর্বহ!

এমনি করিয়া আটমাস কাটিয়া গেল। পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ, এ আটমাসের মধ্যে আমি একদিনও শয্যাগত হইয়া পড়ি নাই। আট মাসের শেষে বড়বাবুর দেনা শোধ করিয়া তমসুক ফিরাইয়া লইয়া বাসায় আসিলাম; নিঃশেষিত তৈল নির্বাণোন্মুখ দীপশিখা নৈশবায়ু তাড়নায় যেমন প্রতি মুহূর্তেই অন্ধকারে বিলীন হইবার উপক্রম করে, আমার নিঃশেষিত শক্তি জীবনও সেইরূপ মৃত্যুর চির অন্ধকারে অচিরে আচ্ছন্ন হইবে বলিয়া অনুভব করিতে লাগিলাম। দেনা শোধ করিয়া মনের ভার কমিয়া গেল বটে, কিন্তু দেহের ভার দুর্বহ হইয়া উঠিল; যে উৎসাহে এতদিন অমানুষী পরিশ্রম করিয়াছি, সে উৎসাহ আজ শেষ হইয়াছে, গৃহে আসিয়া সন্ধ্যাকালে শ্রান্ত দেহে শয্যা গ্রহণ করিলাম।

পরদিন প্রাতঃকালে আর বিছানা হইতে উঠিতে পারিনা; বোধ হইল দেহের সমস্ত রক্ত জল হইয়া গিয়াছে। অনেক কষ্টে শয্যা ত্যাগ করিলাম; চক্ষে অসহ্য বেদনা বোধ হইতে লাগিল। আমার স্ত্রী বলিলেন, দুটি চক্ষুই 'করম্‌চার' মত লাল হইয়াছে! যত বেলা বাড়িতে লাগিল, তত যন্ত্রণার বৃদ্ধি হইল। প্রেসে যাইতে পারিলাম না। অতি কষ্টে, অনিদ্রায় সে রাত্রিও অতিবাহিত করিলাম।

রাত্রি প্রভাত হইলে মেডিকেল কলেজের হাসপাতালে চক্ষু দেখাইবার জন্য উপস্থিত

হইলাম। বসু মহাশয়ের এক ছেলে সেখানকার ডাক্তার। তিনি আমাকে তাঁহাদের সাহেবের কাছে লইয়া গেলেন; সাহেব যন্ত্রাদির সাহায্যে চক্ষু পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, —যে কথা বলিলেন, তাহা মৃত্যুকাল পর্যন্ত আমার মনে থাকিবে।

তিনি বলিলেন, আমার দুটি চোখই গিয়াছে, চিকিৎসার আর সময় নাই।

দৃষ্টিশক্তি বিলুপ্ত হইবার পূর্বেই আমি জগৎ অন্ধকার দেখিলাম। অন্ধত্ব আসিয়া আমাকে গ্রাস করিতেছে; অর্ধাশনে আটমাস কাটাইয়াছি, কিন্তু অনশন ত অভ্যাস করিতে পারি নাই, অভাগিনি সুলোচনা কাহার দ্বারে গিয়া দাঁড়াইবে? অশ্রুজলে আমার উভয় গণ্ড ভাসিয়া গেল। আত্মসংবরণ করিতে পারিলাম না।

আমাকে শোকাকুল ও অধীর দেখিয়া প্রবোধবাবু দয়া করিয়া একখানা গাড়িতে তুলিয়া আমাকে আমার সেই খোলার ঘরে রাখিয়া আসিলেন। সকল কথা শুনিয়া আমার স্ত্রী মূর্ছিতা হইয়া পড়িলেন; আমাদের উভয়ের পরস্পরকে সান্ত্বনা দেওয়ার কোন সামর্থ্য রহিল না।

প্রবোধবাবুর পিতা আমার প্রথম মনিব বসু মহাশয়, দয়াপরবশ হইয়া আমাদের দুইজনকে তাঁহার গৃহে লইয়া গেলেন; প্রবোধবাবু প্রাণপণে আমার চক্ষুর চিকিৎসা করিতে লাগিলেন; কিন্তু সকল চিকিৎসা বৃথা হইল। ডাক্তার সত্যই বলিয়াছিলেন, চিকিৎসার আর সময় নাই! দুই সপ্তাহের মধ্যে আমার দৃষ্টিশক্তি বিলুপ্ত হইল; এই চির-দীপ্তিমান, চির-দৃশ্যমান পৃথিবীর চির-নবীন শোভা হইতে চিরজীবনের জন্য আমি বঞ্চিত হইলাম।

একদিন বসু মহাশয় কথা প্রসঙ্গ আমাকে বলিলেন, "ললিত, প্রবোধ বলিতেছিল, চক্ষুর অতিরিক্ত পরিচালনাই তোমার অন্ধত্বের কারণ, আমি কথাটার অর্থ বুঝিলাম না। তোমার অপেক্ষা অনেক বয়োবৃদ্ধ কম্পোজিটারকে আমি জানি, তাহাদের দৃষ্টিশক্তির কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই।

আরাধ্য দেবতা সুদীর্ঘকালের তপস্যা নিষ্ফল করিয়া দিলে সাধক যেমন হৃদয়ের বেদনা পায়, বসু মহাশয়ের কথায় আমি কষ্ট বোধ করিলাম। হায় বৃদ্ধ, তুমি জাননা আমার চক্ষু দুটির উপর আমি কি অত্যাচারই না করিয়াছি! কিন্তু তাহার পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক;—আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

বসু মহাশয় ছাড়িবার পাত্র নহেন। কেন জানিনা, আমি অন্ধ হওয়ার পর হইতে আমার প্রতি তাঁহার স্নেহশত গুণ বর্ধিত হইয়াছিল; তাঁহার সে প্রশান্ত মুখচ্ছবি দেখিতে পাইতাম না, কিন্তু তাঁহার করুণার্দ্র কণ্ঠস্বর আমি হৃদয়ে অনুভব করিতে পারিতাম। এ নিরুপায়ের অবলম্বন করিয়াই বিধাতা বুঝি তাঁহাকে পাঠাইয়া ছিলেন।

তাঁহার আগ্রহে আমি ধীরে ধীরে সকল কথা খুলিয়া বলিলাম; প্রথমে আমি মুখ তুলিয়াই কথা বলিতেছিলাম, জন্মান্ধ নহি, অভ্যাস সহজে যায় না। অবশেষে বুঝিলাম, চোখে জল আসিয়াছে; তখন চক্ষু অবনত করিলাম, কিন্তু আত্মগোপন করিতে পারিলাম না; দুরবস্থায়, যন্ত্রণায় শোকে কথা বলিতে বলিতে আমি বসু মহাশয়ের সম্মুখে কাঁদিয়া ফেলিলাম, কিন্তু আমার কথা শেষ করিবার অবসর না দিয়াই তিনি বলিলেন, "ললিত তোমার জীবনের সার-

রত্ন আমিই নিজের হাতে নষ্ট করিয়াছি। কেন তোমাকে বলিলাম না আমার গহনাগুলা কেমিকেল সোনার!—আমি তোমাকে প্রবঞ্চিত করিয়াছি, কিন্তু তুমি অগাধ বিশ্বাসে আমার সেই প্রবঞ্চনার কি কঠোর প্রতিফল দান করিলে! তোমার চক্ষু ফিরাইয়া দেওয়ার সাধ্য আমার নাই, কিন্তু যতদিন বসু-বংশে কেহ অভুক্ত না রহিবে ততদিন তোমার ও তোমার স্ত্রীর অন্নের অভাব হইবে না।—তুমি আমাকে ক্ষমা কর।"—বৃদ্ধ দুই হস্তে আমাকে বক্ষে ধারণ করিলেন।

অন্ধের সান্ত্বনার শেষ অবলম্বনটুকু এক মুহূর্তে নির্বাণ হইয়া গেল। বিধাতা আমার চক্ষুগ্রহণ করিয়া আমাকে অনন্ত দুঃখ দান করিয়াছেন, এখন জীবন গ্রহণ করিয়া মৃত্যু দান করিলেই এ অন্ধ অসহায় পরাশ্রিত হতভাগ্যের অন্তিম শান্তিলাভ হয়; ভগবান, তাহাও কি এত দুর্লভ?"*

একটি ইংরেজি গল্পের সামান্য ছায়া অবলম্বনে লিখিত।

পাগল

বাবু রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের ফরেক্কাবাদে ওকালতি করিতেন। ফরেক্কাবাদে প্রথম শ্রেণির উকিল যে কয়জন ছিলেন, রাজেন্দ্রবাবু তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। অনেক অর্থ উপার্জন করিতেন বটে, কিন্তু তিনি কিছুই সঞ্চয় করিতে পারিতেন না। পরিবারের মধ্যে স্ত্রী ও এক কন্যা মাত্র; এ অবস্থায় তিনি টাকা জমাইতে পারিতেন না কেন তাহা যাহারা তাঁহাকে জানিত, তাহারা বুঝিত। রাজেন্দ্রবাবুর বাড়ি হুগলী জেলায় হরিহরপুর গ্রামে। বড় ভাই বাড়ির কর্তা, দেশে বিষয় সম্পত্তিও বেশ ছিল, তথাপি রাজেন্দ্রবাবু মধ্যে মধ্যে দাদার কাছে টাকাকড়ি পাঠাইতেন। তিনি মনে করিতেন তাঁহার উপার্জনের অর্থে তাঁহার পিতৃস্থানীয় জ্যেষ্ঠ সহোদরের একটা ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে। উচ্চ শিক্ষিত হইলেও রাজেন্দ্রবাবুর হৃদয় হইতে এই সকল দেশীয় কুসংস্কার বিদূরিত হয় নাই।

রাজেন্দ্রবাবুর কন্যা শুক্লপক্ষের শশধরের মত দিন দিন বাড়িয়া. উঠিতে লাগিল। রাজেন্দ্রবাবুর এজন্য বিশেষ চিন্তা ছিল না, কিন্তু তাঁহার দাদা মহেন্দ্রবাবু অষ্টমে গৌরী অথবা নবমে রোহিণী দানের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন; মেয়ের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিবার জন্য তিনি রাজেন্দ্রবাবুকে ক্রমাগত পত্র লিখিতে লাগিলেন। একমাত্র মেয়ে, বিবাহ দিয়া তাহাকে বিদায় করিতে রাজেন্দ্রবাবুর কিছুমাত্র ইচ্ছা ছিল না; তাঁহার ইচ্ছা পিতৃমাতৃহীন ভাল ছেলে পাইলে তাহার সহিত ইন্দুর বিবাহ দিয়া জামাইটিকে ঘরে রাখেন। চারিদিকে ছেলের অনুসন্ধান চলিতে লাগিল; ইন্দু এদিকে একাদশ ছাড়িয়া দ্বাদশবর্ষে পা দিল।—আগামী বৈশাখে ইন্দুর বিবাহ না দিলেই নয়।

অনেক চেষ্টার পর মৈনপুরীর সেরেস্তাদার শ্রীযুক্ত রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের একমাত্র পুত্র পরেশের সঙ্গে ইন্দুর বিবাহ স্থির হইল। সেরেস্তাদার একমাত্র পুত্রকে ঘরজামাই রূপে দান করিতে সম্মত হইলেন না; তবে রাজেন্দ্রবাবুর একটা সান্ত্বনা ছিল; মৈনপুরী ফরেক্কাবাদ হইতে বেশি দূর নহে, ইচ্ছা করিলেই মেয়েকে দেখিবার উপায় ছিল। সুতরাং বিবাহে আর কোন আপত্তি রহিল না, বৈশাখের ১৭ই তারিখে ইন্দুর বিবাহ হইয়া গেল। রাজেন্দ্রবাবু কাছারির কাজকর্ম বন্ধ রাখিয়া প্রিয়তমা দুহিতার সহিত মৈনপুরী যাত্রা করিলেন এবং সপ্তাহের মধ্যেই ইন্দুকে লইয়া বাসায় ফিরিলেন। নিরানন্দময় গৃহ সপ্তাহ পরে আবার আনন্দপূর্ণ হইয়া উঠিল, বিষাদ-মেঘ কাটিয়া গেল। বর্ষার সুনিবিড় জলদজাল ধরণীর মুখ আচ্ছন্ন করিয়া রাখিলেও অবশেষে যেমন শরতের পীতরৌদ্ররাগ-রঞ্জিত প্রভাতে তাহার শেষ চিহ্ন অপসৃত হয়, বর্ষপরে বঙ্গগৃহ গিরি-দুহিতা উমার সুকোমল পাদস্পর্শে পবিত্র হইয়া উঠে, গৃহে গৃহে আগমনির সকরুণ-রাগিণীতে বিরহী মাতৃহৃদয়ের উদার-করুণা উদ্বেলিত হইয়া চারিদিক পরিপূর্ণ করিয়া তুলে, ইন্দুকে শ্বশুরবাড়ি হইতে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া ফরেক্কাবাদের হিন্দু পল্লির প্রতিগৃহে সকলে সেই সুমধুর ভাব অনুভব করিতে লাগিল। ইন্দুকে সেখানে কে না ভালবাসিত? সকলের স্নেহ হরণ পূর্বক বালিকা তাহার হৃদয়কুসুম পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল।

আশ্বিন মাসে নূতন জামাইকে সঙ্গে লইয়া দেশে আসিবার বন্দোবস্ত হইতেছে। জিনিষ পত্র বাঁধা হইতেছে; যাত্রার দিনও স্থির হইয়া গিয়াছে; এমন সময় একদিন টেলিগ্রাম আসিল, পরেশের বড় অসুখ; তাহার পিতা ইন্দুকে অবিলম্বে লইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। রাজেন্দ্রবাবু, স্ত্রী ও কন্যা লইয়া সেই রাত্রেই মৈনপুরী যাত্রা করিলেন; কিন্তু রামলাল বাবুর গৃহে উপস্থিত হইয়া আর পরেশকে দেখিতে পাইলেন না, পরেশ নিদারুণ বিসূচিকায় আক্রান্ত হইয়া মাটির দেহ মাটিতে ফেলিয়া রাখিয়া আলোকহীন, আত্মীয়স্বজনশূন্য এক অনুদ্দিষ্ট অজ্ঞাত দেশে চলিয়া গিয়াছে।

পরেশের সোনার দেহ শ্মশানে ভস্মীভূত করিয়া অন্ধকারময় গৃহে ফিরিয়া আসিয়া রামলাল বাবু দেখিলেন পুত্রবধূকে লইয়া বৈবাহিক উপস্থিত! রাজেন্দ্রবাবু বিদীর্ণ হৃদয়ে গৃহকোণে বসিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। আজ ছয় মাসও যে ইন্দুর বিবাহ হয় নাই! মানুষ যখন শোক-দুঃখ-বিদীর্ণ-হৃদয়ে সর্বসুখদুঃখের অতীত সর্বদর্শী বিধাতার কার্যের দোষদ্ঘাটনে প্রবৃত্ত হয়, তখন সেই সর্বান্তর্যামী নিখিল চক্ষুর অন্তরাল হইতে সম্পূর্ণ উদাসীন দৃষ্টিতে তাঁহার অমোঘ ইচ্ছার শেষফল নিরীক্ষণ করেন; এবং তাঁহার অমর-নেত্র হইতে বিন্দুমাত্র অশ্রুও বিগলিত হয় কি না, তাহা কে বলিতে পারে? স্ত্রীও কন্যা লইয়া শোকাকুল হৃদয়ে রাজেন্দ্রবাবু কার্যস্থলে প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহার একমাত্র নয়নপুত্তলি, জীবনের অবলম্বন শিশুকন্যা সিঁথির সিন্দুর মুছিয়া চিরদিনের জন্য তাঁহার গৃহে বাস করিতে আসিল। তিনি ভগবানের নিকট কামনা করিয়াছিলেন, তাঁহার কন্যাকে যেন কখন ছাড়িয়া থাকিতে না হয়; ভগবান তাঁহার সেই কামনাই পূর্ণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি কি কখন স্বপ্নেও ভাবিয়াছিলেন যে, এই ভাবে তাঁহার কামনা পূর্ণ হইবে?

পাষাণ-ভার হৃদয়ে চাপাইয়া, প্রাণের শক্তি চির-বিসর্জন দিয়া রাজেন্দ্রবাবু আবার ওকালতি করিতে লাগিলেন। দিন পড়িয়া থাকে না, দিন কাটিতে লাগিল; কিন্তু সে আনন্দ উৎসাহ, সে হাস্য-রসিকতা কোথায়?—দুইটি পরিবারের সকল সুখশান্তি হরণ করিয়া একটি সংসারজ্ঞানবর্জিত অবোধ বালক ইহকালের পরপারে চির জীবনের জন্য মাথুর যাত্রা করিয়াছে।

২

বিধবা ইন্দুর দুঃখময় জীবনের পাঁচ বৎসর অতীত হইল। রাজেন্দ্রবাবু অভাগিনি কন্যাকে লইয়া আরও পাঁচ বৎসর ফরেক্কাবাদে কাটাইলেন। তাঁহার দাদা দেশে যাইবার জন্য পুনঃপুন তাঁহাকে অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিলেন,—তিনি নিজে পর্যন্ত আসিলেন; কিন্তু রাজেন্দ্রবাবু চিরনির্বাসনদণ্ড গ্রহণ করিয়াছিলেন, দেশে ফিরিলেন না। কি লইয়া, কোন্ সুখের আশায় দেশে যাইবেন? প্রাণের সুখ ও মনের শান্তি যাহার অপহৃত হইয়াছে, বিদেশে ঔদাস্যময় নিভৃত-জীবন অতিবাহিত করাই তাহার পক্ষে বাঞ্ছনীয়।

ইন্দুর বয়স ষোল বৎসর। সর্বাঙ্গে যৌবনসৌন্দর্য প্রস্ফুটিত। সে সৌন্দর্যে মধুরতা আছে

প্রখরতা নাই, হিমযামিনীর নীহারপাতক্লিষ্টা প্রস্ফুটিতা যূথিকার ন্যায় বৈধব্য-যন্ত্রণা-পীড়িতা যুবতীর সৌন্দর্যে একটা অশ্রুসিক্ত কাতরতা বিজড়িত ছিল। পিতামাতা সেই অতুলনীয় সৌন্দর্য দেখিয়া গোপনে অশ্রুত্যাগ করেন, মন সংযত করিবার তাঁহাদের কোন উপায়ই ছিল না। ভগবানের প্রতি যাহাদের বিশ্বাস নাই, নির্ভর নাই, সংসারে তাহারা নিগৃহীত ও নিপীড়িত হইলে বলে, "ভগবান এই কি তোমার বিচার? তোমাকে মঙ্গলময় কে বলে?"—কিন্তু রাজেন্দ্রবাবুর ন্যায় ধর্মভীরু বিশ্বাসী ভগবদ্‌ভক্তের মুখ হইতে কখন এমন কথা বাহির হইত না; হৃদয় ফাটিয়া চক্ষু দিয়া যখন অশ্রু বহিত, তখন তিনি কাতর দৃষ্টিতে উর্ধ্বে চাহিয়া যুক্তকরে বলিতেন, "দয়াময়, হৃদয়ের এ তুষানল নির্বাপিত কর। তোমার রহস্যময় কার্যের কারণ আবিষ্কার করি, এত ক্ষমতা আমার নাই। দুর্বল আমি, এ কঠিন পরীক্ষার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত।' ইন্দু সকলই বুঝিতে পারিত, তাই সে তাহার হৃদয়ের ভাব গোপনে রাখিবার চেষ্টা করিত, পিতামাতার সম্মুখে প্রফুল্ল ভাব দেখাইবার জন্যও তাহার আগ্রহ ছিল; কিন্তু সূর্য যখন অস্ত যায়, তখন ক্ষুদ্র প্রদীপ তাহার সমস্ত শক্তি ব্যয় করিয়াও অন্ধকার বিদূরিত করিতে পারেনা।

নিজের রূপের উপর ইন্দু একটা প্রাণব্যাপী অবহেলাব ভাব প্রকাশ করিত, রূপকে সে নিজের জীবনের অভিশাপস্বরূপ মনে করিত। সে সমস্ত অলংকার, অনিচ্ছার সহিত নহে, বিড়ম্বনা-জনক বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিল; মোটা সাদা থান পরিত, শয্যাত্যাগ করিয়া কঠিন মৃত্তিকার উপর গড়াইত এবং দেহকে নিগৃহীত করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করিত না। কিন্তু তাহাতেও তাহার সৌন্দর্য বিনষ্ট হইল না; প্রাসাদবাসিনী, হীরকরত্নালংকার-ভূষিতা বিলাসশয্যা-শায়িনী সুন্দরীর সৌন্দর্য তাহাতে ছিল না; যৌবনে ব্রহ্মচারিণী, সংযতহৃদয়া যোগিনীর ন্যায় সে সুন্দরী; দেবচরণে নিবেদিত, ধূপচন্দনের স্নিগ্ধ মিশ্রগন্ধে সুরভিত বৃন্তচ্যুত কুসুমের ন্যায় তাহার সৌন্দর্য; বিধাতার চরণে আত্মসমর্পণের জন্যই তাহার সৃষ্টি, বালিকা তাহা বুঝিতে পারিত। তাই বিগলিতনয়না বিধবার হৃদয়ের ভার যখন অসহ্য হইয়া উঠিত, কোন সুখের স্মৃতি, কোন কোমলস্পর্শ, কৌমুদী-সম্পাতে স্বচ্ছসলিলা প্রবাহিনীর মুক্ত হাসির মত কোন প্রসন্ন হাস্যচ্ছটা বিস্মৃত অতীতের স্বপ্ন-আবরণ ভেদ করিয়া বালিকার হৃদয়ে যখন ধীরে ধীরে সমুদিত হইত, তখন অভাগিনি ইন্দু আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিত না, সকলের লক্ষ হইতে দূরে·দ্বিতলস্থ তাহার নিভৃত কক্ষটিতে প্রবেশ পূর্বক দ্বার বন্ধ করিয়া দিত, এবং মর্মরশুভ্র মেঝের উপর পড়িয়া লুটাইয়া আকুল হৃদয়ে বলিত, "হে অনাথনাথ, হে হরি, আমার সর্বস্ব কাড়িয়া লইয়া আমাকে কাঙালিনী করিয়াছ, আমার এ মনের আগুনও নিবাইয়া দাও। আমার সুখের দুঃখের সকল স্মৃতি, আমার জীবন মরণের সকল কষ্ট গ্রহণ করিয়া তোমার অভয় চরণে স্থান দাও, আমি আর সহ্য করিতে পারি না প্রভু!"—শোক-ভার লাঘব হইলে, ইন্দু ধীরে ধীরে গৃহকর্মে ব্যাপৃত হইত। মা কোন কোন দিন তাহার অশ্রুসজল ভাব ধরিয়া ফেলিতেন; নিঃশ্বাস ফেলিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন—'ইন্দু, তোর চোখ ভিজে ভিজে লাগচে যে, কেঁদেছিস বুঝি?"—বলিতে বলিতে মায়ের চোখে মোটা মোটা দুইটি মুক্তাবিন্দু দেখা দিত। ইন্দু হাসিয়া তাহার চোখের জলে সিক্ত, সরল, আদরপূর্ণ, কোমল স্বরে বলিত— "মরণ ! কাঁদবো কোন্ দুঃখে। চোখে বুঝি কি একটা পোকা পড়েছিল।"—মা বৈধব্যযন্ত্রণা

জানিতেন না; ইন্দু মনে করিত, মাকে খুব ফাঁকি দেওয়া গেল! হায় সরলা, নিজের কষ্ট সে সহিত, কিন্তু মা বাপের কষ্ট সহ্য করিতে পারিত না, তাই নিজের যন্ত্রণা লুকাইতে গিয়া তাঁহাদের অধিকতর যন্ত্রণার কারণ হইত।—এমনই করিয়া কাটিতে লাগিল।

যাহা হউক, এ ভাবে দিন কাটিলেও কথা ছিল না, কিন্তু তাহাও কাটিল না। একদিন কাছারি হইতে ফিরিয়া রাজেন্দ্রবাবুর শরীর সামান্য অসুস্থ হইল, রাত্রে সেই অসুখ বাড়িল। ডাক্তার আসিলেন, ঔষধের ব্যবস্থা হইল, রীতিমত চিকিৎসা চলিতে লাগিল; কিন্তু পীড়ার উপশম হইল না। ঘোরতর জ্বরবিকারে তাঁহার কয়েক দিন অতিবাহিত হইল। বিকারের ঘোরে তিনি কেবল 'পরেশ' 'পরেশ' বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। তাহার পর একদিন রাত্রিশেষে, ঊষার আলোক-লেখায় চরাচর আলোকিত হইবার পূর্বেই রাজেন্দ্রবাবুর দেহপিঞ্জর হইতে প্রাণপক্ষী বহির্গত হইয়া জামাতার উদ্দেশে কোন্ অনুদ্দিষ্ট পথে চলিয়া গেল। সকলই ফুরাইল! উচ্চ সৌধ-বাতায়ন হইতে দুইটি নিরুপায় বিধবার আর্তনাদ ও দীর্ঘশ্বাস উত্থিত হইয়া শূন্যে বিলীন হইতে লাগিল। বায়ুহিল্লোলিত শান্তিময় সুন্দর প্রভাতে দুইটি হতভাগিনির নয়ন সমক্ষে জীবনব্যাপী নৈশ অন্ধকার বিশ্বের বিযাদ এবং অনন্ত দুঃখ আনিয়া তদ্দ্বারা তাঁহাদিগকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

৩

আর একদিনও ফরেক্কাবাদে থাকা চলে না। কোন্ আশায়, কি অবলম্বন করিয়া দুইটি নিরাশ্রয়' বিধবা এই শূন্যময় বিদেশে দুর্বহ জীবন বহন করিবেন? ইন্দুর মা বিধবা কন্যার হাত ধরিয়া হরিহরপুরে ফিরিয়া আসিলেন। নয় বৎসর পরে মা ও মেয়ে থানের ধুতি পরিয়া, কাঙালিনী বেশে, অশ্রুপূর্ণ নেত্রে গ্রামে প্রবেশ করিলেন; গৃহে ক্রন্দনরোল উঠিল। গ্রামে রাজেন্দ্রবাবুর খ্যাতি ছিল; সকলেই তাঁহার দানশীলতা, ও পবিত্র স্বভাবের প্রশংসা করিত। গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা দুঃখিত হইল; সকলেই বলিতে লাগিল। এমন সোনার সংসার এতদিনে ছারেখারে গেল! এমন গৃহে কি কখন এমন বজ্রাঘাত হয়?

ইন্দুর অপূর্ব রূপ, তাহার অসামান্য গুণ দেখিয়া গ্রামের লোকের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। ইন্দুর বয়স যখন আট বৎসর, তখন ইন্দুকে তাহার বাবা কর্মস্থানে লইয়া গিয়াছিলেন। এই নয় বৎসরের মধ্যে কি অসাধারণ পরিবর্তন! সকলে বলিতে লাগিল, মুখুয্যে মহাশয়ের মেয়ে সাক্ষাৎ ভগবতী; এমন মেয়েও বিধবা হয়! সকলই ভগবানের ইচ্ছা!

পল্লিগ্রামের গৃহস্থঘরের মেয়েরা অন্তঃপুরবদ্ধা নহেন। পাড়ার সকলের বাড়িতেই তাঁহাদের গতিবিধির প্রথা আছে; স্নানের জন্য পুকুরঘাটেও তাঁহাদের যাইতে হয়। ইন্দুর এ অভ্যাস ছিল না; প্রথম প্রথম তাহার কিছু বাধবাধ ঠেকিত, তাহার পর ক্রমে তাহার অভ্যাস হইয়া গেল। গভীর শোকের কঠোর আঘাতে তাহার হৃদয় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল; সে সর্বদা হৃদয়ের উপর দুঃসহ পাষাণভার অনুভব করিত। পল্লিগ্রামের দৃশ্য-বৈচিত্র্যের মধ্যে আসিয়া, পল্লিবাসিনী মধুরহৃদয়া রমণীগণের সাহচর্য ও অকৃত্রিম সহানুভূতি লাভ

করিয়া ক্রমে তাহার হৃদয় সংযত হইয়া আসিল। যে শোকের প্রথম আঘাতে মানুষ মনে করে তাহাতেই প্রাণবিয়োগ হইবে, সে আঘাতও ক্রমে সহিয়া যায়; হৃদয়ের ক্ষত ক্রমে শুকাইয়া উঠে, আবার মুখে হাসি আনিতে হয়, সংসারের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হয়, এবং নূতন নূতন সুখ দুঃখ, আশা আকাঙ্ক্ষা লইয়া জীবনের খেলাঘরে বসিয়া দিনযাপন করা আবশ্যক হইয়া উঠে। ইহাই বিধাতার নিয়ম; নতুবা প্রাণের শ্রেষ্ঠ বন্ধন ছিঁড়িয়া গেলে, কে সংসারে থাকিতে পারিত?

একদিন ইন্দু প্রতিবেশিনী কয়েকটি বধূর সহিত তাহাদের পুকুর ঘাটে স্নান করিতে গিয়াছে। এ পুকুরে পাড়ার স্ত্রীলোকেরা স্নান করেন বলিয়া গ্রামস্থ পুরুষেরা এদিকে আসেন না। সেদিন দক্ষিণপাড়ার বসিরদ্দি মণ্ডলের পুত্র আমির মণ্ডল পুকুরের ধারে জলের উপর ঝুঁকিয়া-পড়া খেজুর গাছটা ঝুরিতে উঠিয়াছিল। স্নানের ঘাটে রমণী-কণ্ঠস্বর শুনিয়া গাছ কাটিতে কাটিতে আমির একবার সেই দিকে চাহিয়া দেখিল—দেখিল এক পরি আস্‌মান হইতে নামিয়া, আগ্রীব নিমজ্জিত হইয়া স্নান করিতেছে; তাহার রূপের ছটায় পুকুরঘাট আলোকিত হইয়াছে। এত রূপ, এমন শোভা বেচারি তাহার জীবনে কখন দেখে নাই। সে গাছ কাটা ভুলিয়া গেল; চক্ষু ভরিয়া আমির ইন্দুর রূপসুধা পান করিতে লাগিল। উনিশ বৎসর বয়সের মুসলমান যুবক, মাথায় লম্বা চুল, গৌরবর্ণ, অল্প গোঁফের রেখা দিয়াছে; আমির তাহার যৌবনে নারীর রূপ দেখিয়া কখন পাগল হয় নাই; আজ সে এই বিধবা যুবতীর রূপের সাগরে ডুবিয়া গেল। সম্ভ্রান্ত গৃহস্থের মেয়ে, ব্রাহ্মণকন্যা, তাহা তাহার মনেই আসিল না; তাহার মনে তখন আর কোন কথাই ছিল না, সকল ইন্দ্রিয়পথ দিয়া রূপের আবর্ত তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করিতেছিল; তাহার দেহের প্রত্যেক ধমনীতে বিদ্যুৎপ্রবাহের সঞ্চার হইল; তাহার সমস্ত দেহ থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল; তাহার অবশ হস্ত হইতে গাছ কাটিবার অস্ত্র পুকুরের জলে ঝুপ করিয়া পড়িয়া গেল।—তখন সহসা তাহার চৈতন্যোদয় হইল এবং স্নানার্থিনী রমণীগণের দৃষ্টি তাহাব দিকে আকৃষ্ট হইল। তাঁহারা দেখিলেন, একটি মুসলমান যুবক খেজুর গাছ হইতে নীচে নামিতেছে। সেদিকে আর লক্ষ না করিয়া রমণীগণ পূর্ব্ববৎ স্নান করিতে লাগিলেন। পুকুরের ধারে পক্কপ্রায় সোনার ধান শরৎ প্রভাতের বায়ুহিল্লোলে হিল্লোলিত হইতে লাগিল; শিমুলগাছের অগ্রভাগে বসিয়া একটা দহিয়াল পুচ্ছ খুলিয়া মুক্তপ্রাণে গান গাহিতে লাগিল এবং শুভ্র মেঘখণ্ড রৌদ্র-প্রদীপ্ত নির্মল আকাশে ভাসিয়া চলিতে লাগিল।

মণ্ডলপুত্র আমির গাছ হইতে নামিয়া আর জলের মধ্যে অস্ত্রের সন্ধান করিল না। পুকুরধারের কালকাসিন্দার বেড়া ডিঙাইয়া, লাল ভেরেণ্ডার জঙ্গল দুই হাতে ঠেলিয়া অদূরবর্তী ধানের জমিতে উঠিয়া একটা আইলের উপর দুই জানুর ভিতর মাথা দিয়া বসিয়া পড়িল। বিশ্ব-সংসার তাহার মাথার মধ্যে ঘুরিতে লাগিল; আজ সে উন্মত্ত, বাহ্যজ্ঞানশূন্য। একবার সে জানুর উপর দুই হাতের ভর দিয়া উঠিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কি ভাবিয়া আবার বসিয়া পড়িল। অনেকক্ষণ পরে আবার উঠিল। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিযা মাথা নীচু করিয়া চোরের মত পা টিপিয়া পুকুরধারে কালকাসিন্দার বেড়ার নিকটে গেল; অত্যন্ত আগ্রহপূর্ণ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে

বেড়া একটু ফাঁক করিয়া দেখিল,—ঘাট অন্ধকার, ঘাটে কেহ নাই। আমির বাঁধা ঘাটে আসিয়া বসিল, সে কান পাতিয়া শুনিতে লাগিল অদূরে গাঙ্গুলি-বাড়ীতে দুইজন বাউল খঞ্জনি বাজাইয়া সমস্বরে গাহিতেছে—

"একদিনও না দেখিলাম তারে,
আমার ঘরের কাছে আরশি নগর,
তাতে এক পড়শি বসত করে।"

৪

সেই দিন হইতে আমির কাজ কর্ম ছাড়িয়া দিল। প্রথমে কয়েক দিন বাড়ির বাহির হইল না; কেবল হাঁটুর মধ্যে মাথা দিয়া বসিয়া বসিয়া ভাবে, আর এক একবার মাথা তুলিয়া কাতর দৃষ্টিতে যেন কাহাকে দেখিতে চায়। বৃদ্ধ পিতা ভাবিয়া অস্থির, মাতা কাঁদিয়া আকুল। মণ্ডলের একমাত্র লায়েক পুত্র—সংসারের অবলম্বন, ভাল কবিয়া খায় না, কোথাও যায় না, একেবারে নির্বাক্। কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তরের জন্য পীড়াপীড়ি করিলে সজলনয়নে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকে—সে দৃষ্টি অর্থশূন্য, ভাবশূন্য,—উন্মাদের ন্যায় শূন্যদৃষ্টি।

অবস্থা সঙ্গিন দেখিয়া আমিরের পিতা পাড়ার ও ভিনপাড়ার মাতব্বর ব্যক্তিগণকে আহ্বান করিল। সর্দার, ঘরামি, সেখ ও মাল্‌তে মহাশয়েরা তাহার দাবায় আসিয়া অধিষ্ঠান করিল। প্রতিবেশী হবিবুল্লা সরদারের অশীতিবর্ষীয়া বৃদ্ধা জননীও সেই দাবার একপ্রান্তে উপবিষ্টা। সকলেই একবাক্যে বলিল, ছেলের উপর পরির দৃষ্টি হইয়াছে; সে বিষয়ের অনেক প্রমাণ প্রয়োগও হইল; নানা জনে পরির দৃষ্টি সম্বন্ধে অনেক অসম্ভব গল্প বলিল; খুব উৎসাহে খরশান পুড়িতে লাগিল; অবশেষে হবিবুল্লার মা কিছু তুকতাকের প্রস্তাব করিল। তুকতাক হইল; জলপড়া, তেলপড়া, সর্ষেপড়া, ঝাড়ফুঁক মন্ত্র কিছুরই অভাব হইল না; কিন্তু সমস্তই নিষ্ফল হইল। অবশেষে সেখপাড়ার পরমবিজ্ঞ উজির মাল্‌তে বলিল, "বলি ও মণ্ডলের পো, পিরের দরগায় পাঁচ পয়সার গুড়ে পাটালির শিন্নি দাও না।" শিন্নি দেওয়া হইল, তাহাতেও কোন ফল পাওয়া গেল না। তখন কাশিমপুরের শ্রেষ্ঠ গুনিন হানিফ শেখ রোজাকে আনাইবার ব্যবস্থা হইল। আমির প্রতিদিন একভাবে বসিয়া থাকে; কতজনে কত কথা বলিয়া যায়, আমিরের কানে কোন কথা প্রবেশ করে না; বুঝি সেই ব্রাহ্মণকন্যার রূপরাশি তাহার সকল ইন্দ্রিয়ের শক্তি অপহরণ করিয়াছে, তাহার দেহ অসাড় করিয়া ফেলিয়াছে।

পবদিন রোজা আসিল, অনেক মন্ত্র আওড়াইল, অনেক জলপড়া দিল, পাঁচবার করিয়া ঝাড়িল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। "শক্ত পরিতে নাগাল লইয়াছে, আপনি না গেলে কেহ তাড়াইতে পারিবে না।" এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়া রোজা ঘরে গেল।—আমিরের মা দাওয়ায় পা ছড়াইয়া কাঁদিতে বসিল, তাহার সকল আশাই বিলুপ্ত হইল।

৫

আমিরের স্কন্ধে যে শক্ত ভূত চাপিয়াছিল, সে সহজে নামিল না। আমিরের পিতা মাতা নিরাশ হইল; এমন কর্মক্ষম ছেলেটির এমন দশা দেখিয়া তাহারা জীবন্মৃত হইয়া পড়িল। তাহাদের মনে হইল, কে যেন তাহাদের অন্নের গ্রাস মুখ হইতে কাড়িয়া লইয়া গেল;—কে যেন তাহাদের অন্ধের নড়ি ভাঙিয়া ফেলিয়া দিল। চিকিৎসা আর কি করিবে? এত বড় ওঝা যখন হার মানিয়া গেল, তখন আর চিকিৎসা নাই। এখন ভরসা আল্লা! সেই আল্লার উপর নির্ভর করিয়াই আমিরের বাপ মা চুপ করিয়া রহিল।

সকলে মনে করিয়াছিল, আমিরের উন্মাদের লক্ষণ প্রকাশ পাইবে; কিন্তু সে সব কিছুই হইল না। আমির কয়েক দিন বাড়িতেই বসিয়া রহিল; দিবারাত্রি বুঝি তাহার হৃদয়ের মধ্যে দেবাসুরের যুদ্ধ চলিতেছিল। শেষে অসুরেরই জয় হইল। আমির আর গৃহে তিষ্ঠিতে পারিল না। কিন্তু কেমন কবিয়া সে ব্রাহ্মণবাড়িতে যাইবে? সেখানে গেলে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, "কেন আসিয়াছ? কি চাও?" তাহা হইলে সে কি জবাব দিবে? লোকে যদি তাহাকে সন্দেহ করে, তাহা হইলে কি হইবে? অনেক ভাবিয়া শেষে আমিব স্থির করিল, সে পুকুরের পাড়ে কোন স্থানে বসিয়া থাকিবে; ব্রাহ্মণকন্যা নিশ্চয়ই স্নান কবিতে, জল লইতে, দুই চারিবার ঘাটে আসিবে; তাহা হইলেই তাহাব সাধ মিটিবে। সে ত আর কিছুই চাহে না, শুধু সেই দেবীপ্রতিমা দেখিতে চায়, শুধু এক একবার দেখামাত্র। রূপমুগ্ধ যুবক মনে ভাবিয়াছিল, সেই সুন্দরীর রূপ এক একবার করিয়া দেখিলেই বুঝি তাহার হৃদয় শীতল হইবে।

একদিন প্রাতে উঠিয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া আমির সেই পুকুরের ধারে খেজুরতলায় গিয়া বসিয়া রহিল। পুকুরের ঘাটের দিকে সরলভাবে চাহিতে তাহার সাহসে কুলাইতেছিল না; সে ভয়ে ভয়ে ঘাটেব দিকে পিছন করিয়া বসিয়া হিল, কিন্তু থাকিয়া থাকিয়া তাহার যেন মনে হইতে লাগিল, কে তাহাকে উঁচু করিয়া ধরিয়া তাহাব মুখখানা সজোরে পুকুরের দিকে ফিরাইয়া দিতেছে। হায়, হায়! মণ্ডলের ছেলে সত্য সত্যই পাগল হইল।

ঘাটের দিকে একটু শব্দ হইলেই আমির চোরের মত চাহিয়া দেখে। বেলা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। কত স্ত্রীলোক স্নান করিতে আসিল; কত হাস্যপরিহাসে পুকুরের ঘাট পরিপূর্ণ হইল; কত জন স্নান করিয়া চলিয়া গেল। বেলা হইল, কিন্তু বিধবা ব্রাহ্মণকন্যা ত স্নান করিতে আসিল না। তবে কি সে আজ স্নান করিবে না? কেন? হয় ত তাহার অসুখ হইয়াছে, তাই সে আজ স্নানে আসিল না। অসুখের কথা মনে হইতেই আমির কেমন হইয়া গেল। তখন সে ব্রাহ্মণবাড়িতে গিয়া কোন প্রকারে সংবাদ লইতে কৃতসঙ্কল্প হইল।

পুকুরের ধারের সেই কালকাসিন্দার বেড়ার ভিতর দিয়া বাহির হইয়া মাঠ পার হইয়া আমির রাস্তায় উঠিল। সেইটি পুকুরের রাস্তা। একটু অগ্রসর হইয়াই একটা মোড় আছে; আমির সেই মোড় ফিরিয়াই দেখে, সম্মুখে পথের মাঝখান দিয়া ব্রাহ্মণকন্যা একাকিনী একটি কলসি কক্ষে স্নান করিতে আসিতেছে। তাহাকে দেখিয়াই আমির ক্ষণকালের জন্য থমকিয়া দাঁড়াইল;—তাহার পর এক দৌড়ে পলায়ন।

৬

আমির সত্যসত্যই পাগল হইয়াছে। তাহার মুখে কথা নাই; সারাদিন মুখোপাধ্যায়দের বাহির-বাড়ির উঠানের পাশে একটা লম্বা ঘরের বারান্দায় পড়িয়া থাকে। সারাদিন সে সেখান হইতে নড়ে না, কোথাও যায় না। রাত্রে উঠিয়া খানিকক্ষণ রাস্তায় দৌড়িতে থাকে। তাহার বাপ মা কতদিন তাহাকে জোর করিয়া বাড়ি লইয়া গিয়াছে; হাত পা বাঁধিয়া রাখিয়াছে; কিন্তু যদি কোন প্রকারে সে একবার ছাড়া পাইয়াছে, অমনি এক দৌড়ে ব্রাহ্মণবাড়ির বারান্দায় আসিয়া হাজির! কাহারও সহিত সে কথা কহে না, কাহারও প্রতি কোন অত্যাচার করে না, শুধু সেই বাড়ির ভিতরকার দ্বারের দিকে চাহিয়া সে বসিয়া থাকে।

বিধবা ইন্দুব হৃদয় এই পাগলের দুঃখে গলিয়া গেল। আহা, এমন জোয়ান ছেলে, পাগল হইয়া গেল! এই কথা সর্বদাই তাহার মনে হইত। প্রতিদিন দ্বিপ্রহরে সে পাগলকে ভাত দিয়া যাইত। একখানি কলাপাতায় করিয়া ভাত ব্যঞ্জন দিত; আর একটা মাটির ভাঁড় ছিল, তাহাতেই জল দিত। ইন্দু প্রথম প্রথম ভাত দিয়াই চলিয়া যাইত; কিন্তু বিকালে কি অন্য সময়ে আসিয়া দেখিত, যেমন ভাত তেমনি পড়িয়া আছে; তখন দয়াময়ী ইন্দু সেখানে দাঁড়াইয়া সেই বলিত, "আমির, ভাত খাও" আর অমনি পাগল গোগ্রাসে ভাতগুলি খাইয়া ফেলিত। ইন্দু বলিত "আমির, পাতখানি ফেলিয়া মুখ ধুইয়া এস;" আমির অবিলম্বে আদেশ পালন করিত। ইন্দুর এখন এক কাজ বাড়িল,—প্রতিদিন পাগলকে খাওয়ান। জ্যেঠামহাশয় এক এক দিন দাঁড়াইযা এই দৃশ্য দেখিতেন, আর বলিতেন, "মা আমার অন্নপূর্ণা,—আমাব মায়ের গুণে পাগলও বশ হয়।" হায় ব্রাহ্মণ, কি বুঝিবে তুমি!

আর কি আত্মসংবরণ, কি ইন্দ্রিয়জয়ের শক্তি ঐ নিরক্ষর চাষার ছেলে আমিরের! তাহার সাধনার ধন, তাহার জীবনের অবলম্বন, তাহার তৃষ্ণার জল, তাহার কল্পনার সর্বস্ব প্রতিদিন তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়; তাহার ক্ষুধায় অন্ন, পিপাসার জল দিয়া যায়; কিন্তু যে ক্ষুধায় তাহার প্রাণ জ্বলিতেছে, যে মহাতৃষ্ণায় তাহার ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে, আমির তাহা হৃদয়ের অন্তস্তলে লুকাইয়া রাখিয়াছে, একদিনও সে ভাল করিয়া তাহার আরাধ্যা দেবীর মুখের দিকে তাকাইতে পারিল না।

এই ভাবে পাগলেব দীর্ঘ তিন বৎসর কাটিয়া গেল। পাগল ব্রাহ্মণবাড়ির বারান্দায় দিন কাটাইতে লাগিল। একদিন দ্বিপ্রহরে তাহার খাবার আসিল না। কি হইয়াছে,—পাগল তাহা ভাবিয়া পাইল না। ক্ষুধা তাহার ছিল না, ক্ষুধাতেও সে কাতর নহে; রূপের তৃষ্ণায় তাহার হৃদয় নিশিদিন জ্বলিয়া যাইতেছে। যাহার রূপ দিনান্তে একবার দেখিতে পাইলেও তাহার তৃষিত প্রাণ শীতল হয, সে কৈ? আমির অধীর ভাবে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে ইন্দুব মা আসিয়া তাহাকে ভাত দিয়া গেলেন। পাগল ভাবিল, এমন ত হয় না: ব্রাহ্মণকন্যা ভিন্ন এ তিন বৎসর আর ত কেহ তাহাকে খাইতে দেয় নাই, একটি মিষ্ট কথা বলে নাই, করুণ নেত্রে তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহে নাই। আজ তাহার কি হইয়াছে, কেন সে আসিল না। আমির ভাতের পাতা সম্মুখে রাখিয়া ভাবিতে লাগিল। ভাতগুলি শুকাইতে লাগিল। সেদিন আর তাহার খাওয়া হইল না।

বিকালে পাগল শুনিল, ইন্দুর বড় জ্বর হইয়াছে; তাহার পর শুনিল জ্বর আরও বাড়িয়াছে, চক্ষু লাল হইয়া উঠিয়াছে, ইন্দু নাকি সবেগে বালিসের উপর মাথা লুটাইতেছে প্রলাপ বকিতেছে। অবশেষে বৃদ্ধ কবিরাজ প্রেমচাঁদ নিদান-রত্নকে ডাকা হইল; কবিরাজ মহাশয়ের নাড়িজ্ঞান অসাধারণ। তিনি নস্য টানিয়া, নাড়ি টিপিয়া বলিলেন, "এ সান্নিপাতিক বিকার, বাঁচিবার আশা নাই। মধু দিয়া খলে মাড়িয়া এই ঔষধ এক প্রহর অন্তর খাওয়াও। আবার সন্ধ্যার পর আসিব"—চাদরের খুঁট হইতে ঔষধ বাহির করিয়া কবিরাজ তাহা ইন্দুর মার হাতে দিয়া গেলেন। ইন্দুর মা সজল নেত্রে কন্যাকে ঔষধ খাওয়াইতে বসিলেন।

সমস্ত দিন আমির জ্বলন্ত দীপশিখার চতুর্দিকে পতঙ্গের মত ইন্দুদের বাড়ির চারিদিকে ঘুরিল। আজ সকলেই ব্যস্ত, কেহ তাহাকে খাইতে বলিল না, সেও কিছু খাইল না, অনাহারে অস্থির ভাবে বাড়ির চারিদিকে চাহিতে লাগিল, এক একবার মাটিতে পড়িয়া দুই হাতের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া নিশ্চল ভাবে রহিল, বোধ হয় সে মনে মনে প্রার্থনা করিতেছিল—"হে আল্লা, আমার এই আশাহীন, উদ্দেশ্যহীন প্রাণের অবলম্বনকে রক্ষা কর।"

কিন্তু আল্লা তাহার প্রার্থনায় কর্ণপাত করিলেন না। শেষ রাত্রে বাড়িতে মহা ক্রন্দনের রোল উঠিল। সকল দুঃখ, সকল যন্ত্রণার হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া পুণ্যবতী সতী আনন্দধামে চলিয়া গেল। আমির সমস্ত রাত্রি বসিয়া কাটাইতেছিল। ক্রন্দনের শব্দে সে বুঝিল, সব ফুরাইয়াছে! আর সে সেখানে বসিয়া থাকিতে পারিল না; সে ছুটিয়া গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার পর সেই অন্ধকার রাত্রে বাঁশতলা দিয়া, স্যাওড়াবন পার হইয়া, ধানের জমি অতিক্রম করিয়া, কালকাসিন্দার বেড়া ডিঙাইয়া পুকুরের বাঁধা ঘাটে গিয়া বসিল; দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ফুকরাইয়া কাঁদিতে লাগিল। শর্বরী প্রভাতকল্পা, পূর্ব গগন ঈষৎ পরিষ্কার হইয়াছে, আকাশের ম্লান নক্ষত্রের প্রতিবিম্ব পুকুরের জলে পড়িয়াছে, ধীরে ধীরে শীতল সমীরণ আমিরের দীর্ঘ কেশগুচ্ছ কম্পিত করিতেছে। আমির জলের ধারে নিশ্চলভাবে বসিয়া থাকিল, কেবল এক একবার দীর্ঘনিঃশ্বাস তাহার যন্ত্রণামথিত বক্ষঃস্থল ভেদ করিয়া শূন্যে বিলীন হইতে লাগিল।

সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে পথে "বল হরি, হরিবোল" শব্দ উঠিল। সেই শব্দে আমিরের সংজ্ঞা হইল, সে উঠিয়া দাঁড়াইল। উন্মত্তের ন্যায় ধানের ক্ষেতের ভিতর দিয়া দূরে দূরে মৃতদেহের অনুসরণ করিতে লাগিল। এক ক্রোশ দূরে কালীগঙ্গা নদী। নদীতীরে শ্মশান-ঘাটে ইন্দুর মৃতদেহ নামান হইল, শববাহকগণ চিতার উপর সেই পুষ্পময় দেহ তুলিয়া দিল। দীর্ঘ কেশ লুটাইয়া পড়িয়াছে, সর্বাঙ্গ শ্বেত বস্ত্রে আবৃত, চক্ষু নিমীলিত, এত কঠিন রোগেও মুখের শোভা নষ্ট হয় নাই; মৃত্যুর যন্ত্রণাহীন, চিন্তারহিত, সঙ্কোচশূন্য ক্রোড়ে শয়ন করিয়া যুবতী বিধবা নিদ্রা যাইতেছে। একটা গাছের আড়াল হইতে আমির নির্নিমেষ নেত্রে সেই অন্তিম শোভা নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। আজ আর পাগল কিছুতেই হৃদয়কে সংযত করিতে পারিল না। তিন বৎসর ধরিয়া হৃদয়ের সহিত মহাসংগ্রামে সে জয়ী হইয়াছে, আজ তাহার দৃঢ়তা ও ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল, আজ তাহার পরাজয়ের দিন। উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া সে ইন্দুর চিতার উপর আসিয়া পড়িল। শববাহীগণ নিকটেই ছিল, তাহারা মহাব্যস্তভাবে "হাঁ-হাঁ করিস

কি, ছুঁসনে ছুঁস্‌নে" বলিয়া দৌড়িয়া আসিয়া তাহাকে সরাইয়া দিল। মুহূর্ত মধ্যে পাগলের মোহ ছুটিয়া গেল তৎক্ষণাৎ এক দৌড়ে সেখান হইতে অন্তর্ধান করিল। কোথায় গেল, কেহ বলিতে পারে না।

সেই হইতে পাগল নিরুদ্দেশ। কেবল এক একদিন রাত্রিশেষে কালীগঙ্গা দিয়া নৌকা বাহিয়া যাইতে যাইতে মাঝিবা শ্মশান ঘাটের কাছে আসিয়া সভয়ে শুনিত, নদীর ধারে শ্মশানের উপর লুণ্ঠিত হইয়া কে একজন "হায় আল্লা, হায় আল্লা" করিযা গভীর শোকে হৃদয় ফাটাইয়া কাঁদিতেছে, নৈশ বায়ু প্রবাহে তাহার সেই নিরাশা শুষ্ক বিদীর্ণ কণ্ঠস্বর শূন্যে ভাসিয়া যাইতেছে, এবং তাহার পদতল দিয়া চল-চঞ্চলা নদী কলপ্রবাহে ছুটিয়া চলিয়াছে।

–সাহিত্য ১০ম বর্ষ ১৩০৬, ৮ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ।

মা কোথায়?

সরকারি কার্যোপলক্ষে আমাকে বঙ্গের নানা জেলায় ঘুরিতে হইত। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরতের উপর সরকারি কার্যের বিরাম নির্ভর করে না। ভারতের সর্বত্র এখন কল চলিতেছে। কিন্তু আমাদের সরকারি নফরের ন্যায় জীবন্ত কল আর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কুত্রাপি দেখা যায়না; তথাপি আমরা চাকুরির জন্য লালায়িত।

কিন্তু আক্ষেপ করিয়া ফল নাই। দাসত্ব ছাড়া অন্য কোন উপজীবিকার সহিত পরিচয় হয় নাই; সরকারি আদেশে দেশ-বিদেশে দাসত্ব করিয়া বেড়াইতাম, সঙ্গে আমার বিশ্বস্ত ভৃত্য, রামকুমার।

ইংরেজের বিভিন্ন মূর্তি; এক মূর্তিতে তিনি রাজ্যশাসন করেন, এক মূর্তিতে সদাগরী করেন, এক মূর্তিতে চা-কর, নীলকর। আমি সেই ইংরেজের চাকর; আমার ভৃত্যটিরও বিভিন্ন মূর্তি ছিল; এক মূর্তিতে সে আমার চাপরাশি, অন্য মূর্তিতে খানসামা, তৃতীয় মূর্তিতে পাচক।

রামকুমার আমার বহুদিনের পুরাতন ভৃত্য। যখন আমি খুলনার কর্মস্থলে নিযুক্ত ছিলাম সেই সময় রামকুমার আমার চাকরিতে নিযুক্ত হয়। তাহার বাড়ী ঐ জেলাতেই ভৈরব নদীর তীরে; সে জাতিতে ধীবর। সংসারে আমি একাকী; আমার সংসারে আসিয়া রামকুমার পাচক-ব্রাহ্মণরূপে পরিগণিত হইয়াছিল। সত্যযুগে অনেক আরাধনায় বিশ্বামিত্র যাহা লাভ করিয়াছিল, কলিযুগে রামকুমারকে আমি সেই ব্রহ্মণ্য গৌরব দান করিয়াছিলাম; রামকুমারেরও দিব্যজ্ঞান জন্মিয়াছিল। যদি কেহ রামকুমারকে বলিত, "তুই বেটা জেলে, তোর বাবু তোর হাতে খায়?"—রামকুমার অম্লানবদনে উত্তর দিত, "ব্রাহ্মণের যিনি জীব দিয়াছেন, জেলেরও তিনি জীব দিয়াছেন, ব্রাহ্মণ-শূদ্রের ভাতে তফাৎটা কি?"—আমার সংস্রবেই বোধ করি তাহার এই সাম্যভাব লাভ হইয়াছিল এবং এইজন্যই বোধ করি সে আমাকে দেবতাজ্ঞান করিত। বস্তুত রামকুমারের মত একটা ভৃত্য না জুটিলে আমার মত অভিভাবকহীন, আত্মীয়-পরিবার শূন্য লোক এ সংসার-সাগরে পাড়ি জমাইতে পারিত না।

সংসারে রামকুমারের কোন বন্ধনই ছিল না। সেইজন্যই হয়ত সে আমার নিকট অধিক করিয়া ধরা দিয়াছিল। বাল্যকালেই তাহার বাপের মৃত্যু হয়; সম্পত্তির মধ্যে তাহার একখানি ছোট নৌকা, আর এক কুঁড়ে ঘর ছিল। যতদিন তাহার মা বাঁচিয়া ছিল, ততদিন সে তাহার পৈতৃক নৌকা লইয়া ভৈরবে মাছ ধরিত, সময়ে-অসময়ে লোকজন ও পারাপার করিত। একদিন হঠাৎ ওলাওঠা হইয়া তাহার মা মরিয়া গেল, তাহার পরও কিছু দিন সে মাছ ধরিয়া ছিল। শেষে একদিন তাহার কি খেয়াল হইল, নৌকা ও বসতবাটী বিক্রয় করিয়া সে নিরুদ্দেশ হইল। শুনিয়াছি নাকি সে তীর্থভ্রমণে বাহির হইয়াছিল। যাহা হউক, এই সংসার সুখ বঞ্চিত, উদাসীন, বন্ধনহীন মৎস্যজীবী যুবকের জীবনে সহসা এমন নির্বেদ ভাব উপস্থিত হইল কেন, তাহা সংবাদ লইবার অবসর এবং আগ্রহ পৃথিবীতে কাহারো হয় নাই। আমিও তাহার কথা

প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিলাম; অবশেষে বছর দুই পরে রামকুমার একদিন সকালবেলা আমার নিকট উপস্থিত। আমি অনেক দিন পরে তাহাকে দেখিয়া খুসী হইলাম, বলিলাম, "কিরে রামা, এতদিন কোথায় ছিলি?" খবর কি? "—রামকুমার বলিল, "হুজুর দুনিয়ার চারিদিক একবার ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিলাম; কোথাও সুখ নাই। এখন চাকরি করিব; হুজুরের কাছেই থাকিতে চাই।"—রামকুমারের মুখে একটা সহাস্য সরলতা ও উদারতার ভাব মাখান ছিল। সে যে ছোট জাত, জেলে এবং অশিক্ষিত মূর্খ, একথা কোনদিন আমার মনে হয় নাই; তার বুকের মধ্যে যে একখানা খাঁটি হৃদয় ছিল, তাহার অস্তিত্ব আমি নিজের হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিতে পারিতাম। মানুষের পদগৌরব, অর্থগৌরব, খ্যাতি এবং বংশ মর্যাদা হৃদয়ের এই পবিত্রতাকে কখন পরাভূত করিতে পারে না। আমি রামকুমারকে আমার অধীনে চাপরাশিগিরি কর্মে নিযুক্ত করিলাম। সেই হইতে রামকুমার আমার সঙ্গী; বিপদে সম্পদে, সুখেদুঃখে সে কখন আমার সঙ্গছাড়া হয় নাই।

মফস্বল ঘুরিয়া বেড়ান যাহাদের চাকুরি, তাহাদিগকে অনেক সময় বিপদে পড়িতে হয়; আমাকেও মধ্যে মধ্যে বিপদে পড়িতে হইত। এক দিনের কথা বলি।

সেদিন বৈশাখ মাস। বৈশাখের অপরাহ্ন সাধারণত পরিষ্কার থাকে না। অধিকাংশ সময়ই ঝড়-বৃষ্টি লাগিয়া থাকে। আমি সেদিন ঘটনাক্রমে খুলনার অপর পারে একটা তদারকে যাইতে বাধ্য হইলাম; সঙ্গে রামকুমার। রামকুমার সে গ্রাম বিশেষরূপে চিনিত। সেখানে একটা ফাঁড়ি ছিল, ফাঁড়ির লোকের সাহায্যে আমার কার্যসিদ্ধি হইবে স্থির করিয়া অন্য লোক সঙ্গে লই নাই।

যখন নৌকায় উঠিলাম, তখন পশ্চিমাকাশে অল্প মেঘ করিয়াছিল; রামকুমার বলিল এ মেঘ শীঘ্রই কাটিয়া যাইবে। যাহা হউক আমরা তাড়াতাড়ি চলিলাম; কিন্তু মেঘ কাটিয়া গেল না; অবিলম্বে ঝড়-বৃষ্টি আসিয়া আমাদের ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে আরও আধমাইল নৌকা চালাইয়া তবে কূলে পৌছিলাম। যখন নৌকা হইতে নামিলাম তখন ও বৃষ্টি চলিতেছে। সেই বৃষ্টি মাথায় করিয়া চলিতে লাগিলাম। একটা মাঠ পার না হইলে আর গ্রাম মিলিবে না। আমরা বেগে চলিতে লাগিলাম। জুতা কাপড় সমস্ত ভিজিয়া গেল; বাতাসের ঝাপ্‌টায় মাথায় ছাতা রাখা অসম্ভব। গ্রামে পৌছিতেই সন্ধ্যা হইয়া আসিল; ঝড় আরও প্রবল হইয়া উঠিল।

নদীতীরে একখানি বড় ঘর; উপায়ান্তর না দেখিয়া আমরা সেই ঘরে আশ্রয় লইলাম। রামকুমার বলিল, "এখানি সেই গ্রামের স্কুলঘর।" দ্বার বন্ধ ছিল। রামকুমার কৌশলে ঘরের একটা দ্বার খুলিয়া ফেলিল। সঙ্গে বাতি ও দিয়াশলাই ছিল; লণ্ঠন জ্বালাইয়া রামকুমার কয়েকখানা বেঞ্চ একত্র করিয়া একখানা চৌকি রচনা করিল। বিছানা বালিশ সমস্ত ভিজিয়া গিয়াছিল; রামকুমার ঘরের মধ্যেই কাপড়চোপড় বিছানা শুকাইতে দিল। আহারের কি ব্যবস্থা হইবে তাহাও সে জিজ্ঞাসা করিল। আমি বলিলাম, "রামকুমার এমন রাত্রে এ মাঠে আর কোথায় কি মিলিবে? গ্রামের মধ্যে যাওয়া ও দুঃসাধ্য; এক রাত্রি অনাহারে মরিবনা, তুমি কোন চিন্তা করিওনা।"—আমি দক্ষিণ বাহুমূলকে উপাধানে পরিণত করিয়া সেই একত্র

সংযোজিত বেঞ্চত্রয়ের উপর শুইয়া পড়িলাম। দক্ষিণের দিকের একটা দ্বার মুক্ত ছিল, তাহা দিয়া বায়ুর প্রবাহও। বিদ্যুতের ঝলক আভা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল; আমি সেই বিদ্যুদ্দামস্ফুরিত ঝটিকা লুণ্ঠিত নৈশপ্রকৃতির প্রলয় দৃশ্যের দিকে চাহিয়া রহিলাম। পৃথিবীতে আমি একা; এই নির্জন মাঠে, এই স্তব্ধ ঘরে আমার হৃদয়ের দুঃসহ নিঃসঙ্গতা বাহিরের বিজনতার মধ্যে নবজাগ্রত হইয়া উঠিল। চিন্তার তাড়নায় আমি ডুবিয়া গেলাম রামকুমার, আমার ছায়ার ন্যায় আমায় কাছে বসিয়া আমার পদসেবা করিতেছে; রামকুমারও নীরব।

কিয়ৎক্ষণ পরে আমি সবিস্ময়ে উঠিয়া বসিলাম। বোধ হইল আমায় পাদমূলে দুই এক বিন্দু জল পড়িয়াছে; নিশ্চয়ই ইহা বৃষ্টির জল নহে। আমি উঠিয়াই রামকুমার মুখের দিকে চাহিলাম, লণ্ঠনের আলোকে দেখিলাম তাহার উভয় গণ্ড অশ্রুধারায় ভাসিয়া যাইতেছে। বুঝিলাম তাহারই গণ্ডপ্রবাহিত দুই বিন্দু অশ্রু আমার পাদমূলে পড়িয়াছে।

আমাকে চকিতভাবে উঠিতে দেখিয়া রামকুমার কিছু অপ্রতিভ হইল; আত্মসংবরণ করিয়া তাড়াতাড়ি সে মুখ মুছিল; বোধ হয় সে ভাবিয়াছিল তাহার অন্তরের যে অবরুদ্ধ যাতনা তাহাতে আর কাহারো অধিকার নাই এবং তাহার হৃদয় বেদনার অন্যের নিকট সান্ত্বনা লাভের আশা তাহার পক্ষে দুরাশা মাত্র!—আমি সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলাম, "রামকুমার তোর হইয়াছে কি? এমন করিয়া কাঁদছিস কেন? আর ত কোন দিন তোকে কাঁদিতে দেখি নাই!"

রামকুমার আমার সেই স্নেহার্দ্র কথা সহিতে পারিল না; সে কোন উত্তর না করিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল। আমি সবিস্ময়ে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম। প্রতি মুহূর্তে লণ্ঠনের বাতি টা জ্বলিয়া জ্বলিয়া গলিয়া ক্ষয় হইতে লাগিল এবং বাহিরের অন্ধকার ও দুর্যোগ ঘনীভূত হইয়া উঠিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে রামকুমার আত্মসংবরণ করিয়া কথা কহিল? বলিল, "বাবুজি এই আমার জন্মস্থান। এই স্কুলের ঘাটে আমি আমার ডিঙিতে করিয়া মানুষ পার করিতাম"—রামকুমার নীরব হইল।

আমি ভাবিলাম, বহুদিন পরে স্বগ্রামে নিজের পারঘাটায় আসিয়া রামকুমারের পূর্বস্মৃতি জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। রামকুমারের পূর্বজীবন অপেক্ষা এখন তাহার অবস্থার অনেক উন্নতি হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আর্থিক উন্নতির উপরই কি মানুষের সকল সুখ নির্ভর করে? তাহার সেই উদ্বেগহীন, প্রবৃত্তির কি স্বহস্তরচিত সরল শৈশব, তাহার পিতামাতার স্নেহপূর্ণ হৃদয়, নদীপ্রান্তবর্তী গোময়লিপ্ত কুটীর, তরঙ্গমালা-ভূষিত খরগতি ভৈরবের উপর তাহার সেই ক্ষুদ্র তরণীর পরিচালন, এই সকল মধুর স্মৃতি হয়ত আজ সহসা তাহার প্রৌঢ় জীবনের এই বৈচিত্র্যহীন, সরকারী চাকরির অবসাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাকে ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছে। আমি বলিলাম, "রামকুমার, ছেলেবেলার-কথা মনে করিয়া কাঁদিতেছ? চিরকাল কি এক ভাবে যায়? সুখ এ পৃথিবীতে নাই। সুখের অভাবে যদি কাঁদিতে হইত, তাহা হইলে চিরজীবন কাঁদিয়াই কাটাইতাম।"—শিক্ষিত, সুসভ্য

পাঠক, ক্ষুদ্র চাপরাশির সঙ্গে আমি এভাবে কথা কহিলাম, আমার এ অপরাধ মার্জনা করিবেন। নিদারুণ নৈশ প্রলয়ানুষ্ঠানের মধ্যে সেই নির্জন নদীকূলে এক স্তব্ধ গৃহে বসিয়া তখন আমার কেবলই মনে হইতেছিল, সংসার ছাড়িয়া শ্মশানে আসিয়াছি; জীবনতরণী আজ মৃত্যুর সুচিরলক্ষ অন্ধকার কূলে আসিয়া ভিড়িয়াছে; মাথার উপর ঐ মেঘমণ্ডিত অন্ধকার আকাশ দিক্‌দিগন্ত ধ্বনিত করিয়া যে বজ্রনাদ কানে আসিয়া বাজিতেছে, তাহা কর্ণ-বিবরে প্রবেশ করিবার পূর্বেই ত লোল রসনা সৌদামিনী রাক্ষসীর সামান্য স্পর্শমাত্রে দেহ-বৃন্ত হইতে জীবন পুষ্পটি খসিয়া পড়িতে পারে!—বাহিরের অহঙ্কারের খোলস ছাড়িলে ভিতরের সব মানুষ এক।

যাহা হউক, রামকুমার আমার কথায় কোন সান্ত্বনা লাভ করিল কি না জানিনা, কিন্তু তাহার হৃদয়ের আবেগ প্রশমিত হইল না; সে কম্পিত কণ্ঠে বলিল। "বাবুজি, আপনি আমার সব কথা জানেন না। সে সকল কথা কাহাকেও বলি নাই, আজ বলিব; আমি মহা অপরাধী; আমি নরহত্যা, ব্রহ্মহত্যা করিয়াছি। আমি বুঝিতেছি, সে কথা শুনিয়া আপনি আমাকে ঘৃণা করিবেন;—করুন, সে কথা আজ আমি বলিব। পরমেশ্বরের কাছে আমি অপরাধী হইয়া আছি, মানুষের ঘৃণা, মানুষের দণ্ডকে আমি কি ভয় করিব?"—আমার বিশ্বস্ত ভৃত্য রামকুমার নরঘাতক! পৃথিবীতে নিশ্চয়ই মুখ দেখিয়া মানুষ চেনা যায়না; এই রামকুমারের মনেও কোন পাপ থাকিতে পাবে, একথা আমি বিশ্বাস করিনা। —আমি সন্দেহাকুল নেত্রে রামকুমারের অশ্রুসজল চক্ষের দিকে চাহিলাম,—বুঝিলাম অনুশোচনায় তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। বলিলাম, "রামকুমার, তোমার মনের কথা যতই গোপনীয় হোক, আমাকে বলিতে পার। মহা অপরাধীকেও পরমেশ্বর ক্ষমা করেন। তোমায় পাপ কি বল? পাপীর প্রতি আমার ঘৃণা নাই, তোমার প্রতি আমার স্নেহ কখন বিলুপ্ত হইবে না।"

রামকুমার বলিল, মা স্বর্গে চলিয়া গেলেও কিছুদিন ধরিয়া আমি এই ভৈরবে মাছ ধরিতাম এবং নৌকায় করিয়া লোকজন পার করিতাম। মনে করিয়াছিলাম, একটা বিবাহ করিয়া সংসারধর্ম করিব; বিবাহের কথাও স্থির হইয়াছিল। কত বৎসরের কথা মনে নাই, কিন্তু মনে আছে তখন বৈশাখ মাস। একদিন সন্ধ্যার আগে খুব মেঘ করিয়া অন্ধকার হইয়া আসিল। সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক ঝড়-জল আসিল, নদীতে তুফান উঠিল দেখিয়া আমি তাড়াতাড়ি আমার নৌকাখানা নদীর কিনারায় বাঁধিয়া তীরে উঠিলাম। তখন এ স্কুল ঘর হয় নাই; এখানে একখানা ছোট মুদিখানার দোকান ছিল। দোকানদারের বাড়ি গ্রামের মধ্যে; সন্ধ্যার সময় মেঘ দেখিয়া সে সকালসকাল দোকান বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। আমি ঝড়-জলের মধ্যে আর বাড়ি যাইতে পারিলাম না; সেই দোকানের বারান্দায় গিয়া বসিলাম। পাশেই একটা শিমুলগাছ ছিল; মড় মড় করিয়া তাহার দুটো ডাল ঝড়ে ভাঙ্গিয়া পড়িল; বাঁশ ঝাড়ের যত বাঁশ ছিল, দেখিতে দেখিতে লম্বা আগা মাটিতে লুটোপুটি করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে কড়কড় কড়কড় শব্দে চারিদিক কাঁপাইয়া আমার চক্ষুর উপর ঐ কানাইখালির নীলকুটীর লম্বা চিমনিটার উপব বাজ পড়িল। আমি

কোঁচার কাপড় গায়ে জড়াইয়া সেই বারান্দায় একটা বাঁশের খুঁটায় ঠেস দিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলাম।

আবার বিদ্যুতের ঝলক দিল।—সেই আলোকে দেখিলাম দোকান ঘরের সম্মুখে দুইটা মনুষ্য মূর্তি, একটি স্ত্রীলোক আর একটি পুরুষ। প্রথমে অনুমান হইল, হয়ত প্রেতদেহ। দেহেরা আমার নিকটে আসিল; বিদ্যুতের আলোকে আমাকে দেখিতে পাইয়া পুরুষটি সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল—"কে ও"; বোধ হয় তাহারও আমাকে ভূত মনে করিয়াছিল। আমি বলিলাম, "আমি রামকুমার মাঝি।"—উভয়ে দোকানের বারান্দায় আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। পুরুষটা বলিল—"মাঝি, আমাদের পার করিয়া দাও।"

এই তুফানে নদী পার হইতে চাহে এমন মানুষ ব্রহ্মাণ্ডে আছে বলিয়া আমার জ্ঞান ছিল না। এমন ঝড়-জলে নদী পার করিতে পারে; এমন মাঝিও বোধ করি পৃথিবীতে নাই।—আমি অবাক হইয়া এই অপরিচিত লোক দুটির দিকে চাহিয়া রহিলাম; অন্ধকারে তাহাদের চেহারা নজরে পড়িলনা।

আবার বিদ্যুৎ চমকিল। এবার যুবককে দেখিয়া লইলাম,—যুবকের বয়স ১৮/১৯ বলিষ্ঠ দেহ; যুবকের সঙ্গিনী ১৪/১৫ বৎসরের নবীনা বলিয়া বোধ হইল; ঘোমটার ভিতর হইতে একবার মাত্র তাহার মুখ দেখিয়াছিলাম—তাহার পর আর একবার যখন দেখিয়াছিলাম—সে কথা যাক্।

যুবকের মুখে তাহাদের পরিচয় পাইলাম। ইহাদের বাড়ি দূরবর্তী কোন গ্রামে; সঙ্গের মেয়েটি তাহার ভগিনী, কুলীন ব্রাহ্মণ, এখন বিবাহ হয় নাই। সেদিন তাহারা খুলনায় মামার বাড়ি যাইতেছিল। সেখানে তাহার মাতা মৃত্যুশয্যায় পড়িয়া আছে। সেই রাত্রেই তাহাদের পার করিয়া না দিলে তাহাদের অদৃষ্টে আর মাতৃদর্শন হয় না। যুবক বলিল, যদি চেষ্টা করিতে গিয়া নদীগর্ভে তাহাদের প্রাণ যায় তাহাতেও স্বীকার। এমন আগ্রহ ভরে যুবক আমাকে বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিল যে আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। মা মরণাপন্ন, ভদ্রলোকের ছেলেমেয়ে প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া এমন ভয়ানক দুর্যোগের মধ্যে নদীতীরে দাঁড়াইয়া আমার সাহায্য ভিক্ষা করিতেছে; আর আমি দেড় কুড়ি বছর বয়সের জোয়ান রামকুমার মাঝি; আমার দুখানা হাতে অসুরের মত বল, আমি যদি প্রাণের ভয়ে তাহাদের পার করিয়া না দিই, তাহা হইলে আমি এতদিন বৃথা মাঝিগিরি করিয়াছি!

আমি বসিয়াছিলাম, উঠিয়া কোমর বাঁধিয়া নৌকার কাছে চলিলাম। ঝড়ের ও বৃষ্টির বেগ তখন একটু কমিয়া আসিয়াছিল। যুবক ও তার ভগিনী নৌকায় উঠিল। আমি বলিলাম, "তোমরা নৌকা ভাল করিয়া ধরিয়া হুঁসিয়ার হইয়া বোসো,"—'দরিয়ার পাঁচ পির গাজির বদর', বলিয়া আমি নৌকা খুলিয়া দিলাম। ভৈরব হুহু করিয়া গর্জন করিতেছে; চারিদিকের নালা হইতে হুড়হুড় শব্দে মাঠের জল নদীর মধ্যে গিয়া পড়িতেছে। আমি প্রাণপণ শক্তিতে নৌকা চালাইতে লাগিলাম। কিন্তু পরমেশ্বরের যাহা ইচ্ছা, মানুষে চেষ্টা দ্বারা তাহা বিফল হইতে পারে না; মাঝগাঙে স্রোতের বেগে সহসা হাল ভাঙ্গিয়া গেল; ভয়ানক কড়া জল, আমি নৌকা সামলাইতে পারিলাম না; একটা প্রবল ঢেউ লাগিয়া নৌকা

উল্টাইয়া গেল; ভৈরব গর্জিয়া উঠিল, অন্ধকার, ঘোর অন্ধকারে আকাশ, পৃথিবী, নদীর জল সমস্ত আচ্ছন্ন হইল! বোধ হইল পৃথিবীতে প্রলয় আসিয়াছে, আমি "দুর্গা, একি করিলে মা" বলিয়া জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িলাম।

ঠিক সেই মুহূর্তে মগ্নপ্রায় নৌকার অপর দিক হইতে যুবক বলিয়া উঠিল, "মা, মা—রামকুমার, মা কোথায়? মাকে ত এজীবনে আর দেখা হইল না!"—আর কোন শব্দ শুনিতে পাইলাম না। আমি প্রবল মৃত্যুস্রোত তুচ্ছ করিয়া সেই শব্দের দিকে লক্ষ করিয়া সাঁতরাইতে লাগিলাম; ইচ্ছা হইল চরম সাহসে ভর করিয়া, আমার ত্রিশ বৎসর বয়সের প্রাণপণ শক্তি লইয়া আমার অসুরের মত বলবান দুখানা হাত দিয়া সেই অবলম্বনহীন যুবক-যুবতীকে জল হইতে টানিয়া তুলি, তীরের দিকে লইয়া যাই; এ চেষ্টায় যদি মরিতে হয়, তাহাতেও দুঃখ নাই, পৃথিবীতে কিসের আশায় বাঁচিয়া থাকিব?

কিন্তু কাহাকেও খুজিয়া পাইলাম না। সেই অন্ধকার রাত্রে, সেই উন্মত্ত, উদ্দাম, উচ্ছ্বসিত ভৈরবের মধ্যে প্রবল স্রোতের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া যতক্ষণ সাধ্য যুবকযুবতীর অনুসন্ধান করিলাম,—কোথাও তাহাদের পাইলাম না!

নদীতীরে কাশবন, শরবন, সৈকতপুলিনে পাগলের ন্যায় ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। বৃথা চেষ্টা!

তখন আমি ক্লান্ত শরীরে তীরে উঠিয়া তাহাদের কত অনুসন্ধান করিলাম; বায়ুর শব্দ কানে আসিয়া বাজতে লাগিল। সমস্ত রাত্রি শুনিতে পাইলাম—"মা, মা, মা কোথায়?"—মা, মা, মা কোথায়?" নদীতরঙ্গ বায়ুতরঙ্গের সহিত মিলিয়া অন্ধকার প্রান্তর ধ্বনিত করিয়া কেবলই চিৎকার করিতেছে, "মা, মা, মা কোথায়?" তাহার পর কতদিন চলিয়া গিয়াছে; তবুও যখনই আকাশে ঘনকৃষ্ণ মেঘের সঞ্চার হয়, তুমুল গর্জনে ঝড় বহিতে থাকে, তখন ভৈরবের সেই মহাপ্রলঙ্কর ভৈরব মূর্তি আমার মানস নয়নের সম্মুখে উপস্থিত হয়; তখনই আমি যেন শুনিতে পাই, কে যেন গগন পবন ভেদ করিয়া বলিতেছে, "মা, মা, মা কোথায়?"

রাত্রি প্রভাত হইল। প্রভাতে খুঁজিতে খুঁজিতে দেখি আমাদের গ্রাম হইতে প্রায় আধ মাইল ভাটিতে চড়ার উপর মেয়েটিকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া যুবক মরিয়া রহিয়াছে। প্রভাত-রৌদ্র তাহাদের মুখে বিকীর্ণ হইতেছে—ঝটিকাশ্রান্ত ভৈরব তাহাদের পদতল দিয়া তর তর গতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে—তাহাদের যুদ্ধশ্রান্ত মুখের উপর মৃত্যু নির্বিকার শান্তির ছায়া ফেলিয়া গিয়াছে। আমি তাহাদের কাছে বসিয়া চক্ষুর জলে বালুকারাশি ভিজাইতে লাগিলাম। আমিই দুটি প্রাণীর মৃত্যুর কারণ; আমি অন্যায় সাহস করিয়া সে রাত্রে পারে লইবার চেষ্টা না করিলে কি তাহারা মরিত?

সেইদিন হইতে আমার কি হইয়াছে; এই ভৈরবের ধারে আমি সেই ধ্বনি শুনিতে পাইতাম, "মা, মা, মা কোথায়?"—আমি মাছ ধরা, নৌকা বহা ছাড়িয়া দিলাম; নৌকাখানা, কুটীর খানা বিক্রয় করিয়া তীর্থযাত্রা করিলাম। কত তীর্থে ঘুরিলাম, মনের আক্ষেপ কিছুতেই ঘুচিলনা। আপনার কাছে তারপর চাকরি লইয়াছি, কিন্তু সেই দারুণ রাত্রির কথা ভুলিতে

পারিতেছিনা;—আজ এই বৈশাখের রাত্রে এস্থানে আসিয়া নূতন করিয়া সে কথা মনে হইয়াছে,—ঐ শুনুন।"

রামকুমার সহসা নীরব হইল।—লণ্ঠনের মধ্যে বাতিটা জ্বলিয়া জ্বলিয়া হঠাৎ ধপ্ করিয়া নিবিয়া গেল। অন্ধকারের মধ্যে রামকুমার নীরব; আমার মুখেও একটা কথা নাই। স্কুল ঘরের একটা ভাঙা জানালার ভিতর দিয়া সেই মধ্যরাত্রের উদ্দাম বায়ুপ্রবাহ সাঁ সাঁ করিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল—তাহার প্রত্যেক কম্পনে আমি শুনিতে লাগিলাম, "মা, মা, মা কোথায়?"—"মা, মা, মা কোথায়?"—

সে রাত্রে আর আমার ভাল ঘুম হইল না; দুই একবার তন্দ্রাঘোরে স্বপ্ন দেখিলাম—উন্মত্ত ভৈবব ভৈরব গর্জনে ছুটিয়া চলিয়াছে, আর তাহারই ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে একটি যুবক তাহার ভগিনীটিকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া কণ্ঠাগত প্রাণের সমস্ত আবেগ ঢালিযা বলিতেছে, "মা, মা, মা-কোথায়?" চরাচরের সর্বত্র হইতে এই করুণ কণ্ঠের প্রতিধ্বনি উত্থিত হইতেছে;—কেবল মানুষের সুখদুঃখের চির উদাসিনী জড় পৃথিবী অন্ধ আবেগে আপনার গতিপথে আবর্তন করিতেছে

ছোট কাকী

নয় বৎসরের একটি পুত্র রাখিয়া রামদয়ালের স্ত্রী স্বর্গারোহণ করিলেন। বত্রিশ বৎসর বয়সে বিপত্নীক হইয়া রামদয়াল বড় বিপদে পড়িলেন—হৃদয়েও দারুণ ব্যথা পাইলেন। তবে রামদয়াল খাঁটি বাংলানবিশ, পাড়াগাঁয়ের জমিদারের কাছারির ১৬ টাকা বেতনের তহশিলদার;—তাঁহার পত্নীশোক কবিতামুখে উচ্ছ্বসিত হইল না, বা দীর্ঘকেশ ও গৈরিক বসনেও প্রকটিত হইল না। দিন যেমন যাইতেছিল, তেমনই যাইতে লাগিল;—আকাশের নক্ষত্রও খসিয়া পড়িল না, অশ্রুপ্রবাহে মাসিকপত্রের পৃষ্ঠাও অভিষিক্ত হইল না। কিন্তু রামদয়াল বড়ই বিপদে পড়িলেন!—বাড়িতে তাঁহার স্ত্রী ব্যতীত দ্বিতীয় স্ত্রীলোক ছিলেন না; কনিষ্ঠ কৃষ্ণদয়াল বর্ধমানের উকিল। তিনি সপরিবারে সেইখানেই থাকেন। তাঁহার স্ত্রী পল্লিগ্রামে খড়ের চালা-ঘরে বাস করিতে সম্পূর্ণ অসম্মত। সুতরাং পরিবারে লোক থাকিয়াও নাই।

স্ত্রীর শ্রাদ্ধ পর্যন্ত রামদয়াল নিজেই রন্ধনাদির ভার গ্রহণ করিলেন। পিতা-পুত্রে অতি কষ্টে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিলেন। শ্রাদ্ধের সময়ে কৃষ্ণদয়াল বাবু তিন দিনের জন্য বাটীতে আসিলেন;—সপবিবারে নহে, একাকী। শ্রাদ্ধশেষে রামদয়াল বাবু কনিষ্ঠ ভ্রাতার নিকট প্রস্তাব কবিলেন যে, তুমি অমবকে সঙ্গে লইয়া যাও। বাড়ীতে থাকিলে তাহার পড়াশুনাও হইবে না, দেখে শুনেই না কে? দুইটা ভাত দিবাবও লোক নাই। প্রতিবেশীরা একটি বয়স্থা মেয়ে দেখিয়া দ্বিতীয় দার-পরিগ্রহের প্রস্তাব করিলেন। রামদয়াল একই কথা বলেন, "অমরনাথ বাঁচিয়া থাকুক।"

কৃষ্ণদয়াল বাবু দাদার প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করিতে পারিলেন না,—মনে মনে অনিচ্ছা থাকিলেও সম্মত হইলেন। রামদযাল একমাত্র পুত্রকে বর্ধমানে পাঠাইবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণদয়াল তিনদিন পরেই চলিযা গেলেন। যাইবার সময় দাদাকে বলিয়া গেলেন, তিনি যেন সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া স্বযং অমরকে বর্ধমানে রাখিয়া আসেন।

আজ নয় বৎসব অমবকে বুকে কবিযা মানুষ করিয়াছেন, এক দিনের জন্য চোখের আড়াল করেন নাই। অমরকে বর্ধমানে রাখিয়া আসিতে বামদয়ালের মনে বড়ই কষ্ট হইল; কিন্তু কি করেন,—উপায় নাই।

যাইবার কথা শুনিয়া অমর বড়ই বিষণ্ণ হইল। "বাবা আমি তোমার কাছেই থাকবো। আমি ত বাবা দুষ্টুমি করিনে!" একদিন বড়ই কাতরভাবে অমরনাথ পিতাকে এই কয়টি কথা বলিল। রামদয়াল অনেক করিয়া ছেলেকে বুঝাইলেন। কাকাব কাছে কোন কষ্ট হইবে না; লেখাপড়া না শিখিলে কি চলে?—অগত্যা অমর যাইতে স্বীকার করিল।

২

মাতৃহীন অমরকে লইয়া রামদয়াল বাবু যথাসময়ে বর্ধমানে কৃষ্ণদয়াল বাবুর বাসায় উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণদয়াল তখন বাসাতেই ছিলেন; তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাদার পায়ের ধূলা লইলেন। অমরকে বাড়ীর ভিতর পাঠাইয়া দিলেন।

কৃষ্ণদয়ালের পত্নী অবসরপ্রাপ্ত সবজজ রামেন্দ্রবাবুর কন্যা। সবজজের মেয়ে বলিয়া তাঁহার যথেষ্ট আত্মগরিমা ছিল, এবং কৃষ্ণদয়াল এম. এ. বি. এল. হইলেও জুনিয়ার উকিল বলিয়া পত্নী মনোরমা তাঁহাকে কৃপার চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেন। তাঁহার যে কিঞ্চিৎ পসার হইয়াছে, তাহা যে মনোরমার পিতার সই সুপারিশের জোরে, তাহা ভাবিয়া তিনি বিশেষ গর্বিতা ছিলেন। একদিন পাড়ার কোনও জুনিয়াব উকিলের স্ত্রী তাঁহাদের বাড়ীতে বেড়াইতে আসিয়া, তাঁহার স্বামীর ভাল উপার্জন হইতেছে না, অথচ কৃষ্ণদয়ালের প্রশংসা করিতে লাগিলেন; মনোরমার এ স্বামী-প্রশংসা ভাল লাগিল না; তাঁহার স্বামী যে নিজের গুণে পসার করিয়াছেন; এ কথা প্রতিপন্ন হইলে তাঁহার পসার যে কমিয়া যায়! তাই তিনি বাধা দিয়া বলিলেন, "ভাগ্যি বাবা সবজজ ছিলেন, তাই হাকিমদিগকে বলিয়া কহিয়া দিয়াছিলেন, তা' নইলে আমাদের বাসাখরচই চলিত না। আর বাবা ত সর্বদাই জিনিযটা পত্রটা দিয়া সাহায্য করিতেছেন।" মনোরমার পরিচয় দিবার আর আবশ্যক হইবে না। তবে একটি কথার উল্লেখ আবশ্যক,—মনোরমার সন্তানাদি হয় নাই।

অমর যখন বাড়ীর মধ্যে যাইয়া কাকিমাকে প্রণাম কারল, তখন মনোরমা কি একখানি বই পড়িতেছিলেন; অমর প্রণত হইলে তিনি একবার তাহার দিকে চাহিলেন, আবার পরক্ষণেই বই পড়িতে লাগিলেন। অমর একটু দাঁড়াইয়া থাকিয়া বাহিরে চলিয়া আসিল।

অমর দ্বারে বাহির হইবামাত্রই মনোরমা বিশেষ বিবক্তির সহিত বলিলেন, "ভাল একটা গেরো এসে জুটলো!"

৩

বৈঠকখানা ঘরের পাশেই ছোট একটি কুঠুরী; তাহাতে কৃষ্ণদয়াল বাবুর মোহরার হরেকৃষ্ণ শয়ন করিত। অমরের জন্য হরেকৃষ্ণ সেই ঘরটি ছাড়িয়া দিল। ছেলেমানুষ, পড়াশুনা করিবে, নির্জন ঘর হইলেই ভাল হয়। হরেকৃষ্ণ নিজের তক্তপোশখানি অমরকে ছাড়িয়া দিল। বাড়ীর ভিতর হইতে মনোরমা অনেক অনুসন্ধানে একখানি ছেঁড়া লেপ ও একটা মলিন বালিশ বাহিরে পাঠাইয়া দিলেন—ইহাই অমরের বিছানা। কৃষ্ণদয়াল অমরকে মিউনিসিপাল স্কুলে ভর্তি করিয়া দিলেন।

গিন্নির আদেশ ছিল, বাবুর ও তাঁহার নিজের জন্য সরু চাউলের ভাত হইবে, আর সকলেব জন্য মোটা চাউলের ব্যবস্থা। ব্রাহ্মণঠাকুর ত আব এম. এ বি. এল. নথ বা তাহাব বাড়ীতে সবজজের মেয়ে বধূরূপেও বিরাজমানা নহে; সুতরাং সে ভদ্র গৃহস্থের বাড়ীর যেমন দস্তুর, তাহাদের মত গরীব ব্রাহ্মণের বাড়ীতেও যাহা হইয়া থাকে, সেই ভাবিয়া, অমরেব জন্যও সরু চাউলই বাহির করিয়া লইত। এ ব্যাপার পাঁচ ছয় দিন গৃহিণীর দৃষ্টি অতিক্রম করিয়াছিল। এক দিন হঠাৎ তিনি রান্নাঘরে যাইয়া দেখেন, অমর সরু চা'লের ভাত খাইতেছে। সবজজের কন্যা আর ক্রোধ সংবরণ করিতে পারিলেন না। কাহার হুকুমে ঠাকুর এত সরু চাউল নষ্ট করিতেছে, বলিয়া ঠাকুরের কৈফিয়ত তলব হইল। ঠাকুর ভালমানুষ; সে বলিল, "মা ঠাক্‌রুণ, খোকা বাবু আপনার পেটের ছেলের মত, তাই ভাবিয়া তাকেও সরু চাউলের

ভাত দিই।" গৃহিণী রাগিযা বলিলেন, "আরে আমার পেটের ছেলে!—" আরও যেন কি বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে কৃষ্ণদয়াল বাবু স্নান করিবার জন্য ভিতরে আসিলেন, এবং "ব্যাপার কি' জিজ্ঞাসা করায় "কিছু না" বলিয়া গৃহিণী উপরে চলিয়া গেলেন। সেই দিন হইতে চাকর বাকরের হাঁড়িতে অমরের অন্নের বরাদ্দ হইল।

৪

একদিন স্কুল হইতে ফিরিয়া আসিয়া অমর কাঁদ-কাঁদ মুখে বাড়ীর মধ্যে গেল। বিকালে সে আর কখন বাড়ীর ভিতর যাইত না; কারণ তাহার ছোটকাকা বা ছোটকাকি তাহার জন্য কোনও প্রকার জলখাবারের বন্দোবস্ত করিয়া দেন নাই। দুই তিন দিন দেখিয়া হরেকৃষ্ণ নিজ হইতে রোজ অমরকে দুইটি করিয়া পয়সা দিয়া যাইত, অমর তাহারই দ্বারা জল খাইয়া ক্ষুধানিবৃত্তি করিত। অমরের উপর হরেকৃষ্ণের বড়ই স্নেহ হইয়াছিল। গরিবের দুঃখ গরিবেই বুঝে!

অমর আজ বাড়ীর ভিতর যাইয়া কাকিমাকে বলিল, "কাকিমা, আজ তিন দিন আমাকে স্কুলে যাইয়া এক ঘণ্টা দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়; আমার রোজই লেট (Late) হয়।"

"লেট হয় তার আমি কি কববো?"

"আপনি যদি ঠাকুবকে একটু বোলে দেন, তা হ'লে সে সকালে ভাত দিতে পারে।"

"সে হবে টবে না। তোমার জন্য আবার সকালে কে ভাত রাঁধ্‌তে যাবে? সকলে যেমন খায়, তেমনি খেয়ে থাক্‌তে পার থাক, না পার দেশে চলে যাও। ঠাকুরপুত্র আর কি!"

অমর আর কথা কহিতে পারিল না, সে কাঁদিয়া ফেলিল। অপরাহ্নে হরেকৃষ্ণ বাসায় আসিলে অমর তাহাকে সকল কথা বলিল। হরেকৃষ্ণ লেখাপড়া সামান্যই জানে, কিন্তু তাহার হৃদয় বড়ই কোমল। সে অমরের কথা শুনিয়া সত্যসত্যই কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার চক্ষে জল দেখিয়া অমরও কাঁদিতে লাগিল। শেষে হরেকৃষ্ণ বলিল, "কেঁদো না ভাই; কষ্ট না করিলে কি লেখাপড়া হয়? বিদ্যাসাগরের নাম ত জান, তিনি কত কষ্ট ক'রে পড়াশুনা করেছিলেন, তাই তিনি বিদ্যাসাগর হয়েছিলেন। তুমিও কষ্ট কোরছো তুমিও বিদ্যাসাগর হবে। আজ আমি বাবুকে ব'লে তোমাব সকালে ভাতের বন্দোবস্ত কোরে দেবো।"

সেইদিন রাত্রে কৃষ্ণদয়াল যখন কাজকর্ম সারিয়া বাড়ীর ভিতর যাইবার জন্য উঠিলেন, সেই সময় হবেকৃষ্ণ অমরের দেরিতে স্কুলে যাওয়ার কথা বলিল; গিন্নি কি বলিয়াছেন, সে কথা আর বলিল না।

কৃষ্ণদয়াল বাবু শয়নগৃহে গিয়া মনোরমাকে বলিলেন, "দেখ ঠাকুরকে ব'লে দিও—কা'ল থেকে যেন একটু সকাল সকাল রান্না করে। অমরের স্কুলে যেতে দেরি হয়,—সেই জন্য তাকে নাকি শাস্তি পেতে হয়।"

মনোরমা এই কথা শুনিয়া একেবারে ফুলিয়া উঠিলেন, অতি কর্কশস্বরে বলিলেন, "তা তোমার চাকর বামন, হুকুম করলেই পার। আমি কোথাকার কে যে, তোমার চাকরের উপর হুকুম চালাতে যাবো? আমার এক পেট, খেতে দিতে যদি কষ্ট হয়,—বলিলেই পার, আমি বাপের বাড়ী

চলে যাই। তারা আর আমাকে ফেলতে পারবে না। এত অপমান কেন? এখন ভাইপো আপন হোলো; আর আমার বাবা যে এতগুলি টাকা গণিয়া দিয়াছিলেন, তা' এখন মনে হবে কেন?"

কৃষ্ণদয়াল একেবারে নিরুত্তর। ধীরে ধীরে বাহিরে চলিয়া আসিলেন; সে দিন আর আহার হইল না। অন্তঃপুরে যে সুধাপান করিয়া আসিলেন, তাহাতেই তাঁহার উদর পরিতৃপ্ত হইল।

৫

মাঘ মাস; বড় শীত। সেবার অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা শীত একটু বেশি পড়িয়াছিল। অমর একলা সেই ছোট কুঠুরিতে থাকে। একদিন রাত্রে ঘুমের ঘোরে ছেলেমানুষ শয্যা কলুষিত করিয়া ফেলিয়াছিল। প্রাতে উঠিয়াই অমর সে কথা তাহার সুখদুঃখের একমাত্র সুহৃৎ হরেকৃষ্ণের নিকট অতি সঙ্কুচিতভাবে বলিতেছিল, এমন সময়ে ঝি সেই স্থান দিয়া যাইতেছিল। সে দিন প্রাতে আবার বৃষ্টি হইতেছিল। একে মাঘ মাস, তাহাতে আবার বৃষ্টি, শীত আরও বেশী হইয়াছিল। ঝি জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে?" হরেকৃষ্ণ বলিল, "ছেলেমানুষ, রাতে উঠ্‌তে পারেনি; তাই ঘুমের ঘোরে -।" ঝি বাড়ীর মধ্যে পদার্পণ করিয়াই সে কথা মনোরমাকে বলিল।

তখনও বৈঠকখানায় লোকজন আসে নাই, তখনও বাবুর নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই। মনোরমা একেবারে বৈঠকখানায় হাজির! "লক্ষ্মীছাড়া ছোঁড়া! তোল্ বিছানা, মাদুর। এখনই পুকুর থেকে সব কেচে নিয়ে আয়। কি আমার আদুরে গোপাল রে!" হরেকৃষ্ণ কি বলিতে যাইতেছিলেন, গৃহিণী তাঁহাকে এক ধমক দিয়া নিরস্ত করিলেন। আবার হুকুম হইল, "তোল্ বিছানা। এখুনি কেচে এনে দিবি, তবে আমি এখান থেকে নড়বো।"

নয় বৎসরের ছেলে অমরনাথ ভয়ে একবারে এতটুকু হইয়া গিয়াছিল। কি করে? সেই শীতের দিনে, সেই বৃষ্টির মধ্যে, কোঁচার কাপড় গায়ে দিয়া অমরনাথ প্রথমে লেপটি লইয়া ভিজিতে ভিজিতে পুষ্করিণীতে গিয়া তাহা কাচিয়া আনিল, তাহার পর সেই ছেঁড়া মাদুরটি লইয়া আবার ঘাটে গেল। শানবাঁধা ঘাট, বৃষ্টি পড়িয়া পিচ্ছিল হইয়াছিল; অমর পা হড়কাইয়া সেই ঘাটে পড়িয়া গেল। তাহার বুক ফাটিয়া কান্না আসিতেছিল। ঘাটে পড়িয়া গিয়া একবার শুধু সে বলিল, "বাবা গো!" তাহার পর কতক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিল। কিন্তু বসিয়া থাকিয়া কি হইবে! কাকিমা যে বকিবেন। পায়ে ও মাথায় বড়ই লাগিয়াছিল; অমর বড় কষ্টে উঠিল। মাদুরটা জলে ডুবাইয়া দুই হাতে ধরিয়া লইয়া আসিল; মাদুরের জলে তাহার কাপড়খানি একেবারে ভিজিয়া গেল, বৃষ্টিতেই পূর্বে অনেকটা ভিজিয়াছিল।

সে দিন রবিবার; অমরের স্কুল বন্ধ। সমস্ত দিন চলিয়া গেল। সন্ধ্যার সময় অমরের কেমন অসুখ করিতে লাগিল। সে কিছুই আহার করিল না; রাত্রে ভয়ানক জ্বর।

প্রাতঃকালে কৃষ্ণদয়াল বাবু শুনিলেন, অমরের জ্বর হইয়াছে। "সামান্য জ্বর, সারিয়া যাইবে। আজ কিছু খেতে দিও না!" ভ্রাতুষ্পুত্রকে না দেখিয়াই এই আদেশ প্রচার করিয়া কৃষ্ণদয়াল বাবু স্বকার্যে মনোনিবেশ করিলেন; এবং দ্বিপ্রহরে আহারাদি করিয়া কাছারিতে গেলেন।

অপরাহ্নে কাছারি হইতে আসিয়া হরেকৃষ্ণ দেখিল, অমর বিছানায় পড়িয়া ছট্‌ফট্

করিতেছে। নিকটে কেহই নাই। গায়ে হাত দিয়া দেখে, গা ভয়ানক গরম, চক্ষু দুইটি জবা ফুলের মত লাল হইয়াছে, আর অমর অনবরত মাথা নাড়িতেছে, হরেকৃষ্ণকে দেখিয়া অমর বলিল, "দাদা! একটু জল খাবো, তৃষ্ণায় আমার বুক ফাটিয়া গেল যে দাদা।" ঘরে একটু জলও কেহ রাখিয়া যায় নাই। হরেকৃষ্ণ তাড়াতাড়ি একটু জল আনিয়া অমরের মুখে দিল; কতকটা জল সে গিলিল, কিন্তু আর কতকটা গিলিতে পারিল না।

কৃষ্ণদয়াল বাবু সন্ধ্যার একটু পূর্বে বাসায় আসিলেন। তখন হরেকৃষ্ণ বলিল, "অমরের জ্বর বড়ই বেশী হইয়াছে।" কৃষ্ণদয়াল বাবু বলিলেন, রাতটা যাক্, কা'ল সকালে কেষ্ট কম্পাউণ্ডারকে ডেকে যা হয় করা যাবে।" হরেকৃষ্ণ বলিল, "বাবু, জ্বরটা ভাল বোধ হোচ্চে না, একবার ডাক্তার ডাক্‌লে হয় না?"

"না হে, অত ব্যস্ত হ'লে কি চলে?—তা, না হয়, তুমি সরকারি ডাক্তারখানায় গিয়ে আমার নাম ক'রে একটু ফিবার মিক্‌শ্চার এনে দাও।"

হরেকৃষ্ণ বিষণ্নমুখে র‍্যাপারখানি গায়ে দিয়া ডাক্তারখানায় গেল। কিন্তু সে প্রথমে ডাক্তারখানায় না গিয়া একেবারে বরাবর ষ্টেশনে চলিয়া গেল; সেখানে দুইটি টাকা দিয়া রামদয়ালকে একটা টেলিগ্রাম করিল। তাহার পর ডাক্তারখানা হইতে একটা ফিবার মিক্‌শ্চার আনিয়া সমস্ত রাত্রি অমরকে খাওয়াইতে লাগিল।

কিছুতেই জ্বর থামিলনা। রাত্রে প্রলাপ আরম্ভ হইল। অমর প্রলাপে শুধু বলে, "কাকিমা, আর আমি বিছানা খারাপ করব না।"

৬

প্রাতঃকালে কৃষ্ণদয়াল বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, অমরের অবস্থা বড়ই খারাপ। তখন তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন; মনে হইল, কি একটা জঞ্জাল! কি করেন, সরকারি ডাক্তারকে আনিতে পাঠাইলেন। বেলা নয়টার সময়ে ডাক্তার আসিল; রামদয়ালও তখন আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ডাক্তার বলিলেন, "রোগীর জীবনের আশা নাই, জীবন-দীপ নিভিবার আর বিলম্ব নাই। বেলা বারোটা পর্যন্তও থাকে কি না সন্দেহ।" ডাক্তার ঔষধ দিলেন। প্রলাপ ক্রমেই বাড়িতে লাগিল, রামদয়াল একমাত্র পুত্রকে কোলে করিয়া বসিয়া রহিলেন।

একবার অমর চমকাইয়া উঠিল; পরক্ষণেই বলিল, "কাকিমা! আর আমি বিছানা খারাপ করব না।" তাহার পরেই সব নীরব হইল। রামদয়াল অমরকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া তাহার দীপ্তিহীন নির্নিমেষ নেত্রের দিকে ব্যাকুল দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, "বাপ্‌ধন অমর রে! তুইও আমাকে ফাঁকি দিয়ে গেলি, আমি আর কি নিয়ে সংসারে থাক্‌বো?" অমরের ছোটকাকি বাতায়ন অন্তরাল হইতে বিরক্তি ভরে বলিলেন, "কোথাকার আপদ কোথায় এসে মরে, তার ঠিক নেই, এ পাপ বিদেয় হবে কখন!"

—সাহিত্য ১২শ বর্ষ ১৩০৮, ৭ম সংখ্যা, কার্তিক।

মোহ

"পিসিমা, "আমি তোমার কাছে আর শোব না।"

"কেন বাবা, কি হয়েছে? আমার অপরাধ?"

"তুমি মাথা ন্যাড়া করলে কেন, গয়না খুলে ফেললে কেন, ঝির মত কাপড় পরলে কেন. তোমার কাছে আমি শোব না।"

চারি বৎসরের ছেলে পটলার অভিমান হইয়াছে সে ত জন্মাবধি আমার এ বেশ দেখে নাই। কিন্তু যে যদি বুঝিত, পৃথিবীর লোকে যদি বুঝিত, কত দুঃখে কত কষ্টে, কি আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হ'য়ে আমি আজ এ সব ছেড়েছি! মা বাবা কাঁদিতেছেন, দাদা চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে অনাহারে আফিসে গেলেন; বউদিদির অমন হাসিমুখ মলিন।

সাত বৎসর বয়সের সময় বিবাহ হয়, সে দিনের কথা ভাল করিয়া মনেও পড়ে না। ছয় মাস যাইতে না যাইতেই সংবাদ আসিল, আমি বিধবা হইয়াছি। কুমারী ছিলাম, হঠাৎ একদিন বাদ্যভাণ্ড করিয়া আমাকে যাহারা সধবা সাজাইয়াছিল, আবার ছয় মাস পরে তাহারাই ঘোর কান্নাকাটি করিয়া আমার সিঁথির সিন্দুর মুছিয়া দিল—বলিল, আমি বিধবা। নিজের ইচ্ছায় সধবাও সাজি নাই, নিজের ইচ্ছায় বিধবাও সাজিলাম না।

সাত বৎসর বয়সে বিধবা। কলিকাতা সহরে বাড়ী; বাবা হিন্দুসমাজভুক্ত হইলেও উদারমতাবলম্বী; দাদা তখন কলেজে পড়েন। বাড়ীতে হিন্দু চা'ল চলন ঠিক রক্ষা হয় না। সুতরাং আমি বিধবা হইলেও বেশভূষা পরিত্যাগ করি নাই; বরঞ্চ আমার বৈধব্যের বাহ্যবিকাশ ঢাকিয়া রাখিবার জন্য মা আমাকে সর্বদাই সুন্দর বহুমূল্য বেশভূষায় সজ্জিত করিতেন। আমাকে পড়াইবার জন্য মাষ্টার নিযুক্ত ছিল; বিধবা হইবার পর আমার শিক্ষার ভার বাবা ও দাদা স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। আমি ইংরাজী, বাঙ্গলা ও সংস্কৃত পড়িতে আরম্ভ করিলাম। এখন আমার বয়স ১৯ বৎসর। এতদিন একই ভাবে যাইতেছিল,—পিতামাতার আদর, দাদার স্নেহ, বউদিদির যত্ন, পটলার আবদার—আমি এই সকল লইয়াই ছিলাম। আজ হঠাৎ আমার বেশপরিবর্তন দেখিয়া সকলেই অবাক্ হইয়া গেলেন। কেন এমন কাজ করিলাম, তাহাই বলিতেছি।

২

আমার দাদা,—পৃথিবীতে এতগুণ কার? আমার দাদা শাপভ্রষ্ট দেবতা। দাদা আমার জন্য প্রাণ দিতে পারেন, দাদা আমার জন্য নিজের সুখ বিসর্জন দিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন।

আমার বয়স যখন পনর বৎসর, তখনও আমি বালিকার ন্যায় সরলা ছিলাম; আমার মনে কোনই অভাব ছিল না। দিন রাত্রি আমোদ আনন্দ ও পড়াশুনা করিয়াই কাটাইতাম। পড়াতেই আমার সুখ। আমি সংস্কৃত মহাকাব্যে বিভোর থাকিতাম; দাদার কৃপায় ভাল ভাল

ইংরাজী পুস্তকও অনেক পড়িতে পাইতাম। আমার মনে হইত, পৃথিবীতে জ্ঞানানুশীলনই সুখের চরম উৎস; আমি দেশ বিদেশের মনীষিগণের অতুল জ্ঞানসাগরে নিমগ্ন থাকিয়া সংসারের শোকতাপ কিছুই অনুভব করিতে পারিতাম না। তবে একটা অশান্তি মধ্যে মধ্যে আমাকে বড়ই কাতর করিত; সে দাদার বিবাহে অনিচ্ছা। দাদা এম্. এ. পাশ করিলেন, দাদা ওকালতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন; ছোট আদালতে বাহির হইলেন। তখন দাদার বয়স ২৭ বৎসর। কিন্তু দাদাকে কেহ বিবাহে সম্মত করিতে পারিল না; কেহ বিবাহের প্রস্তাব করিলেই দাদা বলিতেন, "এতদিন ত বাপের পয়সাই ব্যয় করিতেছি; নিজে দশ টাকা আনিতে শিখি, তখন বিবাহ করিবার কথা ভাবিয়া দেখা যাইবে।" আমাদের অবস্থা এমন নয় যে, দাদা দশটাকা না আনিতে পারিলে সংসার অচল হয়। বাবা স্মিথ কোম্পানীর হেড ক্যাশিয়ার; তিনি যাহা উপার্জন করেন তাহাতে আমাদের সংসার চলিয়া যায়, বরঞ্চ কিছু কিছু সঞ্চিত হয়। তাহা ছাড়া পিতামহের আমলেব কিছু কোম্পানির কাগজ আছে; বাড়িখানি আমাদের নিজের। চোরবাগানে আরও একখানি বাড়ি আছে, তাহার ভাড়াও নিতান্ত কম নহে। সুতরাং সাংসারিক অস্বচ্ছলতা আমাদের মোটেই ছিল না; কিন্তু দাদার সেই এক কথা,—"দশটাকা আনিতে না শিখিলে বিবাহের কথা ভাবিবার সময় হইবে না।" এই জন্য মধ্যে মধ্যে আমার একটু কষ্ট হইত। আমার ইচ্ছা, দাদার একটি বেশ সুন্দর বউ আসিবে, সে আমার সঙ্গিনী হইবে, আমি তাহাকে কত সুন্দর পুস্তক পড়াইব; যখন একলা বসিয়া থাকিব, তখন সে আমার সঙ্গে গল্প করিতে আসিবে। দাদা এ সব কথা একেবারেই বুঝিতে চান না।

শেষে এ আপত্তিও আর টেঁকে না। দাদার বেশ পসার হইয়াছে,—মাসে যেমন করিয়া হউক দাদা দুই শত টাকা রোজগার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, আমি একদিন বলিলাম, "দাদা! মাসে দুই শত টাকা ত বড় কম টাকা নহে; দুই শত টাকায় কি একটা বউয়ের ভরণপোষণ চলে না?" দাদা আমার কথার কোন উত্তর করিলেন না, তাঁহার মুখ যেন মলিন হইয়া গেল। আমি কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বিষণ্ণভাবে সেখান হইতে উঠিয়া কার্যান্তরে চলিয়া গেলাম।

সন্ধ্যার সময়ে ছাঁদে বেড়ান আমার কেমন একটা অভ্যাস আমি প্রতিদিন সন্ধ্যার পূর্বে ছাদে উঠি, দুই এক ঘণ্টা রাত্রি না হইলে আর ছাদ হইতে নামি না। নীল আকাশ দূরবিস্তৃত, আকাশের কোলে একখণ্ড শুভ্র মেঘ, মেঘের পাশে পাশে পথহারা দুই একটা পাখি, এই সকলে মিলিয়া আমার স্বপ্নবাজ্য প্রস্তুত করিয়া দিত; আমি সেই নীলাকাশতলে বসিয়া স্বর্গসুখ অনুভব করিতাম।

একদিন সন্ধ্যার পরে ছাদ হইতে নামিয়া আসিতেছি এমন সময়ে বাবার ঘরে কথাবার্তা শুনিতে পাইলাম। অনেকক্ষণ সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, তবুও বাবাব ঘরে আলো দেয় নাই,—অন্ধকারেই কথাবার্তা হইতেছে। স্বরে বুঝিলাম, ঘরের মধ্যে মা, বাবা, দাদা, তিন জনেই আছেন। অন্ধকারের মধ্যে তিন জনে এমন কি গুরুতর বিষয়ে পরামর্শ কবিতেছেন, জানিবার জন্য আমার বড়ই ইচ্ছা হইল। আমি দ্বারের পার্শ্বে চুপ করিয়া দাঁড়াইলাম।

দাদা বলিতেছেন, "আমি বিবাহ করিতে পারিব না। এ বাড়িতে আবার বিবাহের আমোদ!

কমল চিরজীবন বৈধব্যযন্ত্রণা ভোগ করিবে, আর আমি বিবাহ করিয়া সুখে ঘর করিব, তাহা হইতেই পারে না। কমলের জীবন যে ভাবে যাইবে, আমার জীবনও সেই ভাবে কাটাইব।" বাবা এই কথা শুনিয়া বলিলেন, "নলিন, তোমার কথা আমি বুঝিয়াছি। ইহার উপর আমার মতামত প্রকাশ করা বড়ই কঠিন।" মা বলিলেন, "তবে কি আমার অদৃষ্টে সুখ নাই? সোনার মেয়ে কমল, তার এই অদৃষ্ট; তার পর তোমার এই পণ। আমার কি আর সাধ আহ্লাদ করিতে ইচ্ছা হয় না? না বাবা এমন ইচ্ছা করিও না। বিবাহ কর, বৌ আসুক। আমার কমলও তাতে সুখী হইবে। কমল আমার কোথাও যায় না, কাহারও সঙ্গে মেশে না। যদি একটা বউ বাসে, তবে তার সঙ্গে গল্প আমোদআহ্লাদ করে তার জীবনটা বেশ কেটে যেতে পারে।"

এমন সময়ে তামাক লইয়া হরিদাসকে আসিতে দেখিয়া আমি নিঃশব্দে ছাদে চলিয়া গেলাম। সেখানে সেই অন্ধকার রাত্রে একাকিনী বসিয়া আমি ভাবিতে লাগিলাম। আমার দাদা সত্য সত্যই দেবতা—এমন করিয়া কে আত্মসুখ বিসর্জন দিতে পারে? আমার দুঃখ কি? আমি ত বেশ আছি। ইহাতেও দাদার মন উঠেনা। কেন? দাদা বিবাহ করিয়া সুখী হইলে আমার ত আনন্দই বাড়িবে। বউদিদিকে কত আদর যত্ন করিব;—শেষে যখন দাদার ছেলে কি মেয়ে হইবে, তখন তাহাদের লালনপালন করিয়া আমার দিন সুখে কাটিয়া যাইবে। দাদার বুঝিতে ভুল হইয়াছে। আজ দাদার সঙ্গে মহা তর্ক করিব।

৩

দাদা বলিলেন, "আজ তুই যে ভাবে বসলি, তাতে দেখছি বিপুল আয়োজন! মিল, স্পেন্সার প্রভৃতি দুই একখানি অমোঘ অস্ত্র বাহির করিব নাকি?"

আমি গম্ভীর হইয়া বলিলাম, "না দাদা, সে সব অস্ত্রে চলিবে না। বঙ্কিম বাবুর দাম্পত্য-দণ্ডবিধির ধারা লইয়া তর্ক ।"

দাদার মুখ মলিন হইয়া গেল, তিনি গম্ভীর হইয়া বসিলেন। আমি বলিলাম, "দেখ দাদা, তোমরা এই একটু আগে যে সব কথা বলাবলি করিতেছিলে, আমি সে সব শুনেছি—সব না শুন্‌লেও তোমার শেষ বক্তৃতা আমি শুনে ফেলেছি।"

দাদা আমার মুখের দিকে কাতর দৃষ্টিতে চাহিলেন; আমিও থামিয়া গেলাম। কথাটা পাড়িয়াছি, কিন্তু এখন কেমন করিয়া অগ্রসর হইব, তাহার যো পাইতেছি না। শেষে হঠাৎ বলিয়া বসিলাম, "দাদা তোমাকে বিবাহ করিতে হইবে।" কথাটা বেশ দৃঢ়তার সহিতই বলিলাম। স্থির করিলাম, যুক্তি তর্ক করিব না, বিচার বিতণ্ডা মোটেই করিব না; আমি জোর করিয়া দাদাকে বিবাহ করাইব। আমি দাদার অতুল স্নেহের অধিকারিণী; সেই স্নেহের খাতিরে দাদা আমার কথা ঠেলিয়া ফেলিতে পারিবেন না। দাদা চুপ করিয়া রহিলেন, কোনও জবাবই দিলেন না। আমি আবার অধিকতর দৃঢ়তার সহিত বলিলাম, "তোমাকে বিবাহ করিতেই হইবে।"

এইবার দাদা উত্তর করিলেন, "কাজটা কি বড় সহজ মনে করলে, কমল!"

আমি, সহজ?—এমন কঠিন কাজ কেহ কখন করে নাই; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়োদের মধ্যে তুমিই এ ব্যাপারের প্রথম দৃষ্টান্ত দেখাচ্চ, বাপ রে, বিয়ে করা কি সহজ কাজ!

দাদা। কমল, তুমি কথাগুলি মোটেই তলিয়ে বুঝলে না।

আমি। তা আমার না হয় বুঝিবার শক্তি নাই, অবুঝ ছোট বোনের অনুরোধ,—না দাদা তোমার পায়ের পড়ি, তোমাকে বিবাহ করিতেই হইবে। তুমি যদি এই মাসের মধ্যে বিবাহ না কর, তাহা হইলে ভাল হইবে না। যে জন্য তুমি বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক, তাহা আমি শুনিয়াছি। এখন আমার কথা শোন; এই বৈশাখ মাসের মধ্যে যদি তুমি বিবাহ না কর, তাহা হইলে ১লা জ্যৈষ্ঠ তারিখে যেমন করিয়া হয় আমি মরিব। ইহাই আমার প্রতিজ্ঞা!

আমি আর কথা কহিতে পারিলাম না; ধীরে ধীরে গৃহান্তরে চলিয়া গেলাম। কিছুক্ষণ পরে আসিয়া দেখি, দাদা টেবিলের উপর মাথা দিয়া চেয়ারে বসিয়া আছেন। আমি দাদার পাশে আসিয়া দাঁড়াইলাম, অতি মৃদুস্বরে ডাকিলাম, "দাদা!"

দাদা মুখ তুলিয়া চাহিলেন; তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া আমার বড়ই কষ্ট হইল। আমি বলিলাম, "দাদা, ভালর জন্যই আমি তোমাকে বিবাহ করিতে বলিতেছি; আমার জন্য তুমি তোমার জীবনের সুখ নষ্ট করিবে? তোমার কাছে আমার কিছুই গোপনীয় নাই। তুমি শুধু আমার দাদা নও; আমার খেলার সাথি, আমার সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী। দাদা, তোমাকে সত্য বলিতেছি, আমার ত কোন দুঃখ নাই। তোমার মত দাদা যার আছে, তার দুঃখ কি? দাদা, আমার কথা শোন, বিবাহ কর। আমার মরণ যদি দেখিতে না চাও, তবে বিবাহ কর।"

দাদা বুঝিলেন, আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ; তিনি বলিলেন, "কমল, তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি কিছু করিব না। কিন্তু এখনও ভাবিয়া দেখ, কাজটা ভাল করিলে না।"

"আমি বেশ ভাবিয়া দেখিয়াছি; আমার জন্য তুমি এমন কাজ করিতে পারিবে না।"

দাদা একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "কমল, তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে। তোমার কথা উড়াইবার সাধ্য আমার নাই।"

৪

বৈশাখ মাসেই দাদার বিবাহ হইয়া গেল। বউদিদি সকলেরই মনের মত হইলেন। আমার যে কত আনন্দ হইল, তাহা আর বলিবার নহে। এক বৎসর পরেই দাদার খোকা হইল—আমার কাজ বাড়িল। এখন আর পড়াশুনায় তেমন আগ্রহ রহিল না; দিন রাত্রি শুধু খোকাকে লইয়া থাকি। আমিই আদর করিয়া তাহার নাম পটলা দিলাম।

এই সময়ে এক দিন আমার যেন কি হইল। কেন হইল, তাহা জানি না; তবে কিসে কি হইল, তাহা বলিতে পারি। এক দিন অপরাহ্নে আমি দাদার ঘরের সম্মুখ দিয়া ছাদে যাইতেছি, এমন সময়ে হঠাৎ চাহিয়া দেখি, ঘরের মধ্যে দাদা আর বউদিদি। দাদা আদর করিয়া বউদিদির চিবুক ধরিয়া মুখচুম্বন করিতেছেন। এ দৃশ্য আমি কখনও দেখি নাই, আমার চক্ষে ইহা কখনও পড়ে নাই। হতভাগিনি আমি, এই দৃশ্য দেখিয়া আমার বুক কাঁপিয়া উঠিল, আমার প্রাণের

ভিতর দিয়া কি যেন একটা বহিয়া গেল। আমার সমস্ত হৃদয়ের নির্বাপিতপ্রায় ক্ষুধা তৃষ্ণা যেন জাগিয়া উঠিল। আমি তাড়াতাড়ি ছাদে গেলাম। পূর্বের মত চারি দিকে চাহিয়া আপন মনে গুনগুন করিয়া যেন সেই দৃশ্য আমার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়। আমার প্রাণের অতৃপ্ত বাসনা ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিল। আমার এই ১৮ বৎসর বয়সের মধ্যে একদিনও যে ভাব আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিবার পথ পায় নাই, আজ সেই বাসনা আমাকে আচ্ছন্ন করিল। আমি এক মুহূর্তে যৌবনের সাধ-বাসনার দাস হইয়া পড়িলাম। মনে হইল, কি পাপে আমার এ শাস্তি? এমন করিয়া আদর করিবার আমার যে কেহ নাই! জীবন যেন বৃথা বোধ হইতে লাগিল; দারুণ পিপাসায় আমার ছাতি ফাটিতে লাগিল। সাত বৎসরের সময় বিধবা হইয়াছি, জীবনের কোন সুখেরই যেন আস্বাদ পাই নাই, আজ আমার লালসাবহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। আকাশে—সেই অনন্ত নীলিমার দিকে চাহিয়া রহিলাম; তাহাতেও যেন আমার অতৃপ্ত বাসনা, আমার যৌবন-কামনার স্রোত বহিয়া যাইতেছে; সান্ধ্যপবনহিল্লোল যেন কোথা হইতে যৌবনের অতৃপ্তি আনিয়া আমার গায়ে ঢালিয়া দিতে লাগিল। শুধু মনে হইতে লাগিল, আমায় সোহাগ করিবার কেহ নাই। মায়ের স্নেহ, পিতাব আদর, দাদার অপরিমেয় ভালবাসা সব যেন সামান্য বোধ হইতে লাগিল। রমণীর যাহা সর্বস্ব, যৌবনের যাহা কামনা, সেই আদর সেই ভালবাসার জন্য আমার তৃষিত হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল—আমার সকল বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। আজ আঠারো বৎসর যে চিন্তা কোন দিন আমার মনে উদিত হয় নাই, আজ নূতন করিয়া—তাহা মনে হইল;—বোধ হইল, জীবন বৃথায় গেল। কোন সাধ, কোন বাসনাই পূর্ণ হইল না। আমি জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপাইয়া পড়িলাম।

৫

আমাদের বাড়ির পাশ দিয়াই একটা গলি গিয়াছে। গলির অপর পার্শ্বে সরকারদিগের বাড়ি। এত দিন তাহারা এই বাড়িতেই বাস করিত; কিন্তু এই সময়ে তাহাদের অবস্থা মন্দ হওয়ায় তাহারা শ্যামবাজারে একটা ছোট ভাড়াটিয়া বাড়িতে উঠিয়া গেল। তাহাদের বাড়ি স্কুল কলেজের ছেলেরা ভাড়া লইয়া মেস্ করিল। আমাদের ছাদে উঠা একেবারে বন্ধ হইয়া গেল: কিন্তু আমার এতকালের অভ্যাস, আমি সন্ধ্যার পরে ছাদে না উঠিয়া থাকিতে পারিতাম না। সন্ধ্যার পরেও মেসের ছেলেরা ছাদে বসিয়া নানা বিষয়ে তর্ক বিতর্ক কবিত, কিন্তু তাহাতে আমার কোন প্রকার লজ্জা বোধ হইত না।—আমি ছাদের এক পাশে বসিয়া কখনও বা তাহাদের তর্ক বিতর্ক শুনিতাম, কখনও বা আপন মনে বসিয়া নিজের অদৃষ্টের কথা ভাবিতাম। সরকারদের তেতালায় সবে একটি ঘর। ঘরটি খুব ছোট। সেই ঘরে সোনার চশমা পরা দিব্য ফুটফুটে গৌরবর্ণ একটি ছাত্র থাকিতেন। তাঁহার সেই ঘরের পশ্চিম দিকের জানালা খুলিলে আমাদের ছাদ বেশ দেখা যাইত।

ছাত্র মহাশয়েরা পৃথিবীর সমস্ত বিষয় লইয়া তর্কবিতর্ক করিয়া শ্রান্ত হইয়া যখন নীচে নামিয়া যাইতেন, তখন ঐ ছাত্রটি ধীরে ধীরে সেই তেতালার ঘরে প্রবেশ করিয়া পশ্চিম

দিকের জানালা খুলিয়া দিতেন; তাহার পর টেবিলের উপরের কেরোসিন-ল্যাম্পটি জ্বালিয়া এক খানি চেয়ারে বসিয়া পড়াশুনায় মনোনিবেশ করিতেন; পড়িতে পড়িতে যখন ক্লান্ত বোধ হইত, তখন কখনও বা বই-হাতে ছাদে আসিয়া পায়চারি করিতেন, কখনও বা পশ্চিম দিকের সেই জানালার গরাদে ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেন। জ্যোৎস্নারাত্রে আমি খুব কমই ছাদে বসিয়া থাকিতাম, কিন্তু অন্ধকার রাত্রে আমি ছাদে বসিয়া ছাত্রটির সুন্দর মুখখানি দেখিতাম। তিনি যখন পাঠে নিবিষ্টচিত্ত হইতেন, আমি তখন হাঁ করিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকিতাম। কেমন শিষ্ট শান্ত, কেমন নম্রপ্রকৃতি! ছাদে যখন ছাত্রগণের পার্লিয়ামেণ্ট বসিত, এবং তাহাতে বার্ডসায়ের মূল্য হইতে আরম্ভ করিয়া থিয়েটার, কংগ্রেস, ব্রিটিশ পার্লিয়ামেণ্ট, টেনিসন, সেক্সপিয়র, রবীন্দ্রনাথ, সাহিত্য ভারতী প্রভৃতি হরেক রকমের আলোচনা হইত, তখন ঐ তেতালার ছাত্রটি কিন্তু তাহাতে যোগ দিতেন না। আমি দেখিতাম, তিনি এক পার্শ্বে বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে কি চিন্তা করিতেন। তাঁহার ঐ ভাবটি আমার বড়ই ভাল লাগিত। আমার মনে হইত. এই ছাত্রটি ঠিক আমার মত মানুষ; আমি যেমন এখন দিনরাত্রি বসিয়া ভাবি, ইহারও তাহাই। কিন্তু তিনি কি ভাবেন, কে জানে?

এমন করিয়া কতদিন যাইবে? শেষে তেতালার ছাত্রটি আমাকে দেখিয়া ফেলিলেন। একদিন হঠাৎ আমাদের চারি চক্ষু মিলন হইল; তিনি অমনি মুখ নত করিয়া ঘরের মধ্যে চলিয়া গেলেন। আমি ছাদেই বসিয়া রহিলাম। আমার হৃদয়ের মধ্যে কি যেন একটা বহিয়া গেল। ইহার পর হইতে যখন ছাদে অন্য ছাত্রেরা থাকিত,তখন আমি মোটেই উপরে যাইতাম না। সকলে চলিয়া গেলে আমি চোরের মত ছাদে যাইয়া বসিতাম; কিন্তু রাত্রের অন্ধকারে তিনি আমাকে ভাল করিয়া দেখিতে পাইতেন না, আমি তাঁকে বেশ দেখিতে পাইতাম।

শেষে আমি যেন অধীরা হইয়া উঠিলাম। দিনের বেলায় দ্বিপ্রহরে পথের দিকে চাহিয়া থাকিতাম, কখন তিনি কলেজ হইতে ফিরিবেন। যখন দেখিতাম, তিনি সেই রৌদ্রতপ্ত রাজপথ বহিয়া মেসে আসিতেছেন। তখন আমার আর আনন্দের সীমা থাকিত না। আমি চুপে চুপে সেই দ্বিপ্রহর রৌদ্রে ছাদে উঠিতাম এবং তাঁহাকে দেখিতাম। প্রথম প্রথম তিনি যেন কেমন অপ্রতিভ ও মলিন হইয়া যাইতেন; তাহার পর ক্রমে তাঁহার সে সঙ্কোচ চলিয়া গেল। আমাদের মধ্যে কথাবার্তা চলিতে লাগিল,—অতি গোপনে, অতি সাবধানে!

৬

এমন করিয়া আর কত দিন চলে? শেষে দুই জনে ছাদে বসিয়া পরামর্শ আঁটিলাম, পলায়ন করিব। আমার তখন মনে হইত, এমন করিয়া স্বর্গের দ্বারে তৃষিত অবস্থায় বসিয়া থাকি কেন? একটু সাহস করিলেই ত নরেন্দ্রনাথ চিরজীবনের মত আমার হইয়া যায়— আমার সব সাধ বাসনা পূর্ণ হয়।

পলায়ন স্থির হইল। আমি কিছুই লইয়া যাইব না; টাকাকড়ি গহনাপত্র কিছুই লইব না। দরকার কি? যে স্বর্গসুখের অধীশ্বরী হইব, তাহার নিকট টাকাকড়ি কি ছার!

গতকল্য রাত্রি ৯ টার সময়ে একখানি সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ি আসিয়া আমাদের গলির মোড়ে দাঁড়াইল; আমি অন্যের অজ্ঞাতসারে খিড়কির দ্বার দিয়া বাহির হইয়া গাড়িতে উঠিলাম—গাড়ির মধ্যে নরেন্দ্রনাথ।

আমি নরেন্দ্রনাথের পার্শ্বে উপবিষ্ট হইলাম। নরেন্দ্রনাথ গাড়ির দ্বার বন্ধ করিয়া দিল, গাড়োয়ানকে হাবড়া স্টেশনে যাইতে হুকুম দিল। তাহার পর—সে পাপ কথা বলিতে প্রাণ বাহির হইয়া যাইতেছে—তাহার পর নরেন্দ্রনাথ আমার মুখচুম্বন করিল। সেই মুহূর্তে আমার সর্বশরীর শিহরিয়া উঠিল, আমার হৃদয়ের মধ্যে যেন অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল, আমার শরীরের প্রত্যেক শিরায় যেন বিষের স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল, আমার মাথায় যেন বজ্র ভাঙিয়া পড়িল। আমি সজোরে তাহার মুখ সরাইয়া দিলাম, হৃদয়ের সমস্ত শক্তি একীভূত করিয়া চিৎকার করিয়া উঠিলাম। গাড়োয়ান ভীত হইয়া হঠাৎ গাড়ি থামাইয়া ফেলিল। আমি মুহূর্তের মধ্যে গাড়ির দ্বার খুলিয়া লাফাইয়া পড়িলাম। একেবারে রাস্তার উপরে পড়িয়া গেলাম। "কি কর, কি কর!" বলিয়া নরেন্দ্র—সেই পিশাচ—গাড়ি হইতে নামিতে গেল; আমি এক ধাক্কায় তাহাকে পথের উপর ফেলিয়া দিয়া যে দিক হইতে গাড়ি আসিয়াছিল, সেই দিকে ছুটিতে লাগিলাম। পথে তখন লোক ছিল না। একটু যাইতেই পথ চিনিলাম, আমাদের বাড়ি হইতে বেশি দূরে যাই নাই। সম্মুখে দেখি, কে যেন আসিতেছে; তখন মাথায় ঘোমটা টানিয়া দিয়া জড়সড় ভাবে পথের এক পার্শ্বে দাঁড়াইলাম। লোকটি আমার দিকে তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া চলিয়া গেল। আমি আবার চলিতে লাগিলাম। একটু গিয়াই আমাদের খিড়কিতে প্রবেশ করিয়া দরজা রুদ্ধ করিয়া দিলাম। কেহই কিছু জানিতে পারিল না।

সমস্ত রাত্রি যে আমার কি যন্ত্রণায় কাটিল, তাহা বলিতে পারি না। আমার মনে হইল, কে যেন আমার ওষ্ঠে অগ্নিসংযোগ করিয়াছে; আমার মুখ যে পুড়িয়া গেল। হায়! ইহারই নাম সুখ, ইহারই নাম প্রেম! কে জ্বলন্ত অগ্নিশিখা আমার ওষ্ঠে মাখাইয়া দিল? একবার মনে হইল, গলায় দড়ি দিয়া এ জীবন শেষ করি। কিন্তু পারিলাম না। কেন পারিলাম না? তাহা হইলে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল কৈ? যত দিন বাঁচিব, তত দিন আমার এমনই করিয়া সমস্ত মুখ অদৃশ্য অগ্নিতে পুড়িতে থাকিবে—চিরজীবন আমি অন্যের অগোচরে ধিকিধিকি করিয়া তুষানলে দগ্ধ হইব, তবে ত আমার প্রায়শ্চিত্ত! আমি সেই প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করিলাম। মরা হইল না।

আর আমার এই রূপ—ইহাই আমার কাল। কা'ল রাত্রে আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, বিলাস ত্যাগ করিব, রূপের বাসায় আগুন লাগাইয়া দিব। তাই আজ প্রাতেই আমার সেই নরকের সঙ্গী কেশপাশ কাটিয়া ফেলিয়াছি, অলংকার খুলিয়া ফেলিয়াছি, সাদা কাপড় পড়িয়াছি। ছয় মাস অন্ন গ্রহণ করিব না; সামান্য ফল মূল খাইয়া জীবন ধারণ করিব।

মা বাবা কাঁদিতেছেন দাদা কাঁদিতেছেন, বউদিদি বিষণ্ণ, পটলা আমার এ পরিবর্তনে কাতর, কিন্তু আমার যে কি যন্ত্রণা—সমস্ত মুখটা যেন পুড়িয়া যাইতেছে। হা ভগবান!

—সাহিত্য ১২শ বর্ষ ১৩০৮, ৩য় সংখ্যা, আষাঢ়।

রমণী

হিমালয়বক্ষে বিরাজিত একটি উপত্যকায় একটি সুন্দর সহর কিরূপে স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা কেহ বলিতে পারে না; কিন্তু সে সহরে যে আসে, সেই প্রকৃতির মধুর সৌন্দর্য দেখিয়া মুগ্ধ হয়। কয়েক জন পেন্সনপ্রাপ্ত সাহেব এই স্থানটিতে বাস্তুভিটা নির্মাণ করিয়াছেন, সেই কারণে সহরটিতে বিস্তর শ্বেতাঙ্গ পুরুষ ও মহিলার সমাগম হইত। সিমলায় যখন মরশুম পড়ে, এখানকার জনকোলাহল তখনই বাড়িয়া ওঠে। বিশেষত, যে বৎসর বায়ুসেবনের হুজুক বৃদ্ধি হইত, সে বৎসর বাঙালিটোলাটি একেবারে গুলজার হইত। বাঙালা দেশের অনেক বড়লোকই সেই উপলক্ষে এখানে পদার্পণ করিতেন। আমি বড়লোকই নহি, বায়ুভক্ষণেরও আমার কোন আবশ্যক ছিল না, তবু আমি এখানে বেড়াইতে আসিয়াছি। সখ করিয়া নহে; প্রায় কোন স্থানেই দুই মাসের বেশি থাকিতে প্রবৃত্তি হয় না; এখানে আমি ছয় মাস আছি। —মন টিকিয়াছে কি না সে কথা কোন দিনও চিন্তা করি নাই।

একটি ক্ষুদ্র বাংলো আমার বাসগৃহ। দূর অরণ্য হইতে বায়ুর হিল্লোল আসিয়া পুরাতন সুখের স্মৃতি মনের মধ্যে জাগাইয়া যায়; মধ্যে মধ্যে আরণ্য কুসুমের সৌরভে আমার বাংলোখানি আচ্ছন্ন হয়, এবং বাতায়নে পথে গিরিশৃঙ্গের সহিত ধূমকান্তি মেঘের আলিঙ্গন দেখিতে দেখিতে যেন কোনও দূর স্বপ্নরাজ্যে ভাসিয়া যাই। আমার অতৃপ্ত কামনা পাহাড়ের বাহিরে বহিঃপৃথিবীর মধ্যে ব্যাপ্ত হইবার সুবিধা না পাইয়া যেন সেই সংকীর্ণ স্থানটিতে ব্যাকুলভাবে ঘুরিয়া বেড়াইত। কিন্তু আমার কি হইয়াছে, আমি ঠিক বুঝিতে পারি না।

বাংলোয় আরও দুইটি প্রাণীর সহিত আমি একত্র বাস করি; একজন সেই দেশীয় একটি ভৃত্য, নাম লখিয়া; সে বহুরূপী। কখন ভৃত্য, কখন পাচক, কখন দরোয়ান, আরদালিগিরিও যে তাহাকে দুই এক বার করিতে হয় নাই, তাহা বলিতে পারি না; লুচি ভাজিতে ও জুতা ব্রস করিতে সে সমান তৎপর। আমার অন্য সহচরটির নাম রামচরণ, সে আমার পিতামহের আমলের ভৃত্য। রামচরণের বাল্য-জীবনের ইতিহাসটি করুণরসসিক্ত। সে আমার পিতার বয়সি। সে যখন আমাদের বাড়ি আসিয়াছিল, শুনিয়াছি, তখন তাহার বয়স তের বৎসর। এখন তাহার পেন্সন লইবার বয়স হইয়াছে, পঞ্চান্ন উত্তীর্ণ হইয়াছে। কিন্তু সে শেষ দিন পর্যন্ত আমাদের পরিচর্যা করিবে, এরূপ সংকল্পই স্থির করিয়াছে। পিতামহ আশ্রিতবৎসল ছিলেন, তিনি রামচরণকে একটি বাড়ি দিয়াছিলেন, রামচরণের বিবাহও তিনি দিয়া যান। কিন্তু হতভাগ্যের গার্হস্থ্য সুখ স্থায়ী হইল না। রামচরণের হস্তে তাহার পত্নী মুক্তকেশী একটি পুত্রসন্তান উপহার দিয়া বিধাতার আহ্বানে পৃথিবী ছাড়িয়া চলিয়া গেল। মাতৃহীন শিশুকেও বাঁচাইতে পারা গেল না। রামচরণ অশ্রু মুছিয়া আমার পিতামহের কাছে আসিয়া বলিল, "জ্যাঠামহাশয়! সংসারধর্ম সব শেষ করে' এসেছি; এই ঘরের চাবি নেন, আমার আর বাড়ি

ঘরের দরকার নেই, বৈঠকখানার এক কোণেই পড়ে থাক্‌বো।" পিতামহ কথাটা বুঝিলেন, দাসদাসীর বেদনাবোধের শক্তি নষ্ট করিবার মত বিদ্যা বুদ্ধি তাঁহার ছিল না; তিনি বলিলেন, "কি বলবো বাবা! তোকে সংসারী করবার জন্য আমরা যথাসাধ্য করেছি।" শোক কিঞ্চিৎ পুরাতন হইলে, তাহার অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী পরামর্শ দিয়াছিল, আর একটি দারপরিগ্রহ করিলে তাহার সংসার ধর্ম পুনর্বার বজায় হইতে পারে। রামচরণ সে কথার কোনও উত্তর দিত না, সে আমার ভগিনী সুরবালাকে কোলের মধ্যে টানিয়া লইযা বলিত, "এদের নিয়েই আমাব সংসার।"

আমি সূতিকাগৃহ হইতে বাহির হইলে রামচরণই আমাকে কোলে তুলিয়া লয়; সংসারে আসিয়া মাতৃক্রোড় হইতে সর্বপ্রথম তাহার ক্রোড়েই আশ্রয় লাভ করি। মা আমার স্বর্গে গিয়াছেন। এখনও কত সময় রামচরণের স্নেহের কোলে মাথা রাখিয়া দগ্ধজীবন শান্ত করি। রামচরণের নিকট আমি এখনও খোকা বাবু।

আমার স্নেহময়ী ভগিনী সুরবালাকেও রামচরণ কম ভালবাসিত না, কিন্তু সুরবালার জন্য রামচবণের কোন আক্ষেপ নাই। সুরবালাকে রামচরণ ননি বলিযা ডাকিত। ননির জন্য সময়ে সময়ে তাহার মন কেমন করিত। কিন্তু ননি সম্বন্ধে সে নিশ্চিন্ত; আমার ভগিনীপতি ভবেশ বাবু একজন বড় ডেপুটি। দুই হস্তে উড়াইবার মত পৈতৃক সঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও তিনি কেন চাকরি করেন, সে রহস্য আমি কখনও ভেদ করিবার চেষ্টা করি নাই, বোধ করি, রায় বাহাদুর খেতাবই তাঁহার একমাত্র লক্ষ নহে। যাহা হউক, সুরবালা যোগ্যপাত্রেই পড়িয়াছে। সুরবালা সংসারের কর্ত্রী, আমার ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ভগিনীপতি তাহাকে তাঁহার উপরওযালা ম্যাজিস্ট্রেট অপেক্ষা অধিক ভয় করিতেন।

আমি যে দিনের কথা বলিতেছি, সে দিন বৈশাখ মাস। অপরাহ্ণে হঠাৎ মেঘ করিয়া বৃষ্টি আসিল; বাংলোর সার্সীগুলা বন্ধ করিয়া আমি একখান নেয়ারের খাটে শুইয়া শূন্যদৃষ্টিতে ঘরের কড়িকাঠের দিকে চাহিয়া কি ভাবিতেছিলাম, তাহা তখন কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেও বলিতে পারিতাম না।

রামচরণ আমার মাথার কাছে বসিয়া, দেশে আমাদের বাগানে এবার কি পরিমাণে আম ফলিয়াছে, তাহারই আলোচনা লইয়া ব্যস্ত ছিল। সে কথা দুই একবার আমার কর্ণে প্রবেশ করিল,—শেষে রামচরণ উঠিয়া একটা জানালা খুলিয়া দিল, একটা জলের ঝাপটা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

রামচরণ জানালা বন্ধ করিয়া আমার পায়ের কাছে আসিয়া বসিল; বলিল, "খোকাবাবু! তোমার পায়ে একটু হাত বুলোই?" আমার চক্ষু সিক্ত হইয়া উঠিল। হঠাৎ বোধ করি পূর্বকথা রামচরণের মনে পড়িয়া গেল; সে বলিল, "খোকাবাবু! অল্পের জন্যে এমন সাজান সংসাবটা নষ্ট কল্লে! এ আপশোশ মলেও ত আমার যাবে না।"

রামচরণ আমার সংসারত্যাগের কারণ জানিত, পৃথিবীতে আমবা তিন জন মাত্র লোক ইহা জানিতাম; রামচরণ, আমি, আর—আর এক জন। সে কে, তাহা একটু ভাঙিয়া বলিলে কথাটা বুঝিতে পারা যাইবে।

২

সে অনেক পূর্বকার কথা—প্রায় দশ বৎসর পূর্বের। আমার বয়স এখন সাতাশ বৎসর। এখন আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. নামক চক্রচিহ্নিত শিক্ষিত যুবক। কিন্তু যে ক্ষুদ্র ঘটনাটি এই তুচ্ছ জীবনের গতি পরিবর্তিত করিয়াছিল, তাহা ঠিক দশ বৎসর পূর্বেই সংঘটিত হইয়াছিল। দশ বৎসর পূর্বের সহিত আজিকার দিনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আমি মর্মে মর্মে অনুভব কারিতেছি।

সতেরো বৎসর বয়সের যে উৎসাহ, উদ্যম, যে প্রফুল্লতা, যে হৃদয়ভরা স্ফূর্তি—তাহার তুলনা দুর্লভ। বর্ষাজলপুষ্ট লতার শ্যামলতা, প্রভাতপদ্মের বর্ণের অরুণিমা, শরতের পূর্ণচন্দ্রের শুভ্র কিরণে যূথিকার হাসি, এ সকল অনেকবার দেখিয়াছি, কখন কখন মুগ্ধও হইয়াছি। কিন্তু *নারীমুখের সৌন্দর্য কি, তাহা তখন ঠিক বুঝিতে পাবিতাম না; যে সৌন্দর্য চিরদিন চিত্তকে* মরীচিকার মত উৎক্ষিপ্ত করিয়া শূন্যে মিশাইয়া যায়, তাহার মহিমা, তখনও আমি অনুভব করিতে পারি নাই।

সতেরো বৎসর বয়সে এল. এ. পাশ করিয়া আমি সুরবালার শ্বশুরবাড়ি যাই। সুরবালার বয়স তখন পনেরো বৎসর। তাহার এক বৎসব পূর্বে সুববালার বিবাহ হইয়াছিল। আমার ভগিনীপতি ভবেশবাবু তখন বি. এ. পাশ কবিযা প্রেসিডেন্সিতে এম. এ. পড়িতেন। পূজার ছুটিতে তিনি বাড়ি আসিয়াছিলেন, আমি পূজার অবকাশে সুরবালাকে দেখিতে তাঁহাদের বাড়ি গিয়াছিলাম।

আমি ভবেশ বাবুদের বাড়ি উপস্থিত হইলে, ভবেশবাবু আমাকে আদর করিয়া একেবারে অন্দরমহলে লইয়া চলিলেন। তাঁহার শয়নকক্ষে দুখানি চেয়ারে আমরা মুখোমুখি হইয়া গল্প করিতেছি, এমন সময়ে একটি যুবতী—যুবতী কি কিশোরী ঠিক বলিতে পারি না—সুরবালার প্রায় সমবয়স্কা একটি সুন্দরী "দাদা বড় মজা হয়েছে!" বলিয়া উন্মুক্তহাস্যে যেন হঠাৎ কক্ষটি ঝংকারিত করিয়া বিদ্যুতের মত সেই কক্ষে প্রবেশ করিল; হঠাৎ আমাকে দেখিয়া মুখখানি লাল করিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। তাহার হাসি ও ব্যস্ততা মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হইল। এক মুহূর্ত সেখানে দাঁড়াইয়া মুখখানি নত করিয়া অত্যন্ত অপ্রস্তুতভাবে গৃহ হইতে চলিয়া গেল। তাহার দাদা তাহাকে ফিরাইবাব জন্য কতবার ডাকিলেন, দ্বার পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া তাহাকে ডাকিলেন; সুন্দরী ফিরিল না। ভবেশ বাবু বলিলেন, "রমণীর বড় লজ্জা, তোমাকে দেখেও লজ্জা।" তাঁহার হাস্যময় মুখখানি হঠাৎ গম্ভীর হইয়া উঠিল।

আমি জানিতাম, রমণী কে। রমণী ভবেশ বাবুর কনিষ্ঠা সহোদরা। রমণী বিধবা, সে সংবাদও রাখিতাম। পূর্বে আর কখনও ভবেশ বাবুদের বাড়ি যাই নাই। রমণীকে এই সর্বপ্রথম দেখিলাম।

কিন্তু কি দেখিলাম! এমন আর কখন দেখিয়াছি বলিয়া মনে হইল না। দেখিয়া বোধ হইল, ঘনকৃষ্ণ মেঘের ভিতর বিজলি খেলিয়া গেল; সেই চকিত বিদ্যুতের আলোকে আমার

বোধ হইল, আমার সতেরো বৎসরের আলোকহীন উজ্জ্বলতাহীন যৌবনের রুদ্ধ কক্ষে কে যেন বাতি জ্বালিয়া আলোকিত করিয়া গেল।

তিনদিন পরে ভবেশ বাবুর বাড়ি হইতে বিদায় লইয়া গাড়িতে গিয়া উঠিলাম। কিন্তু দেখিলাম, তিন দিনের মধ্যেই আমার মনের মধ্যে একটা ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। বিপ্লবের কারণও বুঝিলাম, ফলও ভোগ করিতে লাগিলাম; কিন্তু মন সংযত করিবার পক্ষে কোন যুক্তিই কাজে লাগাইতে পারিলাম না। রক্তমাংসের শরীর ভেদ করিয়া যে ছুরিকা মনের উপর দাগ বসাইয়া যায়—তাহার তীক্ষ্নতা একটি মুহূর্তেই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি।—রমণীকে ভুলিতে পারিলাম না।

বাড়ি ফিরিয়াও রমণীর কথাই মনে জাগিতে লাগিল। সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটিয়া গেল, মনকে নানা কার্যে নিযুক্ত রাখিবার জন্য কত চেষ্টা করিলাম—কোনও ফল হইল না। নিজের মনের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া পরাজিত ও অবসন্ন হইলাম। এক মাসও উত্তীর্ণ হইল না, আমি সুরবালাকে দেখিতে আবার ভবেশ বাবুর বাড়ি চলিলাম। সত্যই কি সুরবালাকে দেখিতে?—সুরবালার বিবাহের পর এক বৎসরের মধ্যে তাহাকে দেখিতে যাই নাই; সে কথাও মনে পড়িল। আত্মসুখের জন্য আমাকেও আত্মপ্রবঞ্চনার দাসত্ব করিতে হইল।

সে দিন প্রথমেই বাহিরের ঘরেই ভবেশ বাবুর সঙ্গে আমার আলাপ হইল। তাহার পর ভবেশ বাবু অন্দরে যাইবার জন্য উঠিলেন, গল্প করিতে করিতে চলিলেন, আমি তাঁহার অনুসরণ করিলাম। লজ্জা আসিয়া প্রতিপদে বাধা দিতে লাগিল। ভবেশ বাবু আমাকে লইয়া একেবারে তাঁহার শয়নকক্ষে উপস্থিত হইলেন। রমণী তখন টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া কি একখানি বহি পড়িতেছিল। দরজার সম্মুখে আমি, ভবেশ বাবু ভিতরে—রমণী পলাইতে না পারিয়া হাঁপাইয়া উঠিল। মুখখানি অবনত করিল। আমি একবার তাহার মুখের দিকে চাহিলাম। তাহাতে এমন একটা সলজ্জ কোমলতা মাখান ছিল যে,—আমার নূতন করিয়া মনে হইল, এ অপরূপ সুন্দরী, রমণী বিধবা? বিধাতার এ কি বিচার!

সে দিন আমাদের পরিচয়মাত্র। ক্রমে অধিক আলাপে রমণীর সঙ্কোচ দূর হইল। আমার নিকট তাহার কুণ্ঠিতভাব রহিল না; আমি মধ্যে মধ্যে সুরবালাকে দেখিতে যাইতাম। আমাকে দেখিয়া রমণী কোন প্রকার হর্ষপ্রকাশ করিত না, নিজের গাম্ভীর্য দ্বারা আপনাকে অবগুণ্ঠিত রাখিবার চেষ্টা করিত। কিন্তু তাহার নয়নের ব্যাকুলতা সে লুকাইতে পারিত না; অন্যমনস্কতা ঢাকিবার জন্য তাহাকে জোর করিয়া সকল কাজে মন দিতে হইত।

পাঁচ ছয় মাস পরে কথায় কথায় রমণীর কাছে আমার মনের ভাব প্রকাশ করিলাম। রমণী ধীরভাবে সকল কথা শুনিল, কোনও উত্তর না করিযা মাথা নীচু করিয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় কেবল সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া গেল।

শরীর অবসন্ন, মন ভারাক্রান্ত, কোনও কর্মে উৎসাহ নাই। বাবা আমাকে দার্জিলিং পাঠাইলেন; রামচরণ আমার শুশ্রূষার জন্য সঙ্গে চলিল। দিনকতক বাড়ির কোনও খবর পাই নাই। শেষে এক প্রিয় বন্ধুর পত্রে অবগত হইলাম, বাবার হাতের কাজকর্ম বড় মন্দা, তিনি আমার বিবাহের জন্য একটি সুন্দরী মেয়ে খুঁজিতেছেন। বন্ধুর পত্র পাঠ করিয়া একটু

হাসিলাম।—রামচরণ আমার কাছেই দাঁড়াইয়াছিল, সে আমার হাসি দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"পত্রে কোন সুখবর আছে নাকি, খোকা বাবু?"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "বাবা যে আমার বিয়ের যোগাড় কচ্ছেন, রামচরণ! ফলারটা বুঝি এবার খেলি।"

রামচরণ হতাশভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, "আর ফলার! তোমার যে গতিক—দেখিয়া আমার বড়ই ভাবনা হইয়াছে।"

৩

দিনকতক পরে দার্জিলিংএ একখানি পত্র পাইলাম। অপরিচিত অক্ষর, দেখিয়াই স্ত্রীলোকের হস্তাক্ষর চিনিতে পারিলাম। আমাকে কে পত্র লিখিল? কতক কৌতুকে কতক আগ্রহে পত্র খানি খুলিলাম। দেখিলাম পত্রশেষে রমণীর স্বাক্ষর! রমণী আমাকে পত্র লিখিয়াছে। কখনও মনে করি নাই, রমণীর নিকট হইতে পত্র পাইব।

পত্রখানি এক নিশ্বাসে পড়িয়া ফেলিলাম।

অনাথ বাবু,

"দাদাকে পত্র লিখিয়াছ, তাহা পড়িয়াছি। তোমার শরীরের এখন যে রকম অবস্থা, তাহাতে তোমার কিছুদিন দার্জিলিংএ থাকা উচিত। পড়িয়া পড়িয়াই শরীরটা নষ্ট করিয়াছ। বৌদিদি তোমার জন্য বড় ভাবিতেছেন। তুমি ভাল আছ শুনিতে পাইলেই সুখী হইব। দার্জিলিংএ কত দিন থাকিবে?

"তোমার মনের অবস্থা শোচনীয়, তাহা বুঝিয়াছি। দার্জিলিংএর যাইবার পূর্বে আমাকে যে কথা বলিয়াছিলে, তাহার কোনও উত্তর পাও নাই। অভাগিনি আমি কি উত্তর দিব? আমি বালবিধবা, বিবাহের কথা মনে নাই, স্বামীর মুখও মনে পড়ে না। সে কথা মনে না পড়াতে কোন দুঃখ ছিল না, পিতৃগৃহে আমোদ আহ্লাদেই দিন কাটাইতেছিলাম। সেই ভাবে জীবন কাটাইলেই কি ভাল ছিল না?

"কিন্তু তাহা কাটিল না। আমি তোমাকে দেখিলাম। না দেখিলেই বোধ হয় ভাল ছিল। কিন্তু যাহা হইবার, তাহা হইয়াছে। তুমি আমাকে ভালবাস, তুমি আমাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলে। হিন্দুবিধবার বিবাহ শাস্ত্রসঙ্গত, তাহা আমি অনেকবার শুনিয়াছি। কিন্তু ইহজীবনে বিবাহ হওয়া অসম্ভব। পৃথিবীতে আমার আর সংসারী হওয়া হইবে না। সমাজের ভয়ে এ কথা লিখিতেছি না। কলঙ্কের ভয়ে মানুষ জীবনের সকল কামনা পরিত্যাগ করে না। তথাপি বলিতেছি, সংসারের এ পারে আর তোমার সহিত সে ভাবে দেখা হইবে না। পর পারের জন্য অপেক্ষা করিতে পার? যদি পার, তবে আবার দেখা দিও। তাহা কি এতই কঠিন? আমি ত তাহা মনে করি না।

—রমণী"

দুইবার তিনবার পত্রখানি পাঠ করিলাম। রমণী-হৃদয়ের রহস্য কিছু বুঝিতাম না। পবাজিত হইয়া লজ্জায় মস্তক অবনত করিলাম। বিপুল চেষ্টায় মন সংযত করিয়া বলিলাম, তাহাই হউক, ইহলোকে এই পর্যন্ত; পরলোকে আমার শান্তি। ইহলোকের এ গণ্ডিটুকু অতিক্রম করিতে আর কত দিনই বা অপেক্ষা করিতে হইবে?

যথাসময়ে রমণীকে সে কথা জানাইলাম।

৪

আরও পাঁচ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে অনেক উমেদার আমাকে তাঁহাদেব কন্যারত্ন-সম্প্রদানের প্রস্তাব করিয়া বাবাকে ধরিয়াছিলেন। কেন বিবাহ করিব না, সে কৈফিযত পিতার কাছে দিলাম না। জলের মত দিন কাটিতে লাগিল—সব কয়টা দিন এক সঙ্গে কাটিলেই বাঁচিতাম।

পূর্বের মত মধ্যে মধ্যে ভবেশ বাবুর বাড়ি যাই; রমণী পূর্বের ন্যায় হাসিয়া কথা হয, গল্প কবে, কিন্তু কখনও ভাবান্তর দেখি নাই। আমারও শিক্ষা হইয়াছিল—আমিও কোন দিন অন্য চিন্তা করি নাই। প্রেমের আকর্ষণ আমাকে রমণীর নিকট টানিয়া আনিত, কিন্তু মোহ সেই দেবীব সম্মুখে আমাকে বিহ্বল করিতে পারিত না। রমণী যখন আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইত। তখন তাহাকে আমার ছায়া বলিয়া অনুভব করিতাম। কিন্তু মনের কোণেও বিন্দুমাত্র পার্থিব কামনার উদয় হইত না। রমণীর দৃষ্টান্তে আমি মন সংযত করিয়াছিলাম। মাস ছয়েক পরে বাবা সংসারের কাজ শেষ করিয়া স্বর্গে গেলেন; মা ত অনেক পূর্বে গিয়াছিলেন বাড়িতে পরিবারের মধ্যে আমি, আর রামচরণ।

বাবার মৃত্যুর পর রামচরণ আমাকে বিবাহ করিবার জন্য আর একবার ভাল করিয়া ধরিল। আমার সেই এক উত্তর,—একটু নীরব হাসি। বেচারা বৃদ্ধ আমার কথা কি বুঝিবে?

ভবেশ বাবুই আমার একরকম অভিভাবক হইয়া উঠিলেন। পূর্বেই এম. এ. পাশ করিয়াছিলাম। তাঁহার ইচ্ছা, আমি উকিল হই, না হয় ডেপুটিগিরি পরীক্ষা দিই। সংসারী হইবার জন্য ভবেশ বাবু পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন; আমার প্রিয়তমা ভগিনী সুরবালা আমাকে সংসারে উদাসীন দেখিয়া একটু চোখের জলও ফেলিল। আমি কখনও দেশান্তরে ঘুরিয়া বেড়াই, কখনও বা কয়েক মাস নির্জনে পড়াশুনা করি। জীবন যখন বড় বৈচিত্র্যহীন বলিয়া মনে হয়, তখন ভবেশ বাবুর বাড়িতে গিয়া সুরবালার দুই বৎসরের ছেলে 'বুড়ো'কে কোলে পিঠে লইয়া আমোদ করি।

একদিন অপরাহ্নে বাড়িতে বসিয়া পড়াশুনা করিতেছি, এমন সময় ভবেশ বাবুর একপত্র পাইলাম; তিন দিন হইতে রমণীর জ্বর, বিকারের লক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছে। আমি আর স্থিব থাকিতে পারিলাম না। সেই দিনই রমণীকে দেখিতে ভবেশ বাবুর বাড়ি যাত্রা করিলাম।

পরদিন সন্ধ্যার সময় ভবেশবাবুর বাড়িতে উপস্থিত হইলাম। রমণীর শয়নকক্ষে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, ভবেশ বাবু ও সুরবালা রমণীর শয্যাপ্রান্তে গম্ভীরভাবে বসিয়া আছেন।

ডাক্তার আধঘন্টা পূর্বে রমণীকে দেখিয়া গিয়াছেন; জীবনের আশা অতি অল্প, রাত্রি কাটে কি না, সে বিষয়ে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

সব কথা শুনিলাম। রমণীর শয্যাপ্রান্তে বিহ্বলভাবে বসিয়া ধীরে ধীরে সকল কথা শুনিতে পাইলাম। আমার বক্ষে রক্তস্রোত স্তম্ভিত হইয়া গেল; ব্যাকুলদৃষ্টিতে আমি একবার ইহলোকের পর পারের সেই যাত্রীর দিকে চাহিলাম। তখন রমণীর সংজ্ঞা বিলুপ্ত। সেই দিন অপরাহ্ণ হইতেই রমণী অজ্ঞান—আমি মাথায় হাত দিয়া সেই একই স্থানে একই ভাবে বসিয়া রহিলাম! সমস্ত দিনের পথশ্রমে দেহ অবসন্ন হইয়াছিল। মানসিক দুশ্চিন্তায় দেহের অবসাদকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

রাত্রি প্রায় একটার সময় একবার রমণীর জ্ঞানসঞ্চার হইল। মনে হইল, চারি দিকে চাহিয়া সে যেন কাহাকে খুঁজিতেছে।

পাশ ফিরাইয়া দিলে রমণী আমাকে দেখিতে পাইল। একবার আমার মুখের দিকে চাহিল। তাহার চক্ষে একটি অলৌকিক তীব্রজ্যোতি দেখিতে পাইলাম। ইহলোকের প্রান্তসীমায় সমুপস্থিত মরণাহত কোনও নর বা নারীর চক্ষে তেমন জ্যোতি পূর্বে কখন দেখি নাই। রমণী অতি ধীরে আমার হাতখানি তাহার উভয় হস্তের মধ্যে টানিয়া লইল। একবার তাহার ওষ্ঠ নড়িল, যেন কি বলিবার চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু কথা ওষ্ঠ অতিক্রম করিতে পারিল না; আমি বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলাম, "রমণী! কথা কহিতে কি বড় কষ্ট হইতেছে?" রমণী ক্ষীণস্বরে বলিল, "কষ্ট ? না, কষ্ট কিছুই না। আমি চলিলাম। জানি, একদিন তুমিও আসিবে।"

রাত্রিশেষে সব শেষ হইয়া গেল। সুরবালা রমণীর বুকের উপর পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। রমণীর মৃত্যুচ্ছায়াসমাচ্ছন্ন পাণ্ডুর মুখের দিকে আমি আর চাহিতে পারিলাম না, ধীরে ধীরে রাজপথে আসিলাম। আকাশে চাঁদের আলো, বাতাসে ফুলের গন্ধ, বিজন রাজপথ, স্তব্ধ প্রকৃতি যেন নিদ্রাঘোরে আচ্ছন্ন। আমি উন্মত্তের ন্যায় পথ বাহিয়া চলিতে লাগিলাম। ক্রোশের পর ক্রোশ অতিক্রম করিলাম। ক্রমে পূর্বাকাশ লোহিত হইয়া উঠিল; চন্দ্রকিরণ মলিন হইয়া গেল; বনান্তরালে বিহঙ্গের পক্ষান্দোলন কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল; মুক্ত প্রান্তরের উপর দিয়া সুশীতল সমীরণপ্রবাহ নিদ্রাতুর বিশ্বের নিশ্বাসের মত বহিয়া গেল; চরাচর ধ্বনিত করিয়া আমার হৃদয় মথিত করিয়া কেবল একটা কথা আমার কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল। "আর সময় নাই, আমি চলিলাম।" যেন রাত্রি উষার রক্তিম অঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া বলিতেছে, "আর সময় নাই, আমি চলিলাম।" আকাশের চন্দ্র পশ্চিমগগনে ঝুঁকিয়া পড়িয়া ম্লানদৃষ্টিতে ধরণীর দিকে চাহিয়া বলিতেছে, "আর সময় নাই, আমি চলিলাম।" নৈশ বায়ু বৃক্ষপত্র কম্পিত করিয়া শুষ্কপত্র উড়াইয়া খোলা মাঠের উপর দিয়া ছুটিয়া চলিতে চলিতে বলিতেছে, "আর সময় নাই আমি চলিলাম।" জীবজগতের সুপ্তি যেন পূর্ব দিকে অঙ্গুলিপ্রসারণ করিয়া অস্ফুটস্বরে বলিতেছে, "আর সময় নাই, আমি চলিলাম।" আমার জীবনের দিন কবে ফুরাইবে? কবে আমি একথা বলিতে পারিব?

৫

সমস্ত দিন পথে পথে কাটিয়া গেল। আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই, পথশ্রমে কষ্ট নাই। আমি রাত্রিশেষে গৃহে ফিরিলাম। দ্বারে আঘাত করিতেই রামচরণ উঠিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। আমাকে দেখিয়া সে স্বপ্নাবিষ্টের মত বলিয়া উঠিল, "খোকাবাবু! এত রাত্রে তুমি কোথা হ'তে আস্‌চো—খবর সব ভাল ত?"—রামচরণ প্রদীপ জ্বালিল।

দীপালোকে রামচরণ আমার মুখ দেখিয়া দুই হাত সরিয়া গেল; স্তম্ভিতের মত ক্ষণকাল আড়ষ্টভাবে দাঁড়াইয়া রহিল; শেষে ব্যাকুলভাবে বলিল, "খোকাবাবু ! তোমার এ অবস্থা কেন? কি হ'য়েছে খোকাবাবু?"

আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না, রামচরণকে সকল কথা—আমার জীবনের গুপ্ত ইতিহাস বলিয়া হৃদয়ভার লঘু করিলাম।

আমার কথা শুনিয়া রামচরণ কাঁদিয়া ফেলিল; কথা কহিতে পারিল না। আমি হাত পা ধুইয়া শয্যায় পড়িয়া এ পাশ ও পাশ করিতে লাগিলাম। প্রভাতের কিছু পূর্বে বোধ করি একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল—তন্দ্রাঘোরে স্বপ্ন দেখিলাম, রমণী আমার শিয়রে দাঁড়াইয়া বলিতেছে,— "আর সময় নাই, আমি চলিলাম!" চক্ষু মেলিয়া দেখিলাম, উন্মুক্ত গবাক্ষপথে অরুণের রক্তিমালোক আমার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়াছে, বৃদ্ধ রামচরণ আমার শিয়রে বসিয়া সস্নেহে আমার মস্তকে হাত বুলাইতেছে।—জীবনটাকেই স্বপ্ন বলিয়া মনে হইল।

বাড়িতে আর মন টিকিল না। বাড়িতে চাবি লাগাইয়া দাসদাসীদের বিদায় দিয়া আমি দেশভ্রমণের আয়োজন করিলাম। মূল্যবান্ জিনিষপত্র যাহা কিছু ছিল, সমস্ত সুরবালার কাছে পাঠাইয়া দিলাম। কোম্পানির কাগজ, অলংকারপত্র, পৈতৃক সম্পত্তির দলিলাদি সমস্ত সুরবালাকে দান করিলাম; সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে জানাইলাম সংসারের সহিত আমার আর কোনও সম্বন্ধ নাই; যে কয়টি দিন পৃথিবীতে থাকিতে হইবে—দেশপর্যটন করিব। রামচরণ স্বয়ং সমস্ত জিনিস ও আমার পত্র সুরবালাকে দিয়া আসিল।

কিছু টাকাকড়ি ও রামচরণকে সঙ্গে লইয়া আমি এক সপ্তাহমধ্যে দেশত্যাগ করিলাম। রামচরণকে সুরবালার কাছে গিয়া থাকিবার জন্য আদেশ করিয়াছিলাম, কিন্তু সে আমার হুকুম তামিল করে নাই; সজলচক্ষে বলিয়াছিল, "খোকাবাবু! আমিই তোমাকে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছি; এমন কি অপরাধ করিয়াছি যে, এত কঠিন দণ্ড দিতে চাও? বিদেশে তোমাকে দেখিবে শুনিবে কে?—এবুড়োকে ছাড়িয়া যাইও না।"

তাই রামচরণ সেই দিন হইতে ছায়ার মত আমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছে। আজ আমি স্বদেশ হইতে বহু দূরে পর্বতের নিভৃত বক্ষের একটি ক্ষুদ্র বাংলোয় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি। আমার জীবনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবার আর কত বিলম্ব, তাহা জানি না; কিন্তু আর কতকাল এমন লক্ষহীনভাবে শ্রান্ত জীবনভার বহিয়া পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইব?—রমণীর সেই অন্তিম কথা দিবানিশি আমার কানে আসিয়া বাজিতেছে। আজও এই দিবা অবসানে দুর্গম গিরিপ্রান্তে আমার এই ক্ষুদ্র, রুদ্ধদ্বার শয়নকক্ষে, জগতের পরপ্রান্তবাসিনী, আমার

জীবন মরণের সাধনার ধন, আমার ইহলোকের আলোক ও পরলোকের অবলম্বন, আমার উভয় লোকের সর্বস্ব—প্রেমময়ী ধৈর্যময়ী মহিমময়ী রমণীর সেই আশ্বাসবাণী ঐ আর্দ্র বায়ুহিল্লোলে ও বৃষ্টির ঝর্ ঝর্ শব্দে ভাসিয়া আসিয়া আমার কর্ণে প্রবেশ করিতেছে; আমার দেহ কণ্টকিত ও চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। আমার মনের ভাব মুখে প্রকাশিত না হউক, আমার অন্তরের ভাব অন্তরে অনুভব করিয়াই বৃদ্ধ রামচরণ আমার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "খোকাবাবু! এ পাহাড়ে মুলুক আর ভাল লাগে না; চল, দেশে যাই।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "যেতে হবে রামচরণ, দেশেই যাব; বোধ করি, তার আর বেশি বিলম্ব নাই, কিন্তু এবার তোমাকে ফেলে একাই যাব।"

রামচরণ বোধ হয় কথাটা বুঝিল; হাসিয়া বলিল, "খোকাবাবু! আমিই আগে যাব। আমি আগে না গেলে তোমার জন্য সংসাব সাজিয়ে রাখ্‌বে কে? এ বুড়োকে ছেড়ে তোমার এক দণ্ডও চলবে না যে।"

—সাহিত্য ১৪শ বর্ষ ১৩১০, ১২শ সংখ্যা চৈত্র।

নূতন গিন্নী

আমি এখন চাকুরি করি। বহুবাজারের মিত্রদের বাড়িতে একটি দশ বৎসরের ছেলেকে দুইবেলা পড়াই;—সেইখানেই থাকি, খাই এবং মাসান্তে পনেরোটি করিয়া টাকাও পাই।

আজ ছাব্বিশ বৎসর চাকুরির ভাবনা ছিল না, অন্নচিন্তাও ছিল না, এখন দুই বেলা দুই মুষ্টি অন্নের জন্য আমি পরের দ্বারস্থ। আমার দাদার অন্ন কতজনে খাইতেছে!

দাদা হাইকোর্টের বড় উকিল; মাসে আড়াই হাজার তিন হাজার টাকা রোজগার করেন! আমিই তাঁর একমাত্র সহোদর। বুদ্ধি পড়িয়া অবধি তাঁহারই অন্ন খাইয়াছি;—আজ ছাব্বিশ বৎসর খাইয়াছি,—তাঁহারই পত্নীর স্নেহের ক্রোড়ে মানুষ হইয়াছি। চারি বৎসর বয়সের সময় মা মরেন; দাদার বয়স তখন বাইশ বৎসর। আমি দাদার আঠারো বৎসরের ছোট। মার মৃত্যুর পরেই বাবা মুনসেফি হইতে অবসর লইলেন;—দুই বৎসর যাইতে না যাইতেই তিনি স্বর্গে চলিয়া গেলেন। ছয় বৎসর বয়সে পিতৃমাতৃহীন·—কিন্তু বাপমায়ের অভাব কোন দিন বুঝি নাই; বৌদিদির কাছে মায়ের আদর, দাদার কাছে পিতার স্নেহ পাইয়াছি। বাপমায়ের বুড়া বয়সের ছেলে আমি—বড়ই আদরের ছিলাম; বৌদিদি বড় দাদা সে আদর রক্ষা করিয়াছিলেন—পিতৃমাতৃহীন কনিষ্ঠ ভ্রাতার সকল আবদার তাঁহারা সহিতেন।

দাদা আমার লেখাপড়ার জন্যে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। ভবানীপুরে বাড়ি, বাবা কিছু রাখিয়া গিয়াছিলেন, দাদাও ধীবে ধীরে আলিপুরে পসার করিতেছিলেন; তেমন অভাব কিছুরই ছিলনা। বৌদিদির সন্তান ছিল না; আমিই তাঁহার সন্তানের সাধ মিটাইতাম। পড়াশুনার জন্যে দাদা তাড়না করিলে বৌদিদির অঞ্চলের ছায়ায় গিয়া দাঁড়াইতাম;—জানিতাম সে দুর্গে আশ্রয় লইলে আলিপুরের উদীয়মান উকিল শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ বসু এম. এ. বি. এলের সাধ্যও নাই যে, সেখানে অগ্রসর হন। সমন, ওয়ারেণ্ট, মালক্রোক—কিছুতেই সেখান হইতে আসামী গ্রেপ্তার করিবার যো ছিল না। বৌদিদির দখলের মধ্যে মা সরস্বতী যতটুকু অনধিকার প্রবেশ করিয়াছিলেন, আমার বিদ্যাও ততটুকুই হইয়াছিল। আমি তিন তিন বার এনট্রান্স ফেল করিয়া পড়া ছাড়িয়া দিলাম;—দাদা বলিলেন "লক্ষ্মীছাড়াটা বাপ দাদার মুখ হাসাইল।" বৌদিদি মুখ ভার করিয়া কথাটা সহিয়া লইলেন। তিনবার যে কায়েতের ছেলে এনট্রান্স ফেল করে তাহার পক্ষ হইয়া রাসবিহারী ঘোষও যখন ওকালতি করিতে পারেন না—বৌদিদি ত জুনিয়ার উকিলের পত্নী!

২

মনে করিয়াছিলাম, বৌদিদির স্নেহের যোল আনা মালিক ও দখলিকার হইয়াই এ জীবনটা কাটাইব; কিন্তু তাহা হইল না। আমি যেবার প্রথম এনট্রান্স ফেল করি, সেইবার কোন্ এক অজ্ঞাত দেশের এক নন্দনকানন হইতে একটা দেবশিশু আসিয়া একদিন বৌদিদির কোলে

বসিল—আমাদের সমস্ত বাড়িটা সেই একটুখানি শিশুর আগমনে আনন্দপূর্ণ হইয়া গেল। বৌদিদির কোলে খোকা!—সে যে কেমন সুন্দর দৃশ্য তাহা আমি বলিতে পারিব না—তোমরা কোন কবিও কোন দিন পার নাই।

এতকালের ভোগদখলি সম্পত্তিতে একজন অংশিদার—অংশিদার কেন, ষোল আনার মালিক—আসিয়া জুটিল, ইহাতে আমার একটুও ক্ষোভ হইল না। দ্বিতীয় দিনে সূতিকাগারে যখন খোকাকে দেখিলাম, তখন আমি বিনা নালিশে, বিনা সালিশে, আমার পাকা দখলিস্বত্ব অম্লানবদনে ছাড়িয়া দিলাম; বাড়িতে বিনা পয়সার উকিল থাকিতেও আমি স্বত্বরক্ষার কোন চেষ্টা করিলাম না। ত্যাগের কি মূর্তিমান আদর্শ—এই আমি!

প্রথম বারে এনট্রান্‌স পরীক্ষার যে ইতিহাস ও ভূগোলে আমি ফেল হইয়াছিলাম তাহার জন্যে আমিই দায়ী; কিন্তু দ্বিতীয় বৎসরে দুই বিষয়ে এবং তৃতীয় বৎসরে যে তিন বিষয়েই ঢেরাসহি হইয়াছিলাম, তাহার জন্য আমি বা কতটুকু দায়ি, আর আমার সেই ক্ষুদে ভাইপোটি কতখানি দায়ী, তার একটা নিষ্পত্তি এ জগতের মহা প্রিভিকাউন্সিলেও হইবার যো নাই। খোকাকেই আদর করিব, না মাদাগাস্করের উৎপন্ন দ্রব্যের তালিকা মুখস্থ করিব; খোকার স্বর্গের প্রশ্নেরই সমাধান করিব, না জিওমেট্রির উদ্দেশ্য মুখস্থ করিব; মা সরস্বতীর বরপুত্রেরা হিষ্ট্রি ও জিওমেট্রিই জন্ম জন্ম ঘাঁটিতে থাকুন, আমার খোকাই ভাল। কিন্তু এত করিয়াও ত তাহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিলাম না। সেই দুঃখের কথা, সেই শক্তিশেলের যন্ত্রণার বিবরণই ত এই দিবা দ্বিপ্রহরের অবকাশে লিখিতে বসিয়াছি;—আমার ছাত্রটি স্কুলে গিয়াছে।

৩

খোকার নামকরণ লইয়া মহা বিভ্রাট বাধিল; দাদা অনেক নভেল ও দুই তিনখানি অভিধান তন্ন তন্ন করিয়া খোকার জন্য তিনটি নাম আমাদের দরবারে পেশ করিলেন—রবীন্দ্র, সুরেন্দ্র ও মহেন্দ্র। আমি তিনটাই নামঞ্জুর করিলাম। রবীন্দ্র!—ও বাবা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত যদি খোকা কবি হইয়া বসে, তাহা হইলে আমার যে কাকাগিরি রক্ষা করাই দায় হইবে—ও নাম কাজ নাই। সুরেন্দ্র বাঁড়ুয্যের কথা ভাবিয়াই দাদা হয় ত সুরেন্দ্র নামটা আঁচিয়াছিলেন;—তা ভাই, গরীব উকিলের ছেলের অতটা স্বদেশি হইয়া কাজ নাই—শেষ ত রিপন কলেজ। মহেন্দ্র সরকার লোকটা সার্থকজন্মা বটে,—কিন্তু আমার ভাই-পো নাড়ী টিপিবে?—নো—নেভার। বৌদিদি চিরদিনই আমার দিকে— দাদা একটা ভোটও পাইলেন না; শেষে বলিলেন "তবে তোর মত একটা নামকাটা সেপাইয়ের নামই রাখ্। ভাইপোর বিদ্যাও কাকার মতই হইবে।" এইবার বৌদিদি কথা বলিলেন; বলিলেন "ওগো, রক্ষা করুন বিদ্যাসাগর মশাই। এমন বিদ্যাসাগর হোয়ে দিনরাত্রি মিথ্যার ব্যাপার করার চাইতে আমার দেওরের মত এনট্রান্‌স ফেল হোয়ে থাকাও ভাল। মিথ্যা কথার জাহাজ!"

"বলি এই জাহাজে চোড়েই ত ভবসমুদ্র পার হোচ্ছো !" বৌদিদির সঙ্গে আঁটিয়া উঠার যো নাই, তিনি বলিলেন "আমি কি চড়ন্দার, আমি যে জাহাজের কর্ণধার। কর্ণ ধরিব কি?"

আমি দেখিলাম, ভাল রে ভাল; কোথায় বা খোকার নামকরণ, আর কোথায় বা ভদ্রলোকের শ্রবণেন্দ্রিয় ধারণ। দাদা আর বৌদিদির মধ্যে এমন কথা কাটাকাটি দিবারাত্রই চলিত; যেমন দাদা, তেমনই বৌদিদি!

আমি তখন কথাটা আসল স্থানে লইয়া যাইবার জন্য বলিলাম "খোকার একটা বাঁধাবাঁধি নামে কাজ নাই; যখন যা মনে আসবে, তাই বোলেই ডাকা হবে; এই ধর না টোনা, মোনা, চাঁদ, ননি, বাপধন—নামের অন্ত থাক্‌বে না।" খোকার নামের গোল আর মিটিল না—তবে আর সকলেই তাকে "সখা" বোলে ডাকত। সখা নামটি বেশ—কি বল?

এইবার এক বিষম সমস্যায় পড়া গেল। দাদার বেশ পসার হইয়াছে। তিনি আর আলিপুরে নাই, এখন হাইকোর্টেব উকিল, পয়সাকড়িও বেশ পান। বৌদিদি আর আমি দুই হাতে খরচ করি—দাদা একটা কথাও বলেন না। কিন্তু এমন করিয়া ত দিন চলে না। বৌদিদি দাদাকে ধরিয়া বসিলেন যে, তাঁহার দেবর লক্ষ্মণের জন্য একটি উর্মিলার প্রয়োজন। দাদার তাহাতে অমত নাই; কিন্তু আমি একেবারে ভীষ্মের পণ করিয়া বসিলাম। বিবাহ!—ও কাজটা আমার দ্বারা হইতেছে না; অমন দুষ্কর্ম, দোহাই বৌদিদি, আমি করিতে পারিতেছি না। বিনা অপরাধে এই এনট্রান্‌স ফেল গরিবের উপর এমন কঠোর দণ্ড দিতে নাই। বৌদিদি আমাকে কিছুতেই পারিয়া উঠেন নাই। আমার অকাট্য যুক্তি—"এক পরের মেয়ে ঘরে আসিয়াই ত এই ; তবু যা হোক ঘরে মাথা দিয়ে আছি। আবার আর একজন আসুক, তখন আজ এটা, কা'ল সেটা, তারপর দিন কুরুক্ষেত্র, তারপরে চক্রব্যূহ। এ কর্ম কিছুতেই কোরো না বৌদিদি! আমি বেশ আছি, তুমি আছ, খোকা আছে, দাদা আছে, সংসারে আর চাই কি?"

বৌদিদি বলিলেন—"চাই একখানি পরশ পাথর। যাতে তোমার মত রাং ঠেকাইলেও সোনা হয়।"

"সোনা হোয়ে কাজ নাই, আমি রাংই থাকি।"

বৌদিদিকে এ ক্ষেত্রে পরাজয় স্বীকারই করিতে হইল; আমি তাঁহাকে মায়ের মত ভক্তি করি; কিন্তু তাঁহার এ আদেশ আমি কিছুতেই মানি নাই।

এই ভাবে দুই বৎসর কাটিয়া গেল—খোকার বয়স দুই বৎসর হইল। আমার আর কোন কাজ নাই, দিনরাত্রি শুধু খোকা। খোকা মা চায় না, বাপ চায় না,—চায় শুধু কাকা। কাকার বুকে না হোলে তার ঘুম হয় না, কাকার সঙ্গে না বোস্‌লে তার খাওয়া হয় না। আবার কাকারও কি হইল; তার দুধের বাটির মধ্যে যদি তরকারি কি মাছের ঝোল না পড়ে ত সে দুধ মিষ্টই লাগে না খোকা যদি পাতের উপর একটা ওলটপালট না করে তাহা হইলে সে দিন ভাত খাইয়া আমার পেট ভরিত না। সংসারে কত জনের কত বিষয়ে কত সাধ থাকে—আমার সকল সাধ খোকা। খোকার জিনিস কিনিবার টাকা যোগাইতে যোগাইতে দাদা একেবারে অতিষ্ঠ হইয়া গেলেন—কিন্তু কথা কহিবার যো নাই। কত পুণ্যফলে এমন দাদা পাইয়াছিলাম;—আর এখন সেই দাদা—বলিতেও বুক ফাটিয়া যায়!

৪

বড় সুখের সময় মনে হয় চিরদিন বুঝি এইভাবেই যাইবে—আর কোন দিন দুঃখ বা বিপদ আসিবে না। আমিও তাহাই ভাবিয়াছিলাম। হঠাৎ একদিন আমার সে ভ্রম ঘুচিয়া গেল। একদিন প্রাতঃকালে বৌদিদির কলেরা হইল; শহরের যত ভাল ভাল ডাক্তার সকলেই আসিলেন—সারাদিন যমের সহিত যুদ্ধ চলিল কিন্তু সবই বৃথা হইল;—রাত্রি আটটার সময় সতী সাধ্বী স্বামীর কোলে মাথা রাখিয়া—দুই বছরের সোনারচাঁদকে আমার কোলে তুলিয়া দিয়া—সতী স্বর্গে চলিয়া গেলেন। এতদিনে মায়ের শোক আমার বুকে বাজিল। দাদা কয়দিন কোর্টে যাওয়া বন্ধ করিলেন—আমি বড়ই অধীর হইয়া পড়িলাম; কিন্তু কি করিব, বৌদিদি যে তাঁর খোকাকে আমারই কোলে দিয়া গিয়াছেন। চক্ষের জল মুছিয়া খোকাকে কোলে তুলিয়া লইলাম। আমাদের আনন্দের পুরী সেই যে আঁধার হইল, আর তাহা ঘুচিল না;—এখন ত ঘোর অমাবস্যা!

বৌদিদির মৃত্যুর পর পাঁচ ছয় মাস কাটিয়া গেল। দাদা আবার হাইকোর্টে বাহির হইতে লাগিলেন; আমিও খোকার মুখের দিকে চাহিয়া বৌদিদির শোক ক্রমে ভুলিতে লাগিলাম।

বাড়িতে স্ত্রীলোক কেহই নাই—আমরা যেন ঠিক হোটেলে থাকি; কোন রকমে দিন চলিয়া যায়। বাড়ির ভিতর একেবারে অন্ধকার। দাদা দেখিলেন এমন ভাবে বাস করা অসম্ভব; তাই তিনি আমার বিবাহের প্রস্তাব করিলেন; বলিলেন "যা হবার তা ত হইয়া গেল। এখন ছেলেটিকে মানুষ করা ত চাই। তুই আর দিনরাত এমন করিয়া খোকাকে কতদিন রাখবি। আমি আর বিলম্ব করিতে পারি না; এখন তোকে বিবাহ দিয়া একটা গৃহস্থালি পাতিয়া দিলেই আমি নিশ্চিন্ত হই। তারপর খোকা আছে, আর তুই আছিস, তুই ত আর কাজকর্ম কিছুই শিখ্‌লি না; তা তোকে কিছু ক'র্‌তেও বলি না। আমি যে কয় দিন বাঁচি, সে কয়দিন তোদের জন্যই খাটিব। তা মা বাপের আশীর্বাদে এখন যা আছে, আর কিছুদিন যদি বাঁচি তা হোলে আরও যা কিছু সঞ্চয় কোরতে পারব, তাতে তোদের চাকুরি কোরতে হবে না? বুঝেসুঝে চোললে কোন দিনই কষ্ট হ'বে না।"

আমি দাদার কথার কোনই উত্তর দিলাম না। দাদা মনে করিলেন, মৌনই সম্মতির লক্ষণ। তাই তিনি বলিলেন, "আসছে শনিবারেই আমি একবার হুগলী যাব; সেখানেও নাকি একটা ভাল মেয়ে আছে; দেবে থোবে ভালই; আর মেয়েটিও খুব সেয়ানা। সব দিকেই ভাল! সেইটেই পাকা কোরে আস্‌ব। কি বলিস্?"

আমি আর চুপ করিয়া থাকা সঙ্গত মনে করিলাম না, বলিলাম, "দাদা, আর ও সব জঞ্জালে কাজ নাই। আমাদের অদৃষ্টে যদি সুখ থাক্‌তো তা হোলে বৌদিদি আমাদের ফেলে পালাতো না।"

দাদা বলিলেন, "তা বোলে কি সংসারটা এমনই শ্মশান হ'য়ে থাকবে। তোর আপত্তি খাটবে না। আমি যা হয় একটা কোরেই আস্‌বো।"

দাদার দৃঢ়তা দেখিয়া আমি চুপ করিয়া থাকিলাম; মনে করিলাম, এখনও সময় আছে। দাদা কি আর তাড়াতাড়িই না হয় একটা করিয়া বসিবেন।

দাদা হুগলীতে গেলেন। শনিবারে বিকালে গেলেন, রবিবার সন্ধ্যার সময় ফিরে এলেন। আমাকে আর কোন কথা বোললেন না; আমিই বা কি জিজ্ঞাসা কোর্‌বো। তারপর দেখি, দুই চারিজন অপরিচিত লোক আমাদের বাড়িতে যাওয়া আসা কোর্‌তে লাগলেন; দাদার সঙ্গে গোপনে কি পরামর্শ চোলতে লাগলো। আমি আর কিছু বুঝিতে পারি না—জিজ্ঞাসাও করিতে পারি না। শেষে একদিন দাদা আমায় ডেকে বোললেন "দেখ শরৎ, তোর ত দেখছি বিয়ে করতে ঘোর অনিচ্ছা। এদিকে খোকার দেখবার শুনবার একটা কেউ না হোলেও তা আর চলে না। অনেক ভেবে চিন্তে শেষে স্থির করেছি খোকার জন্যই আমাকে আবার সংসারী হ'তে হ'বে। ছেলেটির মুখের দিকে চাইবার লোক ত চাই।"

আমি একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম! দাদা যে এমন প্রস্তাব করিবেন তাহা আমি একদিনও মনে করি নাই। এই সেদিন বৌদিদি মারা গেলেন; আর এই কয় মাসের মধ্যেই দাদা সব ভুলিয়া গেলেন! ছেলেটা যে পর হইয়া যাইবে তাহাও ভাবিলেন না। হায় মানুষ! হায় মানুষের ভালবাসা! বুঝিলাম এতদিন পরে এ সংসারে আমাদের স্থান থাকিবে না। খোকার জন্যই আরও ভাবনা হইল। খোকার বিমাতা ঘরে আসিবে সে খোকাকে দেখিতে পারিবে না; সে খোকাকে কষ্ট দিবে,—হয় ত বা মারিয়াই ফেলিবে;—আমি এক মুহূর্তের মধ্যে এই কথা ভাবিয়া ফেলিলাম। ঐ ব্যাপারগুলি যেন ভবিষ্যৎ তাহার কৃষ্ণযবনিকা অপসারিত করিয়া আমার চক্ষের সম্মুখে ধরিল, আমি শিহরিয়া উঠিলাম। মনে হইল এখনই খোকাকে লইয়া এখান হইতে পলায়ন করি। হায় হায়, তাই যদি করিতাম!

আমার মুখের ভাব দেখিয়াই দাদা সব বুঝিলেন; তিনি বিষণ্নমুখে উঠিয়া গেলেন। তাতে কি আর বিবাহ বন্ধ থাকে? আমার বিবাহের জন্য হুগলীতে যে মেয়ে দেখিতে গিয়াছিলেন, একদিন তাহাকেই আনিয়া দাদা বৌদিদির ছয়মাসের শূন্য সিংহাসনে বসাইয়া দিলেন। ভৃত্য হরিদাস খোকাকে বলিল "খোকাবাবু, তোমার নূতন মা এসেছেন।" খোকা বলিল "দুষ্টু ছেলে, মিথ্যা বলে।" সাড়ে তিন বৎসরের খোকা মিথ্যা মা চিনিয়া ফেলিল।

দাদার এই পরিবারটি বয়সে ষোল সতর হইলেও একেবারে পাকা গৃহিণী। ভগবান দাদার স্কন্ধের উপর তাহাকে বসাইবেন জানিয়াই তাহাকে গোড়া হইতেই গৃহিণীপনার শিক্ষানবিশি করাইয়াছিলেন। দাদার স্ত্রী মাস দুইয়ের মধ্যেই বেশ গোছাইয়া গাছাইয়া নিজের স্থান অধিকার করিয়া লইলেন। শুধু তাই নহে, এই বসুপরিবারের মধ্যে লক্ষ্মীছাড়া শরৎপ্রসাদ বসুর যে কিঞ্চিৎ অধিকার ছিল, তাহাও তিনি দখল করিয়া বসিলেন। ক্রমে দেখিতে লাগিলাম দাদাও ধীরে ধীরে তাঁহার কর্তৃত্ব হইতে অপসারিত হইতেছেন। বুঝিলাম, খোকার এ সংসারে এই লক্ষ্মীছাড়া অকর্মণ্য কাকা ব্যতীত আর গতি থাকিবে না;—বুঝিলাম আর দাদার ভাইগিরি করা এ সংসারে পোষাইবে না। আমি একেলা হইলে কোন ভয় ছিল না—কোন ভাবনা ছিল না—যেখানে সেখানে যেমন তেমন করিয়া আমার দিন কাটিয়া যাইত। কিন্তু খোকাকে মানুষ করিতে হইবে;—শুধু বাঁচাইয়া রাখা নয়, শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ বসু এম. এ. বি. এল. মহাশয়ের ছেলের মত মানুষ করিতে হইবে। যাক্ কায়েতের ছেলে, সামান্য একটু লেখাপড়াও ত করেছি ভয় কি—এ বাড়ি ছাড়িয়া যাইব—এ দেশ ত্যাগ করিব;—দূরদেশে গিয়া সামান্য কাজ

করিয়াও খোকাকে মানুষ করিব। খোকার গায়ে কাঁটার আঁচড়ও লাগিতে দিব না। যে দিন খোকার সামান্য একটু অযত্ন দেখিব—যে দিন দাদার মুখে একটু বিরক্তির ভাব দেখিব, সেই দিন এ পাপপুরী ত্যাগ করিয়া যাইব।

খোকা আমার কাছেই থাকে;—এতকালও ছিল, এখনও থাকে। দাদা সর্বদাই তত্ত্ব লন; পূর্বেরই মতই যত্ন করেন। দাদার স্ত্রীর যত্নের আশাই যখন আমরা করি নাই, তখন তাঁহার কথার আর কি উল্লেখ করিব। মনে করিলাম, দাদা যদি ঠিক থাকেন তাহা হইলে আর ভয় কি? কিন্তু আমরা মনে করিলেই যদি কাজ হইত, তাহা হইলে আর দুঃখ কি ছিল। কে একজন অলক্ষ্যে বসিয়া কল ঘুরাইতে লাগিল, আর দিনে দিনে দাদা যেন দূরে যাইয়া পড়িতে-লাগিলেন। তাহার ফলে আমরা বৈঠকখানার পাশের ঘরে আসিয়া পড়িলাম, অন্দর মহলের সহিত আমাদের সম্পর্ক ক্রমেই লোপ পাইতে লাগিল। কেন বলিতে পারি না, এ সকল অনাদরও সহিতে লাগিলাম। প্রথম আবেগে মনে করিয়াছিলাম, একটু সামান্য ত্রুটি দেখিলেই খোকাকে লইয়া এ বাড়ি ত্যাগ করিব; কিন্তু সে প্রথম আবেগ চলিয়া গেলে ধীরে ধীরে অনেকটা সহিয়া লইলাম—অনাদর অবজ্ঞাও যেন কেমন সহিয়া গেল। এখন মনে হইত, খোকাকে প্রতিপালন করিবার যোগ্যতা আমার নাই; আর আমি লইয়া যাইতে চাহিলেই বা দাদা তাহাকে ছাড়িয়া দিবেন কেন? থাকি—এই বাড়িতেই থাকি। দাদার যত অবজ্ঞা, যত অশ্রদ্ধা মাথা পাতিয়া লইব—খোকাকে আমার বুকের মধ্যে রাখিব; তাহার গায়ে কোন আঁচ লাগিতে দিব না।

তা কি হয়! তুমি আমি অনেক সহিতে পারি; কিন্তু শিশুর কোমল হৃদয় একটু অনাদরে, সামান্য একটু উপেক্ষায় মলিন হইয়া যায়। শিশু অতি অল্পেই আদর অনাদর বুঝিতে পারে;—আমার মনে হয় শিশুই ঠিক মানুষ চিনিতে পারে—তোমরা আমরা চিনিতে পারি না। দাদা যে ক্রমে ক্রমে পর হইয়া যাইতেছেন, দাদার আদর যে কমিয়া যাইতেছে, খোকা হয় ত তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল। তাই সে দিনে-দিনে শুকাইয়া উঠিতে লাগিল। আমি দাদাকে একদিন বলিলাম যে, খোকা দিনে দিনে রোগা হইয়া যাইতেছে। দাদা বলিলেন, "ও কিছু নয়; খুব খেলা করিয়া বেড়াইলেই সারিয়া যাইবে; তুই ওকে মোটে দৌড়াদৌড়ি করিতে দিস্ না, তাই ও অমন হইয়া গিয়াছে।" একথার আর কি উত্তর দিব? নীরবে একবিন্দু চক্ষের জল ফেলিলাম।

একদিনও সহিল না। যেদিন দাদার সঙ্গে কথা হইল সেই রাত্রেই খোকার জ্বর হইল। ক্রমেই জ্বর বাড়িতে লাগিল; শেষে রাত্রে দাদাকে খবর দিবার জন্য নিজেই বাড়ির ভিতর গেলাম। দাদার শয়নঘরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ডাকিলাম "দাদা, দাদা!" দাদা বোধ হয় তখন জাগিয়াই ছিলেন। উত্তর দিলেন "কে, শরৎ, এত রাত্রে কেন?" আমি অতি কাতরকণ্ঠে বলিলাম "দাদা, একবার উঠে এস, খোকার বড় জ্বর হয়েছে।" দাদার কণ্ঠস্বর দ্বিতীয়বার শুনিবার পূর্বেই আর একটি কণ্ঠস্বর শুনিলাম, "জ্বর হয়েছে, তার কি হবে। রাত পোহাক্, তখন ডাক্তার ডাক্লেই হবে। সবই বাড়াবাড়ি।" কথা কয়টি আমার কানে গেল। তখন দাদা বলিলেন, "শরৎ, তুই খোকার কাছে যা, আমি আস্‌ছি।" আমি আর বাক্যব্যয় না করিয়া নীচে

নামিয়া আসিলাম—মনে করিলাম, দাদা হয় ত রাত্রে আর আসিবেন না। খোকার নিকট আসিয়া বসিলাম; দ্বারের দিকে চাহিয়া রহিলাম—দাদার আসিতে বিলম্ব হইল। তখন আর কি করিব, খোকার শিয়রে বহুদিনের চাকর হরিদাস বসিয়াছিল; তাহাকে বলিলাম "হরি, যা শীঘ্র অমৃত ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে আয়; যত টাকা লাগে আমি দিব।" হরি তখনই একটা লণ্ঠন হাতে করিয়া চলিয়া গেল। টাকার অভাবে খোকার চিকিৎসা হইবে না? কেন, এ বাড়িতে আমার অংশ আছে; তাহাই বেচিয়া ডাক্তারের ধার শোধ দিব। এই কথা ভাবিতেছি, আর খোকার গায়ে মুখে হাত বুলাইতেছি; এমন সময় দাদা নীচে নামিয়া আসিলেন। খোকার গায়ে হাত দিয়া বলিলেন "কৈ জ্বর ত বেশী নহে।" আমার আর সহ্য হইল না; আমি তখন ভুলিয়া গেলাম তিনি আমার বড় ভাই, আমরা এক মায়ের পেটের সন্তান। আমি কঠোর স্বরে বলিলাম "না খোকার জ্বর বেশী নয়। তুমি উপরে যাও; তোমার সুখের ব্যাঘাত কেন আমরা হই। যেদিন বৌদিদি গিয়েছে, সেইদিনই তোমার আশা আমরা ছেড়ে দিয়েছি। জ্বরের জ্বালায় ছেলে ছট্‌ফট্ করিতেছে, আর তুমি বোলছো, কৈ জ্বর বেশি নয়! যাও তোমার মত বাপের এ ছেলে বাঁচার চাইতে ওর মরণই ভাল।" দাদা আর কথা বলিলেন না; খোকার শিয়রে বসিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। একবার ইচ্ছা হইল দাদাকে ঘরের বাহির করিয়া দিই; খোকার পবিত্র শরীর তাহাকে স্পর্শ করিতে দিব না। পরক্ষণেই খোকার মুখের দিকে চাহিলাম; খোকা বলিল "কাকা, বড় জ্বর।" তার পরে আর খোকা কথা বলে নাই, কত আদর করিয়া ডাকিয়াছি, কত কি বলিয়াছি, খোকা আর কথা বলে নাই। ডাক্তার আসিলেন, ঔষধ দিলেন; বলিলেন যে, জ্বরের সঙ্গে সঙ্গেই ঘোর বিকার; বাক্‌রোধ হইয়াছে। তখন বুঝি দাদার জ্ঞান হইল—তখন বুঝি তিনি বুঝিতে পারিলেন সোনার খোকাকে আর বাঁধিয়া রাখিতে পারা যাইবে না।

প্রাতঃকালেই সাহেব ডাক্তার আনা হইল, ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঔষধ চলিল; কিন্তু সব বৃথা। সারাদিন গেল; সন্ধ্যার পূর্বে যখন সূর্যদেব পশ্চিম আকাশে ঢলিয়া পড়িলেন, তখন সেই সন্ধ্যার সময়—খোকার আমার ক্ষুদ্র প্রাণটুকু বাহির হইয়া গেল।

সেইদিনই প্রতিজ্ঞা করিলাম, আর এ পাপপুরীতে থাকিব না—আর দাদার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখিব না। সেই রাত্রেই খোকাকে যখন শ্মশানে লইয়া গেল, তখনই আমি বাড়ি ত্যাগ করিলাম। দুই চারি দিন এদিক ওদিক, এখানে সেখানে কাটাইয়া এখন এই মিত্রদের বাড়ির একটি ছেলের গৃহশিক্ষক হইয়াছি। কিছু টাকা হাতে হইলেই এ দেশ ত্যাগ করিয়া যাইব। কোথায় যাইব—ভগবান বলিতে পারেন।

কালো মেয়ে

রামকানাই বসু রাইপুরের একজন সম্পন্ন গৃহস্থ। জমাজমি যাহা আছে, তাহার আয়ে সংসার চলিয়া যায়, বৎসরান্তে কালীপূজার খরচও জমির আয় হইতেই চলে। তাহা ছাড়া বসুজার লগ্নি কারবারও আছে, তাহাতেও বিলক্ষণ দশটাকা আয়; সুতরাং গ্রামের মধ্যে বসু মহাশয়েরা দশজনের একজন।

রামকানাই বসু ইংরেজি লেখাপড়া জানেন না; অল্প বয়সে সামান্য কিতাবতি লেখাপড়া শেষ করিয়াই হরিপুরের বাবুদের জমিদারি-সরকারে প্রথমে তিনি তহশিলদার হন, ক্রমে ক্রমে প্রমোশন পাইয়া নবাবগঞ্জ পরগনার নায়েব পর্যন্তও হন। শেষ বয়সে আর চাকুরি ভাল না লাগায়, বসু মহাশয় কর্মত্যাগ করিয়া দেশে আসিয়া বসেন।

সংসারে স্ত্রী ও একটি পুত্র ব্যতীত রামকানাইয়ের আর কেহ ছিল না। নায়েবি করিয়া যাহা সংস্থান করিয়াছিলেন, তাহাতে সংসার বেশই চলিত।

ছেলের নাম হরিপদ। রামাকানাই নিজে ভাল লেখাপড়া জানিতেন না; এজন্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যথাসর্বস্ব ব্যয় করিয়াও ছেলেটিকে মানুষ করিবেন।

যথাসর্বস্ব ব্যয় করিলেই যদি ছেলে মানুষ হইত, তাহা হইলে অনেক বড়মানুষের ছেলেগুলি এতদিনে মানুষ হইয়া যাইত। হরিপদের শিক্ষার জন্য রামকানাই যথাসর্বস্ব না হউক, যথেষ্ট ব্যয় করিয়াছিলেন; কিন্তু নবাবগঞ্জ স্কুলের তৃতীয় শ্রেণির সহিত হরিপদের এমন মিত্রতা হইয়াছিল যে, সে চারি বৎসরেও সে শ্রেণির উপরে যাইতে পারিল না—চারি বৎসর পরে বোধ হয়, মনোমালিন্য হওয়ায় হরিপদ বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণি হইতে একেবারে রাজপথে আসিয়া দাঁড়াইল।

হরিপদ যে কোন বিদ্যাই শিখে নাই, তাহা বলিতে পারি না। আঠারো বৎসর বয়স পর্যন্ত মা সরস্বতীর আরাধনা করিয়া সে ঐ নিষ্ঠুরা দেবীর প্রসাদলাভে যদিও বঞ্চিত হইয়াছিল, কিন্তু দেবীরও পূজনীয় কৈলাসনাথের অনুচরগণের মধ্যে স্থানলাভ করিবার উপযুক্ত শিক্ষা সে পাইয়াছিল। প্রথমে হরিপদ সিদ্ধির ক্লাশে ভর্তি হইল, (তখন সিগারেট দেশে চলে নাই) তিন মাস না যাইতেই সে গাঁজার ক্লাশে প্রমোশন পাইল। তাহার পর দুই বৎসরের মধ্যেই সে সরকারি আবগারি বিভাগের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক হইয়া উঠিল। এ অবস্থায় নবাবগঞ্জ উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণির সহিত তাহার মিত্রতা যে দূর হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নাই।

বাপমায়ের এক মাত্র ছেলে, সুতরাং বাপ-মা প্রথম যখন হরিপদের শিক্ষানবিশির অবস্থা জানিতে পারিলেন, তখন সে দিকে তেমন মনোযোগ করিলেন না;—ছেলেমানুষ বলিয়াই উড়াইয়া দিলেন। বয়স হইলেই সব দোষ দূর হইবে! কিন্তু বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে হরিপদের শিক্ষাও বাড়িতে লাগিল। শেষে যখন রামকানাই পুত্রকে শাসন করিতে গেলেন,

তখন পুত্র হাতের বাহির হইয়া গিয়াছে; বিশেষত রামকানাইয়ের গৃহিণী যখন পুত্রের উপর পিতার তাড়না দেখিয়া অশ্রুবর্ষণ আরম্ভ করিতেন, তখন বেচারি রামকানাই একেবারে এতটুকু হইয়া যাইতেন।

"আমার ঐ একই ছেলে, কত টাকাই উড়াইবে" বলিয়া গৃহিণী যখন মনকে প্রবোধ দিতেন, নবাবগঞ্জের জমিদারের নায়েব মহাশয় আর দ্বিরুক্তি করিতে পারিতেন না। মনের দুঃখে নায়েব মহাশয় ছেলেকে স্কুল ছাড়াইয়া এবং নিজেও চাকুরি ছাড়িয়া দেশে আসিলেন।

২

হরিপদের এখন বড়ই অসুবিধা। রাইগঞ্জ তেমন একটা শহর নহে, সামান্য গ্রাম। সে গ্রামে ব্রিটিশ-রাজের গৌরব-বাহিনী মদের দোকান স্থাপিত হইবার কোনই সুবিধা হয় নাই। ছোট বাজার—সেখানে একখানি গাঁজা ও আফিমের দোকান ছাড়া দেশি বা বিলাতি মদের দোকান ছিল না; কাজেই শ্রীমান হরিপদ মদ ছাড়িয়া দিল; কিন্তু ক্ষতিপূরণ স্বরূপ সে গাঁজার মাত্রাটা বাড়াইয়া দিল এবং আফিমের একটা বিশুদ্ধ সংস্করণও গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিল। হরির মা ইহাতে আনন্দিত হইলেন। কর্তাকে বলিলেন, "দেখেছ, ছেলে আমার ভাল হইয়াছে; মদের নেশা একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছে। এখন ছেলের একটা বিবাহ দাও; তাহা হইলেই সামান্য যে একটু তামাক খাওয়া অভ্যাস আছে, তাহাও থাকিবে না।"

রামকানাই গৃহিণীর বাক্য চিরদিনই বেদবাক্যের ন্যায় বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার বিশ্বাস, স্ত্রীর ভাগ্যেই তাঁহার অবস্থা সচ্ছল হইয়াছে। এ হেন লক্ষ্মীস্বরূপিণী গৃহিণীর কোন আদেশ, অবহেলা করা, হেলায় লক্ষ্মী হারাইবার মতই তিনি মনে করিতেন। হরিপদের বিবাহের সম্বন্ধ আসিতে লাগিল; কিন্তু যে সকল মেয়ের বাপের সামান্য একটু কাণ্ডজ্ঞান আছে, তাঁহারা কেহই রামকানাইয়ের জোতজমা দেখিয়া ভুলিলেন না—ছেলের অতুলনীয় গুণরাশি দেখিয়াই তাঁহারা পৃষ্ঠভঙ্গ দিলেন। অবশেষে কানাই নগরের পশুপতি মিত্রের কন্যার সহিত হরিপদের বিবাহ স্থির হইয়া গেল। পশুপতির অবস্থা বড়ই শোচনীয়; তিন চারিটি মেয়ে পার করিতে হইবে। ছেলের অতশত খুঁত দেখিলে কি তাঁহার চলে। বিশেষত তাঁহার মেয়েগুলির শরীরের রংয়ের সহিত মসির রংয়ের কোন বিশেষ পার্থক্য ছিল না; আজকালকার ছেলেরা কি সহজে এমন মেয়ে গ্রহণ করিতে সম্মত হয়? এই রকম সাত পাঁচ ভাবিয়াই পশুপতি বিবাহ দিতে সম্মত হইলেন। রামকানাই টাকাকড়ির জন্য বিশেষ আগ্রহ করিলেন না;—গৃহিণীর নিষেধ।

হাল ফ্যাশানের ছেলে হইলেও হরিপদ স্বয়ং কনে দেখিতে গেল না—তাহার বিবাহে মোটেই মত ছিল না। অগত্যা যে কাজ করিতে হইতেছে, তাহাতে আর দেখা শুনা কেন? যথাসময়ে হরিপদের সহিত পশুপতির মেয়ে উমাকালীর বিবাহ হইয়া গেল। প্রজাপতির নির্বন্ধ!

৩

বউ ঘরে আসিল, কিন্তু হরিপদ ঘবে মন দিল না। বধূর মসিবিনিন্দিত রং দেখিয়াই তাহার মন চটিয়া গেল। বাপ-মা যাহা মনে করিয়া তাড়াতাড়ি হরিপদের বিবাহ দিলেন, তাহার কিছুই হইল না; লাভের মধ্যে হরিপদ বাড়ীতে রাত্রিবাস ত্যাগ করিল। নিশাযাপনের জন্য সে অন্য ব্যবস্থা করিয়া লইল।

রামকানাই এবং তস্য গৃহিণী ইহাতে বড়ই চটিয়া গেলেন; কিন্তু সে চোটটা যেখানে প্রযুক্ত হওয়া উচিত ছিল সেখানে না পড়িয়া অতি নির্দোষী এক বেচারির স্কন্ধে গিয়া পড়িল। তাঁহাদের যত রাগ সব ঐ অলক্ষুনে বউটির উপর পড়িল। পশুপতির কন্যা নিতান্ত নাবালিকা ছিল না—উমাকালীর বয়স যখন কোষ্ঠীতে পনর বৎসর, তখনই পশুপতি তাহাকে 'এই সবে বারতে পা দিয়াছে' বলিয়া পার করিয়াছিল। স্বামী কি পদার্থ, তাহা উমাকালী বুঝিতে পারিয়াছিল। স্বামীর অনাদর ও অবজ্ঞা তাহার প্রাণে বড়ই বাজিতে লাগিল। তাহার পর শ্বশুর শ্বাশুড়ী যখন গঞ্জনা দিতে আরম্ভ করিলেন, তখন সে বুঝিতে পারিল না—তাহার কি অপরাধ। তাহার চেহারা ভাল নহে—কিন্তু সে জন্য ত সে দাযি নহে। কে যে দায়ি, তাহাও সে ভাবিয়া পাইল না। তাহার পিতা যে কোন প্রকার প্রতারণা করিয়া তাহার মত কালো মেয়ে পার করিয়াছে, তাহাও ত সে বুঝিতে পারিল না। সে শুধু দেখে সকলেই তাহাকে তুচ্ছ করে। শাশুড়ী তাহাকে সকলের সমক্ষেই অলক্ষুনে বলিয়া গালি দেয়। সত্য সত্যই কি সে অলক্ষুনে! কিসে তাহার লক্ষণের অভাব হইল, অনেক চিন্তা করিয়াও তাহা সে আবিষ্কার করিতে পারিল না।

উমাকালী বুঝিল, চিরজীবন এই প্রকার দুঃখের বোঝা বহিয়াই তাহাকে জীবনযাপন করিতে হইবে। ইহা হইতেও অধিকতর দুঃখ যে তাহাকে ভোগ করিতে হইবে, তাহা সে কখন মনেও ভাবিতে পারে নাই।

৪

একদিন কর্তা-গিন্নিতে মহা বিবাদ উপস্থিত। বিবাদ বলিলে বোধ হয় কথাটা ঠিক বলা হয় না; কারণ বিবাদে দুই পক্ষই কথা বলে। উপস্থিত ক্ষেত্রে একপক্ষ নীরব, ধীর, অতি সহিষ্ণু শ্রোতা; অপর পক্ষ বক্তা। গৃহিণী বক্তার আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। গৃহিণীর প্রধান অভিযোগ কর্তা চক্ষুহীন ব্যক্তি; তিনি অনেক দিন হইতেই মানুষের পরম ধন চক্ষু দুইটির মস্তক চর্বণ করিয়াছেন;

নতুবা তিনি কেমন করিয়া দেখিয়া শুনিয়া এমন কালো ভূত, অলক্ষুনে মেয়ের সঙ্গে তাঁহার সোনারচাঁদ হরিপদের সম্বন্ধ করিলেন। রামকানাই এ ক্ষেত্রে জবাব দিবার কিছুই খুঁজিয়া পাইলেন না; সুতরাং গৃহিণীর বাক্যসুধা নীরবে পরিপাক করা ব্যতীত তাঁহার উপায়ান্তর ছিল না।

প্রচুর বাক্যসুধা বর্ষণের পর গৃহিণী প্রস্তাব করিলেন যে, যাহা হইবার হইয়াছে, এখন এ বৌটাকে বাপের বাড়ি চিরদিনের মত পাঠাইয়া দেওয়া হউক। তিনি ভাল একটি মেয়ে দেখিয়া

সোনারচাঁদের আবার বিবাহ দিন; তাহা হইলেই সমস্ত গোল মিটিয়া যাইবে। রামকানাই এ প্রস্তাবে সম্মত না হইয়া কি করেন।

এমন কথাটা গোপনে থাকিবার নহে; বিশেষত কর্তা-গৃহিণীও ইহা গোপন করিবার কোন আবশ্যকতা দেখিলেন না। কথাটা উমাকালীরও কর্ণে পৌছিল। সে এতদ্দিন মনে করিয়াছিল, স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ী যাহাই করুন, বাড়ি হইতে তাড়াইয়া দিতে কিছুতেই পারিবেন না। গৃহের সকলের স্নেহে বঞ্চিত হইয়াও সে আশা করিয়াছিল, এক মুষ্টি অন্নে বঞ্চিত হইবে না। তাহার পিতা অতি দরিদ্র ব্যক্তি, তাঁহার উপর বোঝা হইতে যাওয়া তাহার পক্ষে অকর্তব্য বলিয়া বোধ হইল।

একবার উমাকালী মনে করিল, স্বামীর পায়ে ধরিয়া নিষেধ করিবে। স্বামী একটা কেন দশটা বিবাহ করুন, কিন্তু এই বাড়িতে দাসীবৃত্তি করিবার অধিকার তাহাকে প্রদান করা হউক। কথাটা মনে হইল বটে, কিন্তু দ্বিতীয়বার আর সে কথাটা ভাবিতে পারিল না। তাহার স্বামী তাহাকে ত্যাগ করিবে, অন্য পত্নী গ্রহণ করিবে, একথা মনে করিতেও তাহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। সে ভাবিল, এই অল্প বয়সেই ভগবান তাহাকে এত কষ্ট দিতেছেন কেন? সে কি অপরাধ করিয়াছে? সমস্ত রাত্রি উমাকালী এই সকল কথাই ভাবিতে লাগিল। ভাবিতে ভাবিতে কখন তাহার নিদ্রাকর্ষণ হইয়াছিল, তাহাও সে জানিতে পাবে নাই।

৫

উমাকালী যে ঘরে ঘুমাইতেছিল, সে ঘরে আর কেহ ছিল না। সে একেলা ভিজা মাটিতে পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।

এদিকে হরিপদ সে রাত্রে একটু অধিক পরিমাণে গঞ্জিকা সেবন করিয়া অপ্রকৃতিস্থ হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার রাত্রিবাসের স্থানে নানাপ্রকার উপদ্রব করায় গৃহস্বামিনী তাহাকে বাড়ি হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিল।

হাজার হউক ভদ্রলোকের ছেলে। এইভাবে অপমানিত ও গৃহবহিষ্কৃত হওয়ায় তাহার গাঁজার নেশা ছুটিয়া গেল। সে অন্যমনস্কভাবে শেষরাত্রিতে বাড়ির দিকে আসিতে লাগিল। মনটা যেন আজ কেমন করিতে লাগিল।

ধীরে ধীরে বাড়িতে প্রবেশ করিয়া দেখে, সকল ঘরের দ্বারই ভিতর হইতে বন্ধ, কেবলমাত্র একখানি ঘরের দ্বার বন্ধ করিতে কে যেন ভুলিয়া গিয়াছিল। হরিপদ মনে করিল, এই ঘরে গিয়াই অবশিষ্ট রাত্রিটুকু কাটাইব।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখে, একপার্শ্বে একটি প্রদীপ মৃদু মৃদু জ্বলিতেছে, খাটের উপর বিছানায় কেহই নাই। সে যখন সেই বিছানায় শয়ন করিতে যাইবে, তখন দেখে ভূমিশয্যায় উমাকালী শয়ন করিয়া আছে; তাহার কেশপাশ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

হরিপদ হঠাৎ চমকিয়া দাঁড়াইল। এতদিন পরে একবার সেই কালো, অনাদৃতা, উপেক্ষিতা, অলক্ষুনে মেয়েটির দিকে সে চাহিয়া দেখিল। দৃষ্টি আর ফিরাইতে পারিল না। গাঁজাখোর

হরিপদ সেই কালো মুখখানিতে যেন স্বর্গের অপূর্ব জ্যোতি দেখিল। ছেলেবেলায় সে পূজা দেখিতে গেলে, লক্ষ্মীর মুখে যে শোভা দেখিত, আজ তাহার অবমানিতা পত্নীর মুখে সেই শোভা দেখিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, ঐ কালো রূপে যেন ঘরখানি আলো হইয়া আছে; তাহার মনে হইল, ঐ কালোরূপ যেন স্বর্গের অমৃত চারিদিকে বর্ষণ করিতেছে;—তাহার মনে হইল—এমন সুন্দর মুখ—এমন পবিত্র দৃশ্য—এমন স্বর্গীয় মাধুরীমাখা শ্রী সে কখন দেখে নাই। এত রূপ, এত পবিত্রতা যে মানুষে থাকিতে পারে, তাহা সে জানিত না।

হরিপদ আব দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না—সে সেই স্থানেই বসিয়া পড়িল; এক একবার উমাকালীর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত কবে, আর তাহার প্রাণ যেন শীতল হইয়া যায়। তাহার মনে হইতে লাগিল, কি এক আশ্চর্য অমানুষিক শক্তির প্রভাবে তাহার মনের সমস্ত মলিনতা যেন কাটিয়া যাইতেছে, তাহাব সমস্ত নেশা যেন ছুটিয়া যাইতেছে, সে এতদিন যে জগতে বাস করিতেছিল, কে যেন তাহাকে সে জগৎ হইতে তুলিয়া আর কোথায় লইয়া যাইতেছে। অলক্ষে তাহার চক্ষু হইতে দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। তাহার বিগত জীবনের কার্য সকল মনে হইয়া, তাহার হৃদয় যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল।

তাহার পর কি অন্যায় কার্যেই সে সম্মতি প্রদান করিয়াছিল; ঘরে যাহার এমন দেবী প্রতিমা বিদ্যমান, সে কিনা তাহাকে ছাড়িয়া আবার বিবাহ করিতে যাইতেছিল। হরিপদ অনুতাপের তীব্রদংশনে জর্জরিত হইতে লাগিল—কি করিবে তাহা ভাবিয়া পাইল না।

এমন সময় উমাকালী ঘুমের ঘোরে কাঁদিয়া উঠিল; জোড়হস্তে বলিল—"ও গো আমাকে তাড়াইয়া দিও না।"

হরিপদ আর স্থির থাকিতে পারিল না, পাষাণ গলিতে আরম্ভ হইয়াছিল, এবারে আর বাধা মানিল না। সে পাগলের মত উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল, "না, উমা, কে তোমাকে তাড়ায়?"

মানুষের গলার শব্দ শুনিয়াই ভীতা হইয়া উমাকালী ব্যস্তভাবে উঠিয়া বসিল; চাহিয়া দেখে তাহার শিয়রে তাহার জীবনের দেবতা, তাহার সাধনার ধন, তাহার যথাসর্বস্ব হরিপদ বসিয়া আছে। তাহার মুখে আর কথা সরিল না; সে মনে করিল, তখনও বুঝি সে স্বপ্ন দেখিতেছে। তাই সে আবার কাতরকণ্ঠে বলিল, "ঠাকুর, আমার এ স্বপন ভাঙিও না।"

হরিপদ তখন সেই অনাদৃতা দুঃখিনী পত্নীকে কোলে জড়াইয়া ধরিল; বলিল "উমা, এ স্বপ্ন নহে। সত্য সত্যই আমি আসিয়াছি। আর তোমাকে ছাড়িয়া থাকিব না। তোমার মুখ দেখিয়া আমার নূতন জীবন লাভ হইল।" উমাকালী আর কিছুই বলিতে পারিল না—তাহার চক্ষুর সম্মুখে সমস্ত পৃথিবী ঘুরিতে লাগিল।

প্রত্যূষে, আর বিলম্ব ছিল না; গাছে গাছে পাখি গান করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, পূর্বের দিকে ঈষৎ আলোকের রেখা দেখা দিয়াছিল। সেই শুভমুহূর্তে এই দুঃখতাপক্লিষ্ট সংসারের একটি ক্ষুদ্র গৃহে স্বর্গের পবিত্র কিরণ নামিয়া আসিয়াছিল।

এমন সময়ে গ্রামের রূপা পাগলা সেই রাস্তা দিয়া গাহিতে গাহিতে যাইতেছিল,—

"তাই কালো রূপ ভালবাসি।
শ্যামা মনোমোহিনী এলোকেশী।"

—জাহ্নবী (নব পর্যায়) ২য় বর্ষ, ১৩১৩, ২য় সংখ্যা জ্যৈষ্ঠ।

সুষমা

এগার বৎসর কমিসেরিয়েটে চাকুরি করিয়া যদু ভট্‌চাজ যখন রাউলপিণ্ডীর মায়া ত্যাগ করিয়া দেশে চলিয়া আসিলেন, তখন তিনি সঙ্গে আনিলেন এক রাশি কোম্পানির কাগজ, জামাতৃ-শোকাতুরা পত্নী, আর তের বৎসরের বিধবা কন্যা সুষমা।

যদুবাবুর কেবলমাত্র এক কন্যা—এ দিকে চাকুরির আয়ও যথেষ্ট; কাজেই মেয়েটিকে অল্পবয়সে বিবাহ দিয়া জামাই লইয়া সাধ-আহ্লাদ করিবার ইচ্ছা তাঁহার মনে হওয়া অসম্ভব নহে। তাই তিনি অনেক চেষ্টা করিয়া কানপুরের একটি ভদ্রলোকের ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিবাহ দিলেন—বিবাহে প্রায় বাইশ হাজার টাকা ব্যয় করেন। বিবাহের পর পাঁচ মাসও গেল না—যদুবাবুর বড় সাধের একমাত্র কন্যা সুষমা বিধবা হইল। স্বামী চিনিতে না চিনিতেই চিরবৈধব্য আসিয়া বালিকার সকল সুখের বাসা ভাঙিয়া দিল।

আর কাহার জন্য—কিসের জন্য চাকুরি। গৃহিণী বলিলেন, "এ পোড়া রাউলপিণ্ডীতে আর থাকিব না, দেশেও আর এ মুখ দেখাইব না। চল, কাশীতে বাবা বিশ্বেশ্বরের ধামে জীবনের বাকি কয়টা দিন কাটাইয়া দিই।"

যদুবাবুর তাহাতে মন উঠিল না—তিনি ধর্ম-কর্ম তেমন মানিতেন না—তীর্থশ্রেষ্ঠ কাশীর উপর তাঁহার তেমন ভক্তি ছিল না—বালবিধবা কন্যা লইয়া কাশীবাসের ব্যবস্থা তাঁহার মনের মত হইল না—অথচ রাউলপিণ্ডীতেও আর বাস করা যায় না। যে বাড়ির প্রত্যেক বস্তুর সঙ্গে সুষমার মূর্তি জড়িত—সে বাড়িতে, সে স্থানে বাস করা অসম্ভব হইয়া উঠিল।

সুষমা যদি আরও একটু কম বয়সে বিধবা হইত—তাহা হইলে সে অনেক পরিমাণে স্মৃতির দংশন হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারিত। পয়সাওয়ালা ভদ্রলোকের তের বৎসরের মেয়ে নিতান্তই বালিকা নহে;—সুষমা লেখাপড়া শিখিয়াছিল—বাংলা ইংরেজি সংস্কৃত পড়িয়াছিল—বিবি মাস্টারের কাছে সূচিকর্ম ও হারমোনিয়াম বাজানোও অভ্যাস করিয়াছিল—দু'দশখানা বাঙালা উপন্যাসও পড়িয়াছিল; সুতরাং বয়স তের বৎসর হইলেও তাহার স্বামী চিনিতে বিলম্ব হয় নাই। সবে মাত্র সে স্বামীসুখ-ভোগে প্রবৃত্ত হইয়াছিল—সবে মাত্র তাহার বালিকা-জীবনে যৌবনের রেখাপাত হইতেছিল—সবে মাত্র তাহার হৃদয়াকাশে পূর্ণচন্দ্র উঠিতেছিল—সবে মাত্র তাহার প্রাণের মধ্যে যৌবনের জ্যোৎস্না উঁকি মারিতেছিল—সেই সময় তাহার সমস্ত সুখের কল্পনা—তাহার জীবনের আনন্দ-কানন কোথায় অন্তর্হিত হইল। একদিনের একখানি এক পয়সার পোষ্টকার্ড তাহার জীবনের সকল সাধ-আহ্লাদ হরণ করিয়া লইয়া গেল।

যদু বাবু দেশে ফিরিয়া আসাই কর্তব্য মনে করিলেন। তাই এগার বৎসব পরে স্ত্রী ও বিধবা কন্যা লইয়া তিনি তাঁহার নিভৃত পল্লিগ্রামে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি ভাবিলেন শহরের কোলাহল, শহরের ভোগবিলাস হইতে দূরে পল্লিগ্রামের সুশীতল ছায়াব বসাইয়া তিনি তাঁহার সুষমার হৃদয়কে শান্ত করিবেন—তাহার জীবনকে পল্লিময় করিয়া

ফেলিবেন—তাহার হৃদয় হইতে বিলাস ও সুখের স্মৃতি মুছিয়া দিবেন। ইহাই তাঁহার পল্লিবাসের মুখ্য অভিপ্রায়।

বাড়িতে এক বুড়া পিসিমা ছাড়া তাঁহার আর কেহ ছিল না। পৈতৃক একটি নারায়ণশিলা ছিলেন, আর বিশ পঁচিশ বিঘা ব্রহ্মোত্তর ছিল। পিসিমা সেই জমির খাজনা আদায় করিতেন, ধান পাইতেন, আর ঠাকুরের সেবা করিতেন। যদু বাবু সর্বদাই পিসিমার খরচের জন্য টাকা পাঠাইয়া দিতেন, কিন্তু পিসিমার আর খরচ কি? বাড়িতে তিনি আর অনেক দিনের পুরাতন ভৃত্য রমানাথ। রমানাথেরও ত্রিজগতে কেহই ছিল না; সে ভট্‌চাজ বাড়ির নোনাধরা পুরাতন একতলা বৈঠকখানা বারান্দায় বসিয়া হরিনাম করিত।

যদু বাবু বাড়িতে আসিয়া কি ব্যবস্থা করিবেন, তাহা পূর্ব হইতেই স্থির করিয়াছিলেন, কমিসেরিয়েটের চাকুরিতে বিলক্ষণ দু'পয়সা প্রাপ্তি ছিল; যদু বাবুও অনেক টাকা জমাইয়াছিলেন। পরের ধন সকলেই বেশি দেখে। অনেকেই বলিল যদু বাবু চার পাঁচ লাখ টাকা জমাইয়াছেন, কিন্তু আমাদের মনে হয় এত টাকা তাঁহার ছিল না, তবে, লাখ টাকার উপর যে তাঁহার ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

যদুবাবু বাড়িতে আসিয়াই পুরাতন বাড়ি সংস্কার করিলেন, নূতন বাড়িঘর প্রস্তুত করিলেন না। পাড়ার দশজনে মনে করিযাছিল যে, এত বড় একটা চাকুরে এত টাকা লইয়া দেশে আসিলেন, দেশে একটা হৈ-হৈ বৈ-রৈ পড়িয়া যাইবে; পাড়ার নিষ্কর্মা লোকদের একটা আড্ডা জমিবে; পেশাদার মোসাহেবদিগের দিনপাতের সুবিধা হইবে; কিন্তু যদু বাবুর কাজকর্মের ব্যবস্থা দেখিয়া অনেকেই নিরাশ হইলেন, কেহ কেহ তাঁহাকে মহাকৃপণ বলিয়াও দেশে রাষ্ট্র করিল। যদু বাবু কাহারও কথায় কর্ণপাত করিলেন না, কাহারও অযাচিত সুপরামর্শও গ্রহণ করিলেন না। দুই একজন মুরুব্বি-শ্রেণির বৃদ্ধ যদু বাবুর জামাতার মৃত্যুকে শোক প্রকাশ করিয়া ধীরে ধীরে পুনরায় দারপরিগ্রহ করিয়া বংশরক্ষার প্রস্তাবও করিলেন, এবং তাহাতে যদি নিতান্তই অনিচ্ছা হয়, তাহা হইলে অন্তত একটি পোষ্যপুত্র গ্রহণ করা অতীব কর্তব্য, তাহা প্রতিপাদন করিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। এত ধনদৌলত কে ভোগ করিবে—মধু ভট্‌চাজের নাম যে একেবারে লোপ হইবে, তাহা তাঁহাদের নিতান্ত অসহ্য বোধ হইল। মধু ভট্‌চাজ গ্রামের দশজনের একজন ছিলেন; তাঁহার উপযুক্ত পুত্র যদু ভট্‌চাজ যে বুদ্ধির দোষে বাপ পিতামহের নাম ডুবাইবে, ইহা শুভানুধ্যায়ী মহাশয়গণের নিকট কিছুতেই কর্তব্য বোধ হইল না। কিন্তু যদু বাবু এ সকল অকাট্য যুক্তির কোনই প্রতিবাদ করিলেন না; সকলই শুনিতে লাগিলেন। শুভানুধ্যায়ীরা দেখিলেন এ পশ্চিম-ফেরত লড়াইয়ে ব্রাহ্মণকে সুপরামর্শ দান বৃথা। সুতরাং ক্রমে তাঁহারা রণে ভঙ্গ দিতে লাগিলেন। যদু বাবুও এই সকল উপদেশের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিলেন।

বাড়ি আবশ্যক সংস্কার-কার্য শেষ হইলে যদু ভট্‌চাজ পুরোহিত ঠাকুরকে ডাকিয়া দেবালয়ের ভিত্তি-স্থাপনের একটা শুভদিন দেখিতে বলিলেন; ঠাকুর দিন স্থির করিয়া দিলেন। যথাসময়ে দেবালয়ের ভিত্তি স্থাপিত হইল; তাহার পর আট নয় মাসের মধ্যেই বাড়ির বাহিরে একটি অনতিবৃহৎ মন্দির প্রস্তুত হইল; ভোগশালা, অতিথিশালা নির্মিত হইল, সুন্দর সরোবর

খনিত হইল, উদ্যানে পুষ্পবৃক্ষ রোপিত হইল। তাহার পর একদিন মহাসমারোহে দেবালয় প্রতিষ্ঠা হইল; গৃহদেবতা নারায়ণ শিলা এই নবনির্মিত দেবালয়ে আসন গ্রহণ করিলেন—আর শুভ্র-বস্ত্র-পরিহিতা চতুর্দশবর্ষীয়া বিধবা সুষমা এই দেবালয়ের সম্পূর্ণ ভার প্রাপ্ত হইল। যদু ভট্টাচার্য যাহা মনে স্থির করিয়া কাশীধাম ত্যাগ করিয়া বাংলাদেশের এই নির্জন পল্লিতে আগমন করিয়াছিলেন তাহারই ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। বিধবা কন্যাকে প্রকৃত ব্রহ্মচারিণী দেবসেবিকা করাই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল—তিনি বহু অর্থব্যয়ে তাহাই করিলেন। তাঁহার মন অনেকটা নিশ্চিন্ত হইল।

সুষমাও ইহারই জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। দেবচরণে আত্মনিবেদন ব্যতীত তাহারও উপায়ান্তর ছিল না। হৃদয় হইতে সংসার-বাসনা সমূলে উৎপাটিত করিয়া ফেলিবার জন্য চতুর্দশবর্ষীয়া বালিকা প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল; যত প্রকার কঠোর ব্রত করা যাইতে পারে, সে তাহাতেই প্রবৃত্ত হইল। পিতামাতা কেহই নিষেধ করিলেন না। তাপতপ্ত নিদাঘের একাদশী তিথিতে তাহার কণ্ঠ শুষ্ক হইলেও সে অধীরা হইত না;—একান্ত চিত্তে তাহার সেই গৃহদেবতা জনার্দনের মন্দিরে বসিয়া তাঁহাকে ডাকিত—তাঁহারই ধ্যানে নিমগ্ন থাকিত। ক্রমে তাহার দেহে অপূর্ব জ্যোতি প্রকাশিত হইতে লাগিল—তাহার মুখের দিকে চাহিলে অতি বড় পাষণ্ডেরও মনে ধর্মভাব ক্ষণেকের জন্য জাগ্রত হইত।

জনার্দনের পূজা, অতিথিসেবা, শাস্ত্রাধ্যয়ন ইহাই তাহার জীবনের কার্য হইল; কিন্তু তবুও থাকিয়া থাকিয়া এক একদিন তাহার হৃদয়ের মধ্যে যেন কেমন একটা শূন্যতা আসিয়া উপস্থিত হইত। সে কত চেষ্টা করিত, কতবার জনার্দনকে ডাকিত, কতদিন মন্দিরের মধ্যে ভূমিশয্যায় লুটাইয়া পড়িয়া কাতরকণ্ঠে দেবতাকে ডাকিত—তবুও তাহার এ দুর্বলতা যাইত না। মধ্যে মধ্যে কোথা হইতে বাসনার প্রবল-বহ্নি এক একবার জ্বলিয়া উঠিত। সুষমা ভয়ে জঁড়সড় হইত। ভাবিত, কিছুতেই কি ভোগ-বাসনা তাহাকে ত্যাগ করিবে না—কিছুতেই কি সামান্য পাঁচ মাসের স্মৃতি সে মুছিয়া ফেলিতে পারিবে না—কিছুতেই কি সে জনার্দনের পাদপদ্মে প্রাণমন সঁপিয়া দিতে পারিবে না। এত কঠোর ব্রত নিয়ম সকলই কি ব্যর্থ হইয়া যাইবে? জীবনান্ত ব্যতীত কি তাহার চিত্তশুদ্ধি হইবে না? কে তাহার এ প্রশ্নের সদুত্তর দিবে, কে তাহার হৃদয়ের এই জ্বালা নিবারণ করিবে?

এই অবস্থার আরও চারি বৎসর কাটিয়া গেল সুষমা সেই একই ভাবে জনার্দনের পূজা করে, তেমনই অতিথিসেবা করে, তেমনই দিন কাটায়,—আর তেমনই মধ্যে মধ্যে অকস্মাৎ তাহার হৃদয়ের ভিতর দিয়া কালবৈশাখির মত একটা প্রবল হাহাকার বহিয়া যায়।

এই সময় একদিন বৃন্দাবন হইতে যদু বাবুর গুরুপুত্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যদু বাবু যখন রাউলপিণ্ডীতে থাকিতেন, তখন গুরুদেব মধ্যে মধ্যে সেখানে যাইতেন; যদু বাবু দেশে আসিবার পরে আর গুরুদেব আসিতে পারেন নাই—এতদিন পরে পুত্রকে পাঠাইয়াছেন। যদু বাবু গুরুপুত্রকে সমাগত দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন।

গুরুপুত্র নবীন যুবক, বাইশ তেইশ বৎসর মাত্র বয়স; সুকুমার সুশ্রী। যেমন বর্ণ, তেমনই অঙ্গসৌষ্ঠব, তেমনই ভাষার লালিত্য। ইহা ব্যতীত গুরুপুত্রের আর একটি গুণ ছিল, তিনি

অতি উৎকৃষ্ট কথকতা করিতে পারিতেন। সমগ্র শ্রীমদ্‌ভাগবত তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। যদু বাবু মনে করিলেন গুরুপুত্র যখন আসিয়াছেন, তখন ঠাকুরবাড়িতে একমাস ভাগবত পাঠ হউক। সুষমা ইহাতে আপত্তি করিলেন না, বিশেষ আগ্রহের সহিতই সম্মতি প্রদান করিলেন।

শুভদিন দেখিয়া পাঠ আরম্ভ হইল। গ্রামের বহু লোকে প্রত্যহ অপরাহ্নে ভাগবত-পাঠ শ্রবণ করিতে আসিতেন। প্রথম কয়েকদিন সুষমা গুরুপুত্রের সম্মুখে বাহির হইলেন না; কিন্তু গুরুপুত্র তাঁহারই গৃহে সমাগত—কয়দিন সম্মুখে বাহির না হইয়া থাকা যায়। গুরুপুত্রের সম্মুখে বাহিব হইবার তাঁহার অন্য আপত্তিও ছিল; কিন্তু সে কথা তিনি মুখ ফুটিয়া কাহাকে বলিবেন? সে ত বলিবার কথা নহে। গুরুপুত্র যখন ভাগবত পাঠ করিতেন, সুষমা একাগ্রমনে তাহাই শুনিবার চেষ্টা করিতেন; কিন্তু কি জানি কেন তাঁহার চক্ষু হইতে একটি করুণ চাহনি তাঁহাকে লুকাইয়া যুবকের অনিন্দ্যসুন্দর রূপের দিকে ছুটিয়া যাইত। তাঁহার সুমধুর কণ্ঠস্বরেই সুষমার হৃদয় আর্দ্র হইত; শাস্ত্রকথা তাঁহার কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশের অবকাশ পাইত না। তাহার পর বাধ্য হইয়া তাঁহাকে যখন গুরুপুত্রের সম্মুখে বাহির হইতে হইল, তখন তাঁহার সঙ্কোচের ভাব সমধিক বর্ধিত হইল। সঙ্কোচ দুই রকমের. এক স্বাভাবিক সঙ্কোচ, আর এক জোর করিয়া সঙ্কোচ। সুষমা সঙ্কোচের গুণ্ঠনে আপনার প্রবৃত্তিকে প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিবার জন্য সর্বদা চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহাব এ ভাব আর কেহ বুঝিতে পারিল না, কিন্তু দ্বাবিংশবর্ষীয় সুকুমারকান্তি যুবক গুরুপুত্রের নিকট তাহা গোপন রহিল না। সুষমার অতুল রূপরাশি দর্শনে যুবকের মনেও একটা বাসনা জাগ্রত হইয়াছিল। সেই জন্যই তিনি অতি অল্প আয়াসেই সুষমার অতিরিক্ত সঙ্কোচের মর্ম বুঝিতে পারিলেন।

সুষমা কি করিবে? তাহার এতদিনের সাধনা, এতকালের ব্রহ্মচর্য, এত কঠোর ব্রত নিয়ম সমস্তই বুঝি প্রবৃত্তির পঙ্কিল স্রোতে ভাসিয়া যায়। এতদিন সুষমার হৃদয়ের মধ্যে যে হাহাকার —যে অতৃপ্ত বাসনা মধ্যে মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিত, এখন তাহা দুর্দমনীয় হইয়া উঠিল। সুষমার তখন মনে হইল "কি অপরাধে আমার এই শাস্তি? পৃথিবীতে সকলে সুখভোগ করিবে, আর আমি চিরদিন বাসনার তুষানল বুকের মাঝে জ্বালিয়া রাখিব? কেন আমি এই ভরা যৌবনে যোগিনী হইব? বিনাপরাধে সমাজের এ কঠোর শাস্তি কেন আমি বহন করিব? যা থাকে অদৃষ্টে—আমি ডুবিব।" সুষমা এই কথা বলিল বটে কিন্তু তাহার প্রাণের এক নিভৃত কোণ হইতে কে যেন অতি স্পষ্টস্বরে বলিল—"সাবধান, সাবধান, মোহ ক্ষণিক!"—ভীতা শঙ্কিতা ব্যথিতা অভাগিনি দিব্য-কর্ণে এই দৈববাণী শুনিল—তাহার সর্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল।

তখন রাত্রি তৃতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে। সুষমাকে কে যেন হাত ধরিয়া শয্যা হইতে তুলিল, কে যেন অঙ্গুলি-সঙ্কেতে তাহাকে ডাকিতে লাগিল। সুষমা আহ্বান উপেক্ষা করিতে পারিল না—শয্যাত্যাগ করিয়া যন্ত্রচালিত পুত্তলিকার ন্যায় চলিতে লাগিল। সহসা তাহার জ্ঞানের সঞ্চার হইল; দেখিল সে জনার্দনের মন্দিরের দ্বারে উপস্থিত! দ্বার বাহির হইতে বন্ধ ছিল; সুষমা ধীরে ধীরে দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। মন্দির অন্ধকারময়। অভাগিনি সেই তমিস্রামগ্ন মন্দিরের মধ্যে জনার্দনের পদতলে বসিয়া পড়িল,—করজোড়ে কাতরকণ্ঠে বলিতে লাগিল "নারায়ণ, আমাকে বাঁচাও—আমাকে রক্ষা কর। আমি যে নিজের

শক্তিতে আর উঠিতে পারিতেছি না দেব! আমার ইহকাল ত গিয়াছে, পরকালও যে যায়! কোথায় তুমি দেব, আমাকে রক্ষা কর।" তাহার মুখ দিয়া আর কথা সরিল না! বিলুপ্ত-চেতনা অভিভূতা অভাগিনি দেবতার পাদমূলে বিলুণ্ঠিতা হইতে লাগিল।

কতক্ষণ সে এ অবস্থায় ছিল, তাহা সে জানে না—অকস্মাৎ কাহার কোমল করস্পর্শে তাহার জ্ঞানসঞ্চার হইল। তখন প্রভাত হইয়াছে, মুক্তদ্বার পথে বালার্ককিরণ মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।

বাহিরে পাখিরা কলবর করিতেছে। দূরে গ্রাম প্রান্তে একজন বৈষ্ণব প্রাণ খুলিয়া গান

"কামরূপের ঘাটে নেমোনা রে মন আমার।"

দূর হইতে এই সঙ্গীত সুষমার কর্ণে যেন দৈববাণীর ন্যায় ধ্বনিত হইল। তৎক্ষণাৎ সে চক্ষু চাহিয়া দেখিল,—শিয়রে গুরুপুত্র দণ্ডায়মান। সুষমা তখন বাঘিনির ন্যায় লম্ফ দিয়া দাঁড়াইল; কেশপাশ আলুলায়িত, পরিধেয় বসন শ্লথবিন্যস্ত; কিন্তু সে দিকে তাহার দৃষ্টি নাই। তাহার দীপ্তনয়ন দিয়া যেন বহ্নিশিখা বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল? দৃঢ়স্বরে বলিল "এখানে কি চাও তুমি ঠাকুর?" সে সময়ে যদি মন্দিরের মধ্যে বজ্রপতন হইত, তাহা হইলেও গোস্বামীপুত্র এমন ভীত হইত না। ঠাকুর দেখিল তাহার সম্মুখে অপূর্ব দেবীপ্রতিমা—মাতৃমূর্তি! কোথায় চলিয়া গেল তাহার বিলাস-লালসা—কোথায় পলায়ন করিল তাহার প্রেম-সম্ভাষণ! সবিস্ময়ে রুদ্ধবাক্ গোস্বামী পুত্র সুষমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সুষমা তখন আবার গর্জিয়া বলিল "গোঁসাই, তোমাকে ক্ষমা করিলাম। এই দণ্ডেই তুমি এখান হইতে চলিয়া যাও; নতুবা—" বাতাহতা বেতসের ন্যায় সুষমার অঙ্গ কম্পিত হইতেছিল।

গোঁসাই আর সেখানে দাঁড়াইতে সাহসী হইল না, একটি কথাও সে বলিতে পারিল না। তখনই মন্দির হইতে বাহির হইয়া গ্রামের সকলের অজ্ঞাতসারে কোথায় চলিয়া গেল; পরদিন আর কেহ তাহার খোঁজ পাইল না। যদু ভট্টাচার্য বৃন্দাবনে পত্র লিখিলেন—কিছুদিন পরে সংবাদ পাইলেন যে, গুরুপুত্র বৃন্দাবনে গিয়াছেন। তাঁহার এই অকস্মাৎ চলিয়া যাওয়ার কারণ কেহই জানিতে পারিল না।

আর এদিকে এই মহাসংগ্রামে বিজয়ী হইয়া সুষমার জ্যোতি আরও যেন বাড়িয়া গেল—তাহার বাসনার অনল একেবারে নিবিয়া গেল। প্রাণে আর হাহাকার রহিল না। এই জ্বলন্ত অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তাহার প্রাণে যে আনন্দ হইয়াছিল—সমগ্র পৃথিবীর বিনিময়েও বুঝি তাহা দুর্লভ।

শেফালিকার দুঃখ

রামকমল মিত্রের বৃহৎ উদ্যানের এক পার্শ্বে এক অতি ক্ষুদ্র কোণে বহুকালের একটি মৃতবৎ কামিনী গাছ ছিল; এখন আছে কিনা কেমন করিয়া বলিব? আমি আজ ১০ বৎসরের সংবাদ বলিতে পারিনা। সেই কামিনী গাছের ছায়ায় ঘাসের জঙ্গলের মধ্যে আমার জন্ম; কবে কেমন করিয়া আমার জন্ম হয়, তাহা আমি জানি না; কি সূত্রে কামিনী গাছের ছায়ায় আমার বীজ পতিত হয় তাহা বলিতে পারিনা। কতদিন সেখানে ছিলাম, তাহাও জানিনা। এক কথায় আমার জন্ম ও জন্মভূমির কোন সংবাদই আমার জানা ছিল না।

একদিন, বোধ হয় বসন্তকালই হইবে, একদিন অপরাহ্নে একদল বালক-বালিকা মিত্রদিগের বাগানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। তাহাদিগের হাস্যতরঙ্গে, তাহাদিগের দৌড়াদৌড়িতে সমস্ত উদ্যান শব্দিত হইতেছিল, সমস্ত বৃক্ষলতাও যেন সেই আমোদ-কোলাহলে যথেষ্ট আমোদ উপভোগ করিতেছিল। আমি ক্ষুদ্র এক প্রান্তে পড়িয়াছিলাম, বালক-বালিকাগণের উল্লাসধ্বনি আমারও কর্ণে পৌঁছিতে ছিল। ক্রমে শব্দ নিকট হইতে আরম্ভ করিল; শেষে দেখি দুই তিনটি বালিকা কামিনীবৃন্ত তলে উপস্থিত; একজন কামিনীর একটি শাখা ভাঙ্গিয়া লইল, আর একজন গাছের একটি শাখা ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। সকলের ছোট একটি মেয়ে গাছের তলায় ঘাস ছিঁড়িতে লাগিল; তাহার ইচ্ছা কামিনীবৃক্ষের তলাটা পরিষ্কার করে। হঠাৎ তাদের দৃষ্টি আমার উপরে পড়িল। আমি তখন বড়ই ক্ষুদ্র, সবে দুই তিনটা কচি পাতা আমার শরীরে শোভমান। বালিকা আমাকে দেখিয়া সহর্ষে করতালি দিয়া উঠিল এবং সঙ্গী-সঙ্গিনীদিগকে ডাকিয়া আমার ন্যায় একটি মহার্ঘরত্ন আবিষ্কার করিয়াছে বলিয়া নিজের গৌরব উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিল। তখন তাহার সেই কচি কচি রাঙা দুইখানি হস্ত আমার দেহ স্পর্শ করিল। সে যে কি স্পর্শ! কি বলিয়া বুঝাইব, সেই কুসুমকোমল স্পর্শ, আমরা বৃক্ষজাতি, অমন স্নেহ-পরশনে আমাদের প্রাণের মধ্যে কি এক অপূর্ব ভাবের সমাবেশ হয় তাহা তোমরা কঠিন মানব, কেমন করিয়া বুঝিবে। সেই বালিকার করস্পর্শে আমার প্রত্যেক পরমাণুতে যেন বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল; আমি এক মুহূর্তে জীবন পাইলাম। এতদিন সেই কামিনী গাছের ছায়ায় তৃণরাশির মধ্যে আমি আমার অস্তিত্ব লোপ করিয়া বসিয়াছিলাম। আজ আমি যে "দশজনের একজন" তাহা বুঝিতে পারিলাম। আমি বৃক্ষজীবনে আজ এই প্রথম মানুষের আদর পাইলাম।

বালিকা তখন সেই তৃণাসনে উপবিষ্ট হইয়া আমার গায়ে হাত বুলাইতে লাগিল, এবং কি করিয়া যে আমাকে সেখান হইতে তুলিয়া লইয়া যাইবে তাহারই চেষ্টা দেখিতে লাগিল। শেষে একটি বালকের সাহায্যে আমি সেই মিত্র উদ্যানের নিভৃত কোণ হইতে উত্তোলিত হইলাম। বালিকা আর বিলম্ব করিতে পারিল না। তাড়াতাড়ি আমাকে লইয়া বাড়িতে চলিয়া গেল। তাহাদের বহিঃপ্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে আমার জন্য স্থান নির্দেশ করিয়া দিল। পাছে কোন প্রকারে আমার অনিষ্ট হয়, এই ভয়ে বালিকার পিতা, স্নেহময়ী কন্যার অনুরোধে আমার

চারিদিকে ঘিরিয়া দিল। প্রতিদিন, প্রাতে, সন্ধ্যায় বালিকার হস্তসিঞ্চিত নির্মল জলে—ততোধিক তাহার স্নেহ বারিতে আমি বর্ধিত হইতে লাগিলাম।

দুই তিন বৎসরেই আমি পুষ্পিত হইলাম—আমি একটি ক্ষুদ্র শেফালিকার গন্ধে আমোদিত হইয়া, আমি তাহারই অজ্ঞাতসারে তাহার নিকট হইতে যে সামান্য একটু সুবাস চুরি করিয়া রাখিতাম, সেইটুকু যথাসময়ে চারিদিকে বিতরণ করিতাম। যখন আমার ফুল ফুটিত, তখন সে ফুল কাহারও অধিকার ছিল না। অতি প্রত্যুষে বালিকা আসিয়া আমার সমস্ত ফুল কুড়াইয়া লইত। পাছে তাহার কোমল করে বেদনা বোধ হয়,—তাই আমি রাত্রি শেষেই পতনোন্মুখ হইয়া থাকিতাম। একটু আমার শরীর স্পর্শ করিলেই বুঝিতাম, আমার পোষণকারিণী আসিয়াছে; অমনি তাহার মস্তকে পুষ্পরাশি ঢালিয়া দিতাম। বালিকার কতই আনন্দ।

তাহার পর হঠাৎ একদিন চারুদের বাড়িতে মহাসমারোহ: বাড়িঘর সব পরিষ্কার হইতেছে, লোকজন যাতায়াত করিতেছে। প্রাতঃকাল হইতে নহবত বাজিতে আরম্ভ হইয়াছে। আমি সেদিন ভয়ে জড়সড়। ছিলাম—এক বৃহৎ উদ্যানেব এক ক্ষুদ্র প্রান্তে লোকলোচনের অন্তবালে। সেইখানেই আমার বৃক্ষজীবন শেষ হইত। সেই নিভৃতস্থানেই আমি আমাব জীবনব্রত উদ্‌যাপন করিয়া চলিয়া যাইতাম । চারু তাহা করিতে দিল না। আজ এই লোক সমাগমেব মধ্যে পড়িবা আমি যেন মরিবার মত হইলাম। আজ আর চারুকে দেখি না। বাড়ীতে এত আনন্দ, এত কোলাহল, বালক-বালিকারা নূতন নূতন পোষাক পরিধান করিয়া চারিদিকে ঘুবিয়া বেড়াইতে লাগিল। আমি আর এখন ছোট নই; আমাব ছায়ায় অপবাহ্নে একদল বাজনাদার বসিয়া গেল; তাহারা সমস্ত অপরাহ্নটা আনন্দপর্ব করিয়া বসিয়াছিল, কিন্তু আমার মনে আনন্দ নাই। আমি সেদিন মোটেই চারুর সেই প্রসন্ন মুখ, সেই হাসি দেখিতে পাইলাম না। বাঁশি যখন কত কি সুন্দর রাগিণী আলাপ কবিতে লাগিল, আমি তখন শুধুই ভাবিতে লাগিলাম, এত লোক সমারোহের মধ্যে পড়িয়া চারু কি আমাকে ভুলিয়া গেল? দুই একদিনের পরিচয় নয়, আজ ৬ বৎসর আমি চারুর খেলার সাথি, ৪/৫ বৎসর আমি চারুকে ফুল যোগাইতেছি; হঠাৎ আজ সে আমাকে ভুলিয়া গেল! কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। সমস্ত রাত্রি লোকের কলরবে আমি শান্তি পাইলাম না।

পরদিন ভোর হইতে না হইতেই আমার তলায় বসিয়া সানাইওয়ালা কাঁদিয়া কাঁদিয়া যখন বাজাইতে লাগিল, তখন বুঝিলাম, কে যেন আজ চলিয়া যাইবে; কাহার বিচ্ছেদ যন্ত্রণা এই প্রত্যুষ হইতেই সানাইয়ের ভিতর হইতে বাহির হইতেছে। একটু বেলা হইলেই দেখিলাম, চারু মহাবাদ্যভাণ্ডেব মধ্যে দোলায় চড়িয়া কোথায় চলিয়া যাইতেছে। সেই চারু পাষাণে বুক বাঁধিয়া সব ছাড়িয়া কোথায় যায়? আমার দিকে সে ত একবারও চাহিয়া দেখিল না। আজ দীর্ঘ ছয় বৎসবের সম্বন্ধ কি এমন করিয়া ভাঙতে হয়? আমি যে প্রতিদিন, ভোর হইতে না হইতেই, কত ফুল লইয়া তাহার জন্য উৎসুক করিয়া বসিয়া থাকিতাম, আর সে আমার কাছে আসিলেই যে, তাহার চোখে কানে মাথায় অঞ্চলে সমস্ত ফুল ঢালিয়া দিতাম, এই কি তাহার প্রতিদান? বাদ্যভাণ্ডের আনন্দে মোহিত হইয়া কি সে আমাকে তুচ্ছ করিয়া গেল? আমারই

পাশ দিয়াই ত তাহার দোলা গেল, তখন কি সে তাহার মধ্য হইতে একটু উঁকি দিয়া আমাকে দেখিতে পাইত না। তার সেই লাল চেলির বস্ত্রখানির ঘোমটা একটু ফাঁক করিলেই ত দোলায় উঠিবার সময় তাহার সে মুখখানি আমি দেখিতে পাইতাম। তাহা আর হইলনা। বাদ্যের শব্দ ক্রমে দূরে যাইতে লাগিল। আমার প্রাঙ্গণ যেন হায়! হায়! করিতে লাগিল।

চারু এখন আসে যায়; কিন্তু আমার দিকে আর চায়না। কতদিন দেখি পাল্‌কি হইতে নামিতেছে, কতদিন দেখি পাল্‌কি চড়িয়া কোথায় যাইতেছে। আমার সহিয়া গিয়াছে; চারুর অনাদর আমার সহ্য হইয়া গিযাছে। এখন আর আমি বড় বেশি ফুল দিইনা।

অনেকদিন পরে, কতদিন ঠিক বলিতে পারিনা, তবে বোধ হয় চারুর বিবাহের ৪/৫ বৎসর করে, একদিন একখানি পাল্‌কি আসিয়া চারুদের বাড়িতে উপস্থিত হইল। তাহার মধ্য হইতে কে যেন একজন যুবতী বাহির হইল। বাড়ির মধ্যে ঘোর কান্না পড়িয়া গেল, এমন কান্না আমি এখন রোজই শুনি। আজ তিন চারি মাস হইতে এমন দিন যাইতে দেখি নাই যে দিন এ বাড়িতে লোক কাঁদে না। কি বলিয়া কাঁদে তাহারাই জানে। আমার মর্মে শুধু সেই করুণ স্বর আসিয়া আঘাত করে।

সেদিন সন্ধ্যার সময়, তখনও ভাল করিয়া অন্ধকার হয় নাই, তখন শুধু নীল আকাশে দুই একটি তারা উঠিতেছে;—সেই সন্ধ্যার সময় সাদা কাপড় পরা একটি ষোল বৎসরের মেয়ে আলুলায়িত কেশ, নিরাভরণা, ধীরে ধীরে আমার তলায় আসিল; ধীরে ধীরে আমার গায়ে মাথা রাখিয়া কাঁদিতে লাগিল। স্পর্শেই বুঝিলাম এ আমার চেনা কেহ, কিন্তু এমন শীতল ত তাহার স্পর্শ নহে, এমন মলিন ত তাহার মুখ নহে, এমন মৃদু ত তাহার পদনিক্ষেপ নহে। ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলাম;—দেখিলাম চারু! সে চারু নহে! আজ চার বৎসরের মধ্যে আমার চারুকে একেবারে কে যেন বদলাইয়া দিয়াছে, চারুর কান্না দেখিয়া আমারও কান্না পাইল। সেই শীতল অঙ্গ স্পর্শে আমার রস সব শুকাইয়া গিয়াছে। চারুর কান্নার স্থল আমি। আমার এখন আর পুষ্প সম্ভার নাই; কার জন্য ফুল ফুটাইব? আর সে সাধ্য কি আছে? আমি যে চারুর হৃদয়ের দারুণ আগুনে প্রতিদিন দগ্ধ হইতেছি। বাড়ির কর্তাটি মধ্যে মধ্যে আমাকে কাটিয়া ফেলিতে চায়। বোধহয় চারুর নিষেধে তা করে না। আমরা দুইজন একদিনে মরিব।

—জাহ্নবী (নব পর্যায়) ৩য় বর্ষ, ১৩১৪ ১ম সংখ্যা বৈশাখ।

বিবাহের ফর্দ্দ

তোমরা কর্মফল মান কি না জানিনা আমি মানি। নতুবা তুমি মা সরস্বতীর ত্যজ্যপুত্র, কোনদিন পাঠশালা ছাড়িয়া স্কুলের মুখ দেখ নাই,—কোন গোলদিঘির উপরের ঐ প্রকাণ্ড বাড়িটার সিঁড়িতে পর্যন্ত পদার্পণ কর নাই,—সেই তুমি সেই আমাদের গ্রামের উন্‌পাঁজুরে ছোকরা রাধাকিশোর এখন মাসে পাঁচশত সাতশত টাকা রোজগার করে, আর আমি কিছু কম ১৩ বৎসর দিন নাই, রাত্রি নাই অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া—শরীর মাটি করিয়া—চক্ষু দুইটির মাথা খাইয়া—মস্তিষ্কের পীড়া জন্মাইয়া এই যে একটা নয় দুইটা নয় চারিটা পাশ দিলাম, আমি এখন মাসে ৫০ টাকা বেতনের মাস্টারি করি দারিদ্রের কঠোর কষাঘাতে জর্জরিত দেহ নানা প্রকার অভাবের তাড়নায় অবসন্ন হৃদয় হইয়াছি; ইহা পূর্বজন্মেব কর্মফল নয় ত কি?

মনে করিওনা আমি কাহারও সুঅবস্থা দেখিয়া হিংসায় মরিতেছি। হিংসা করিতেছি না—নিজের অবস্থার কথা ভাবিয়া কাতর হইতেছি, তার কর্মফলের কথা বলিতেছি। আমার দুঃখের কথা শুনিবে?

আমি মাস্টার; বিশ্ববিদ্যালয়ের চারিটা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াও আমি মাষ্টার। গ্রামের বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় পড়িতে আসি। আমার পিতা জমিদারের সেরেস্তায় সামান্য কার্য করিতেন, সামান্য যে জমাজমি ছিল (এখন তাহাও নাই) তাহাতে সংসার চলিতনা, বাবার মাসিক বেতন বার টাকা ও জমির উৎপন্ন শস্যে কোনরকমে বড়ই কষ্টে সংসার চলিত। এ অবস্থায় আমার পড়ার খরচ দেওয়া বাবার সাধ্যাতীত ছিল। আমি ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া যোল বৎসর বয়সের সময় প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় উচ্চশিক্ষা লাভ করিবার জন্য আসিয়াছিলাম।

আমাদের গ্রামের তিনটি ছেলে তখন কলিকাতায় একটা মেসে থাকিয়া পড়িতেন; আমি তাঁহাদেরই ভরসায় কলিকাতায় আসিয়াছিলাম—তাঁহারাই ৫ দিনের জন্য তাঁহাদের মেসে আমাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। সেই পনেরো দিন আমি কলকাতাব শহরের কত বড় মানুষের বাড়ীতে যে'গিয়াছি তাহার সংখ্যা করিতে পারিনা। যাঁর বাড়িতে একটা কুকুরের জন্য তিনটি চাকর নিযুক্ত আছে, তাঁর নিকট একমুষ্টি অন্নের জন্য প্রার্থনা করিয়া অকথ্য গালাগালি খাইয়া ফিরিয়াছি। যাঁর বিলাস বাসনা পরিতৃপ্তির জন্য মাসে সহস্রাধিক টাকা জলের মত উড়িয়া যায়, যাহার দাসদাসীদিগের ভুক্তাবশিষ্ট অন্নে আমার অভাব মোচন হয়, তার দ্বার হইতে শুষ্ক মুখে ফিরিয়াছি। পনেরো দিনের পর অদৃষ্ট প্রসন্ন হইল। আমারই মত কষ্ট করিয়া লেখা পড়া শিখিয়া রমেশবাবু তখন বড় চাকুরি করিতেন, তিনি একদিন এই নিরাশ্রয় কায়স্থ সন্তানের দুঃখকাহিনী এবং লেখা-পড়া শিখিবার অটল প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়া আমার উপর দয়া প্রকাশ করিলেন—আমি মাসিক আট টাকা বেতনে তাঁহার পুত্রের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হইলাম। প্রাতঃস্মরণীয় দয়ার অবতার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত কলেজে বিনা বেতনে পড়িবার অধিকার পাইলাম। এম. এ. পরীক্ষা পর্যন্ত রমেশবাবুর বাড়িতেই গৃহশিক্ষক ছিলাম, মাসিক

বেতন পনেরো টাকা পর্যন্ত উঠিয়াছিল, এতদ্ব্যতীত তিনি নানারকমের সাহায্য করিতেন। তিনি বড় চাকুরি করিতেন, আমার পাঠ শেষ হইলে আমার কাজকর্মের সুবিধা করিয়া দিবেন এ আশ্বাসও তিনি দিয়াছিলেন। কিন্তু আমার অদৃষ্টে আছে মাষ্টারি, আমার এত আশা সহিবে কেন? আমি যেবার এম. এ. পরীক্ষা দিলাম যেই বৎসরই রমেশবাবু মারা গেলেন। তাঁর পরিবারবর্গ কলিকাতা ত্যাগ করিয়া দেশে চলিয়া গেলেন। এদিকে এই পাঁচ বৎসর ঘোর দারিদ্রের সহিত সংগ্রাম করিয়া আমার পূজনীয় পিতামহাশয়ও সেই বৎসরে স্বর্গারোহণ করিলেন। আমি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হইলাম সাতশত টাকার দুইখানি খত, ভদ্রাসন ও জমিজমা বন্ধকি একখানি সতেরোশত টাকা রেহিনি তমসুক, তিনটি নাবালিকা কন্যাসহ একটা নিঃসহায় বিধবা ভগিনী, বিধবা মাতা. বৃদ্ধা মাসিমা, আর পাইলাম চতুর্দশ বর্ষীয়া অবিবাহিতা একটি কনিষ্ঠা ভগিনী। পিতামাতা ও মাসিমাতার অনুরোধ, আদেশ ও অশ্রুজল উপেক্ষা করিতে পারিয়াছিলাম বলিয়া একটা পরের মেয়ে এবং তাহার ষষ্ঠীর দাসদিগের ভার আমাকে গ্রহণ করিতে হয় নাই। তাহা হইলেই ষোলকলা পূর্ণ হইত।

উত্তরাধিকার সূত্রে যাহা পাইয়াছি তাহার পরিচয় প্রদান করিলাম। স্বোপার্জিত সম্পত্তিরও একটা তালিকা দাখিল করি। স্বোপার্জিত সম্পত্তির মধ্যে প্রধান হইতেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের চাবিখানি ছাড়পত্র, দ্বিতীয় সম্পত্তি একরাশি বর্তমানে অনাবশ্যক পুস্তক এবং তৃতীয় সম্পত্তি ডিসপেপসিয়া ও ক্ষীণদৃষ্টি। পিতাঠাকুরের মৃত্যুর পর বাড়িতে বসিয়া জমা খরচ মিলাইয়া আমার অবস্থা যাহা দাঁড়াইয়া ছিল, তাহা বলিলাম। ইহা ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসের কথা।

বি. এ. পাশই বল, আর এম. এ. পাশই বল, চাকুরীক্ষেত্রে চাই মুরুব্বির জোর যা'র মুরুব্বি নাই, সে যত বড় বিদ্বান হইক না কেন তাহার কদর হইবে না; আর যা'র মুরুব্বি আছে সে কোনরকমের Yes, No বলিতে পারিলে এবং নাম স্বাক্ষর করিতে পারিলেই বড় চাকুরি। আমার মুরুব্বি নাই, রামচন্দ্রপুরের জমিদারের সামান্য গোমস্তা স্বর্গীয় রাধানাথ মিত্রের পুত্র হরিদাস মিত্রের এ সংসারে মুরুব্বি নাই। রমেশবাবু যদি বাঁচিয়া থাকিতেন তাহা হইলেও না হয় একটু বড়াই করিতে পারিতাম, কিন্তু আমার অদৃষ্টের দোষে তিনিও অসময়ে চলিয়া গেলেন।

বাড়িতে বসিয়া ভাবিলে যদি ঋণ শোধ হইত; যদি সুদের টাকা দেওয়া যা'ইত, যদি দিনান্ন জুটিত, যদি চতুর্দশ বর্ষীয়া ভগিনীর বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইত, তাহা হইলে ঘরে বসিয়াই ভাবিতাম; কিন্তু এ সংসারে তাহা ত হইবার যো নাই। সুতরাং চাকুরির চেষ্টায় কলিকাতায় উপস্থিত হইলাম। কলিকাতার রাজপথে যে চাকুরি পড়িয়া নাই তাহা আমি জানিতাম। কিন্তু তাহা বলিয়া ঘরে বসিয়া থাকিলে লাভ কি? কলিকাতা শহরে কত জনের অন্ন মিলিতেছে, আর এম. এ পাশ হরিদাস মিত্রের মুরুব্বি নাই এই অপরাধে কি তাহার অন্ন মিলিবে না এই সাহসে বুক বাঁধিয়া কলিকাতায় আসিয়াছিলাম।

বাড়ি হইতে আসিবার সময় তেরটা টাকা লইয়া আসিয়াছিলাম—তাহার অধিক আনিতে হইলে ঘটিবাটি বন্ধক দেওয়া ব্যতীত উপায়ান্তর ছিল না। কলিকাতায় একটা মেসে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। তারপর কয়েকদিন এ অফিস, ও অফিস ঘুরিলাম, দুই চারিজন সাহেবের

সহিতও সাক্ষাৎ করিলাম, কেহ বলিলেন No vacancy. কেহবা একটু ভদ্রতা বা একটু উপহাস করিয়া বসিলেন Sorry, no room for a graduate like you. কতকগুলি পাশ করিয়াও দেখছি বিপদে পড়িয়াছি; একদিকে graduate আর একদিকে অনাহার! শেষে স্থির করিলাম যাহারা এই জয়পত্র গলায় বাঁধিয়া দিয়াছেন তাঁহাদেরই দ্বারস্থ হইব। একদিন শিক্ষাবিভাগের বড়কর্তার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। তিনি দয়া করিলেন,—তাঁদেরই দয়ায় ৫০্ টাকা বেতনে মাষ্টারি জুটিয়াছে। আর দুই বৎসর ৫০্ টাকাই পাইতেছি, শুনিতেছি শীঘ্রই আর দশটি টাকা পাইব। মাসিক ৫০্ টাকা নাকি একশ এম. এ. পাশের পক্ষে এখনকার দিনে যথেষ্ট। হায় মুরুব্বি! বেতনের ৫০্ টাকাই বাড়িতে দিই, একটা ছাত্র পড়াইয়া যে পনেরো টাকা পাই তাহাতেই কলিকাতার খরচ এবং মাসে একবার বাড়ি যাওয়ার খরচ কুলাইতে হয়। আমার সহপাঠী বিমলচন্দ্র দত্তের কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে প্রত্যহ সন্ধ্যার পর দুই ঘণ্টা ইংরেজি সাহিত্য পড়াই তাহারই পারিশ্রমিক মাসিক ১৫্ টাকা।

বিমলচন্দ্রের পিতামাতা আছেন, ছোট ভাই প্রেসিডেন্সি কলেজে ফার্স্ট আর্টস পড়ে, আমি তাহার ইংরেজি শিক্ষক। বিমলদের অবস্থা ভাল; বিমল এইবার বি. এল. পরীক্ষা দিয়েছে, উদ্দেশ্য উকিল ও অ্যাটর্নি দুইই হইবে। কলিকাতার অনেক লোকের সহিত তাহাদেব আত্মীয়তা আছে, পাশ করিতে পারিলে পসার হইবার বিশেষ সম্ভাবনা।

বিমলদের পরিবারের মধ্যে কেহ কখন বিলাত যান নাই বা সমুদ্র লঙ্ঘন করেন নাই, কিন্তু বিমলের পিতামাতা আঠারো খানা সাহেব; বিলাত প্রত্যাগত বাবুরাও বোধ হয় মিঃ দত্তের সহিত সাহেবিয়ানায় পারিয়া উঠেন না। বাড়ীতে সব সাহেবি কায়দা; ব্রাহ্মণের পরিবর্তে বাবুর্চি খানসামার পরিবর্তে বেয়ারা, ঝিয়ের পরিবর্তে আয়া, 'হরে', 'রামা' প্রভৃতি স্মৃতি-মধুর সম্বোধনে ভৃত্যকে কেহ এ বাড়ীতে ডাকিতে পারে না, ভৃত্যকে ডাকিতে হইলে হয় ডাকিতে হয় 'ব্যারা', আর না হয় ডাকিতে হয় 'বয়'। মিঃ দত্তের সহিত কেহ সাক্ষাৎ করিতে আসিলে 'সাহেবকো সেলাম দাও' বলিতে হয়, দত্ত মহাশয় বলিবার যো নাই। বিমলের কনিষ্ঠা ভগিনী যোড়শ বর্ষীয়া শ্রীমতী বেলা সুন্দরীকে অন্যেরা দিদিমণি বলিয়া ডাকিতে পারে না, 'মিসিবাবা' ডাকতে হয়। ইত্যাদি, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এ হেন মিঃ দত্তের বাড়িতে আমি প্রাইভেট টিউটর। পনেরো টাকা বেতন পাইলে কি হয়, সাহেব বাড়িতে পড়াইতে যাইতে হয়, সুতরাং পোশাকের প্রতি অবস্থার অতিরিক্ত দৃষ্টি রাখিতে হইতেছে। খরচা পোষায় না, কিন্তু কি করি বল।

প্রতিদিন সন্ধ্যার পর মাস্টার দত্তকে পড়াইতে যাই। প্রথম প্রথম কয়েক দিন বেশ গেল, পড়িবার ঘরে কোন গণ্ডগোল নাই; ছেলেটাকে পড়াই, পড়া শেষ হইলে বাসায় চলিয়া যাই; কিন্তু ক্রমে আর একটি উপসর্গ আসিয়া জুটিলেন,— ইনি ভৃত্যদিগের মিসিবাবা কুমারী বেলা। ইনি কয়েক বৎসর বেথুন স্কুলে পড়িয়াছেন কোন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'ন নাই; প্রবেশিকার শ্রেণি হইতেই বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। এখন নাকি বাড়ীতে বসিয়া পড়েন, গান-বাজনা শিখেন, ছবি আঁকেন।

আর কি করেন তার খোঁজ ১৫ টাকা বেতনের প্রাইভেট টিউটর কেমন করিয়া জানিবেন।

এই কুমারী বেলা ক্রমে ক্রমে আমার 'ফাউছাত্রী' হইলেন; মাস্টার দত্তকে পড়াই, তাহার 'ফাউ' রূপ মিস দত্তকে আজ এ কবিতা অর্থ বলিয়া দিই, কাল ও কবিতার Parrallel Passage বলিয়া দিই, পরশু শেলির কাব্যের সমালোচনা করি। কর্ম ভোগ মন্দ নহে। এই ভাবেই দিন যায়। মিস বেলা নাকি মাস্টার মহাশয়কে খুব like করেন। আমার সৌভাগ্য!

ইতিমধ্যে একদিন বিমল আমাদের পড়িবার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল; তখন আমার ছাত্র অমল ও ছাত্রী মিস বেলা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বিমল আসিয়াই বলিলেন, 'ভাই হরিদাস, আজ আর পড়ান কাজ নাই; তুমি আমার সঙ্গে এসো, একটা দরকার আছে।" আমি দ্বিরুক্তি না করিয়া পাঠগৃহ ত্যাগ করিলাম। মনে করিয়াছিলাম, বোধ হয় বিমলের বৈঠকখানায় বসিতে হইবে; কিন্তু সে আমার হাত ধরিয়া একেবারে রাস্তায় ফুটপাথে উপস্থিত হইল। সম্মুখেই গাড়ি সজ্জিত ছিল, আমাকে তাহাতে লইয়া উঠিয়া কোচম্যানকে বলিল, "যাও ময়দান।"

ব্যাপার কি, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। গাড়িতে বসিয়াও বিমল একটি কথাও বলিলনা, কি যেন চিন্তা করিতে লাগিল। আমি দেখিলাম, এত বড় বিপদ ; দুইটি মানুষ গাড়ির মধ্যে বসিয়া আছি, কথাবার্তা কিছু নাই। এমন করিয়া কি থাকা যায়? আমি আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম না, জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার মতলবটা কি বল দেখি?" বিমল বলিল, "মতলব আর কি! একটু বেড়াইবার সখ হইল; একেলা বাহির হইতে ইচ্ছা হইল না, তাই তোমাকে পাকড়াও করিলাম।" আমি বলিলাম "বেশ"। আবার কথা বন্ধ হইল।

গাড়ি এসপ্ল্যানেড জংসনে উপস্থিত হইলে বিমল বলিল "রোসো", গাড়ি থামিল, আমরা নামিয়া কার্জন পার্কে বেড়াইতে গেলাম। পার্কের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই বিমল বলিল, "এস, এই পার্কের ঘাসের উপর হাত-পা ছড়াইয়া বসা যাক্।" বড় মানুষের খেয়াল, তাহাই হইল। আবার চুপ। কিন্তু বিমলের ভাব দেখিয়া বোধ হইল সে যেন আমাকে কিছু বলিবে, কিন্তু কেমন করিয়া কথা আরম্ভ করিবে তাহাই ভাবিয়া পাইতেছেনা।

আমি তাহার ভাব বুঝিয়াই জিজ্ঞাসা করিলাম, "বিমল, তোমার কি কোন কথা আছে।" বিমল একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "হ্যাঁ, ভাই, তোমার সঙ্গে একটা বিশেষ কথা আছে; সেই জন্যই তোমাকে এই নির্জন স্থানে ডাকিয়া আনিয়াছি, কিন্তু কথাটা যে কেমন করিয়া আরম্ভ করিব ভাবিয়া পাইতেছিনা।" আমি বলিলাম, "তাহা বেশ বুঝিয়াছি; এখন কথাটা কি বলিয়া ফেলত।"

তখন বিমল বলিল, "দেখ ভাই, আমার ছোট বোন বেলার বিবাহের বয়স হইয়াছে; সমাজের কড়াক্কড় থাকিলে অনেক আগেই তাহার বিবাহ দিতে হইত; তবে জান কি, আজকাল কলিকাতা শহরে ও সব জঞ্জাল বড় একটা নাই। তাই আমরা বেলারও এতদিন বিবাহ দিই নাই। আর তুমি ত দেখেছ, তা'কে লেখাপড়া শোখাবার জন্য আমরা যত্ন চেষ্টা অর্থব্যয়ের ত্রুটি করি নাই। আজকালকার শিক্ষিত ছেলেরা যা চায়, বেলাকে তেমন ভ:বেই আমরা শিক্ষা দিয়াছি। সে লেখাপড়াও বেশ জানে, গান বাজনা জানে, নানারকম শিল্পকার্যও শিখিয়াছে; এদিকে বেশ নরম সরম—"

আমি তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিলাম, "তোমার ভগিনীকে আমি প্রত্যহই দেখিতেছি, তাহার রূপগুণের বর্ণনা আমার নিকট করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। এখন আমাকে কি করিতে হইবে, তাই বল। একটা ভাল ছেলের সন্ধান করিতে বলিতেছ কি? কিন্তু সে ভারটা আমার উপর না দিয়া অন্য কোন যোগ্যতর ব্যক্তির উপর দিলে ভাল হয়না? আমি ভাই পাড়াগেঁয়ে লোক, তোমাদের কলিকাতার শিক্ষিত সমাজের রুচির আমি মোটেই জানিনা; সুতরাং ঘটকালির ভারটা আর কাহারও উপর দিলে ভাল হয়না? বিমল বলিল, "আরে তোমাকে ঘটকালি করিতে কে বলিতেছে। আমরা ঘটকী ডাকিয়া বিবাহেব সম্বন্ধ করিবনা। বর আমি স্থির করিয়াছি, এখন তোমার মত সাপেক্ষ।" আমি বলিলাম, "আমার মত; আমি তোমাদের বাড়ির শিক্ষক মাত্র, তোমরা ভগিনীর বিবাহ দিবে, তাতে আমার মতের প্রয়োজন কি, আর তার মূল্যই বা কি?"

আমার কথা শেষ হইতে না হইতেই বিমল বলিল, "এই দেখ, আমাব কথাগুলি আগে শোনো, তারপর মতের কথা তুলিও। বাবার ও মায়ের ইচ্ছা যে তোমার সঙ্গে বেলার বিবাহ—।"

"আমি। আমার সঙ্গে বল কি? তোমর৷ কি পাগল হোয়েছ, না আমাকেই তোমবা পাগল পেয়েছ। আমার সঙ্গে,—ভাই বিমল, ঠাট্টা করবার লোক বুঝি আর দুনিয়ায় খুঁজিয়া পাইলে না।"

বিমল। "এই দেখ, আমার কথাটাই শেষ কোরতে দাও। বাবা ও মায়ের ইচ্ছা যে, তুমি বেলাকে বিয়ে করে বিলাতে যাও, সেখান থেকে ব্যারিস্টার হয়ে এস। তারপর আরও এক কথা বেলার এতে খুব মত আছে; সে এক রকম কথাটা প্রকাশই কোবেছে। দেখ, এতে তোমার অমত হবার কোন কারণ নাই; এদেশে থেকে কোন দিনও উন্নতি হবে না। তার চাইতে বিলাত থেকে ব্যাবিস্টার হোয়ে এলে তোমার নিশ্চয়ই পসার হবে; ততদিনে আমিও একটা এটর্নির অফিস খুলে বসবো। আর জানত, কলিকাতায় আমাদের অনেক বড় মানুষ বন্ধু-বান্ধব আছে, পসার হোতে দেরি হবে না। বাবার নিতান্ত ইচ্ছা, মায়ের ইচ্ছা, বেলারও মত আছে, এখন তুমি মত করলেই আমরা সব ঠিকঠাক করে ফেলি। বল, তোমার কি মত!"

আমি ত একেবারে অবাক। এ ছোঁড়াটা বলে কি! আমার সঙ্গে বেলার বিবাহ। দোহাই ধর্মেব । এমন কথা আমি কোন দিন স্বপ্নেও ভাবি নাই, এমন কল্পনাও আমার মনে স্থান পাব নাই। আমি ৫০ টাকা বেতনের স্কুল মাস্টার, পনেরো টাকা উপরি লাভের লোভে মিঃ দত্তের বাড়ী প্রাইভেট টিউটারী করি; আমি কিনা মিঃ দত্তের মেয়েকে বিবাহ করিব। আর সে মেয়েও যে সে মেয়ে নয়, মিস বেলা চাকরের "মিসিবাবা"। এমন কর্ম আমার দ্বারা হইবে না, আমি রামচন্দ্রপুরের হরিদাস মিত্র, এমন কর্ম কখনও করিতে পারিবনা।

আমাকে নীরব দেখিয়া বিমল বলিল, "কি বল, কথা বোলছনা যে! দেখ বেলা তোমাকে ভালোবাসিয়া ফেলিয়াছে, আমরা তার এবং তোমার মঙ্গলের জন্যই এই প্রস্তাব করিতেছি। তা বেশ, আজই তোমার উত্তর চাইনা, আগামী কল্য তুমি উত্তর দিও। এখন ওঠো, পশ্চিম দিকে বড় মেঘ করিয়াছে হয়ত জল হইবে। তোমাকে তোমার বাসায় নামিয়ে দিয়ে আমি বাড়ি যাবো, ওঠো।"

গাড়িতে আর কোন কথা হইল না: বিমল আমাকে মির্জাপুরের মেসের দ্বারে নামাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। আমি মিঃ দত্তের ভবিষ্যৎ জামাতা, হাইকোর্টের সুদূর ভবিষ্যতের ব্যারিস্টার মেসের ডাল চচ্চড়ি আহার করিয়া আমার সেই সনাতন কেওড়া কাঠের তক্তাপোশে অঙ্গ ঢালিয়া দিলাম। এইবার চিন্তার পালা। মিথ্যা কথা বলিব না, বিমলের প্রস্তাবে যে একটু গৌরব অনুভব করি নাই, তাহা নহে। আমার বয়স ২৩ বৎসর, এম. এ. পাশ করিয়াই ক্ষীণদৃষ্টির জন্য চশমাও লইয়াছি, চেহারাও নিতান্ত পাড়াগেঁয়ে মত নহে; সুতরাং আমি যে একটা মেয়ের নিকট "লভের" পাত্র, একথা অস্বীকার করি কেমন করিয়া। কিন্তু তারপরেই অন্ধকার! সেই অন্ধকার দূর করিবার জন্যই বিমলের প্রস্তাব যে আমি সাগর লঙ্ঘন করিয়া ব্যারিস্টার হইয়া আসি। হয়ত শ্রীমতী বেলা ও আমার ভবিষ্যৎ ব্যারিস্টার মূর্তি কল্পনা করিয়াই বিবাহ করিতে সম্মত হইয়াছে, নতুবা ৫০্ টাকা বেতনের স্কুল মাষ্টারের সঙ্গে মিস বেলার বিবাহ কি সম্ভব? বেশ কথা, মিস বেলাকে মিসেস মিত্র করিলাম, বিলাত হইতে ব্যারিস্টার হইয়াও আসিলাম; কিন্তু আমার মা, আমার মাসিমা, আমার বিধবা ভগিনী, আমার অবিবাহিতা ভগিনী! তাহাদিগকে বিসর্জন দিতে হইবে, এবং এই বিলাসে পরিবর্দ্ধিতা একটি মেয়েকে জীবন পথের সঙ্গিনী করিয়া কাটাইতে হইবে। সে কিছুতেই হইতে পারে না। আমি ভালবাসার ধার ধারিনা, ৫০্ টাকা বেতনের স্কুল মাষ্টারের হৃদয়ে কবিত্বের স্থান নাই। এই সাতটাকা মন চাউলের বাজারে যাহাকে প্রকাণ্ড একটা সংসার প্রতিপালন করিতে হয়, যাহার গলায় একটা অবিবাহিতা ভগিনী, একটি বিধবা ভগিনী ছেলেমেয়ে লইয়া, যাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে, যাহার ভদ্রাসন রেহেনে আবদ্ধ, সে চুরি করিতে পারে, ডাকাতি করিতে পারে কিন্তু সে "লভ" করিতে পারেনা; "লভের" শাস্ত্রে এ কথা লেখে না। মিস বেলা আমার নিকটে পড়িতে আসিত, আমি পড়া বলিয়া দিতাম। ব্যস, এইখানেই ছিল আমার কার্য শেষ। "লভ" করিবার অবকাশও আমার ছিল না, প্রবৃত্তিও আমার ছিল না, এখনও এই বিবাহের প্রস্তাব শুনিয়া হঠাৎ আমার প্রেমসিন্ধু উথলিয়া উঠিবারও কোন সম্ভাবনা দেখিতেছি না। অবশ্য আমি গরিব স্কুল মাস্টার, আমার সহস্র অভাব; কিন্তু সম্মুখে প্রকাণ্ড প্রলোভন; কিন্তু এসকল কিসের জন্য—আত্মসুখের জন্য কি এই কাজ করিব? আমার ভাবী শ্বশুরের প্রদত্ত মাসিক বৃত্তিতে আমার মাতা, মাসিমাতার ভরণপোষণ নির্বাহ হইবে। তাহার পর বিলাত হইতে ফিরিয়া আমি হয়ত বা মা-মাসির প্রতি কর্তব্যই ভুলিয়া যাইব; বিলাতের বাতাস যে বড় খারাপ, অনেকের মাথা বিগড়াইয়া যাইতে দেখিয়াছি।

তবে কি এই বিবাহে মত দিবনা? অনেক রাত্রি পর্যন্ত ভাবিলাম, কিন্তু কথাটার আর মীমাংসা হইল না; তাহার পর নিদ্রা।

প্রাতঃকালে উঠিয়া আমার আবার ঐ এক চিন্তা, আজ ত বিমলকে জবাব দিতে হইবে। শেষে যাহা স্থির করিলাম, তাহা বলিতেছি। স্থির করিলাম সেদিন আর পড়াইতে যাইব না; একখানি পত্রে সমস্ত কথা লিখিয়া বিমলের বাড়ির দ্বারবানের হস্তে দিয়া আসিব। তাহাই করিলাম। পত্রের একখানি নকল রাখিয়া দিলাম; নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

"ভাই বিমল, তোমার প্রস্তাবের প্রথমাংশ আমি স্বীকার করিতেছি, তোমার ভগিনীকে

বিবাহ করিতে আমি সম্মত আছি। কিন্তু আমি বিলাত যাইতে পারিব না, ব্যারিস্টারও হইব না। ইহাতে সম্মত আছ?

বর্তমান নিয়ম অনুসারে বিবাহে একটা দেনা-পাওনার ফর্দ হইয়া থাকে। আমার কোন অভিভাবক নাই, সুতরাং ফর্দটা আমিই দিতেছি। আমি এই বিবাহে কি কি চাই এবং কি কি চাইনা তাহার ফর্দ দিতেছি।

(১) একটি ভাল ছেলে দেখিয়া আমার অবিবাহিতা ভগিনীর বিবাহ দিতে হইবে; সমস্ত ব্যয়ভার তোমরা বহন করিবে।

(২) আমার পিতার প্রদত্ত সাতশত টাকার হ্যাণ্ডনোট খানি ফিরাইয়া লইতে হইবে, মায় সুদ সমস্ত টাকা তোমাদিগকে পরিশোধ করিতে হইবে।

(৩) আমার বাড়িখানি চোদ্দশত টাকার মর্টগেজ আছে, তাহা ছাড়াইয়া দিতে হইবে।

(৪) তোমাব ভগিনীকে কোন অলঙ্কার পত্র কি বহুমূল্য বস্ত্রাদি দিতে পারিবেনা, শাঁখা শাড়ি দিয়া মেয়ে সম্প্রদান করিবে।

(৫) আমাকে কোন প্রকার যৌতুক দিতে পাবিবে না। বরসজ্জা, ঘড়ি, চেন ইত্যাদি কিছুই আমি চাহিনা।

(৬) তোমাব ভগিনী সামান্য গৃহস্থ বধূর মত আমাব গৃহে গমন কবিবেন, এবং আমার পল্লিকুটিরে থাকিয়া আমার মাতা, মাসিমাতা, বিধবা-ভগিনীর সেবা কবিবেন।

(৭) তোমর ভগিনীকে তোমরা কোন পকেট মানি দিতে পারিবে না, ৫০্ টাকা বেতনের স্কুল মাস্টারের স্ত্রীর যাহা প্রয়োজন তাহা আমি দিতে পারিব।

এই আমার বিবাহের দেনা পাওনার ফর্দ। তুমি বলিয়াছিলে যে, তোমার ভগিনী আমাকে ভালোবাসিয়া ফেলিয়াছেন। সত্যসত্যই যদি তিনি আমাকে ভালোবাসিয়া থাকেন, তাহা হইলে সেই ভালোবাসার জন্য তিনি এই সামান্য ত্যাগস্বীকার অবশ্যই করিতে পারিবেন। আর যদি তিনি আমাকে ভালো না বাসিয়া ভবিষ্যতের মিঃ এইচ. মিত্র ব্যারিষ্টার এট-ল কে ভালোবাসিয়া থাকেন তাহা হইলে আমি নাচার আছি।

তারপর প্রথম যে তিনটা দফা লিখিয়াছি তাহা দেওয়া তোমাদের মত ধনীলোকের পক্ষে অতি সামান্য মাত্র।

আমর বক্তব্য আমি অসঙ্কোচে বলিলাম, এখন তোমরা কর্তব্য স্থির করিতে পার। ইতি

বিনীত, হরিদাস মিত্র।

আমার এই পত্র পাইয়া মিঃ দত্তের বাড়িতে কি হইয়াছিল, সে সংবাদ আমি পাই নাই, কিন্তু সেই দিন সন্ধ্যের সময় মিঃ দত্তের বাড়ি হইতে একজন বেহারা আসিয়া আমাকে সাতটি টাকা দিয়া বলিয়া গেল যে, পরদিন হইতে আমাকে আর পড়াইতে যাইতে হইবে না।

তাহার পব এই তিনমাস যায়। বিমলের ভগিনীর বিবাহ হইয়াছে কিনা জানিনা। আমি ২০্ টাকা বেতনের আর একটা প্রাইভেট টিউটারী পাইয়াছি, সে বাড়িতে বিলাতি চাল নাই, অবিবাহিতা মেয়েও নাই। আমার বেতনও দশ টাকা বড়িয়াছে।

—মানসী ১ম বর্ষ ১৩১৫-১৬, ৪র্থ সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ।

চিতার আগুন

আমার নাম গোরাচাঁদ দাস মিত্র, পিতার নাম ৺ফকিরচাঁদ মিত্র, পিতামহের নাম দয়ালচাঁদ মিত্র।

তোমারা যে একেবারে হেসেই অস্থির ! ব্যাপারটা কি, বল দেখি? নামগুলি তোমাদের পছন্দসহি হইতেছে না,—কেমন? তা কি করবো বল! তোমাদের কাছে গল্প বলতে হবে বোলে ত আর বাপের নামটা একটা নবেলী রকম করতে পারিনা। ফকিরচাঁদ, দয়ালচাঁদ নাম যদি তোমাদের মনের মত না হয়, তা হোলে যাদের বাপের নাম প্রাণবল্লভ, পিতামহের নাম জ্যোৎস্নাকুমার, তাদের কাছে গল্প শুনিতে যাও, আমার গল্প তোমাদের মত লোকের মনের মত হইবে না।

কি বোল্‌ছো—'দাস মিত্র' কথাটায় তোমাদের আপত্তি? তা তোমরা 'বর্ম্মণ মিত্র', শর্ম্মণ মিত্র যা ইচ্ছা তাই বলিতে পার আমি কিন্তু 'দাস মিত্র'ই বলিব। 'দাস' বোলে আত্মপরিচয় দিতে যার আপত্তি, সে ইংরাজের মুল্লুক ত্যাগ করে আর কোথাও যাইতে পারে,—আমি দাসত্বের মায়া কাটাইতে পারিবনা, তা তোমরা আমার গল্প শোন আর নাই শোন।

নাম জিজ্ঞাসা করিলে পিতৃপিতামহের পরিচয় দিতে হয়। তোমাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে এতকাল পরে আমি কিছুতেই জি. মিটার' বোলে আত্মপরিচয় দিতে পারিব না।

গল্প বোলবো কি, নাম বলিয়াই তো তিন নম্বর কৈফিয়ত দিলাম। এমনই কোরে প্রতি কথায় যদি তোমরা জেরা আরম্ভ কর, তাহা হইলে আমাকে এই স্থানেই বিদায় গ্রহণ করিতে হইবে। তোমরা হয়ত মনে করিয়াছ যে, আমি যখন বর্তমান নিয়মের বশবর্তী হইয়া গল্পারম্ভেই চাঁদের জোছনা, মলয় সমীর, ফুলের সুবাস, লতা-কুঞ্জ প্রভৃতি কিছুরই আমদানি করি নাই, তখন আমার গল্প একবারেই কিছুনা, কিন্তু হে সমজদার পাঠক, সকল জিনিসেরই সময় অসময় পাত্রাপাত্র ভেদ আছে, এ বয়সে 'কাব্যি' করা আমার মত গোরাচাঁদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব।

যাক্, ওসব বাজে কথা। গল্পটাই আরম্ভ করি। আমার নাম গোরাচাঁদ শুনিয়া তোমরা যদি মনে করিয়া থাক যে, আমি কোন জমিদারের নায়েব বা তহশিলদার, অথবা কোন বড় মানুষের বাজার সরকার, তাহা হইলে তোমাদের ভ্রম হইয়াছে। আমার পিতার নাম ফকিরচাঁদ হইলেও তিনি সত্যসত্যই ফকির ছিলেন না। কোন দিন তাঁহাকে চাকুরির উমেদারি করিতে হয় নাই, পূর্বাহ্ন সাড়ে নয়টার সময় তাড়াতাড়ি অন্ন উদরস্থ করিয়া তাঁহাকে ঊর্ধ্বশ্বাসে অফিসে হাজিরা দিতে যাইতে হয় নাই। আমাদের গোলাভরা ধান আছে, পুকুর ভরা মাছ আছে, দালানে নারায়ণ আছেন, আর বাড়ির অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপা আমার পিসিমা আছেন—তোমাদের দশজনের আশীর্বাদে আমাকেও চাকুরি করিয়া খাইতে হয় না।

আমিও যৎকিঞ্চিৎ লেখাপড়া শিখিয়াছি। তোমাদের ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের দেড় হাত লম্বা ও তিন-পো হাত প্রশস্ত প্রশংসাপত্র আমারও খান দুয়েক আছে। আমিও এককালে মির্জাপুর

ষ্ট্রীটের মেসে থাকিয়া তোমাদেরই প্রেসিডেন্সি কলেজে যাতায়াত করিতাম। তবে দিব্য করিয়া বলিতে পারি যে, তোমাদের গোলদিঘিতে বসিয়া চাঁদের জোছনা পান করা, বা তোমাদের কাহারও কাহারও মত বিরহে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করা, —ওসব গ্রহের ফেরে আমাকে পড়িতে হয় নাই, তাই এখন তোমরা দেখিতেছ যে, আমি একেবারে খাঁটি গোরাচাঁদ দাস মিত্র। নির্বিকার চিত্তে বাড়িতে বসিয়া থাকি, প্রজার নিকট হইতে ধান আদায় করি, খাজনা ওয়াশিল করি, ছোটখাট বিবাদের নিষ্পত্তি করি, বাগানে তরিতরকারি জন্মাই, গ্রামের লোককে হোমিওপ্যাথি ঔষধ বিতরণ করি; আর কি করি—তাহা আমি বলিবনা, শেষে তোমরা সংবাদপত্রে সেই সকল কথা লইয়া অন্দোলন কর, আর আমার এই নিভৃত পল্লি-নিবাস অশান্তির আবাসস্থল হউক।

আমার বয়স ৩২ বৎসর ৮ মাস। বাড়িতে কে কে আছেন, তাহার পরিচয় দিতে হইতেছে। প্রথমেই আছেন, গৃহদেবতা নাবায়ণ বিগ্রহ; তাহার পরে আছেন—গোশালায় ১৩টি গোদেবতা, তাহার পর আছেন—নরদেবতা আমার পিতামহের আমলে বৃদ্ধ ভৃত্য—আমার শ্যামা কাকা, আর আছেন—আমার পিসিমা। আমার একটি ছোট ভগিনী আছেন; তিনি বৎসরের আটমাস আমার ভগিনীপতির বাড়িতে থাকেন, চারি মাস আমাদের বাড়িতে থাকেন। আমাদের বাড়িতে আর কেহ নাই।

নবেলের উপকরণের সম্পূর্ণ অভাব দেখিয়া বোধ হয তোমারা নিরাশ হইতেছ; স্ত্রী নাই, অন্ততপক্ষে সেই রকম একটা কিছুর সম্ভাবনাও দেখিতে না পাইয়া তোমরা নিরাশ হইওনা। আমি বিবাহ করি নাই, করিবার ইচ্ছাও নাই, বয়সও নাই। এখন বিবাহের ব্যবস্থা করিলেও তাহার মধ্যে রোমান্সের কোন সম্ভাবনাই থাকিবেনা; সুতরাং সে কার্যে অগ্রসর হইবার প্রয়োজনাভাব।

কিন্তু আমি গোরাচাঁদ মিত্র এম্ এ.—চিরকুমার থাকিব বলিয়া পাঠ্যাবস্থায় কোন প্রতিজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষর করি নাই, এবং সেই প্রতিজ্ঞা রাখার জন্যও এতদিন কুমার জীবন যাপন করিতেছিনা। আমার জীবনেও একদিন বিবাহের ফুল ফুটিয়াছিল; একদিন কেবল এক দিনের জন্য প্রজাপ্‌তি আমার দিকে মুখ তুলিয়া চাহিয়া ছিলেন;—তাহার পরেই চিতা সজ্জা। সেই চিতার অগ্নি এখনও আমার সম্মুখে প্রজ্জ্বলিত রহিয়াছে—আমি এখন সেই অগ্নিব উপাসক। সেই কথা বলিবার জন্য এতক্ষণ বৃথা বাক্যব্যয় করিলাম।

আমি যখন এম. এ. পাশ করি, তখন আমার বয়স ২২ বৎসর; সে আজ ১৩ বৎসরের কথা; তখন আমার পিতৃদেব জীবিত ছিলেন; মাতা ঠাকুরাণি তাহার অনেক পূর্বেই স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন।

এম. এ. পাশের অনেক পূর্ব হইতেই আমার বিবাহ সম্বন্ধ হইতেছিল; কিন্তু পরীক্ষা শেষ না হইলে বিবাহ করিব না, এই কথা পিসিমাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেওয়ায়, তিনি কিছুদিন অপেক্ষা করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। পিসিমার কথার উপর আর কাহারও কথা চলে না; সুতরাং বাবাও নিরস্ত হইয়াছিলেন।

পাশের সংবাদ বাহির হইলেই বিবাহের আয়োজন হইতে লাগিল; আমার তাহাতে

কিছুমাত্র আপত্তি ছিল না। বিশেষত পিসিমা যখন তাঁহার ননদের মেয়ের সঙ্গে আমার বিবাহের সম্বন্ধ করিতেছেন, তখন কাহার সাধ্য যে, তাহার উপর কথা বলে? মেয়েটি সুন্দরী; তাহার পিতার অবস্থা ভাল; তাহারা কুটুম্ব ও তাহাদের বাড়িও আমাদের বাড়ি হইতে দূরে নহে। এতগুলি শুভসংযোগের বিরুদ্ধে বলিবার কোন কথাও ছিলনা।

কথাবার্তা স্থির হইয়া গেল; ১৭ই বৈশাখ বিবাহের দিন স্থির হইল। দুই বাড়িতেই আনন্দ কোলাহল পড়িয়া গেল; বিবাহেব আয়োজন হইতে লাগিল। যথাসময়ে গাত্রহরিদ্রা হইয়া গেল। অন্য দিনের মত ১৭ই বৈশাখ বুধবারও আসিল। অপরাহ্ন কালে বাদ্যভাণ্ড করিয়া আমরা যাত্রা করিলাম; আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব যিনি যেখানে ছিলেন, সকলে এই শুভ কার্যে যোগদান করিলেন।

আমাদের গ্রাম হইতে শেখরনগর তিন মাইল পথ। আমরা দুই ঘণ্টার মধ্যেই শেখরনগরে পৌঁছিলাম। সেদিন পূর্ণিমা। আমরা সন্ধ্যাব সময় যখন গ্রামপ্রান্তে উপস্থিত হইলাম, তখন একটা প্রকাণ্ড বাগানের পার্শ্ব হইতে পূর্ণিমার চাঁদ উঠিতেছিল; আকাশে মেঘ নাই, চারদিক সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ।

আমাদের শোভাযাত্রা ধীরে ধীরে গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিল। আমরা গ্রামের বড়বড় রাস্তা ঘুরিয়া বসুদিনের প্রকাণ্ড বাড়িতে উপস্থিত হইলাম। বরপক্ষীয়দিগের অভ্যর্থনার জন্য বসু মহাশয়েবা বিশেষ আয়োজন করিযাছিলেন। আমি বরের আসনে উপবিষ্ট হইলাম।

এমন সময় বাড়ির মধ্য হইতে একজন দৌড়াইয়া আসিয়া বলিল,—"রামা দৌড়ে যা ডাক্তারবাবুকে আসতে বল।"

উপস্থিত সকলে বজ্রাহতবৎ হইলেন। কাহারাও মুখে কথা নাই;—কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেছেনা। বাড়ির লোকেরা একবার ভিতরে —একবার বাহিরে আসিতেছেন। শেষে জানিতে পারা গেল যে, যাহার সহিত আমার বিবাহ হইবার কথা, তাহার ওলাওঠা হইয়াছে। অপরাহ্নে মেয়েটির দুই-তিনবার দাস্ত হইয়াছিল, কিন্তু সেদিকে আর কাহারও দৃষ্টি পড়ে নাই,—কেহ তত মনোযোগও করেন নাই। আমরা যখন বাড়িতে উপস্থিত হইলাম তখন মেয়েটির আর একবার দাস্ত হইল; সে আর চলিতে পারিলনা। তখন সকলে ধরাধরি করিয়া তাহাকে বিছানায় শয়ন করাইল; তখন ডাক্তারের বাড়িতে লোক ছুটিল।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ডাক্তার আসিলেন; তিনি রোগিনীর অবস্থা দেখিয়া বলিলেন, আর আশা নাই—'এশিয়াটিক কলেরা'! বাইরে এই সংবাদ প্রচাবিত হইতে বিলম্ব হইল না। প্রতিবেশী রামরতন মজুমদার মহাশয় তখন আমাদিগকে তাঁহার বাড়িতে গমন করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। আমি বরের আসন ত্যাগ করিয়া মজুমদার বাড়িতে গমন করিলাম; বরযাত্রগণ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িলেন। তখন সকলের মুখেই বিপদের ছায়া অঙ্কিত ছিল।

আমি বরবেশ ত্যাগ করিলাম। বিবাহ করিতে আসিয়া এমনভাবে ফিরিয়া যাইতে হইবে ভাবিয়া একটু কাতরও হইলাম; কিন্তু উপায় নাই। মজুমদারদিগের বৈঠকখানার ঘরের সম্মুখেই পথ। আমি একাকী সেই পথে বেড়াইতে লাগিলাম।

একটু পরেই বসুদিগের বাড়িতে কান্নার রোল উঠিল। বুঝিলাম সকল শেষ হইয়া গেল।

আমাদের দলের অনেকেই তখন চলিয়া গেলেন; বাবা আমাকেও বাড়ি যাইতে বলিলেন। কিন্তু সমস্তদিন অনাহারে থাকিয়া আমার শরীর এমন অবসন্ন হইয়াছিল এবং এই ব্যাপারে আমি এমন কাতর হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, সে রাত্রিতে বাড়ি ফিরিয়া যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব হইল। বাবা তখন বলিলেন, "আজ তুমি এখানেই থাক; কাল সকালে পাল্‌কি পাঠাইয়া দিব; তোমাকে লইয়া যাইবে।

বৈঠকখানার পার্শ্বের ঘরেই আমার জন্য শয্যার ব্যবস্থা হইল। কোথায় বরের শয্যা—না এই বিপদ! আমার কিছুতেই নিদ্রা হইল না; আমি বিছানায় শয়ন করিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিলাম।

রাত্রি তখন এগারটা, তখন পল্লি কম্পিত করিয়া ভীষণ শব্দ হইল—"বল হরি, হরিবোল।"

আমি আর বিছানায় থাকিতে পারিলাম না। ধীরে ধীরে বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলাম, সম্মুখেই পথ। একটু পরেই আবার শব্দ হইল "বল হরি হরিবোল।" তাহার পরেই দেখিলাম, বরসজ্জার জন্য যে খাট আনীত হইয়াছিল, সেই খাট কয়েকজন লোকে বাহির লইয়া যাইতেছে। যেমন খাট তেমনই আছে যেমন বিছানা তেমনই আছে। যে খাট দুইদিন পরে ফুলশয্যাব জন্য ব্যবহৃত হইত, সে খাটে আজ শ্মশান-শয্যা বিস্তৃত হইয়াছে। আমার সম্মুখ দিয়া শ্মশান-যাত্রীরা চলিয়া গেলেন। আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। যাহাকে জীবনযাত্রীর সঙ্গিনী করিবার জন্য আমি গিয়াছিলাম। সে আমাকে ফেলিয়া আগেই মহাযাত্রা করিল,—এই কথা ভাবিয়া আমার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। আমিও ধীরে ধীরে শ্মশান-যাত্রী দিগের সঙ্গী হইলাম। পায়ে জুতা নাই, গায়ে জামা নাই, তাহার সঙ্গে চলিলাম। আমাকে এ অবস্থায় তাহাদের অনুগমন করিতে দেখিয়া দুইচারি জন সরিয়া দাঁড়াইল। আমি নীরবে তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিলাম; মধ্যে মধ্যে পূর্ণিমা রজনীর নীরবতা ভঙ্গ করিয়া শব্দ হইতে লাগিল, "বল হরি হরিবোল"। গ্রামের অদূরেই নদী। নদীতীরে সকলে সমাগত হইলেন। খাটখানি নামাইয়া রাখা হইল। আমি একটু দূরে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

এমন সময় আমার যিনি শ্বশুর হইতে চাহিয়াছিলেন, তিনি আমার নিকটে আসিলেন এবং আমার হাত ধরিয়া বলিলেন,—"এস বাবা, একবার দেখে যাও, একবার—" ভদ্রলোক আর কথা বলিতে পারিলেন না, চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। আমার তখন গলা শুকাইয়া গিযাছিল, আমার শরীর তখন কাঁপিতেছিল।

বসু মহাশয় আমার হাত ধরিয়া খাটের পার্শ্বে লইয়া গেলেন। বহুমূল্য মুশারির একপ্রান্ত তুলিয়া ধরিলেন। আমি জন্মের শোধ একবার সেই মুখখানি দেখিয়া লইলাম। এখনও চন্দনের রেখা সেই সুন্দর ললাটে রহিয়াছে, এখনও মুখে হাসি;—নববধূরবেশে কিশোরী কোথায় চলিয়া যাইতেছে। একবার মাত্র দেখিয়াছিলাম; তাহার পর চিৎকার করিয়া মূৰ্চ্ছিত হইয়াছিলাম।

সে আজ তের বৎসরের কথা—কিন্তু এখনও আমার সমস্তই মনে পড়িতেছে চিতার অগ্নি প্রজ্বলিত হইল; কিশোরীর পিতাই মুখাগ্নি করিলেন,—আমি ত আর কেহ নহি।

তাহার পর এই তের বৎসর যাইতেছে, তোমরা শুনিলে বিশ্বাস করিবেনা—প্রতি পূর্ণিমার রাত্রিতে আমি ঐ দৃশ্য দেখিতে পাই। অন্যদিন কত চিন্তা করিয়াও মনে আনিতে পারিনা; কিন্তু প্রতি পূর্ণিমার রাত্রিতে আমি দেখিতে পাই,—আমি সেই সুসজ্জিত খাটের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছি; আবার একটু পরেই দেখিতে পাই—হু হু করিয়া চিতা জ্বলিতেছে; আর যেন চিতার উপর একটি নববধূ গলায় ফুলের মালা পরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এক পূর্ণিমা—দুই পূর্ণিমা নহে। তের বৎসর ধরিয়া আমি প্রতি পূর্ণিমা রজনীতে এই দৃশ্য দেখিয়া আসিতেছি। প্রতি পূর্ণিমায় যাহার সম্মুখে এই চিতা জ্বলিয়া উঠে, সে কি আর বিবাহ করিতে পারে?

সেই দিনের পর হইতেই আমি একেবারে পল্লিবাসী হইয়াছি,—সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা ছাড়িয়া দিয়াছি। আবার কবে এক পূর্ণিমা আসিবে, যে দিন আমি অমন করিয়া চলিয়া যাইব!

–মানসী ১ম বর্ষ ১৩১৫-১৬, ১ম সংখ্যা ফাল্গুন।

রাধারাণীর ইচ্ছা

বুড়া হরিশ মণ্ডল যখন বাড়ি, ঘর জমিজিরাত, দেনাপাওনা কিছুই বুঝাইয়া না দিয়া, কাহাকেও কিছু না বলিয়া হঠাৎ একদিন সদিগর্মি রোগে দুই ঘণ্টার মধ্যে কোন এক অজানা দেশে চলিয়া গেল, তখন তাহার দুই পুত্র অদ্বৈত ও মহেশ বড়ই বিপদে পড়িল। পিতার মৃত্যুর সময়ে দুই পুত্রের একটিও বাড়িতে ছিল না। তাহারা কি জানিত যে তাহাদের পিতা—বদনগঞ্জের পঞ্চায়েত—সত্যসত্যই এমন তাড়াতাড়ি চলিয়া যাইবে। রোগ নাই, ব্যাধি নাই. ভাল মানুষ. প্রাতঃকালে পাওনা টাকার তাগাদা করিতে গ্রামান্তরে গিয়াছিল; চৈত্র মাসের রৌদ্রে বুড়ার একটু কষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু আজ ৪৫ বৎসর সে এইপ্রকার রৌদ্রবৃষ্টি সহ্য করিয়াছে, কোন দিন সামান্য একটু অসুখও বোধ করে নাই। পনেরো বৎসর বয়সের সময় একটা দরিদ্র গৃহস্থালির ভার মাথায় লইয়া এই ৪৫ বৎসরের মধ্যে ধীরে ধীরে সে অর্থসঞ্চয় করিয়াছে, জমিজিরাত করিয়াছে, মানসম্ভ্রম অধিকার করিয়াছে, গ্রামের মণ্ডল হইয়াছে, এমন কি সরকার বাহাদুর তাহাকেই বদনগঞ্জের পঞ্চায়েত নিযুক্ত করিয়াছেন। এমন স্বনামধন্য, কষ্টসহিষ্ণু হরিশ মণ্ডল যে বেলা এগারটার সময়ে চৈত্র মাসের রৌদ্র সহ্য করিতে পারিবে না, এ কথা কে বিশ্বাস করিতে পারে? কিন্তু লোকে বিশ্বাস না করিলে কি হইবে, সত্যসত্যই গ্রামের প্রান্তভাগে আসিয়া হরিশের শরীরটা কেমন করিতে লাগিল। ষাট বৎসরের বুড়া হরিশ তখন নিকটবর্তী একটা গাছের তলায় বসিল। গ্রামের শ্রীরাম পোদ্দার সেই পথ দিয়া যাইতেছিল, সে হরিশকে অমনভাবে গাছে হেলান দিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি মণ্ডলের পো, এমন সময় এখানে ব'সে যে?" মণ্ডলের-পোর তখন কথা বলিবার শক্তি নাই, তবে জ্ঞান আছে। সে হাত নাড়িয়া শ্রীরামকে ডাকিল এবং হাত নাড়িয়াই বুঝাইয়া দিল যে, তাহার শরীর কেমন করিতেছে, কথা কহিবার শক্তি নাই, চলিবার শক্তি নাই। শ্রীরাম তখন গ্রামের মধ্যে দৌড়িল এবং যাহাকে পাইল তাহাকেই মণ্ডলের-পোর কথা বলিল। গ্রামের লোক সকলেই নানা কারণে হরিশের বাধ্য ছিল; যে সংবাদ পাইল সেই দৌড়িয়া গাছতলায় গেল। যাহারা আগে গিয়াছিল, তাহারা মণ্ডলের-পোর জ্ঞান-সঞ্চারের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু সকলই বৃথা হইল। তাহার স্ত্রী ও অন্যান্য সকলে যখন সেই গাছতলায় আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন সব শেষ হইয়া গিয়াছে।

যথাসময়ে হরিশ মণ্ডলের শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইয়া গেল। তাহার পর বিষয়কর্ম কেমন করিয়া চলিবে, দুই ভাই অদ্বৈত ও মহেশ তাহারই পরামর্শ করিতে বসিল। অদ্বৈত কিছু লেখাপড়া শিখিয়াছিল, কিন্তু মহেশ পাঠশালায় দুই চারি দিন গিয়াছিল। তাহাদের পিতা হরিশ মণ্ডল খুব রাশভারি লোক ছিল। বাড়ির সকলে তাহাকে ভয় করিত। হরিশ মণ্ডল অনেক চেষ্টা করিয়াও বড় ছেলে অদ্বৈতকে বিষয়কার্যে নিযুক্ত করিতে পারে নাই। অদ্বৈত কাজকর্মের দিকে ঘেঁসিত না, সে দিনরাত্রি ধর্মকর্ম লইয়াই থাকিত; চৈতন্যচরিতামৃত, ভাগবত, মহাভারত পাঠ, সন্ধ্যার সময় গ্রামের মহাপ্রভুর আখড়ায় যাইয়া অধিক রাত্রি পর্যন্ত সংকীর্তন ও দীন দুঃখীর সেবা,

এই সকলই তাহার কাজ ছিল। বড় ছেলের এই ভাব দেখিয়া বুড়া মণ্ডল তাহার আশা ছাড়িয়া দিয়াছিল। ছোট ছেলে মহেশ অতি সামান্য কিতাবতী* লেখাপড়া শিখিলেও খুব চালাক চতুর ছিল; কাজকর্ম তাহার বেশ মন ছিল ; সে পিতার যথেষ্ট সাহায্য করিত।

অদ্বৈতের বয়স ৩৫ বৎসর, মহেশের বয়স প্রায় ত্রিশ বৎসর। হরিশ মণ্ডল দুই জনেরই বিবাহ দিয়াছিল। পনর বছর হইল অদ্বৈতের বিবাহ হইয়াছে, কিন্তু তাহার কোন সন্তান হয় নাই, আর হইবার সম্ভাবনাও নাই। মহেশের একটিমাত্র কন্যা। অদ্বৈত বড় আদর করিয়া তাহার নাম রাখিয়াছিল রাধারানি। এই রাধারানিই বুড়া মণ্ডলের একমাত্র অবলম্বন ছিল, অদ্বৈতও এই মেয়েটিকে বড়ই ভালবাসিত—বাড়ীতে ত আর ছেলেমেয়ে ছিল না। হরিশ মণ্ডল যখন মারা যায় তখন রাধারানির বয়স ১০ বৎসর ।

শ্রাদ্ধান্তে মহেশ যখন দাদার নিকট বিষয়কর্ম্মের কথা পাড়িল, তখন অদ্বৈত বলিল "মহেশ, ও সব কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করো না। আমি ও সকলের কিছু জানি না; আর রাধারানি যদি কৃপা করেন তাহা হইলে আর জানিতেও ইচ্ছা নাই। ঘর সংসার আছে; বিষয় আশয় আছে, আর তুমি আছ; যখন যা পবামর্শের দরকার হয় তা মায়ের সঙ্গে করো; আমাকে ভাই কিছুতেই জড়াইও না। আমি ত মনে কর্বেছি নবদ্বীপে যাইয়া বাকি কটা দিন কাটিয়ে দেব। তা ত আর এখন হচ্ছে না। রাধারানির বিয়েটা শেষ ক'রে না গেলে যে রাধারানি আমায় কৃপা ক'রছেন না। কাজেই আর কিছুদিন তোমাদের কাছে থাক্‌তেই হবে।"

মহেশ বলিল, "আমি একলা মানুষ, কত দিকে দেখ্‌ব। টাকা পয়সাগুলো বাবা ত দেশময় ছড়িয়ে রেখে গেছেন, তার সুদ আদায় করা, কোন্‌টা তামাদি হ'ল না হ'ল তা দেখা, মামলা মোকদ্দমা করা, খাজনা আদায় করা, জমি চায করা, এত কাজ কি একেলা পেরে উঠ্‌বো। তারপর আবার গাঁয়ের সকলের ইচ্ছা যে, বাবার পঞ্চায়েতের কাজটাও আমিই নিই।"

অদ্বৈত বলিল "পারবে না কেন ভাই! রাধারানির কৃপায় তুমি সব করতে পারবে।"

মহেশ মনে করিয়াছিলেন, তাহার পিতা যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন অদ্বৈত ততদিন কিছু দেখে নাই; এখন পিতার অভাবে সে নিশ্চয়ই কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণ করিবে। মহেশ যদিও এতদিন কাজকর্ম করিয়াছে, কিন্তু বিশেষ দুই পয়সা হাতে করিতে পারে নাই—বুড়া মণ্ডলকে ফাঁকি দেওয়া বড় সহজ কথা ছিল না। এখন অদ্বৈত যদি সমস্ত কাজের ভার গ্রহণ করিত, তাহা হইলে তাহার প্রাপ্তির পক্ষে বিশেষ বিঘ্ন উপস্থিত না হইলেও সে সর্বগ্রাস করিতে পারিত না। কিন্তু অদ্বৈত যখন সমস্ত কাজকর্ম্মের ভার তাহার উপর অর্পণ করিল, তখন সে মৌখিক একটু আপত্তি জানাইয়া মনের আনন্দে সমস্ত কার্যেব ভার গ্রহণ করিল।

অদ্বৈত সংসারবিরাগী ভালমানুষ হইলে কি হয়, তাহার গৃহিণী কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। এতদিন বুড়া মণ্ডল বাঁচিয়া ছিল, তাই কেহই আত্মপ্রকাশ করিতে পারে নাই, সকলেই বুড়ার ভয়ে নীরব ছিল, কাহারও কিছু বলিবার বা গোলযোগ করিবার সাহস হয় নাই। এখন বুড়া মরিয়া গিয়াছে সুতরাং অদ্বৈত-গৃহিণী নিজমূর্ত্তি ধারণ করিল। সে বিষয়ে

* পুঁথিগত।

মহেশের গৃহিণীও কম ছিল না। এতদিন তাহারা বুড়ি শাশুড়িকে বিশেষ সম্মান করিয়াই চলিয়াছিল; কিন্তু এখন ত আর বুড়া নাই; সুতরাং তাহারা বুড়ির উপর কথা চালাইতে আরম্ভ করিল। বুড়ি এখন হরিনাম করে, আর নাতিনী রাধারানিকে লইয়া সময় কাটায়।

অদ্বৈত-গৃহিণী যখন দেখিল যে, তাহার অকর্মণ্য স্বামীটি যথাসর্বস্ব ভ্রাতার হস্তে সমর্পণ করিয়া হরিপাদপদ্ম সার করিল, তখন তাহার হরিভক্তি উড়িয়া গেল, রাগে তাহার সর্বশরীর জ্বলিয়া গেল। ইহার প্রতিবিধানের জন্য সে বদ্ধপরিকর হইল। সে সমস্ত বিষয়ের আট আনার মালিক, আর সে কি না তাহার দেবরের ও দেবর-পত্নীর হাততোলা খাইয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিবে! ইহা কিছুতেই হইতে পারে না; ইহার একটা হেস্তানেস্তা তাহাকে করিতেই হইবে।

কিন্তু সে ত স্বামীকে হাতের মধ্যে পায় না। অদ্বৈত একবেলা আহারের সময় ব্যতীত বাড়ির মধ্যেই আসে না, রাত্রিতে প্রতিদিনই সে মহাপ্রভুর আখড়ায় প্রসাদ পায় এবং অনেক রাত্রিতে বাড়িতে আসিয়া বাহিরের ঘরেই শয়ন করে; দিবাভাগে যতক্ষণ বাড়িতে থাকে, ততক্ষণ রাধারানিকে লইয়াই তাহার সময় কাটিয়া যায়।

একদিন দ্বিপ্রহরে স্বামীকে নির্জনে পাইয়া অদ্বৈত পত্নী তাহাকে চাপিয়া ধরিল। সে যে নিতান্ত অকর্মণ্য, তাহার যে বিষয়বুদ্ধি মোটেই নাই, সে যে নিরীহ জীববিশেষ, ইত্যাদি অনেক কথা বলিয়া সে তাহার স্বামীকে বুঝাইতে চেষ্টা করিল যে, এমন করিয়া ভাইয়ের হাতে যথা-সর্বস্ব সমর্পণ করিয়া দিলে, পরে তাহাকে ভিখারি হইতে হইবে, দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করিয়া খাইতে হইবে।

গৃহিণীর কথা শুনিয়া অদ্বৈত বলিল, "বৌ, ভিখারি হইতে হইবে! তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক ; আমি তো তাই চাই বৌ! রাধারানি কি আমার কপালে এমন সুদিন আনিয়া দিবেন, যে দিন হরিনাম করিয়া দ্বারে দ্বারে ফিরিব। বৌ ! এ ত অভিসম্পাত নয়, এ যে আমার পক্ষে পরম লাভ। সেই দিনের অপেক্ষাতেই ত বসিয়া আছি! রাধারানি, তোমারই ইচ্ছা!"

গৃহিণী ঝঙ্কার দিয়া কহিল "তোমার পথ তুমি দেখ্‌লে, আমার কি হবে? আমার ভাতকাপড়ের কি হবে? ভাগ্যি যে পেটে পাঁচটা ধরিনি, তা হ'লে কি হ'ত ?"

অদ্বৈত বলিল "বৌ! সবই রাধারানির ইচ্ছা। তিনি দয়া করিয়া সংসারের বন্ধন থেকে নিস্তার ক'রেছেন। তোমার কথা বল্‌ছ বৌ ! আমি যেখানে তুমিও সেখানে। আমি যদি বনে যাই, তোমাকেও সেখানেই যেতে হবে; আমি যদি ভিক্ষা করি, তোমাকেও তাই করতে হবে; তাকেই ত বলে স্ত্রী ও সহধর্মিণী।"

গৃহিণী রাগে অধীর হইয়া বলিল "পোড়ামুখ আমার, আমি কেন তোমার সঙ্গে ভিক্ষা কর্‌তে যাব! আমার পোড়াকপাল, তাই তোমার হাতে পড়েছিলাম। খেতে দিবার মুরদ্ নেই তবে বিয়ে করতে গিয়েছিলে কেন; বৈষ্ণব হওয়াই যদি ইচ্ছে ছিল, তবে আবার আর একটিকে গলায় বেঁধেছিলে কেন?"

অদ্বৈত পূর্বের মত ধীর শান্তভাবে বলিল, "বৌ ! সবই রাধারানির ইচ্ছা! আমরা কি নিজের ইচ্ছায় কিছু ক'রতে পারি। তাঁর উপর সব ভার দেও, বৌ, সব ভার দেও। কোন ভাবনা থাক্‌বে না। গৌর হে কৃপা কর।"

অদ্বৈত-গৃহিণী দেখিল যে, এ ক্ষেত্রে তাহার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইবে। তখন সে বলিল "আমার কথা যেমন শুন্‌লে না, তেমনই তোমাদের সংসারে আগুন লাগিয়ে দিয়ে তবে ছাড়ব। আমি তেমন পরামানিকের মেয়ে নই!"

অদ্বৈত হাসিয়া বলিল "কার সংসারে কে আগুন দেয় বৌ! যাঁর সংসার তিনি যদি আগুন ধরিয়ে দেন তা হ'লে কেউ রাখ্‌তে পারবে না। জান ত কথা আছে—রাখে কৃষ্ণ মারে কে, মারে কৃষ্ণ রাখে কে?"

অদ্বৈত-গৃহিণী রাগে গরগর করিতে করিতে বলিল "তুমি তোমার কেষ্ট নিয়েই থাক; আমার অদেষ্টে যা থাকে তাই হবে।" এই বলিয়াই সে বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেল।

তাহার পর হইতেই মণ্ডলদিগের সংসারে সত্যসত্যই আগুন জ্বলিয়া উঠিল। অদ্বৈত-গৃহিণী একেবারে রণচণ্ডী হইয়া উঠিল। মহেশের স্ত্রীও সে পক্ষে কম ছিল না; সুতরাং প্রতিদিন ঝগড়া বিবাদ চলিতে লাগিল। অনেকদিন এই ঝগড়ার ফলে বাড়িতে রান্না পর্যন্ত হইত না। মহেশ রাগিয়া অস্থির হইত; অদ্বৈত নির্বিকারচিত্তে সমস্ত দেখিত, আর বলিত "রাধারানি! তোমারই ইচ্ছা!"

শেষে যখন একেবারে অসহ্য হইয়া উঠিল তখন একদিন মহেশ অদ্বৈতকে চাপিয়া ধরিল; বলিল "দাদা। দেখ্‌ছ ত! এমন করিয়া আর সংসার চলে না। যা কিছু আছে ভাগ করিয়া লইয়া আমরা পৃথক হই। হয় তুমি এ বাড়িতে থাক আমি অন্যখানে বাড়ি করি: আর না হয় আমাকেই এ বাড়ি ছাড়িয়া দিয়া তুমি অন্যখানে বাড়ি কর। আর সহ্য হয় না দাদা!"

অদ্বৈত হাসিয়া বলিল "আমি ত পৃথকই আছি ভাই! তোমাদের কিছুরই মধ্যেই আমি নেই। যা কিছু আছে সবই তোমার। ঘর বাড়ির কথা বল্‌ছ, রাধারাণি ত আমার জন্য ঘরবাড়ি তৈয়ার ক'রেই রেখেছেন। ভাল একটা দিন আস্‌ছে না, তাই সে বাড়িতে যেতে পারছি না।"

মহেশ বলিল "তুমি ত পথ ঠিক ক'রে রেখেছে, কিন্তু বড় বৌয়ের কি হবে; তার জ্বালায় যে আমরা অস্থির হ'য়ে পড়েছি।"

অদ্বৈত বলিল "গুরুদেব ব'লেছেন স্ত্রী যদি স্বামীর পথ না লয়. তা হ'লে সে স্ত্রী নয়, সে সহধর্মিণী নয়। তোমাদের বড় বৌ যদি আমার পথে আসতে না চান, তা হ'লে তাঁর যা খুশি তাই ক'রতে পারেন।"

মহেশ বলিল "তা ত বুঝলাম, কিন্তু তিনি যদি তোমার মতে না চল্‌েন, তা হ'লে তাঁকে ত খেতেপরতে দিতে হবে! তার জন্য ত আমরা দায়ী।"

অদ্বৈত বলিল "অত কথা বুঝিনে ভাই! তোমার যা ইচ্ছে তাই কর।"

মহেশ বলিল "তুমি যদি সব ছেড়েই চ'লে যাবার মন ক'রে থাক, তা হ'লে বিষয় আশয়ের একটা লেখাপড়া ত চাই।"

অদ্বৈত বলিল "বেশ কথা, তাই হবে। আমি লেখাপড়া ক'রে দিচ্ছি যে, আমার যে বিষয় আশয় আছে তা সব মহাপ্রভুর আখ্‌ড়ায় দেওয়া হবে, আমার স্ত্রী সেখানে প্রসাদ পাবেন।

তাতে যদি তাঁর আপত্তি থাকে তা হ'লে তিনি যেখানে থাকেন, মহাপ্রভুর সেবায়েতরা তাঁকে মাসে পাঁচটি ক'রে টাকা দেবেন। ব্যস, আজ থেকে আমি খালাস্, আজ আমার পায়ের বেড়ি খুল্‌ল।"

মহেশ এই কথা শুনিয়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। এখন উপায়। বিষয়ের অর্ধেকই যে হাতছাড়া হইয়া যায়। তাহার দাদার মনে কি শেষে এই ছিল। দাদা সংসারত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন শুনিয়া সে যত না আকুল হইয়াছিল, বিষয় মহাপ্রভুর আখ্‌ড়ায় যাইবার উপক্রম করিতেছে দেখিয়া সে ততোধিক ব্যাকুল হইয়া পড়িল। মহেশ আর স্থির থাকিতে পারিল না। তাহার ভ্রাতৃস্নেহে ভাদ্রের বন্যা আসিল। গলদশ্রু-লোচনে ভ্রাতার পা দুখানি জড়াইয়া ধরিয়া কাতরবচনে তাঁহাকে গৃহত্যাগ করিবার সঙ্কল্প হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিল। কোনও ফলই হইল না। অদ্বৈত বলিল "কেঁদো না মহেশ! আর আমাকে মায়ার ডোরে বেঁধো না। আমাকে মহাপ্রভু টেনেছেন, তাঁর কাছে আমাকে যেতে দাও। তিনি তোমাদের মঙ্গল কর্‌বেন, সুখে রাখ্‌বেন।"

বিফলমনোরথ মহেশ তখন ভ্রাতার পা ছাড়িয়া অন্তঃপুরে গিয়া পত্নীর কেশ ধরিল। বলিল "হতভাগি, এখন উপায়? তোর জন্যই তো এখন অর্ধেক বিষয় হাতছাড়া হইয়া যায়!"

মহেশপত্নী স্বামীব এই আকস্মিক আচরণ দেখিয়া ফ্যাল ফ্যাল করিয়া স্বামীর মুখের প্রতি তাকাইয়া রহিল। মহেশ পত্নীর নিকট সকল কথা খুলিয়া বলিলেন।

পত্নীর নিকট কোনও সদ্যুক্তি না পাইয়া মহেশ ভ্রাতৃজায়ার নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। বড় বৌ সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, "আমি কি করিব? তার সম্পত্তি সে যদি মহাপ্রভুকে দিবার সঙ্কল্প করিয়া থাকে, দিক; আমি কিছু বলিব না। যার যা খুশি তাই করুক। আমার একটা পেট।"

তাহার পরদিন অদ্বৈত মহকুমায় যাইয়া বিষয়ে তাহার যে অংশ ছিল তাহা গ্রামের মহাপ্রভুর নামে লেখাপড়া করিয়া দিল।

সন্ধ্যার সময় বাড়িতে আসিয়া মহেশকে ডাকিয়া বলিল, "ভাই মহেশ! আমি তবে আসি।" মহেশ অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া রহিল, কোন কথা বলিল না।

তারপর অন্তঃপুরে গিয়া, বড় আদরের ভাইঝি রাধারানিকে কোলে তুলিয়া লইয়া বলিলেন, "মা আমি এখন আসি। নারায়ণ তোমাকে সুখে রাখুন। রাধারানি কাঁদিতে লাগিল, সে জ্যেঠা মহাশয়কে কিছুতেই ছাড়িয়া দিবে না। সংসারবন্ধন-মুক্ত মহাপ্রভুগতপ্রাণ অদ্বৈতেরও চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল। সে তাড়াতাড়ি রাধারানিকে কোল হইতে নামাইয়া দিয়া, মাতৃচরণে প্রণাম করিয়া বাহিরে চলিয়া আসিল।

পরদিন প্রাতঃকালে আর কেহ অদ্বৈতমণ্ডল ও তাহার পত্নীকে গ্রামে দেখিতে পাইল না।

—জাহ্নবী (নব নব পর্যায়) ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, কার্তিক ১৩১৯।

শিবনাথের অধিকার

তিনদিন আগেপাছে যখন শিবনাথ চক্রবর্তীর পিতা ও মাতা শ্মশানশয্যা আশ্রয় করিলেন, তখন শিবনাথের বাটীতে রহিলেন এক বৃদ্ধা পিসিমাতা।

মাতাকে শ্মশানে রাখিয়া আসিবার দুই তিন দিন পরে শিবনাথ তাহার পিসিমার নিকট এক অসম্ভব প্রস্তাব করিয়া বসিল, "পিসিমা, এই দুইটা শ্রাদ্ধ শেষ হইয়া গেলেই তোমাকে কাশীতে রাখিয়া আসিব।"

পিসিমা অশ্রুসিক্তনয়নে মার্জনা করিয়া বলিলেন, "দাদা গেলেন, বৌ গেল, আমারই বা কয় দিন, এখন ত কাশীবাসেরই সময়; কিন্তু তোর কথা ভেবেই যে আমি সারা হচ্চি। তোর কি গতি হবে? বিয়ে থাওয়াও কর্‌লিনে, যজমানবাড়ি ক্রিয়াকর্ম ক'রতে যাস্‌নে। এখন উপায়! এতদিন দাদা বেঁচে ছিলেন, যা কর্‌তি তাই শোভা পেত; এখন ত আর সে ভাবে থাক্‌লে চল্‌বে না। কিশোর চক্রবর্তীর নাম ত রাখ্‌তে হবে? তুই একটা বিয়ে থাওয়া ক'রে সংসারধর্ম আরম্ভ কর, আমি তাই দেখে কাশী চ'লে যাই।"

শিবনাথ বলিল, "পিসিমা, ও সব তোমার না যাওয়ার কথা, আমি বিয়ে করি বা উচ্ছন্ন যাই, তাতে তোমার কি? বুড়ো মানুষ, কাশীতে গিয়ে গঙ্গাস্নান কর, বিশ্বনাথ দর্শন কর, শেষকালের কাজ কর। শিবনাথকে নিয়ে বোসে থাক্‌লে, শিবনাথের কথা ভাব্‌লে কি তোমার স্বর্গলাভ হবে?"

পিসি বলিলেন, "দাদা বেঁচে থাক্‌লে সে কথা খাট্‌ত। আমি ত আর তোকে কঠিন কাজ কিছুই ক'র্‌তে বলছি নে। রাজ্যির লোকেই বিয়ে করে, ঘরসংসার করে, কাজকর্ম করে। তুই কি রাজ্যি-ছাড়া! ও সব পাগ্‌লামি রাখ। আমি যা বলি তাই কর্‌। আমাদের যে দু'শ' আড়াইশ' ঘর যজমান আছে, দাদা ত সব দেখ্‌তে পারতেন না; লোক রেখে দিতেন, নিজে বড় বেশী হয়ত ত্রিশ চল্লিশ ঘরের ক্রিয়াকাণ্ড ক'রতেন। তুইও তেমনি কর। তাতে যা আয় হয় তাই দিয়ে সংসার চলে যায়। তারপর জমা-জমিতে যা আসে দাদা ত এতদিন তা জমিয়েই গিয়েছেন। তোর ভয় কি? সংসার আমি দেখ্‌বো। তুই শুধু যজমানগুলো রক্ষা করবি। প্রজাদের কাছ থেকে যা কর্‌তে হয় না হয়, তা রামহরিই ক'র্‌বে।"

শিবনাথ বলিল, "পিসিমা, আমি ওর একটাও ক'রতে পারব না; তা যাই বল আর যাই কর। যাক্‌, সে কথার অনেক সময় আছে; শ্রাদ্ধ শান্তি মিটে যাক, তখন তা হবে। এখন একটা কাজ কর ত। ঘরে মিছরি আছে? আস্‌বার সময় দেখে এলাম নিমে ছুতোরের ছেলেটার খুব জ্বর হোয়েছে; সে একটু মিছরি মিছরি ক'রে কান্না জুড়ে দিয়েছে। তা নিমের ত ঐ অবস্থা! মিছরি কোথায় পাবে? আজ আবার সে কাজে বেরুতে পারে নাই। তুমি খানিকটা মিছরি আর সের তিনেক চা'ল যদি দাও তবে তাদের দিয়ে আসি। আহা! শুন্‌লাম কা'ল রাত থেকে তাদের খাওয়া হয় নাই। ওঠ পিসিমা, আমি চট্‌ ক'রে ঐ গুলো দিয়ে এসে তারপর হবিষ্যি ক'রব। আসবার সময় একেবারে নেয়ে আস্‌ব।"

পিসিমা বলিলেন, "এই গুরুদশার সময় কি অমন ক'রে বেড়াতে হয়, না যার তার ঘরে যেতে হয়! বামুনের ছেলে, তোকে আর কত বা শেখাব। আমার পোড়াকপাল, আমার অদেষ্টে অনেক ভোগ আছে, তাই এই পাগলা ছেলেটাকে আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে দাদা আর বউ স্বর্গে চ'লে গেলেন।"

শিবনাথ বলিল, "এই শোন কথা! আরে, আমি ত তোমার ঘাড় থেকে নামতেই চাই; তুমিই ত নাম্‌তেই দাও না। তা সে কথা থাক্‌, এখন আমি যা যা চাইলাম, তাই একে দাও, আমি কাজ সেরে আসি। আবার জান ত, হবিষ্যের পরই তাঁতিপাড়ায় যেতে হবে। রামা তাঁতির ছেলেটা আজ তিন দিন নিরুদ্দেশ, কোন খবর নেই; রামা আর তার বৌ নাকি না খেয়েদেয়ে প'ড়ে আছে। তোমার জ্বালায় ত এ দুই তিন দিন কোথাও যেতে পারিনি! আজ এইমাত্র সে খবর পেলাম। দেখি, আমি গিয়ে যদি তাদের শান্ত ক'রতে পারি। দেখ দেখি পিসিমা, ছোঁড়াটার কি অন্যায়! আঠারো বছরের ছেলে, কোন কাজকর্ম করবে না। তাই সেদিন রামা একটু বকেছিল; আর ছেলেটা ফেরার! এসব কি হ'লো! এখন দেখ্‌ছি—"

শিবনাথের কথায় বাধা দিয়া তাহার পিসিমা বলিলেন, "এই দেখ না তুই! কাজ করিস্‌নে কিছু করিস্‌নে, শুধু পাড়ায় বেড়াস্‌। ঐ কাব অসুখ হ'লো, তার ব্যবস্থা; ঐ কার ঘরে খাবার নেই তাব বন্দোবস্ত; এই সব নিয়েই ত তুই থাকিস্‌। এতবড় ছেলে হলি, যেটের কোলে বাইশ বৎসর বয়স হ'তে চোলল, তুই কি সংসারের কিছু দেখিস্‌ ? এদিকে পরের বেলায় ত খুব কথা ফোটে!"

শিবনাথ বলিল, "পিসিমা, আমার ও সব ভাল লাগে না। পরের কাজ করা বেশ, নিজের কাজ ক'রতে ইচ্ছা কবে না। বুঝ্‌লে ? থাক্‌ সে কথা, আমায় শিগ্‌গির বিদায় কর।"

পিসিমা আর বিলম্ব না করিয়া কিছু চাউল ও খানিকটা মিছরি আনিয়া দিলেন। শিবনাথ বাড়ি হইতে চলিয়া গেল।

২

শিবনাথ স্বর্গীয় রামকিশোর চক্রবর্তী মহাশয়ের একমাত্র পুত্র। রামকিশোর ঠাকুর ছেলে শিবনাথকে ইংরাজী পড়িতে দেন নাই; নিজেই মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পড়াইয়াছিলেন এবং ব্যাকরণ পাঠ শেষ হইলে ক্রিয়াকর্ম শিক্ষা দিয়াছিলেন। শিবনাথ অতি সচ্চরিত্র ও সুবোধ ছেলে। ছেলেবেলায় পিতার সহিত যজমান-বাড়িতে যাইত আসিত; ছোটখাট পূজাও করিত।

শিবনাথের বয়স যখন ১৮ বৎসর সেই সময়ে দুর্গোৎসবের পর শিবনাথের পিতা রামকিশোর ঠাকুর অসুস্থ হইয়া পড়েন। এক যজমানের বাড়ি কালীপূজা ছিল। রামকিশোর ঠাকুর শিবনাথকে বলিলেন, "শিবু, সবকারবাড়ির কালীপূজা ত আমি এবার করিতে পারিব

না, অন্য ভাল লোকও পাইতেছি না। তারা বড় সাত্ত্বিক প্রকৃতির মানুষ। তোমাকেই এবার সরকার বাড়িতে পূজা করিতে হইবে। পূজাবিধি আমি তোমাকে এই দুই দিনে ভাল করিয়া শিখাইয়া দিব।" শিবনাথ পিতার আদেশ অমান্য করিতে পারিল না, শুধু বলিল, "কালীপূজা বড় কঠিন পূজা বাবা! আমি ঠিক ঠিক করিয়া উঠিতে পারিব ত?" তাহার পিতা তাহাকে খুব ভরসা দিলেন।

কালীপূজার দিন সমস্ত দিন উপবাসী থাকিয়া শিবনাথ সন্ধ্যার সময় সরকারবাড়ীতে পূজা করিতে গেল। ইতঃপূর্বেই সে পিতার নিকট হইতে পূজা সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিল।

যথাসময়ে পূজা আরম্ভ হইল। শিবনাথ যথারীতি পূজায় বসিল এবং যথাপদ্ধতি পূজা করিতে লাগিল। তাহার পূজা দেখিয়া সরকারবাড়ির সকলেই বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন। শিবনাথ পূজা শেষ করিয়া ক্ষুধাতৃষ্ণায় অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়িল। সে তখন চণ্ডীমণ্ডপের এক পার্শ্বে দুইখানি কুশাসন বিছাইয়া শুইয়া পড়িল। সরকারবাড়ির কর্তামহাশয় শিবনাথকে জলযোগ করিবার জন্য আহ্বান করিলে সে বলিল, "এত রাত্রিতে আমি আর কিছু আহার করিব না, আমি এই স্থানেই একটু বিশ্রাম করি।"

কর্তা চলিয়া গেলে শিবনাথ নিদ্রিত হইল। কতক্ষণ সে নিদ্রিত ছিল তাহা সে বলিতে পারে না। নিদ্রাবস্থায় সে স্বপ্ন দেখিল, কে একজন সন্ন্যাসী তাহার শিয়রে দাঁড়াইয়া তাহাকে ডাকিতেছেন "শিবনাথ !" স্বপ্নাবস্থায় সে সন্ন্যাসীর কথার উত্তর দিল। সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, "শিবনাথ, কি পূজা করিলে?" শিবনাথ বলিল, "কালীপূজা"। সন্ন্যাসী বলিলেন, 'তোমার কি পূজায় অধিকার জন্মিয়াছে?" শিবনাথ বলিল, "সে কথা আমি ভাবি নাই। বাবা বলিয়া দিয়াছেন, তাই যথাশাস্ত্র পূজা করিয়াছি।" সন্ন্যাসী তখন গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "দেখ শিবনাথ, এমন কর্ম আর করিও না। পূজাপদ্ধতি জানিলেই কেহ পূজার অধিকারী হয় না। যখন নিজের প্রাণমন সমর্পণ করিয়া, একাগ্রচিত্ত হইয়া পূজা করিতে পারিবে তখনই পূজা করিও, নতুবা করিও না, এমন করিয়া পাপ অর্জন করিও না। যদি সত্যসত্য পুরোহিত হইতে পার, যদি সত্য সত্য মায়ের পূজা করিতে পার, তবে পূজা করিতে যাইও; এমন করিয়া আত্মপ্রতারণা করিও না, লোক ঠকাইও না।" এই কথা বলিয়াই সন্ন্যাসী অন্তর্হিত হইলেন। শিবনাথের নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। ঠিক সেই সময়ই পূজা-প্রাঙ্গণে একটা বাউলের দল গাইতে ছিল—

শক্তিপূজা কথার কথা না (শ্যামা)।
যদি, কথার কথা হত, চিরদিন ভারত,
শক্তি পূজে শক্তিহীন হ'ত না।
কেবল ডাকের গয়নায়, ঢাকের বাজনায়
শক্তিপূজা হয় না;
এক মনোবিল্বদল, ভক্তিগঙ্গাজল,
শতদল দিলে হয় সাধনা (হৃদয়)।

দিলে আতপান্ন, কি মিষ্টান্ন,
মা যে তাতে ভোলেন না;
কেবল, জ্ঞানদীপ জ্বেলে, একান্ত ধূপ দিলে,
ব্রহ্মময়ী পূর্ণ করেন কামনা।

শিবনাথ অবাক্ হইয়া এই গান শুনিতে লাগিল। এ যে সেই স্বপ্নদৃষ্ট সন্ন্যাসীর কথারই প্রতিধ্বনি! তবে কি সে সত্যসত্যই পূজার অধিকারী নহে? তাহা হইলে তা সে এতদিন ঘোর অপরাধ করিযাছে। শিবনাথ অনেকক্ষণ ধরিয়া এই কথা ভাবিতে লাগিল। বাউলেব দল তখন গাইতেছে—

কাঙ্গাল কয় কাতরে, জাত্‌বিচারে,
শক্তিপূজা হয় না;
সকল বর্ণ এক হ'যে ডাক মা বলিয়ে,
নইলে মায়ের দয়া কভু হবে না।*

শিবনাথ আব বসিয়া থাকিতে পারিল না। সে উঠিযা সম্মুখেব কালীমূর্তির দিকে চাহিয়া বলিল, "মা, তুমি সত্য মিথ্যা যা হও, আমি বলিতেছি, যতদিন অধিকার না জন্মিবে, ততদিন আর পূজা করিব না।" এই বলিয়া সে ধীবে ধীরে পূজামণ্ডপ পরিত্যাগ কবিয়া সেই অমাবস্যাব অন্ধকাবে মিলাইয়া গেল।

তাবপর পরদিনই সে তাহার পিতাকে বলিল যে, সে আর কোন যজমানবাড়িতে পূজা করিতে যাইবে না। পিতা কত বুঝাইলেন, কত শাস্ত্রবচন আবৃত্তি করিলেন; কিন্তু শিবনাথ সে কথা শুনিল না। সেই হইতে শিবনাথ যজন-কার্য ত্যাগ করিয়াছে। সেই হইতে তাহার কার্য হইয়াছে দেশের সেবা। জাতিবর্ণ ভুলিয়া, আত্মপর ভুলিয়া, যেখানে আর্তের ক্রন্দন সেইখানেই শিবনাথ! শিবনাথ বুঝিয়াছে মায়ের সন্তানগণের সেবা করিলেই হয় ত একদিন সে মাতৃপূজার অধিকারী হইবে। এই কারণের শিবনাথ এতকাল বিবাহ করে নাই। পিতার অনুরোধ, মাতার অশ্রুজল, পিসিমাতার আজ্ঞা, কিছুতেই তাহার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয় নাই। শিবনাথ ঘবে থাকিযাও গৃহহীন ; সংসারে তাহার মন বসিত না, বিষয়কর্মে সে সম্পূর্ণ উদাসীন হইযাছিল।

সকলে মনে করিয়াছিল, মাথার উপর পিতা আছেন, তাই শিবনাথ একটা খেয়াল ধরিয়া বসিয়া আছে; যখন সংসারের ভার স্কন্ধে চাপিবে, তখন ও সকল খেয়াল দূর হইবে।

পিতা ও মাতা স্বর্গে চলিয়া গেলেন, কিন্তু শিবনাথের সে খেয়াল দূর হইল না। এ খেয়াল একবার জমিয়া গেলে কি আর ছাড়ে!

৩

পিতার শ্রাদ্ধ উপলক্ষে শিবনাথ একেবারে চরম কার্য করিয়া বসিল। ব্রাহ্মণের শ্রাদ্ধ

* পদটি জলধরসেনের সাহিত্যগুরু হরিনাথ মজুমদারের (কাঙাল ফিকিরচাঁদের) রচনা।

এগাব দিনে হয়। চারি পাঁচদিন চলিয়া গেল। শিবনাথের পিসি শিবনাথকে জানিতেন, তাহার দ্বারা যে কোন আযোজনই হইবে না, তাহা তিনি বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। তাই তিনি কুলপুরোহিত ও গ্রামের দশজনকে ডাকাইয়া শ্রাদ্ধের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। লোকের অভাব হইল না; সকলে বিশেষ আগ্রহের সহিত যাহাতে শ্রাদ্ধকার্য সুসম্পাদিত হয় তাহার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

শিবনাথের কিন্তু এ সকল ভাল লাগিল না। সে একদিন তাহার পিসিমাকে বলিল। "পিসিমা, এ সকল কি হইতেছে? আমি বাবাব শ্রাদ্ধ করিব না।'

পিসিমা বলিলেন, "সে কি কথা! তুই পাগল হলি নাকি? শ্রাদ্ধ করবি নে? বামুনের ছেলের মুখ দিয়ে এমন কথা বের হ'লে প্রাচিত্তির করতে হয়, জানিস্?"

শিবনাথ বলিল, "তা সব জানি, কিন্তু আমি শ্রাদ্ধ কোরবো না। তোমার কথামত হবিষ্যি করছি। আমাব মনে হযেছিল যে, এই রকম কঠোব ক'রলে হয় ত এ কয়দিনেব মধ্যে আমাব শ্রাদ্ধ কববার অধিকার জন্মাবে। কিন্তু কৈ, তা ত হ'ল না।"

পিসিমা বলিলেন, "তোর কথাই যে আমি বুঝি না! তোরই ত শ্রাদ্ধের অধিকার। তই দাদার জ্যেষ্ঠপুত্র, একমাত্র ছেলে, তোরই ত শ্রাদ্ধেব অধিকার। ওসব কথা বলিস্‌নে বাবা' লোকে পাগল বোল্‌বে। তোকে ত কিছু ক'রতে হচ্চে না। সে সব আমি ঠিক ক'রে নেবো।"

পিসিব কথা শুনিয়া শিবনাথ বলিল, "তা যাই বল পিসিমা, আমি বিনা অধিকারে কাজ কোববো না।"

পিসিমা চটিয়া বলিলেন, "যা, যা, তুই তোর কাজে যা। সব তাতেই পাগলামি।" শিবনাথ চলিয়া গেল, তাহার পিসি তাহাব কথাটা আর ভাবিয়াও দেখিলেন না; তিনি মনে কবিলেন, ওটা শিবনাথের বাজে কথা।

শিবনাথ শ্রাদ্ধের দুইদিন পূর্বে বলিল, "পিসিমা, আমাব ইচ্ছা যে বাবার নাম ক'রে কাঙালিভোজন হয়। তুমি কি বল?"

তাহার পিসিমা এ প্রস্তাবে সম্মতি দান কবিলেন এবং কাঙালিদিগেব জন্য প্রচুব চিড়া, মুড়কি, দধি প্রভৃতিব আয়োজন করিবাব ব্যবস্থা করিলেন।

দশম দিনে ক্ষৌরকার্য সম্পাদন করিয়া শাস্ত্রানুসাবে পিণ্ডাদি প্রদান করিতে হয়। শিবনাথ সেদিন আপত্তি করিয়া বসিল, সে ও সকল কবিবে না। সর্বনাশ! শিবনাথ বলে কি?

তখন গ্রামের দশজন ব্রাহ্মণপণ্ডিত, পুরোহিত, সকলে আসিয়া শিবনাথকে বুঝাইতে লাগিলেন; কিন্তু শিবনাথের সেই এক কথা. অধিকারবোধ না হইলে সে লোক দেখাইবার জন্য কিছু করিবে না। বয়োবৃদ্ধগণ শিবনাথকে গালাগালি দিলেন, জাতিনাশেব ভয় দেখাইলেন। শিবনাথের সেই এক কথা! সকলেই তখন বুঝিলেন শিবনাথের মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে। তর্কালঙ্কার মহাশয় শাস্ত্রের বচন দেখাইয়া বলিলেন, "বিকৃতমস্তিষ্ক ব্যক্তির শ্রাদ্ধের অধিকার নাই; অতএব শিবনাথ শ্রাদ্ধ করিতে পারিবে না; কোন জ্ঞাতির দ্বারা শ্রাদ্ধকার্য সম্পাদন করিতে হইবে?"

শিবনাথ এই কথা শুনিয়া হাসিয়া বলিল, "এই ত আপনি ঠিক কথা বলিয়াছেন। আমাদের শাস্ত্রবাক্যের কি অন্যথা হইবার যো আছে! স্পষ্ট বচন শুনুন, স্পষ্ট আদেশ শুনুন, আমার শ্রাদ্ধের অধিকার নাই। আমিও ত ঐ কথাই বলিতেছিলাম।" এই বলিয়া শিবনাথ সেস্থান হইতে উঠিয়া গেল। শিবনাথের পিসিমার ক্রন্দনে বাড়ি পূর্ণ হইয়া গেল। প্রতিবেশিনীরা তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন; "অদৃষ্টে না থাকিলে ছেলে থাকিতেও জলপিণ্ড লাভ হয় না! হায়! হায়! এমন সোনারচাঁদ ছেলেটা দেখ্‌তে দেখ্‌তে পাগল হ'য়ে গেল!"

৪

শ্রাদ্ধের দিবস প্রাতঃকালে দেখা গেল শিবনাথ বাড়িতেই আছে। সে কাহারও সহিত কোন কথা বলিল না। চারিদিকে যখন শ্রাদ্ধের আয়োজন হইতে লাগিল, দ্রব্যাদি যথাস্থানে সজ্জিত হইতে লাগিল, তখন শিবনাথ বাড়ি হইতে বাহির হইয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ করে দেখা গেল যে, সে সেই অশৌচেব মলিন বস্ত্রেই স্নান করিয়া আসিল; সিক্তবস্ত্র ত্যাগ করিল না, বা রৌদ্রেও শুষ্ক কবিবাব চেষ্টা কবিল না। বাহিরের ঘরের একখানি তক্তার উপর তাহার কতকগুলি পুঁথি ছিল। সে তাহার মধ্য হইতে একখানি পুঁথি বাহির করিয়া লইল এবং সেই পুথিখানি হাতে কবিযা বহির্বাটীব উঠানে পাদচাবণা করিতে লাগিলেন। সে সময়ে তাহার অবস্থা দেখিয়া সকলেই বেশ বুঝিতে পারিল, সে পাগল হইয়া গিয়াছে।

কিয়ৎক্ষণ পরেই তাহার জ্ঞাতি ভ্রাতা আসিয়া শ্রাদ্ধের আসনে উপবেশন করিল; শিবনাথ কোন কথাই বলিল না। তাহার পর যখন শ্রাদ্ধকার্য আরম্ভ হইল, তখন শিবনাথ সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সকলে মনে করিল পাগল হয ত একটা বিভ্রাট বাধাইযা বসিবে। কিন্তু শিবনাথ সে প্রকার কিছুই করিল না; সে দাঁড়াইয়া শূন্য-দৃষ্টিতে শ্রাদ্ধের দ্রব্যাদির দিকে চাহিয়া রহিল, তাগার পর প্রাঙ্গণেব একপ্রান্তে গমন করিয়া মৃত্তিকা-আসনে উপবিষ্ট হইল। পাগল কি করে, তাহা দেখিবার জন্য দুই চারিজন তাহার নিকট গেল; সে কোন কথাই বলিল না। তাহার পর ধীরে ধীরে সে তাহার হস্তস্থিত পুঁথিখানি খুলিয়া অত্যন্ত নিবিষ্টচিত্তে মনে মনে পড়িতে লাগিল। কিছুক্ষণপূর্বে তাহার বদনে যে ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল, ক্রমে তাহার পরিবর্তন হইতে লাগিল। সে ধীরে ধীরে যোগাসনে উপবিষ্ট হইল। তাগার পর সে অনুচ্চস্বরে চণ্ডীপাঠ আরম্ভ করিল; ক্রমে তাহার স্বর ঊর্ধ্বে উঠিতে লাগিল; তাহার মুখে অপূর্ব জ্যোতি প্রকাশিত হইল। শ্রাদ্ধসভায় যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা অবাক্ হইয়া এই সুন্দর পাঠ শুনিতে লাগিলেন; এমন পাঠ তাঁহারা কখন শোনেন নাই। শিবনাথ কি এক স্বর্গীয় ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া তন্ময়ভাবে পাঠ করিতে লাগিল। কিছুক্ষণের জন্য শ্রাদ্ধক্রিয়া বন্ধ হইল; সকলেই সেই অপূর্ব পাঠ শুনিতে লাগিল! প্রায় এক ঘণ্টার অধিক সময় শিবনাথ চণ্ডী পাঠ করিল। তাহার পর পুঁথিখানি বন্ধ করিয়া দণ্ডায়মান হইল। সকলে ভাবিল, এই বার হয় ত

সে কোন কথা বলিবে। কিন্তু শিবনাথ একটি কথাও বলিল না, কাহারও দিকে ফিরিয়াও চাহিল না। ধীরে ধীরে সে সেস্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। কেহই তাহার অনুসরণ করিল না।

৫

এই ঘটনা প্রায় তিন মাস পরে একদিন সন্ধ্যার সময় শিবনাথ গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইল। এ তিন মাস কেহ তাহাকে গ্রামে দেখে নাই। তাহার পিসিমা চারিদিকে তাহার অনুসন্ধানে লোক পাঠাইয়াছিলেন; কিন্তু কেহই তাহার সন্ধান পায নাই।

শিবনাথ বরাবর বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইল। বাড়ির মধ্যে প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া সে ডাকিল, পিসিমা!"

শিবনাথের স্বর শুনিয়া পিসিমা তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিলেন। তিনি দেখিলেন ছিন্ন মলিন বসনে শিবনাথ প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া আছে। তিনি "ওরে শিবু!" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। শিবনাথ যেখানে যে অবস্থায় দাঁড়াইয়া ছিল, তেমনই থাকিল। পিসিমার ক্রন্দন একটু কমিলে সে বলিল "পিসিমা, আমি তোমাকে দেখ্‌তে এসেছি। অনেক স্থান ঘুরে এসেছি, অধিকার আর হ'ল না—এজন্মে হবে না। সেই কথাটাই তোমাকে বল্‌তে এলাম। পিসিমা, তুমি কাশী যাও, আমি বাহির হ'য়ে পড়ি।" এই বলিয়াই শিবনাথ তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। তাহার পিসিমা চিৎকাব করিয়া ডাকিতে ডাকিতে বাহিরে গেলেন, "ওরে শিবু ফের্, শিবু যাস্‌নে।" শিবনাথ তখন অন্ধকারে কোথায় মিশিয়া গেল।

তাহার পর আর কেহ শিবনাথকে গ্রামে দেখিতে পায় নাই। তবে একবার ঐ গ্রামের কয়েকটি লোক কাশীতে গিয়াছিল। তাহারা গ্রামে ফিরিয়া গল্প করিয়াছিল যে, তাহারা শিবনাথকে কাশীতে দেখিতে পাইয়াছিল। তাহারা তাহাকে বাড়িতে আনিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু সে কিছুতেই স্বীকৃত হয় নাই। সে নাকি পাগলের মত পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ায়, আর বলে, "কবে অধিকার হবে?"

—বিজয়া-১ম বর্ষ, ১৩১৯-২০, ৩য় সংখ্যা, অগ্রহায়ণ।

বাতাসী

বাতাসী জেলের মেয়ে। বাপ নাই, মা নাই, ভাই নাই—থাকিবার মধ্যে আছে এক বুড়ি ঠাকুরমা। সকলে মরিয়া গেল; যাহাদের পরে মরিবার কথা, তাহারা আগে চলিয়া গেল; বুড়ি রহিল, আর রহিল তাহার বুড়া বয়সের একমাত্র অবলম্বন বাতাসী।

বাতাসী নামটার একটু ইতিহাস আছে। বাতাসীর বাপ মার অনেকদিন সন্তান হয় নাই। তাহারা কত দেবতার মানত করিয়াছে, কিন্তু দেবতারা পাঁঠা, মহিষ, যোড়শোপচার পূজা প্রভৃতির লোভ সংবরণ করিয়াছিলেন—মৎস্যজীবীর পুত্র সন্তানলাভে হতাশ হইয়াছিল। অবশেষে একদিন তাহার গৃহিণী গঙ্গাদেবীকে একমন বাতাসা মানত করিল। গঙ্গাদেবীর বোধ হয় সে সময়ে বাতাসা খাইবার সাধ হইয়াছিল; তিনি বাতাসার লোভে ভুলিয়া গেলেন। জেলের ঘরে একটি মেয়ে জন্মিল! মেয়ের ষষ্ঠীপূজার দিন একমন বাতাসা গঙ্গাদেবীকে নিবেদন করিয়া দিয়া, পাড়ার সকলে তাহাতে যথাযোগ্য ভাগ বসাইল। পুরোহিত-মহাশয় বলিলেন,—"বাতাসা দিয়া যখন মেয়ে পাইয়াছে, তখন মেয়ের নাম থাকুক বাতাসী।" পুরোহিতের কথামত মেয়ের নাম হইল বাতাসী।

বাতাসীর বয়স যখন তের বৎসর, তখন তাহার পিতা বুঝিল, আর বিবাহের চেষ্টা না করিলে নয়; জেলের ঘরের মেয়ে একটু বেশী বয়স পর্যন্ত অবিবাহিতা থাকিলেও সমাজে বড় কথাবার্তা হয় না। রামমোহনের ঐ একটি মাত্র মেয়ে; যে কয়দিন ঘরে রাখিতে পারা যায়, থাকুক না; এই ভাবিয়া পিতামাতা বিবাহের বিশেষ চেষ্টা করে নাই। বিশেষত, তাহারা মনে মনে বর স্থির করিয়া রাখিয়াছিল। হরি হালদারের পুত্র স্বরূপ বেশ ছেলে। হরি হালদার গাঁয়ের পার্শ্বের ইছামতী নদীর পাটনি; দুপয়সা রোজগার করে। এ পাটনিগিরিটা সে এক রকম মৌরসী করিয়াই লইয়াছিল; ঘাট-ডাকের সময় গ্রামের আর কেহ ডাকিত না। হরিই যাহা হয় দিয়া ঘাট ইজারা লইত। বাতাসীর পিতামাতার স্বরূপের সঙ্গেই কন্যার বিবাহ দিবার ইচ্ছা ছিল। এতদিন কথাটা বলি বলি করিয়া বলা হয় নাই। এখন মেয়ে তের বৎসরে পড়িল; সুতরাং আর অপেক্ষা করা সঙ্গত নয়। রামমোহন প্রস্তাব করিল; হরি আনন্দে সম্মত হইল; মেয়ে সুন্দরী, স্বরূপের সঙ্গে বাতাসী শৈশবে কত খেলা করিয়াছে, নৌকায় চড়িয়াছে, দুইজনের খুব ভাব। কিন্তু বিবাহের কালবিলম্ব হইল; স্বরূপের তখন কুড়ি বৎসর বয়স; যোড় বৎসরে ছেলের বিবাহ দিতে স্বরূপের মাতার আপত্তি হইল। রামমোহন বলিল, "বেশ, এত তাড়াতাড়ি কি? এক বৎসর পরেই বিবাহ হইবে?"

বৎসর যাইতে না যাইতেই স্বরূপের মা মরিল। গ্রামের দশ মাতব্বর বলিলেন, "এক বৎসর মরণাশৌচ; তাহার পূর্বে বিবাহ শাস্ত্রসঙ্গত নহে।" রামমোহন বলিল, "বেশ।"

এইভাবে দুই বৎসর গেল। বাতাসীর বয়স তখন পনর। বিবাহের আয়োজন হইতে লাগিল। হরি হালদারেরই বিশেষ আগ্রহ; তাহার ঘরে স্ত্রীলোক নাই। কিন্তু তাহাদের আগ্রহ হইলে কি হয়, প্রজাপতি ঠাকুর নিতান্তই বাঁকিয়া বসিলেন। ঠাকুরই মন্ত্রণা করিয়া ওলাদেবীকে

গ্রামে ডাকিয়া আনিলেন। গ্রামে হাহাকার উঠিল। দেবী প্রথমেই জেলে-পাড়ায় প্রবেশ করিলেন—পাড়াটা নদীর তীরেই কি না। আজ ও বাড়ির রসিক দাস গেল, কা'ল ফটিকের ছেলেটা গেল, তার পর দিন হরি আক্রান্ত হইল। ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই সে মরিল। রামমোহন ওলাউঠার বীজ লইয়া ঘরে গেল। সে ঘরে গিয়া দেখে, তাহার স্ত্রী তাহার অগ্রে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। একই দিনে একই সময়ে স্বামী স্ত্রী চলিয়া গেল। দেবী রামমোহনের বৃদ্ধা মাতাকেও কিছু বলিলেন না, বাতাসীকেও কিছু বলিলেন না। তাহার পর ক্ষুদ্র হরিশপুর গ্রামের ১৩৯ জনের হিসাবনিকাশ করিয়াই দেবী গ্রামান্তরে চলিয়া গেলেন। বাতাসীর বিবাহ চাপা পড়িয়া গেল—কাহার বিবাহ কে দেয়?

দুই তিন মাস কাটিয়া গেল। রামমোহন মেয়ের বিবাহের জন্য তিনশত টাকা সঞ্চয় করিয়াছিল। তাহাই ভাঙ্গিয়া বাতাসী ও তাহার ঠাকুরমার দিন চলিতে লাগিল। এমন সময়ে একদিন পুরোহিত-মহাশয় রামমোহনের বাড়িতে পদধূলি দান করিলেন। অন্যান্য কথার পর তিনি বলিলেন, "মোহন ত চলিয়া গেল, এখন আমাকেই ত তোমাদের মঙ্গল অমঙ্গল দেখিতে হয়। তা এখন মেয়েটার কোন রকমে সাতপাকে দিতে ত হয়, কি বল?

বুড়ি বলিল, "তা ত বটেই। আমাদের ত আর কেউ নেই; আপনিই আছ: যা হয় আপনিই কর।"

পুরোহিত-মহাশয় বলিলেন, "আমি স্বরূপকেও বলি, গ্রামের দশজনকেও বলি; যাতে শুভকর্মটা এই মাসেই হোয়ে যায়, তাই করা যাবে; সে জন্য তুমি ভেবো না।" এই বলিয়া পুরোহিতঠাকুর চলিয়া গেলেন।

বাতাসী ঘরের মধ্যে বসিয়া ছিল, সে সব কথা শুনিল। পুরোহিত চলিয়া গেলে বাতাসী তাহার ঠাকুরমাকে বলিল, "ঠাকুরমা, আমি সব শুনেছি। তোমরা যাই বল, আর যাই কর, আমি বিয়ে কো'রব না। বাবা গেল, মা গেল, বিয়ে আর যায় না।"

বুড়ি নাতিনের কথা শুনিয়া একেবারে অবাক্। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বুড়ি বলিল "তুই বলিস কি, বাতাসী! বিয়ে করবি নে? সে কি কথা? অমন কথা মুখেও আনিস্ নে; লোকে বল্‌বে কি?"

বাতাসী রাগিয়া বলিল, "লোকে যা বল্‌তে হয়, বলুক। আমার দশটা ভাইও নেই, বোনও নেই যে, লোকের কথায় ভয় পাবো। তুই চোক বুজ্‌লেই আমার সব গেল; আমি বিয়ে কিছুতেই কোর্‌বো না।"

বুড়ি রাগিয়া বলিল "আবাগী, বিয়ে করবিনে, খাবি কি? তোর বাবা ত জমিদারি রেখে যায়নি; আর ব'সে খেলে রাজার ভাণ্ডারও ফুরিয়ে যায়। শেষে একটা কলঙ্ক কিন্‌বি না কি?"

বাতাসী বলিল "তোর মুখে আগুন; রামমোহন মাঝির মেয়ের কলঙ্ক রটায়, তার দিকে কু-নজরে চায়, এমন লোক এ সাত গাঁয়ের মধ্যে নেই। খাবো কি বল্‌ছিস্? জেলের মেয়ে, খাবো কি? তুই বুড়ো হো'য়েছিস, ঘরে বো'সে থাক্‌বি, আমি গাঁয়ে গাঁয়ে মাছ বেচে তোকে খাওয়াব,—তার জন্য ভয় কি?"

বুড়ি আসল কথাটা আর চাপিয়া রাখিতে পারিল না; বলিল, "দিদি, ভয় সবই। তোর

এই সোমত্ত বয়েস, তারপর এই রূপ; সবই ভয় দিদি, সবই ভয়। এত বড় মেয়ের কি আইবুড়ো থাক্‌তে আছে—না, কেউ থাকে?"

বাতাসী বলিল "তা, তুই যা বল্‌ ঠাকুরমা! আমি এ জন্মে আর বিয়ে কো'রছিনে।"

বুড়ি বলিল. "কেন স্বরূপকে কি মনে ধরে না? তা, তাকে বিয়ে না করিস, অন্য বর দেখি।"

বাতাসী বলিল, "তুই ফের যদি বিয়ের কথা ব'ল্‌বি তা হোলে আমার যে দিক দুই চোখ যাবে সেই দিকে চোলে যাবো।"

বুড়ি তখন বিমর্ষভাবে বলিল, "তা আমি ত আর তোর সঙ্গে কথায় পেরে উঠ্‌ব না। যাই তোর বরের কাছে; সে যদি পারে।"

বুড়ি সত্যসত্যই স্বরূপের বাড়ি গেল; তাহাকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিল। স্বরূপ কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল, "ঠাকুরমা, তুমি ঘরে যাও। আমি বাতাসীর মন বুঝিব।"

স্বরূপ অনেক চেষ্টা করিয়াছে, অনেক বুঝাইয়াছে; বাতাসীর সেই এক কথা,—"আমি বিবাহ করিব না। তোমাকেও না—আর কাহাকেও না।"

একদিন স্বরূপ বাতাসীকে বলিল, "দেখ বাতাসী, তোমার জন্যে আমি এতদিন ব'সে আছি। আমার এ সংসারে কেউ নেই। তুমি কি মনে কর, আমি তোমায় ভালবাসিনে। তুমি কি ভাব, আমি তোমায় যত্ন কো'র্‌বো না? বাতাসী, আমি তোমায় দিন রাত ভাবি ঝড়বৃষ্টির রাত্রিতে যখন নদীতে লোক পার ক'র্‌তে যাই, তখন তোমার মুখ মনে কো'রেই আমি বল পাই। যখন খালি ঘরে আঁধার রেতে একলা রাঁধিবাড়ি, তখন তোমার কথাই মনে করি। কতদিন তোমার কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে রাত হোয়ে যায়, আর রাঁধিনে—না খেয়েই প'ড়ে থাকি। তারপর সকাল বেলায় যখন তোমাকে দেখি, তখন মনেও হয় না যে, আগের রাত্রি আমার উপবাস গিয়েছে। বাতাসী,—"স্বরূপ আর কিছু বলিতে পারিল না, তাহার চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল।

স্বরূপের কথা শুনিয়া বাতাসীর মন নরম হইল কি না বলিতে পারি না; কিন্তু আজ সে স্বরূপের সঙ্গে অনেক কথা কহিল। অন্যদিন স্বরূপের কথায় সে কানও দিত না। আজ সে স্বরূপকে বলিল "তোমাকে সোজা কথা বলি। দেখ, তোমার কেউ নেই, আমার বুড়ি ঠাকুরমা আছে। তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হোলে ঠাকুরমা কোথায় যাবে? তুমি বো'লবে 'আমার বাড়িতে এসে থাক্‌বে।' তা হ'তেই পারে না; রামমোহন মাঝির মা দু'টো ভাতের জন্য তার নাতজামায়ের বাড়িতে থাক্‌বে—তা' আমি কিছুতেই সইতে পারবো না। আমি নিজে রোজগার ক'রে আমার ঠাকুরমাকে খাওয়াব; তাকে তোমার দোরে আস্‌তে দেব কেন? অহঙ্কারই বল, আর যাই বল, তোমায় আমি ব'ল্‌ছি, আমার যে কথা, সেই কাজ। হয় ত তুমি বোল্‌বে, তুমিই আমাদের বাড়ি এসে থাক্‌বে। তোমাকে ভালবাসি আর নাই বাসি, তুমি ঘরজামাই হ'তে যাবে কেন? যে নিজের বাপের ভিটে ছেড়ে বিয়ের লোভে ঘরজামাই হ'তে চায়, আমি তাকে বিয়ে কো'রবো না। তুমি আর আমাকে কিছু বোলো না। এর পর থেকে যদি তুমি আমার বিয়ের কথা তোলো, তোমার সঙ্গে আমি কথাও কইবো না।"

স্বরূপ নির্বাক হইয়া বাতাসীর কথা শুনিল। তাহার কথা শেষ হইলে, স্বরূপ কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু বাতাসী তাড়াতাড়ি ঘরে চলিয়া গেল। স্বরূপ কি ভাবিতে ভাবিতে খেয়ানৌকায় গিয়া বসিল।

বাতাসী এখন মাছ বিক্রয় করিয়া বেড়ায়। নদীর তীরে তীরে ঘুরিয়া জেলেদের নিকট হইতে সে মাছ কিনিয়া ওপারের হাটে যায়; সেখানে মাছ বিক্রয় করিয়া হাটের পরে আবার নদী পার হইয়া ঘরে আসে। প্রথম প্রথম কয়েকদিন সে স্বরূপের নৌকাতেই পার হইত, স্বরূপও সুবিধা পাইলেই বাতাসীকে কত কথাই বলিত। বাতাসী কোনও কথার উত্তর দিত না। একমাস পরে একদিন বাতাসীর মাসের পারের পয়সা চারি আনা স্বরূপকে দিতে গেল। স্বরূপ পয়সা লইয়া নদীর জলে ফেলিয়া দিল। তাহার পর বলিল, "বাতাসী, তুমি কি মানুষ? কি বো'লে আমায় পারের পয়সা দিতে এলে?"

বাতাসী এ কথার আর উত্তর করিল না; চুপ করিয়া ঘরে চলিয়া গেল। সেই দিন হইতে সে স্বরূপের ঘাটে আর পার হইত না; এক ক্রোশ ভাটিতে আর একখানি খেয়া ছিল, বাতাসী সেই খেয়ায় পার হইত। তাহাতে এপার ওপারে প্রায় দুই ক্রোশ পথ হাঁটিতে হইত, কিন্তু সে তাহা গ্রাহ্যই করিত না। এদিকে স্বরূপের খেয়ায় প্রতিদিন কত লোক পার হইত। দূর হইতে লোকে যখন আসিত, তখন স্বরূপ মনে করিত উহাদের মধ্যে বাতাসী নিশ্চয়ই আছে। তাহারা ঘাটে আসিত—বাতাসী তাহাদের সঙ্গে নাই, স্বরূপ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিত। কত দিন সে নৌকা লইয়া বসিয়া থাকিত, তাহার বুক ভাঙ্গিয়া কান্না আসিত। বাতাসীকে পার করিবার জন্য সে কত আগ্রহে পথের দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকিত। দিনের পর দিন গেল—বাতাসী আর পার হইবার জন্য আসে না। সন্ধ্যার সময় যখন পারের লোক আসিত না, স্বরূপ তখন নৌকায় বসিয়াই আকাশপাতাল ভাবিত; একটু শব্দ হইলেই তীরের দিকে চাহিয়া দেখিত। তাহার মনে হইত, এইবার হয় ত বাতাসী আসিতেছে।

এমনই করিয়া কিছু দিন গেল। একদিন অপরাহ্নে বড় ঝড় উঠিল। বেলা তিনটা হইতে আকাশে মেঘ সাজিতেছিল। চারিটা বাজিতে না বাজিতেই ঝড় উঠিল;—যেমন ঝড় তেমনই বৃষ্টি। ইছামতী নদী গর্জন করিতে লাগিল; চারিদিক অন্ধকার হইয়া গেল। আকাশে প্রলয়ের মেঘ গর্জিতে লাগিল। স্বরূপ খেয়া নৌকাখানি ডবল কাছি' দিয়া তীর-সংলগ্ন করিল। বৃষ্টিতে তাহার কাপড় ভিজিয়া গেল। সে তখন তাড়াতাড়ি তাহার কুটিরে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। ভিজা কাপড় ছাড়িয়া এক ছিলিম তামাক সাজিয়া স্বরূপ ধূমপানের আয়োজন করিতেছে, এমন সময় বাহিরে যেন একটা শব্দ হইল; স্বরূপ কান পাতিয়া শুনিল, কে যেন ঘরের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার পরেই অতি কোমলকণ্ঠে কে ডাকিল, "স্বরূপ।"

এ যে চেনা গলা! এই কণ্ঠস্বর শুনিবার জন্য স্বরূপ যে আজ একমাস কান পাতিয়া প্রতীক্ষা করিতেছিল! কিন্তু আজ এ কি? এমন অসময়ে এই দুর্যোগে, প্রবল ঝড়বৃষ্টি মাথায় করিয়া বাতাসী আসিবে কেন? না, না, বাতাসী নয়। স্বরূপ মনে করিল, তাহার ভ্রম হইয়াছে। এই ঝড়ে, এই দুর্দিনে বাতাসী তাহার কুটিরদ্বারে আসিবে? তাও কি হয়? তবুও স্বরূপ কান পাতিয়া রহিল। হায় মোহ!

এবার শব্দটা আরও একটু স্পষ্ট হইল। কে ডাকিল, "স্বরূপ! স্বরূপ! ঘরে আছ?" আর ত সংশয় নাই! এ নিশ্চয়ই বাতাসীর কণ্ঠস্বর! স্বরূপ তখন তাড়াতাড়ি হুঁকা রাখিয়া দ্বার খুলিল। দেখিল, দ্বারের সম্মুখে বাতাসী একটা ঝুড়ি মাথায় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার সর্বাঙ্গ সিক্ত ও কর্দমাক্ত।

স্বরূপ আর বাতাসীকে কথা কহিবার অবকাশ দিল না। তাড়াতাড়ি তাহার মস্তক হইতে মাছের ঝুড়ি নামাইয়া লইল, এবং তাহার হাত ধরিয়া ঘরের মধ্যে টানিয়া আনিল। তাহার পর সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

তখন বাতাসী বলিল, "স্বরূপ! আমায় পার ক'রে দেবে? আমাকে এখনই ওপারে যেতে হবে।"

পার!—এমন ভয়ানক দুর্যোগে, এই ঝড়ে পার! বাতাসী বলে কি? এই প্রলয়ের ঝড়ে পার কবিবে হইবে—তাও যাকে তাকে নয়, বাতাসীকে! বাতাসী বলে কি?

স্বরূপ কথাটা হয় ত শুনিতে পায় নাই মনে করিয়া বাতাসী আবার বলিল, "স্বরূপ! আমায় পার ক'রে দেবে?

স্বরূপ বলিল, "বাতাসী! তোমাকে পার ক'রবার জন্য ত আমি দিনবাত পথ চেয়ে আছি, তুমি ত আমার খেয়ায় পার হ'তে আস না বাতাসী!"

বাতাসী কোমলস্বরে বলিল, "স্বরূপ, আমাকে পাঁচটার মধ্যে এই মাছ ওপারে মুখুয্যে বাবুদের বাড়ি দিতে হবে। তিন টাকা বায়না নিয়েছি। আমাকে যেতেই হবে। ও ঘাটে গিয়েছিলাম, তারা এ ঝড়ে খেয়া দেবে না। তাই বিপদে প'ড়ে তোমার কাছে এসেছি। তুমি আমায় পার কো'রে দেও। আজকের এই ঝড়ে তুমি ছাড়া আর কেউ পারে যেতে সাহস ক'রবে না।" এই বলিয়া বাতাসী স্বরূপের মুখের দিকে চাহিল। স্বরূপ এমন রূপ আর কখনও দেখে নাই; এমন কথাও আর কখন শোনে নাই। সে বলিল, "বাতাসী, তোমায় পারে দিয়ে যাব তার আবার কথা কি? কিন্তু তোমায় না গেলে হয় না? তুমি এইখানে থাক, আমি ওপারে মাছ পৌছে দিয়ে আসি। বড় তুফান বাতাসী, আজ বড় তুফান!"

বাতাসী বলিল, "তা হবে না স্বরূপ! তুমি যে একেলা এই ঝড়ে আমার জন্য পারে যাবে, তা হবে না; আমিও যাব। চল, আর দেরি কোরো না, আঁধার ক্রমেই বা'ড়ছে!"

স্বরূপ বলিল, বাতাসী, আমার জন্য তোমার ভয়! এ কথা ত আর কখনও বলনি। চল, তোমাকে আজ পারে নিয়ে যাই! স্বরূপ হালদার আজ ঝড়ের সঙ্গে লড়াই ক'রে পাড়ি মেরে দেবে। চল, আজই তোমায় নিয়ে পারে যাবার সময়।" স্বরূপের চক্ষু দিয়া আগুন বাহির হইতেছিল। সে তখন মাছের ঝুড়ি মাথায় তুলিয়া লইল। বাতাসী দুইখানি বৈঠা লইল।

নদীর মধ্যে কি যাওয়া যায়? অনেক কষ্টে তাহারা নৌকায় উঠিল। স্বরূপ একবার আকাশের দিকে চাহিল, একবার বাতাসীর মুখের দিকে চাহিল, তাহার পর নৌকার কাছি খুলিয়া দিল। নৌকা নাচিয়া উঠিল। স্বরূপ বলিল, "বাতাসী, ওখানে নয়; আমার এই হা'লের কাছে এসে বো'সো। দেখ, স্বরূপ তোমায় পারে নিয়ে যেতে পারে কি না?"

সত্যসত্যই স্বরূপ আজ ঝড়ের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। বাতাসী

থাকিয়া থাকিয়া বলে, "বাঁয়ে স্বরূপ, বাঁয়ে টান রেখো" "ঐ ঢেউটা কেটে ওঠো", আর বিহ্বলদৃষ্টিতে সে এক একবার স্বরূপের দিকে চায়। কি অপূর্ব কৌশল! কি আশ্চর্য শক্তি! স্বরূপ নিজে নিজেই বলিতে লাগিল "চল মোর ভাই, আর একটু, আর একটু" "এই ঢেউটা কাটাতে পাল্লেই হয়" "সাবাস জোয়ান!" নিজের বল বৃদ্ধির জন্যই স্বরূপ কথা কহিতেছে। যখন এক একবার সে ক্লান্ত হইয়া পড়ে, তখন সে বাতাসীর মুখের দিকে চায়, আর তাহার বুকে নূতন করিয়া বল আইসে।

ঝড়বৃষ্টির সহিত তুমুল সংগ্রাম করিয়া স্বরূপের নৌকা পারে পৌঁছিল। স্বরূপ এক লম্ফে তীরে নামিয়া নৌকা টানিয়া ধরিল; তাহার পর নদী-তীবের বট গাছের সঙ্গে নৌকার কাছি বাঁধিল। তখনও সন্ধ্যা হয় নাই।

স্বরূপ ক্লান্ত হইয়া নদী-তীরে বসিয়া পড়িল। তখন বৃষ্টি পড়িতেছে। বাতাসী তখন স্বরূপকে বলিল, "স্বরূপ, আজ আর ওপারে গিয়ে কাজ নেই। নৌকা এখানেই থাক্, তুমি ওপরে চল; বাজারে একটা দোকানে আজ তুমি থাকিও। আমার সঙ্গে'ত কিছুই নেই। বাবুদের বাড়ি যে টাকা পাবো তার থেকে কিছু তোমাকে দিয়ে আস্‌বো; তুমি খেয়ে দেয়ে রাত্রিটা কাটিয়ে দিও। আমি বাবুদের বাড়ির এক কোণে প'ড়ে থাক্‌ব। কি বল?"

স্বরূপ উঠিয়া দাঁড়াইল; বলিল, "তা হবে না বাতাসী! তোমাকে না নিয়ে আমি কোথাও যাবো না। তোমায় পারে এনেছি, তোমায় ঘরে নিয়ে যাবো। যতক্ষণ তুমি না আস্‌বে ততক্ষণ পথের দিকে চেয়ে আমি এই খেয়ানৌকায় ব'সে থাক্‌বো। মাথায় আকাশ ভেঙ্গে প'ড়লেও নড়বো না।" বাতাসী হাসিয়া বলিল, "আর যদি আমি না আসি।"

তা হ'লে স্বরূপেরও এ জীবনের মত খেয়া দেওয়া শেষ। আর স্বরূপ কাউকে পার ক'রবে না। যাকে পার ক'রবার জন্যে সে এত দিন বেঁচে ছিল, সে যদি আর পারে না যায়, স্বরূপের খেয়া দিয়ে কাজ কি?

বাতাসী মাথা নিচু করিয়া কি ভাবিল; তাহার পর বলিল, "তুমি নৌকায় থাক; আমি মাছ পৌঁছে দিয়ে আস্‌চি; তার পর দু'জনে ঘরে যাবো।" এই বলিয়া বাতাসী মাছের ঝুড়ি মাথায় করিয়া তীরে উঠিল, স্বরূপ একদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। বাতাসী যখন অদৃশ্য হইল, তখন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে নৌকার উপর বসিয়া পড়িল।

যখন সন্ধ্যা হয় হয়, তখন বাতাসী ফিরিয়া আসিল। তখন আকাশে আরও একখানা ঘন কালো মেঘ উঠিতেছিল! নদীতীর অন্ধকার, ঘাটে একখানিও নৌকা নাই। বাতাসী ডাকিল "স্বরূপ"; স্বরূপ উত্তর দিল. "বাতাসী"!

এক লম্ফে নৌকা হইতে নামিয়া স্বরূপ বাতাসীর নিকট উপস্থিত হইল। বাতাসী আকাশের নূতন কালো মেঘখানি দেখাইয়া বলিল, "স্বরূপ! ও মেঘখানি বড় ভাল নয়, মেঘের গতিক দেখে নৌকা ছাড়লে হ'তো।" স্বরূপ মেঘখানির দিকে চাহিয়া বলিল, "ও কিছু নয়। ও মেঘ উঠে আস্‌তে আস্‌তে আমরা পাড়ি জমিয়ে দেব। ঐ ত ওপারের ঝাউগাছ দেখা যাচ্ছে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে চ'লে যা'ব। তুমি নৌকায় উঠে ভাল ক'রে ব'স।' কোন ভয় নাই।

বাতাসী বলিল, "স্বরূপ, মেঘখানি একটু দেখে গেলেই হ'ত। এখনই তুফান উঠ্‌বে।

আকাশের গতিক ভাল নয়।" স্বরূপ সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল। সিকিখানি নদী যাইতে না যাইতেই একেবারে আকাশ ভাঙ্গিযা ঝড় আসিল। স্বরূপ বলিল, "বাতাসী ভয় নাই; ঐ ত ডাঙ্গা দেখা যাচ্ছে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে যাবো।"

বাতাসী একটু দূরে বসিয়াছিল, সে তখন স্বরূপের আরও একটু নিকটে আসিয়া বসিল। স্বরূপ সিংহবিক্রমে হাল চালাইতে লাগিল। এমন সময় হঠাৎ হালখানি ভাঙ্গিয়া গেল, স্বরূপ জলে পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া গেল। নৌকা ঢেউয়েব উপব আছাড় খাইতে লাগিল। স্বরূপ তখন চিৎকার করিয়া উঠিল, "বাতাসী! এবার নৌকা গেল, আর রক্ষা নাই! বৈঠা কৈ?" তখন বৈঠা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; তাহাদের অজ্ঞাতারে বৈঠা দুইখানিই জলে পড়িয়া গিয়াছিল।

তখন স্বরূপ বলিল, "বাতাসী, আর রক্ষার উপায় নাই। আমাব জন্য ভাবছিনা বাতাসী! কিন্তু আজ যে নৌকাব তুমি রয়েছ! তোমাকে আজ বাঁচাতে পারছিনা, এ কষ্ট যে মরলেও যাবে না। বাতাসী, কেন তোমায় এই ঝড়ের মধ্যে নৌকায় তুলেছিলাম, কেন তোমার কথা শুনলাম না। আমিই তোমাকে মেরে ফেললাম। বাতাসী, ঐ যে ঢেউটা আসছে, ঐ ঢেউয়েই আমাদের নৌকা ডুবে যাবে।"

বাতাসী তখন উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। সে বলিল, "স্বরূপ, আমি কি মবতে ভয় পাই! এস দুইজনে আজ গলা জড়িয়ে ধরে মরি। আজ আমাদেব বিযে। স্বরূপ আজ আমাদের বিযে!" এই বলিয়া বাতাসী স্বরূপের গলা জড়াইয়া ধরিল।

বাতাসী তখন চিৎকার করিয়া বলিল, "স্বরূপ, চল আজ আমরা পারে যাই।"

প্রকাণ্ড একটা ঢেউ আসিয়া নৌকাখানি আছড়াইয়া ফেলিল; স্বরূপ ও বাতাসী দৃঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ হইয়া ইছামতীর গর্ভে ডুবিয়া গেল।

আজও বদনগঞ্জের লোকেরা স্বরূপ-বাতাসীর গল্প করে। যে ঘাটের সম্মুখে তাহাদের নৌকা ডুবিয়া ছিল। এখনও তাহাকে সকলে "স্বরূপমাঝির ঘাট" বলিয়া ডাকে।

—সাহিত্য ২২শ বর্ষ ১৩১৮, ৯ম সংখ্যা, পৌষ।

পরাণ মণ্ডল

মামুদপুর গ্রামে হিন্দু মুসলমান উভয় জাতিরই বাস। গ্রামখানিও নিতান্ত ছোট নহে। গ্রামে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যাই অধিক। উভয় জাতির মধ্যেই দুই চারি ঘর অবস্থাপন্ন গৃহস্থও আছে।

ওলাদেবী প্রায় প্রতি বৎসরই এই গ্রামে শুভ পদার্পণ করিয়া থাকেন। তাঁহার কৃপা বা শুভদৃষ্টি মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুর উপরই অধিক ছিল। দেবতারাও জাতিভেদ মানেন!

এই পক্ষপাতদোষ ক্ষালনের জন্য একবার দেবী গ্রামে আসিয়াই প্রথমে মুসলমান পল্লিতে শুভ পদার্পণ করেন। তিন দিনের মধ্যেই হারু মণ্ডল ও তাহার স্ত্রী এই দেবীর কৃপায় কোন্ এক অজানা অচেনা দেশে চলিয়া গেল। মণ্ডলের বাড়িতে রহিল তাহার সাবালক বড় ছেলে পরান ও নাবালক ছোট ছেলে নয়ান। স্ত্রীলোকের মধ্যে রহিল পরানের যুবতী পত্নী; নয়ানের বয়স তখন সাত বৎসর।

পরানের স্ত্রীর বয়স যদিও উনিশ বৎসর; কিন্তু তাহার মাথার মধ্যে উনচল্লিশ বৎসরের বুদ্ধি খেলিত; আর সে বুদ্ধির গতিটা "সু"র দিকে না গিয়া "কু"রই দিকে গিয়াছিল। এতদিন মাথার উপর বাঘের মত শ্বশুর ও বাঘিনীর মত শাশুড়ি থাকায় পরানপত্নী টুঁ শব্দটি করিবারও সাহস পায় নাই। পরান যদিও পঁচিশ বৎসর বয়সের যুবক, কিন্তু সে ত স্কুল কলেজে পড়ে নাই, সভ্যতার আলোকও পায় নাই; সুতরাং সে পত্নীর জন্য মাতা পিতার অবাধ্য হইতে শিক্ষালাভ করে নাই। চাষার ছেলে, চাষবাস করে, খায় দায়, আমোদ আহ্লাদ করে, আর এই পঁচিশ বৎসর বয়সেও বাপের কথার প্রতিবাদ করা দূরে থাকুক, তাহার সম্মুখে কথা বলিতেও সাহস পায় না,—পরান সত্যসত্যই গো-বেচারি ভালমানুষ।

পরানের স্ত্রী নয়ানকে দেখিতে পারিত না। তাহার মনে কেন যে নয়ানের উপর বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছিল, তাহার কোন কারণই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। একে স্ত্রীলোক, তায় সুন্দরী যুবতী; তাহার মনের ভাব "দেবাঃ ন জানন্তি" আমরা ত ক্ষুদ্র মানুষ!

এতদিন মাথার উপর শ্বশুর শাশুড়ি ছিল,—তাই পরানের স্ত্রী আত্ম-প্রকাশ করিতে পারে নাই। সে হয় ত প্রতিদিন আল্লার কাছে শ্বশুর শাশুড়িব মৃত্যুকামনা করিত; কিন্তু আল্লা, পীর বা পয়গম্বর কেহই তাহার এ আবেদন বা অব্দারে কর্ণপাত করেন নাই। অবশেষে কি কারণে জানি না, ওলাদেবী তাহার আরজ মঞ্জুর করিলেন। পরানের বাপ মা সংসারের কর্তৃত্বভার তাহাদের পুত্রবধূর উপর সমর্পণ করিয়া ওলাদেবীর অনুসরণ করিল। পরাণের স্ত্রী হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল।

সংসারের কর্তৃত্বভার হাতে পাইয়াই পরান-পত্নী নয়ানের উপর তাহার ক্ষমতা জাহির করিতে লাগিল। বৌ যখন অকারণ তাহার উপর বাক্যবাণ বর্ষণ করিত, তখন সে ছেলেমানুষ ছলছল নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া থাকিত। একটি কথাও তাহার মুখ দিয়া বাহির হইত না। বাপমায়ের মৃত্যুর পর প্রথম প্রথম দুই চারি দিন সে বৌয়ের নিকট এটা ওটা চাহিত,

ক্ষুধাবোধ হইলে খাইতে চাহিত; কিন্তু সে যখন দেখিল যে বৌ মুখনাড়া না দিয়ে কথা বলে না, তখন সে ক্ষুধায় কাতর হইলেও মুখ ফুটিয়া ভাত চাহিত না; সাত বৎসরের বালক তখনই বুঝিয়াছিল যে, বাপমায়ের সঙ্গেই তাহার আদর আব্‌দারেরও কব্বর হইয়াছে।

পরানের বাপের বিঘা আষ্টেক জমি ছিল। তাহারা বাপবেটায় সেই জমি চাষ করিত। জমিতে যে ধান ও রবিশস্য হইত, তাহার দ্বারা সারা বৎসর চলিত না—দেশে অজন্মা যে লাগিয়াই আছে। সেইজন্যই যখন তাহাদের চাষের তাড়া না থাকিত, তখন তাহারা বাপবেটায় মজুর খাটিত। তাহারা কখনও বা অন্যের জমি চাষ করিয়া দিত, কখনও বা ঘরামির কাজ করিত। এই উপায়ে তাহাদের যাহা লাভ হইত, তাহাতে তাহাদের সংসার চলিয়া যাইত। তাহারা যদি ইচ্ছা করিত, তাহা হইলে মাসে মাসে কিছু কিছু,—টাকাটা সিকেটা সঞ্চয়ও করিতে পারিত। কিন্তু সঞ্চয় করা বা ভবিষ্যৎচিন্তা করা বাঙলার চাষীর কোষ্ঠীতে লেখে না! হারুমণ্ডল ও পরান কৃষকের মতই ছিল। যে দিন জন খাটিয়া বাপবেটায় দশ আনা পয়সা পাইত, সে দিন ছয় আনা দিয়া হয় ত একটা ইলিশ মাছই কিনিত, দুই আনা দিয়া দুই ভাঁড় দধিই কিনিত। তাহার পরদিন হয় ত বেগুনভাতে ভাত,—অনেক সময় তাহাও মিলত না। সুতরাং হারু মণ্ডল যখন মরিয়া গেল, তখন পরানের ঘরেও একটি পয়সাও ছিল না। দুই বাপবেটায় রোজগার করিত; এখন বাবা চলিয়া গেল; একেলা পরান চাষের কাজই দেখিবে, না জনমজুরই খাটিবে। তবে সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, বাড়িতে খাইবার লোক সবে তিন জন। তবুও পরানকে খাটিতে হইত ; সে যে দুদণ্ড বসিবে, বা ছোট ভাইটির তত্ত্ব লইবে, তাহা আর তাহাব ঘটিয়া উঠিত না। সন্ধ্যার পূর্বে বা কোন কোন দিন সন্ধ্যার সময় বাড়ি আসিয়া সে শুধু বলিত "ওরে নয়ানে, গরু দুটো গোয়ালে তুলেছিস্ ত, ভাল ক'রে জাব দিইছিস?" নয়ান যখন সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িত, তখন পরান নিশ্চিন্ত হইয়া বলিত "তবে এক কল্‌কে তামুক সাজ্।" নয়ান তামাক সাজিয়া দিত, পরান তামাক খাইয়া হাত মুখ ধুইতে যাইত। তাহার পর তাহার স্ত্রী যাহা কোলের কাছে ধরিয়া দিত, তাহাই দুইটা নাকে মুখে দিয়া শুইয়া পড়িত। ভাইয়ের যে অযত্ন হইতেছে বা হইতে পারে, একথা তাহার মনেই আসিত না। তাহার স্ত্রীর প্রকৃতি তাহার অবিদিত ছিল না, কিন্তু সেই ভালমানুষের মেয়ে যে এমন একটা কচিছেলের উপর কোন অত্যাচার করিতে পারে, এ কথা তাহার সাদাসিদে চাষা বুদ্ধিতে আসিত না।

একদিন পরাণের স্ত্রী নয়ানকে পুকুর হইতে একটা পাথরের বাটি ধুইয়া আনিতে বলিয়াছিল। পাড়াগাঁয়ের পুকুরে ত আর বাঁধা ঘাট থাকে না, ইঁটের তৈরি সিঁড়িও থাকে না। নয়ানদের বাড়ীর পাশেই যে পুকুর ছিল, তাহার একটি ঘাটে দুইটা তালগাছ ফেলা ছিল; সেই তালের গুঁড়ি দুইটাই ঘাটের সিঁড়ির কাজ করিত। জলের মধ্যে থাকিয়া থাকিয়া গুঁড়ি দুইটায় সেঁতলা ধরিয়া গিয়াছিল; ভয়ানক পিচ্ছিল হইয়াছিল। সকলেই বিশেষ সাবধানে সেই ঘাটে নামা ওঠা করিত। নয়ান যখন পাথরের বাটি ধুইবার জন্য ঘাটে যায়, তখন বৌ বলিয়া ছিল "জলদি আসিস্, তোর ত আঠারো মাসে বছর।" পাছে বিলম্ব হইলে গালাগালি খাইতে হয়, এই ভয়ে নয়ান যেই তাড়াতাড়ি ঘাটে নামিতে গিয়াছে, অমনই তাহার পা পিছ্‌লাইয়া

গেল এবং হাতের বাটিটা তালের গুঁড়ির উপর পড়িয়া একেবারে দুইখানি হইয়া গেল; নয়ানও বিশেষ আঘাত পাইল।

নয়ান তাড়াতাড়ি গা ঝাড়িয়া উঠিয়া দেখে বাটিটা ভাঙিয়া গিয়াছে। তখন তাহার আঘাতের বেদনার কথা মনে থাকিল না; তাহার অপেক্ষাও গুরুতর বেদনা যে আজ তাহার নসিবে আছে, তাহাই ভাবিয়া বালক কাঁদিয়া ফেলিল। বাড়ি যাইতে তাহার সাহস হইল না। সে একবার মনে করিল, এখনকার মত ত পলায়ন করি, তাহার পর যাহা হয় হইবে। কিন্তু পরক্ষণেই তাহার মনে হইল যে, পলায়ন করিয়া ত সে শাস্তির হাত এড়াইতে পারিবে না; পলায়ন করিলে হয় ত শাস্তি আরও গুরুতর হইবে। বালক কি করিবে, স্থির করিতে না পারিয়া ঘাটের ধারে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল।

এদিকে তাহার ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব দেখিয়া তাহার ভ্রাতৃবধূ চিৎকার করিয়া ডাকিল "ওরে হাড়হাবাতে, পুকুর ঘাট কি যমের বাড়ি? এমন বজ্জাত, কুড়ে ছেলেও দেখি নি!"

নয়ান তখন কি করে! যাহা অদৃষ্টে থাকে তাহাই হইবে, ভাবিয়া সে কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ির দিকে আসিতে লাগিল। তাহার পা দুখানি আর চলে না। যখন সে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিল, তখন তাহার ভ্রাতৃবধূ গর্দভনিন্দী স্বরে বলিল "লবাবজাদার আর ঠ্যাং চলে না, পুকুর কি সাতকোশ রে কুড়ে ! দে পাথর বাটি!"

নয়ান মৃদুস্বরে বলিল "পাথর বাটিটা ভেঙ্গে গেছে, আমি না পিছ্‌লে প'ড়ে গিয়েছিলাম।"

আর যাবে কোথায়! রাক্ষসী বৌটা একেবারে বাঘিনীর মত গর্জন করিয়া উঠিল, "ভেঙে গেছে! ওরে শয়তান, হারাম্‌খোর, বেইমান, কেমন ভেঙে গেছে, দেখাচ্ছি।' এই বলিয়া পরাণের স্ত্রী নয়ানের দিকে ধাবিতা হইল। নয়ান যদি তখন পলায়ন করে, তবে আর তাহাকে প্রহার খাইতে হয় না; কিন্তু ছেলেটা এতই শান্ত, এতই ভালমানুষ, এতই ভীত যে, বৌয়ের রণচণ্ডী মূর্তি দেখিয়া তাহার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাইয়া গেল। সে কাঠের পুতুলের মত সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল।

পরাণের স্ত্রী ছুটিয়া আসিয়া "তবে রে হারামের পুত' বলিয়া সেই বালকের গালে ঠাস্‌ করিয়া চড় লাগাইল। নয়ান "ও আল্লা, জান গ্যাল" বলিয়া পড়িয়া গেল। রাক্ষসীর তখনও রাগ থামে নাই। সে ঐ মূর্চ্ছিত-প্রায় ভূপতিত বালককে একটি পদাঘাত করিয়া বলিল, "ন্যাকামি দেখ! ওঠ্‌ বল্‌ছি, নইলে তোর গোস্ত টুক্‌রো টুক্‌রো কর্‌ব।"

নয়ান মূর্ছিত হয় নাই, কিন্তু সেই দৃঢ়হস্তের চড় তাহার বড লাগিয়াছিল, এবং চড়ের বেগ সামলাইতে না পারিয়া সে পড়িয়া গিয়াছিল। পাছে আরও প্রহার খাইতে হয়, এই ভয়ে সে উঠিয়া বসিল। পরানের স্ত্রী তখন আজ্ঞা প্রচার করিল "বেরো আমার বাড়ি থেকে। আর যদি এ বাড়িতে ঢুক্‌বি তাহ'লে তোরে খুনই করে ফ্যাল্‌ব।" বালক নড়িল না। রাক্ষসী আবার গর্জিয়া উঠিল "শিগ্‌গির বেরো, নইলে তোর ভাল হবে না।"

বেলা তখন দ্বিপ্রহর। চৈত্র মাসের রৌদ্র পৃথিবীময় আগুন ছড়াইয়া দিতেছিল। সেই সময়ে পিতৃমাতৃহীন সাতবৎসরের বালক নয়ান কাঁদিতে কাঁদিতে একবার বৌয়ের মুখের দিকে

চাহিল। সেখানে দয়া বা করুণার লেশ মাত্র দেখিতে পাইল না। সে তখন ধীরে ধীরে উঠিয়া বাড়ির বাহির হইয়া গেল। তখনও তাহার মুখে জলবিন্দু পড়ে নাই। মা বাঁচিয়া থাকিলে এতক্ষণ তাহার তিনবার আহার হইয়া যাইত। এখন আর তাহার সে দিন নাই! এখন যে তাহার মুখের দিকে চাহিবার লোক নাই! এক বড় ভাই, সে সকল সময় বাড়ি থাকে না; নয়ানের উপর যে অত্যাচার হয়, তাহাও সে জানে না। নয়ানও কোন দিন কোন কথা বৌয়ের ভয়ে দাদাকে বলে নাই।

নয়ান বাড়ির বাহির হইয়া ভাবিতে লাগিল, কোথায় যাইবে। একবার ভাবিল পাশের কোন বাড়িতে গেলে হয়,—পরক্ষণেই তাহার মনে হইল কাহারও বাড়িতে গেলেই সে সময় সকল কথা বলিতে হইবে; আর সে কথা বৌয়ের কানে পৌঁছিলে তাহার আর রক্ষা থাকিবে না। বয়স সাত বৎসর হইলে কি হয়, এই অল্প কয়েক দিনের দুঃখ ও নির্যাতন, তাহার বয়সকে দ্বিগুণ করিয়া দিয়াছিল। সে তখন স্থির করিল, সে কোথাও যাইবে না। বাড়িব বাহিবে রাস্তার ধারে গাছের ছায়ায় সে বসিয়া থাকিবে। রাগ পড়িয়া গেলে বৌ তাহাকে ডাকিয়া ভাত দিবেই। আর সে যদি নাই ডাকে, তাহার দাদা ত সন্ধ্যার পূর্বে বাড়ি আসিবে; তখন সে দুইটি খাইতে পাইবেই। একবেলা না খাইলে ত মানুষ আর মরে না।

নয়ান বাস্তার পার্শ্বে বটগাছের শীতল ছায়ায় ঘাসের উপব শুইয়া রহিল। প্রথম কিছুক্ষণ তাহাব বড় ক্ষুধাবোধ হইতে লাগিল; তাহার পর সর্বসন্তাপনাশিনী নিদ্রা আসিয়া এই অনাথ শিশুকে কোলে লইয়া বসিলেন। বালক কিছুক্ষণের জন্য মায়ের কোলে স্থান প্রাপ্ত হইল।

সন্ধ্যার পূর্বে পরান দাখানি হাতে করিয়া শ্রান্তদেহে, ধীর পদবিক্ষেপে যখন বাড়ির সম্মুখের সেই গাছের নিকট উপস্থিত হইল, তখন সে দেখিল নয়ান শুষ্কমুখে মলিনভাবে সেই বৃক্ষতলে বসিয়া আছে।

"ওখানে অমন ক'রে বসে আছিস্ যে নয়ানে!" বলিয়া পরান সেই স্থানে দাঁড়াইল। তাহার দাদার—আপন মায়ের পেটের ভাইয়ের মুখের দিকে চাহিয়া নয়ানের শোকের সাগর উথলিয়া উঠিল। সে কাঁদিয়া ফেলিল—তাহার মুখ দিয়া একটি কথাও বাহির হইল না।

পরান তখন নয়ানের নিকট সরিয়া আসিল, তাহার হাত ধরিয়া তুলিল, স্নেহের স্বরে জিজ্ঞাসা করিল "নয়ান, কি হয়েছে ভাই! তুই কাঁদছিস্ কেন? তোর মুখ শুকিয়ে গেছে কেন. তুই কি কিছু খাস্ নি?"

এমন স্নেহের স্বর যে নয়ান অনেক দিন শোনে নাই। পৃথিবীতে এমন কথা বলিবার যে তাহার কেহ আছে, তাহা ত সে জানিত না। নয়ান কাঁদিতে লাগিল। পরান তখন তাহাকে নিজের কোলের মধ্যে টানিয়া লইল। তাহার স্কন্ধের কালো গামছাখানি দিয়া নয়ানের মুখ মুছাইয়া দিল। তাহার পর অতি স্নেহপূর্ণস্বরে বলিল "কি হয়েছে, আমাকে খুলে বল্। কেউ মেরেছে? কেউ কিছু বলেছে?"

নয়ান তখন আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না; সে কাঁদিতে কাঁদিতে সমস্ত কথা পরানকে বলিল। বাপমায়ের মৃত্যুর পব হইতে তাহার উপর কি অত্যাচার হইয়া আসিতেছে, তাহা সব বলিল। তাহার পর সেই দিনের ঘটনা, সেই পাথরবাটি ভাঙিবার কথা,—সেই

গালাগালির কথা—সেই প্রচণ্ড চড়ের কথা,—সেই লাথির কথা—সেই বেলা দ্বিপ্রহরে বাড়ি হইতে তাড়াইয়া দিবার কথা—সমস্ত কথা নয়ান পরানকে বলিল। তাহার পর বলিল "ভাই-জি, আজ তামাম দিন আমার প্যাটে একটা দানাও পড়ে নেই—একরত্তি জলও না।"

পরান এই কথা শুনিয়া রাগে কাঁপিতে লাগিল; তাহার পর সেই সবার কনিষ্ঠ, তাহার পিতামাতার সেই আদরের নিধি—যখন বলিল "ভাইজি, আজ তামাম দিন আমার প্যাটে একটা দানাও পড়ে নেই—একরত্তি জলও না।" তখন পরান আর স্থির থাকিতে পারিল না। সে চিৎকার করিয়া উঠিল "কি, এত বড় কথা! দেখি গে সে হারামজাদিকে! এত বড় গোস্তাকি তার।"

এই বলিয়া পরান পাগলের মত বাড়ির দিকে দৌড়িল। নয়ান তাহার ভাইজির সেই ভীষণ মূর্তি দেখিয়া চিৎকার করিতে করিতে তাহার পিছু পিছু ছুটিল, আর বলিতে লাগিল, "ভাইজি, দাঁড়াও, ভাইজি! ওরে ভাইজি রে!"

পরান বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিয়াই, গর্জন করিয়া বলিল, "দেখি,—কোথায় সেই হারাম-জাদি। এই বলিয়া সে রান্নাঘরের দিকে গেল,—তাহার হাতে তখনও সেই তীক্ষ্ণধার দাখানি ছিল।

পরানের চিৎকার শুনিয়া এবং তাহাকে ছুটিয়া আসিতে দেখিয়া তাহার স্ত্রী ঘর হইতে বাহির হইয়া পলায়নের চেষ্টা দেখিতেছিল; কিন্তু সে পলায়নের অবকাশ পাইল না। সে যখন দ্বারের নিকট আসিয়াছে, তখন দেখিতে পাইল উন্মত্তের মত পরান তাহার সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছে। তাহাকে দেখিয়াই পরান চিৎকার করিয়া বলিল "তবে রে হারামজাদি!" এই বলিয়াই সে বাম হস্তে তাহার স্ত্রীর কাপড়খানি চাপিয়া ধরিল, আর দক্ষিণ হস্তস্থিত দাখানি দ্বারা সজোরে তাহার গলায় আঘাত করিল। এক আঘাতেই হতভাগিনির ছিন্নমুণ্ড ধরাতলে পড়িয়া গেল, রক্তের ফোয়ারা ছুটিল, পরান সেই রক্তে স্নাত হইল। তখনও পরানের রাগ যায় নাই, ক্রুদ্ধ সিংহের মত তখনও সে গর্জন করিতে লাগিল।

নয়ান বাড়ির মধ্যে আসিয়া দেখে পরানের স্ত্রীর মস্তক একস্থানে ও তাহার দেহ আর একস্থানে পড়িয়া রহিয়াছে, রক্তে ঘর ভাসিয়া গিয়াছে, আর তাহার দাদা সেই দা হাতে করিয়া তখনও গর্জন করিতেছে। নয়ান এই দৃশ্য দেখিয়া "ও, আল্লা, ওরে ভাইজি!" বলিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িল।

গোলমাল শুনিয়া প্রতিবেশীরা আসিয়া পড়িল। এই ভয়ানক দৃশ্য দেখিয়া সকলেই ভয়ে অস্থির হইয়া উঠিল। পরান তখনও দা হাতে করিয়া সেই স্থানেই কাঠের পুতুলের মত দাঁড়াইয়া আছে।

তাহার পর গ্রামের চৌকিদার, পঞ্চায়েত ভদ্রাভদ্র অনেক লোকে সেখানে উপস্থিত হইল। পঞ্চায়েত ও কয়েকজন লোক পরামর্শ করিয়া তখনই চৌকিদারকে থানায় পাঠাইয়া দিল। এত লোকের সমাগম দেখিয়া পরান হাতের দাখানি ফেলিয়া দিয়া সেই স্থানে বসিয়া পড়িল। প্রতিবেশীরা নয়ানের চৈতন্য সম্পাদন করিল। তখন এক বৃদ্ধ পরানকে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতে গেল,—পরান কোন উত্তরই দিল না, চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। নয়ান শুধু মধ্যে মধ্যে

"ও আল্লা, ওরে ভাইজি!" বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিল; সকলে নানাপ্রকারে তাহাকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

রাত্রি প্রায় নয়টার সময় থানার দারোগা, কনস্টেবল প্রভৃতি আসিয়া উপস্থিত হইল। যথারীতি তদন্তের ব্যবস্থা হইতে লাগিল; কিন্তু তদন্ত আর বেশিদূর অগ্রসর হইতে পারিল না। দারোগা যখন নয়ানকে ঘটনার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন পরান আপনা হইতেই বলিয়া উঠিল "বাপুজি, ওকে আর কি জিগেস্ কচ্ছেন। এ খুন আমিই করেছি। আমাকে বেঁধে নিয়ে যান।"

দারোগা বলিলেন, "কেন তুমি খুন করলে?" পরান একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল "সে কথা আর একশবার ব'লে কি হবে; একেবারে জেলার হাকিমের কাছেই সব বলব।" এই বলিয়া পরান যে চুপ করিল, তাহার পর আর কেহ তাহাকে কথা বলাইতে পারিল না। দারোগা মহাশয় নয়নের নিকট হইতে সকল কথা শুনিয়া লাস চালান দিলেন এবং পরানের হাতে হাতকড়ি লাগাইয়া তাহাকে থানায় লইয়া গেলেন। নয়ান উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল।

ডিপুটি হাকিম যথারীতি সাক্ষী সাবুদ গ্রহণ করিয়া পরানকে সেসন-সোপর্দ করিলেন। পরাণ সেই যে চুপ করিয়াছিল, তাহার পর এ পর্যন্ত একটি কথাও বলে নাই। নিম্ন আদালতে গরিব পরানের পক্ষ-সমর্থন করিবার জন্য কোনও উকিল মোক্তার উপস্থিত হন নাই।

সেসন আদালতে যখন মোকদ্দমা উঠিল, তখন একজন জুনিয়ার উকিল পরানেব পক্ষ-সমর্থন করিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তিনি যখন পরানকে দুই একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে গেলেন, তখন পরান সেই প্রথম কথা বলিল; সে বলিল "বাবুজি, আমার কথা আমিই বল্‌ব, সেলাম!" উকিলবাবু বিমুখ হইয়া চলিয়া গেলেন।

মোকদ্দমার ডাক পড়িল। হাতকড়িবদ্ধ পরানকে কাঠগড়ায় দাঁড় করান হইল। সরকারি উকিল মাথায় শামলাটা ভাল করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া বসাইয়া একবার গলা ঝাড়িয়া যখন মোকদ্দমার অবস্থা বলিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন, তখন পরান বলিয়া উঠিল "ধর্মাবতার, সায়েব, আর কাউকে কিছু বল্‌তে হবে না। যা যা বল্‌তে হবে আমিই হুজুরের কাছে ব'লে যাচ্ছি।" এই বলিয়া সে তাহার অবস্থার কথা, তাহার পিতামাতার মৃত্যুর কথা, তাহার স্ত্রীর বদ্‌মেজাজের কথা বলিতে লাগিল। তাহার পর স্বর আরও একটু উঁচু করিয়া সে বলিল "হুজুর, ধর্মাবতার, সায়েব, কোম্পানি বাহাদুর, আমার পরিবার আমার ঐ ছোট ভাইকে ভাত দিত না, যখন তখন তারে ধ'রে মারত। আমি জন খাটি, তামাম দিন পয়সার ধান্দায় ঘুরি; ঘরে কি হয় না হয়, তার কি খবর আমি রাখ্‌তি পারি? যে দিন খুন হয়, সেদিন ধর্মাবতার, আমি মজুরি করে সারাদিনে সাতটা পয়সা কামাই করে ঘরে যাতিছিলাম; মেজাজটা বড়ই খারাপ ছিল। বাড়ির সুমুকে গাছতলায় দেখি নয়ান ব'সে আছে। তার মুখ শুকিয়ে গেছে—আমারে না দেখে সে হাউ হাউ ক'রে কাঁদতি লাগ্‌ল। হুজুর, আমাদের বাপ-মা নেই, আমার ঐ একটা ভাই। তার কান্না দেখে আমার পরানের মদ্দি কেমন করে উঠ্‌ল। আমি গামছা দিয়ে তার মুখ মোছায়ে দেলাম। তারে দুইটা মিষ্টি কথা বল্‌লাম। সে তখন বল্‌ল কি, যে একটা পাথরের খোরা নিয়ে সে ঘাটে গিছ্‌ল; ঘাট পিছল ছিল। নয়ানে সে ঘাটলায় পা

পিছ্‌লে পড়ে গিছ্‌ল; হাতের খোরাটা প'ড়ে একেবারে চৌচির হয়ে গেল। তাই না শুনে, আমার পরিবার নয়ানকে ঠাস্ কবে একটা চড় দিল। ভাই আমার সেই চড় খেয়ে ঘুরে পড়ে গেল। তাতেও কি সে তারে ছাড়ে, তার উপর ধর্মাবতার, লাথি—লাথি সায়েব, লাথি—" পরানের চক্ষু রাগে জ্বলিয়া উঠিল; তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। আদালতশুদ্ধ লোক, জজ সাহেব প্রভৃতি হাঁ করিয়া পরানের কথা শুনিতে লাগিলেন।

জজ সাহেব পরানকে চুপ করিতে দেখিয়া বলিলেন, "ওয়েল, গো অন। তারপর।"

পরান তখন সামলাইয়া লইয়াছে। পরান বলিতে লাগিল "তারপর হুজুর, তারপর। তারপর পরান বল্‌ল, আমার পরিবার এই চৈত্তির মাসের দুপুর রোদ্দুরে নয়ানকে বাড়ি থেকে বা'র করে দেল। ছাওয়াল মানুষ, তখনও তার প্যাটে একটা দানা পড়ে নাই—হুজুর এট্টা দানা পড়ে নাই। এতটুকু ছাওয়ালডার মুখে তখন একরত্তি জলও পড়ে নেই। আমার জন্যি তামাম দিন সে পথে বসে ছিল। হুজুর সাত বছরের ভাই আমার তামাম দিন কিছু খায় নেই, জলটুকুও না হুজুর! তোমর এতটুকু ছোট ভাইকে যদি তোমার মেমসাহেব না খাতি দিয়ে এই চৈত্তির মাসের দুপুর বেলায় বাড়ি থিকে বার কোরে দিত, আর তামাম দিন খবর না নিত, তা হ'লে তুমি সে পরিবারের কি কোরতে হুজুর। তোমার পরানডার মদ্দি তখন কেমন করে উঠ্‌থ হুজুর ! এতটুকু খানি ছাওয়াল, মা নেই, বাপ নেই, তারে কুকুরডার মত এই দুপুর রোদ্দুরে বাড়ির বা'র করে দিল। ধর্মাবতার, তুমিই বল, আল্লার কিরে, তুমিই বল হুজুর, এমন পরিবারেরে তুমি কি ক'রতে? সাতটা না পাঁচটা না, একটা ভাই; তারে কিনা তাড়ায়ে দিল, একটা দানা দিল না, লাথি মারলো; হুজুর লাথি মারলো। তুমিও যা কোরতে, আর দশজনেও যা করতো, আমিও তাই করিছি। এমন পরিবারেরে খুনই কোরতিই হয়। তার জান নিতিই হয়। ধর্মাবতার, কোম্পানির আয়েনে খুনির বদলে খুন নিতি হয়। তাই হোক, তাই হোক।" এই বলিয়া পরান চারিদিকে চাহিয়া যেন কাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিল। জজসাহেবের মন গলিয়া গিয়াছিল; তিনি অনুচ্চস্বরে পরানকে বলিলেন "তুমি কি চাও পরান মণ্ডল?"

পরান বলিল "হুজুর, একবার নয়ানের মুখখানি জন্মের মত দেখ্‌তি চাই হুজুর। একবার তারে বুকির মদ্দি জড়ায়ে ধরতি চাই।"

জজ সাহেব তখনই নয়ানকে সেখানে আনিবার জন্য হুকুম দিলেন। নয়ান আসিয়া যখন কাঠগড়ার মধ্যে প্রবেশ করিল, তখন পরান তাহাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিল; কিছুক্ষণ কোন কথা বলিতে পারিল না। তাহার পর জজ সাহেবের দিকে চাহিয়া পরান বলিল "হুজুর, আমার এই ভাইডারে কার হাতে দিয়ে যাব? আমি এরে কোম্পানি বাহাদুরের হাতে দিয়ে গ্যালাম। ভাই নয়ান, তোরে আজ আমি কোম্পানি—সায়েবের হাতে দিয়ে গ্যালাম ভাইরে—" পরান আর কথা বলিতে পারিল না, চক্ষের জলে তাহার বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল। ধর্মাবতার জজ বাহাদুরও এই দৃশ্য দেখিয়া রুমালে চক্ষু মুছিলেন।

তাহার পর জজ সাহেব বলিলেন "এ মামলার আর সাক্ষীর প্রয়োজন নাই। আসামি কবুল করিয়াছে।" জজসাহেব জুরিদিগের দিকে চাহিলেন; জুরিগণ একবাক্যে বলিলেন "আসামি অপরাধ করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার উপর লঘু দণ্ড প্রদানের জন্য আমরা অনুরোধ

করিতেছি।" জজ সাহেব তখন বলিলেন "আমি আসামি পরান মণ্ডলকে এক বৎসরের মেয়াদের হুকুম দিলাম।"

জজ সাহেবের রায় শুনিয়া সকলে অবাক্ হইয়া গেল। সকলে ভুলিয়া গেল যে, তাহারা আদালতগৃহে উপস্থিত। তখন সেই জনসংঘ একযোগে জয়ধ্বনি করিল। জজ সাহেব বাধা দিলেন না।

কনস্টেবলেরা যখন পবানকে কাঠগড়া হইতে নামাইয়া লইযা যাইতে উদ্যত হইল, তখন জজ সাহেব আসন ত্যাগ করিয়া বলিলেন "পরান মণ্ডল, তোমার ভাই আজ হইতে আমার কুঠিতে থাকিবে।"

পবান জজ সাহেবের দিকে কাতর নয়নে চাহিয়া দক্ষিণ হস্তখানি তুলিল।

–মানসী ৫ম বর্ষ ১৩১৯-২০, ৫ম সংখ্যা, আষাঢ়।

নসীবের লেখা

"ওরে অলপ্পেয়ে, ভাত ভাত যে করিস্, ভাত আসে কেমন ক'রে, তার কোন খবর রাখিস্?"

মায়ের মুখে এই রূঢ় কথা শুনিয়া পুত্র অলিমদ্দী ছলছল নয়নে মায়ের মুখের দিকে চাহিল; তাহার পর অতি কাতর স্বরে বলিল; "হারু পরামানিক কা'ল যেতে ব'লেছে মা! কা'ল থেকে তাদের কাজ ক'রব।"

মাতা বলিলেন, "আবাব তাদের একটা গরু হারিয়ে যাক্, তাই নিয়ে শেষে হেঙ্গাম হুজ্জুত হ'ক।"

অলি বলিল, "মা, মণ্ডলদের ছাগল ত আর আমার দোষে হারায়নি। আমি কত ব'ল্লাম যে, আমি তেরটা ছাগল এনে খোঁয়াড়ে বন্ধ ক'রেছিলাম। রাত্তিরে কে একটা নিয়ে গেল, ওরা বলে আমি মাঠে হারিয়ে এসেছি। মণ্ডলের বৌ আবার বল্লে যে, আমি চুপে চুপে ছাগলটা বেচে ফেলেছি। তাইতে ত ওদের বাড়ির বাখালি ছেড়ে দিলাম।"

মাতা বলিলেন, "এখেনেও যদি অমনই হয়, তখন কি হবে?"

অলি বলিল, "মা, তা হ'লে বুঝব আল্লা আমার নসিবে এই সব লিখেছেন।"

মাতা তখন একটু কোমলস্বরে বলিলেন, আমি কি আর ইচ্ছে ক'রে তোরে বকি; কার ভাত খাচ্ছিস্ তা জানিস্ ত।

অলি বলিল, "সেই জন্যই ত মা, তোমার আবার নিকে পুষতে বারণ ক'রেছিলাম; তুমি ত সে কথা শুনলে না, তুমি একই কথা ধরলে 'তোর একটা হিল্লে হবে'। কেমন, আমি তখন বলিনি?"

মাতা কোন উত্তর করিলেন না, একটি মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "হা আল্লা!"

২

অলিমদ্দী সাধু সেখের ছেলে। সাধু জমিদার-বাড়ির সর্দার ছিল। সাধুর মত পাকা খেলোয়াড় তখন কাল্না অঞ্চলে ছিল না: একখানি ল্যাঠি লইয়া দাঁড়াইলে সাধু সর্দার পঞ্চাশজন লাঠিয়ালের মহড়া লইতে পারিত। একবার তাহার মনিব-জমিদাবের সহিত আর এক জমিদারের একটা হাট লইয়া বিবাদ উপস্থিত হয়। সেই বিবাদ উপলক্ষে একটা প্রকাণ্ড দাঙ্গা হয়। সাধু সর্দার সেই দাঙ্গায় একাকী সতেরো জন লোককে গুরুতর জখম করিয়া পলায়ন করে এবং দুই ঘণ্টার মধ্যে সাতক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া, সাঁতার দিয়া গঙ্গাপার হইয়া কাল্নার থানার দারোগা সাহেবকে সেলাম করিয়া বাড়ি যায়। তারপর যখন সাধু সর্দারকে আসামি করা হইল, তখন স্বয়ং দারোগা সাহেব সাক্ষ্য দিলেন যে, ঘটনার সময় সাধু সর্দার কাল্নার থানায় উপস্থিত ছিল। সাধু বেকসুর অব্যাহতি লাভ করিল। এমন

দাঙ্গা হাঙ্গামা, খুন জখম সাধু সর্দার অনেকবার করিয়া ছিল, কিন্তু সে কখনও বিপদে পড়ে নাই।

সাধু অনেক দিন বিবাহ করে নাই; কেহ তাহার বিবাহের কথা তুলিলে সে তাহার লাঠিখানি দেখাইয়া বলিত, "এরই সাথে আমার সাদি হ'য়েছে।" তাহার পর যেবার স্বরূপগঞ্জে একটা দাঙ্গা হয়, সেই দাঙ্গার পর মনিরুদ্দীন বিশ্বাসের খুপসুরত বেটিকে দেখিয়া সাধুর বিবাহের ইচ্ছা হয় সাধু সর্দারের মত জামাই পাওয়া খুব জোর কপালের কাজ। মনিরুদ্দী সাধুর হাতে কন্যার ভার সমর্পণ করিয়া ইহলোকের কাজ শেষ করিল। মেয়ের বিবাহের জন্যই বোধ হয় তাহারা স্বামীস্ত্রীতে এতদিন বাঁচিয়া ছিল। বিবাহের একমাস পরেই মনিরুদ্দী ও তাহার স্ত্রী বোধ হয় পরামর্শ করিয়া একদিনেই দশঘণ্টা আগেপাছে এই দুনিয়ার কাজে ইস্তফা দিয়া চলিয়া গেল।

এত বড় যোয়ান, এমন পাকা সর্দার! কিন্তু এই এক মাসের মধ্যেই নবপরিণীতা যুবতী পত্নীর উপর তাহার একটা নেশা জন্মিয়াছিল! সাধুর আপনার বলিতে কেহ ছিল না। যখন এতকাল পরে সে বিবাহ করিল, তখন সে মনে ভাবিয়াছিল, বৌ তার বাপমায়ের কাছে থাকিবে; সে নিশ্চিন্তমনে বাবুর বাড়ি সর্দারি করিবে, আর যখন তখন এই সামান্য দশক্রোশ পথ দেখিতে দেখিতে পার হইয়া স্বরূপগঞ্জে আসিবে।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় তার উল্‌টা। সাধুর এ সংসারে লাঠিখানা ছাড়া আর কিছু ছিল না; বেশ দাঙ্গা হাঙ্গামা করিয়া মনের স্ফূর্তিতে তাহার দিন কাটিয়া যাইতেছিল। শেষে চল্লিশ বৎসর বয়সের সময় বিবাহের খেয়াল তাহার মাথায় চাপিল। বিবাহ করিবার একমাস পরেই একটি সুন্দরী যুবতী পত্নীর সম্পূর্ণ ভার তাহার মাথায় পড়িল। সর্দার তখন মহা-গোলে পড়িল।

তাহার মনিব বলিলেন, "সাধু, স্বরূপগঞ্জের বাড়িঘর জমাজমি বেচিয়া এখানে বাড়ি কর; আমরা জমি দিচ্ছি, ঘর তুলবার খরচ দিচ্ছি।"

সাধু তাহার স্ত্রীকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিল; সাধু-পত্নী এ সাধু প্রস্তাবে সম্মত হইল না; সে বলিল, "ও ব্যবসা ছেড়ে দেও; দাঙ্গা-ফেসাদ ক'রে কবে গারদে যাবে, তখন আমার কি হবে? তার চাইতে এখানে চ'লে এস। বাবা যে জমিজমা রেখে গেছেন, তাই চাষ-আবাদ কর; তাতেই বেশ দিনগুজরান হবে। ও সব লাঠালাঠির দরকার নেই।"

অন্য সময় হইলে অন্যের মুখে শুনিলে সাধু এই প্রস্তাবে কর্ণপাত করিত না; কিন্তু এই এক মাসেই সাধু সর্দারের লাঠির বহর একহাত কমিয়া গিয়াছিল; যে সাধুর কোন পরোয়া ছিল না, সেই সাধু এই এক মাসের মধ্যেই আর এক রকম হইয়া গিয়াছিল। স্ত্রীর কথা শুনিয়া সাধু অনেকক্ষণ দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজিয়া ভাবিল; তাহার পর বলিল "যা'ক্, সেই ভাল। আর ও-সব ভালও লাগে না।"

সে তাহার পর জমিদারের কর্ম ত্যাগ করিল। জমিদার মহাশয় কত অনুরোধ করিলেন, কিন্তু সে তাহার পরিবারের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিতে পারিল না; জমিদার বাবুকে সেলাম

করিয়া বলিল, "কর্তা মশাই, বড় একটা কিছু বাধ্‌লে খবর দেবেন, সাধু লহমার মধ্যে দশ কোশ পথ উড়ে আস্‌বে।"

সাধু সর্দার তখন পাকা বাঁশের লাঠি তিনখানি ঘরের কোণে ফেলিল দিল; শ্বশুরের লাঙ্গল গরু লইয়া চাযের কার্যে মন দিল। গ্রামের কেহ কখন সাধুকে লাঠি খেলিতে বলিলে সাধু বলিত, "সে সব গঙ্গাপারে রেখে এসেছি; ও কর্ম আর না।"

এক বৎসর পরেই সাধুর একটি পুত্রসন্তান হইল। সাধু তাহার নাম রাখিল অলিমদ্দী সেখ—সর্দার উপাধিটাও সে মুছিয়া ফেলিল। দশ বৎসর সুখে কাটিয়া গেল; সাধুর আর সন্তান হইল না।

সাধুর স্ত্রী তাহাকে বলিয়াছিল অলিকে চাযের কাজে নিযুক্ত না করিয়া হয় লাঠিখেলা শিক্ষা দেওয়া হউক, অথবা তাহাকে পাঠশালায় দেওয়া হউক। সাধু এই দুই প্রস্তাবেই অসম্মত হইয়াছিল; সে বলিয়াছিল "দেখ বৌ, লাঠিখেলা আমি আর ওকে শিখাব না। যে দিন কাল পড়েছে, তাতে ও কসরত আর শিখে কাজ নেই; দাঙ্গা ফেসাদ এখন আর শিখে কাজ নেই; দাঙ্গা ফেসাদ এখন আর চল্‌বে না। কোম্পানির কাছে গেলেই যখন সকল গোলের রফা হয়, তখন ও সব আর দরকার হবে না। তবে লেখাপড়া,—তা দেখ, আমাদের চাষার ছেলে লেখাপড়া শিখ্‌লে বাবুভেয়েদের মত হ'য়ে যায়; বাপ বড়বাপের চায আবাদের দিকে বড় নজর দেয় না। লেখাপড়া শিখিয়ে ছেলেটার পায়া ভারি ক'রে কাজ নেই। আর এখনও ত ওর ওমর এগার বছর। এখন ও খেলা ক'রেই বেড়াক। আমি যে কয়দিন আছি, সে কয়দিন ওকে আর ভাব্‌তে হবে না। তারপর আমাদের এই জমাজমি চায আবাদ ক'রেই ও বেশ দিনগুজরান কর্‌তে পার্‌বে।" সুতরাং অলিমদ্দী কোন কাজই করিত না; সময়মত বাড়ীতে আসিয়া আহার করিত, আর নিজের মনে খেলা করিয়া বেড়াইত।

এই সময়ে একদিন সাধুর শরীর বড়ই অসুস্থ বোধ হইল; রাত্রিতে কম্প দিয়া জ্বর আসিল। তিন দিন আর সে জ্বর ছাড়িল না। চতুর্থ দিনে অলিমদ্দী কবিরাজ ডাকিয়া ডাকিয়া আনিল; কবিরাজ সাধুকে পরীক্ষা করিয়া বলিল, "জ্বর আজই কমে যাবে, কিন্তু গায়ের বোধ হয় ঠাকরুণ বাহির হইবে।"

কবিরাজের কথাই ঠিক হইল। সাধুকে বসন্তরোগে ধরিল। দশদিন চিকিৎসার পর সাধু স্ত্রীপুত্রকে কাঁদাইয়া চলিয়া গেল। সাধুর স্ত্রী নাবালক ছেলেটি লইয়া অকূল সাগরে পড়িল; কেমন করিয়া দিনপাত হইবে, তাহা সে ভাবিয়া পাইল না।

৩

তখন পার্শ্বের গ্রামের জমির সেখ তাহাদের বাড়িতে বড়ই আনাগোনা আরম্ভ করিল। সাধুর স্ত্রীর বয়স তখনও ত্রিশ বৎসর হয় নাই; তাহার সৌন্দর্যও তখন যায় নাই। জমির সাধুর স্ত্রীকে একদিন বলিল, "দেখ, তোমাদের বড় কষ্ট হচ্ছে। যে জমাজমি আছে, ছেলে মানুষ কি তা রক্ষা কর্‌তে পারবে, বার ভূতে সমস্ত লুটে খাবে। তার চাইতে এক কাজ কর। আমি তোমাকে নিকে করি। আমার যে দুচার বিঘে জমি আছে, তার সঙ্গে তোমাদের জমিও চায

আবাদ করব, তা হ'লে যেমন ভাবে তোমাদের চলে যাচ্ছিল, তাই হবে, কোন কষ্ট হবে না; ছেলেটাও মানুষ হবে।"

জমিরের এ প্রস্তাব সাধুর স্ত্রীর ভাল বোধ হইল না; সে বলিল, "না, আর আমি নিকে ক'রব না। কষ্টেসৃষ্টে ছেলেটাকে মানুষ করতে পারলে আর আমাদের দুঃখ থাক্‌বে না। তুমি যদি একটু দয়া কর, তা হ'লে আমাদের জমি থেকে যা হয়ে, তাতেই আমাদের বেশ চলে যাবে। কি বল?"

জমির বুদ্ধিমান ছিল; সে মনে করিল, তাড়াতাড়ি করিয়া কাজ নাই; দুচারি মাস যাকই না; তখন দেখা যাইবে।

জমির যাহা ভাবিয়াছিল তাহাই হইল। তাহার প্রলোভনে সাধুর স্ত্রীর সঙ্কল্প ঠিক রহিল না। একদিন সে জমিরকে নিকা করিতে সম্মত হইল। এগার বৎসরের ছেলে অলিমদ্দী যখন শুনিল যে, তাহার মায়ের সহিত জমিরের নিকা হইবে, তখন সে মাতাকে অনেক নিষেধ করিয়াছিল; কিন্তু তাহার মাতা তাহাকে বলিল, "তোর ভালব জন্যই এ কাজ করছি এতে তোর একটা হিল্লে হবে, নইলে যা-কিছু আছে সব বেহাত হ'যে যাবে।" অলিমদ্দী মায়ের বিবাহে আগ্রহ দেখিয়া নীরব হইল।

তাহার পর যথাসময়ে অলিমদ্দীর মাতার সহিত জমিরের বিবাহ হইয়া গেল। অলিমদ্দীর মাতা তাহাদের বাড়ি ঘর দুয়ার বিক্রয় করিয়া ছেলেটিকে লইয়া জমিরের বাড়িতে উঠিয়া গেল। তখন জমির নিজ মূর্তি ধারণ করিল। সে ইতঃপূর্বেই জমিদারের নায়েবের সহিত পরামর্শ কবিয়া সাধুর জমি কয়খানি গ্রাস করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল। এখন তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িল।

একদিন জমির বাড়িতে আসিয়া তাহার স্ত্রীকে বলিল, "এ সব কি ব্যাপার, বুঝতে পারি না। তোমাদের জমির আজ তিন বৎসরের খাজনা বাকি, তাছাড়া বকেয়া বাকি ও অনেক টাকা। নায়েব মশাই বল্লেন যে, এই মাসের মধ্যে যদি বেবাক টাকা চুকাইয়া না দেওয়া হয়, তা হ'লে সমস্ত জমি তাঁরা অন্যের সঙ্গে বন্দোবস্ত ক'রে দেবেন। কৈ, এত বাকির কথা ত তুমি একদিনও আমাকে বল নাই?"

তাহার স্ত্রী বলিল। "সে কি কথা! আমি ত কিছুই জানি না। খাজনা যে এতদিনের বাকি আছে, কি ক'রে জানব!"

জমির বলিল, "সাধু সর্দারকে সকলেই ভালবাসত। নায়েব মশাইয়ের সঙ্গেও তার খুব দহরম মহরম ছিল; তাই তাঁরা আর ও সম্বন্ধে তাগাদা করেন নাই, সাধুও সে কথা ভাবে নাই। এখন মহা বিপদ্! আমি এত টাকা কোথায় পাব? এখন কি করা যায়, তাই বল?"

তাহার স্ত্রী বলিল, "আমি মেয়ে মানুষ, আমি কি বলব্; যাতে ভাল হয়, তাই কর। জমিটুকু গেলে ছোঁড়াটার কি হবে?"

জমির বলিল, "আমার হাতে ত আর নশ পঞ্চাশ নেই যে, তাই দিয়ে তোমাদের জমি বাঁচাই; আর সাধুও দুপয়সা রেখে যায় নি! এমন জান্‌লে আমি এ সব গোলের মধ্যেই যেতাম না। পরের বালাই ঘাড়ে ক'রে এখন আমি বাড়ি আর কাছারি করি।"

এই কথার আর উত্তর নাই; অলিমদ্দীরর মাতা মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে লাগিল। তাহার কোন কথাই বুঝিতে বাকি রহিল না। কিন্তু সে স্ত্রীলোক; এ বিপদে যে কি করিতে হইবে, কাহার আশ্রয় লইতে হইবে, তাহা সে ভাবিয়াই পাইল না। এ দিকে জমির জমিদারের নায়েবের সহিত যোগ দিয়া সাধুর সমস্ত জমি নিজের নামে বন্দোবস্ত করিয়া লইল। অলিমদ্দীর মাতা যখন এই কথা শুনিল, তখন সে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া নীরব হইল।

জমিরের ব্যবহার ক্রমেই কঠোর হইতে লাগিল। অলিমদ্দীর উপর তাহার রাগ বেশী হইল; কিন্তু এ রাগের কারণ কি, তাহা কেহই খুঁজিয়া পাইল না। বেগতিক দেখিয়া অলির মাতা পুত্রকে মণ্ডলদের বাড়ির রাখালিতে নিযুক্ত করিয়া দিল; কিন্তু সে সেখানে অনেক দিন থাকিতে পারিল না; একটা ছাগল হারাইয়া যাওয়ায় মণ্ডলেরা অলিকে বিদায় করিয়া গিল।

এই গল্পের আরম্ভেই মাতা ও পুত্রের যে দিনের কথোপকথন বর্ণিত হইয়াছে, সেই দিন প্রাতঃকালে জমিরের মেজাজ্‌টা কি জানি কেন বড় খারাপ হইয়াছিল। প্রথমে সে এটা ওটা বলিয়া স্ত্রীর উপর যথেষ্ট বাক্যবাণ বর্ষণ করিল; কিন্তু জমিরের স্ত্রী বড়ই ভালমানুষ; সে একটি কথার উত্তর দিল না। কথার উত্তর না পাইলে কোন দিনই ঝগড়া বা কথা জমে না; এ ক্ষেত্রেও তাই হইল; জমিরের সকল দুর্বাক্যই ব্যর্থ হইয়া গেল তাহার স্ত্রী কোন কথারই প্রতিবাদ করিল না।

জমির তখন স্ত্রীকে ছাড়িয়া তাহার পুত্রের উপর গালি বর্ষণ আরম্ভ করিল; বলিল, "দেখ দেখি, এত বড় ছেলেটা, কাজকর্ম কিছুই কর্‌ছে না; শুধু ব'সে ব'সে গিল্‌বে। কেন, আমি কি ওর সাতপুরুষের দেন্‌দার? ও আমার কে যে আমি ওকে এমন করে খেতে দেব? কথা কও না যে?"

রমণী সমস্তই সহ্য করিতে পারে; সকল নির্যাতন, সকল অপমান সে মাথা পাতিয়া লইতে পার; শুধু পারে না দুইটি কথা; একটি তাহার সতীত্বের উপর সন্দেহ, আর একটি পারে না তাহার পেটের সন্তানের উপর অবিচার। জমিরের স্ত্রীর উপর দিয়া এত কথা হইয়া গেল, তাহাতে সে বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিল না; কিন্তু যখন তাহার একমাত্র পুত্রের উপর জমির অবিচার করিল, তখন তাহার মাতৃত্বের গর্ব মাথা নীচু করিয়া থাকিতে পারিল না; সে তবুও ধীরভাবে বলিল, "ও তোমার কেউ নয়, কিন্তু ও আমার পেটের ছেলে।" অভাগী আর কিছু বলিতে পারিল না, তাহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল। জমির আর কিছু না বলিযা বাড়ীর বাহির হইয়া গেল। তাহার কিছুক্ষণ পরেই অলিমদ্দীর বাড়ি আসিয়া মায়ের নিকট ভাত চাহিলে তাহার মাতা অভিমানভরে যে কথা বলিয়াছিল, তাহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি।

৪

হারু পরামাণিকের বাড়ি অলিমদ্দীর রাখালি কর্ম হইল না। তাহারও কারণ জমির। জমির হারু পরামানিককে বলিয়াছিল, "দেখ পরামানিকের পো, অলিরে নিতে চাচ্ছ নেও;

কিন্তু শেষে একটা চুরি চামারি হ'লে আমাকে কিছু বল্‌তে পার্‌বে না; সে কথা কিন্তু আগেই ব'লে রাখ্‌ছি।" এমন প্রশংসাবাদের পর কে কাহাকে কর্ম দেয়?

অলিমদ্দী পরদিন যখন পরামাণিক বাড়ি গেল, তখন হারু পরামানিক জমিরের কথা বলিয়া তাহাকে ফিরাইয়া দিল। অলিমদ্দী বিষণ্নমুখে বাড়ি আসিয়া মাতাকে সমস্ত কথা বলিল। মাতা তখন পুত্রকে সাহস দিয়া বলিল, "ভয় কি! এক দুয়োর বন্ধ, দশ দুয়োর খোলা; আল্লা দানাপিনা ঠিক ক'রেই মানুষ পয়দা করেছেন। তুই ভাবিস্‌ নে; যা হয় একটা হবেই।" মায়ের এই আশ্বাসবাণী শুনিয়া অলিমদ্দী মনে একটু বল পাইল; বালক তখন সহাস্য বদনে চলিয়া গেল।

সেই দিন সন্ধ্যার সময় জমির বাড়ি আসিয়া যথারীতি আহারাদি শেষ করিয়া ঘরের বারান্দায় একখানি চট পাতিয়া বসিল, এবং এক ছিলিম তামাক সাজিয়া দিবার জন্য অলিমদ্দীকে ডাকিল। অলিমদ্দী তখন বাড়িতে ছিল না। জমিরের স্ত্রী রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া বলিল, "অলি ত বাড়িতে নাই; তোমার কি চাই?"

জমির বলিল, "বাড়ি নেই, কোথায় গেল?"

তাহার স্ত্রী বলিল, "ও পাড়ায় পিরের গান হবে, সে তাই শুনতে গিয়াছে।"

জমির তখন রাগিয়া বলিল, "নবাবজান গান শুন্‌তে গেছেন! ঘরের কাজকর্ম কর্‌লেও ত বুঝি যে, হাঁ একটা উপকার হয়।"

তাহার স্ত্রী ধীরভাবে বলিল, "ছেলেমানুষ, গান শুন্‌তে যেতে চাইল,আমিই তাকে যেতে বলেছি। তোমার তামাক সেজে দিতে হবে কি?"

জমির কোন উত্তর করিল না; তাহার স্ত্রী তখন কলিকাটা লইয়া রান্না ঘরে গেল এবং তামাক সাজিয়া কলিকায় আগুন দিয়া জমিরের নিকট আসিয়া বলিল, "এই তামাক নেও।"

জমির তাহার স্ত্রীর হাত হইতে কলিকাটা টানিয়া লইয়া উঠানে ফেলিয়া দিল; তাহার স্ত্রী অবাক্‌ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল; এ রাগের কারণ সে কিছুই বুঝিতে পারিল না।

স্ত্রীকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া জমির বলিল, "অমন ক'রে দাঁড়িয়ে রইলে যে?"

তাহার স্ত্রী বলিল, "তোমার এত রাগ কেন হ'ল, তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাব্‌ছি।"

জমির বলিল, "সে ভাবনাই যদি তোমাদের থাক্‌বে, তা হ'লে ত হ'তই। এই সারাদিন খেটেখুটে ঘরে এলাম, কোথায় একটু সোয়াস্তি করব, তা নয় এই সব।"

তাহার স্ত্রী বলিল, "এই সব কি তা' ত বুঝলাম না।" জমির তখন আরও রাগিয়া উঠিল, বলিল, "কি, মুখের উপর জবাব! এত বড় গোস্তাকি!"

জমিরের স্ত্রী আর কথা বলিল না, চুপ করিয়া সেই স্থানে বসিয়া পড়িল। কথা বলিলেও গোস্তাকি, চুপ করিয়া থাকিলেও গোস্তাকি! এ রকম বদ্‌মেজাজি লোকের সঙ্গে কে পারিয়া উঠে?

জমির বলিল, "চুপ ক'রে রইলে যে?" তাহার স্ত্রী কোন উত্তর করিল না। তখন জমির বলিল, "হারু পরামানিক ত তোমার ছেলেকে রাখ্‌বে না। অমন চোরের ব্যাটা চোরকে কে ভাত কাপড় দিয়ে পুষ্‌বে?"

পুত্রের উপর এ অবিচার মায়ের প্রাণে বড়ই বাজিল; সে মনে করিয়াছিল কোন কথারই উত্তর দিবে না; কিন্তু যখন তাহাকে উত্তর দিতেই হইবে, তখন সে অতি ধীরস্বরে বলিল, "অলি কোন দিন চুরি করে নাই।"

জমির গর্জিয়া উঠিয়া বলিল, "চুরি করে নাই—সাধুর বেটা সাধু। বেজন্মা ছেলে আবার কত ভাল হবে?" ক্রুদ্ধা সিংহী গর্জিয়া উঠিল;—জমিরের স্ত্রী বসিয়া ছিল, উঠিয়া দাঁড়াইল, ঘাড় বাঁকাইয়া তীব্রস্বরে বলিল, "কি বলিলে? খবরদার অমন কথা আর মুখে এন না, সাবধান ক'রে দিচ্ছি। কি ব'লব তোমাকে, আল্লার নাম নিয়ে নিকে করেছি, নইলে, আর কেউ এ কথা বল্লে এতক্ষণ এই বাঁ-পায়ের লাথি দিয়ে তার মুখ ভেঙ্গে দিতাম।" জমিরের স্ত্রী আর সেখানে দাঁড়াইল না; দ্রুতগতিতে বাড়ির বাহিরে চলিয়া গেল। জমির হাঁ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার সেই মূর্তি দেখিয়া—সেই সতীত্বের গর্ব, নারীত্বের অপূর্ব বিকাশ দেখিয়া সে একেবারে এতটুকু হইয়া গিয়াছিল; তাহার কথা বলিবার শক্তি অপহৃত হইয়াছিল।

বাহিরে তখন ঘোর অন্ধকার; আকাশে দুই দশটি তারা ফুটিয়া রহিয়াছে; সমস্ত গ্রামটা যেন ঝম্ ঝম্ করিতেছে; নিকটের জঙ্গলের ঝিঁঝিঁ পোকার স্বর সেই ঘনান্ধকার রজনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল; জমির বসিয়া ভাবিতে লাগিল, তাহার স্ত্রী কোথায় চলিয়া গেল? এই অন্ধকার রাত্রিতে বাড়ির বাহির হইয়া সে ত পুকুরে আত্মহত্যা করিতে গেল না? তাহার মনে তখন ভয়ের সঞ্চার হইল। সে উঠিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু কি ভাবিয়া আবার বসিয়া পড়িল।

একটু করেই জমিরের স্ত্রী বাড়ি ফিরিয়া আসিল। জমির তখন ধীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "এই আঁধার রাত্তিরে কোথায় গিয়েছিলে?"

তাহার স্ত্রী সে কথার উত্তর দিল না। জমির মনে করিল তাহার স্ত্রী বোধ হয় প্রশ্নটা শুনিতে পায় নাই; তাই সে পুনরায় বলিল, "এমন আঁধার রাত্তিরে কোথায় গিযেছিলে?"

তাহার স্ত্রী উত্তর করিল, "কোথাও যাই নাই। কোথায় যাব, তাই বাইরে গিয়ে গাছতলায় বসে ভাব্ছিলাম।"

জমির একটু সাহস পাইল; সে বলিল, "তবে এখনও রাগ যায় নাই?"

তাহার স্ত্রী ক্রুদ্ধ-স্বরে বলিল, "তুমি আজ যে কথা বলেছ, তাতে যে রাগ ক'র্বে না, তাকে আমি মেয়েমানুষই বলি না। শোন, তখন রাগ বেশি হয়েছিল, তাই কি বল্তে কি বল্ব মনে করে তোমার সুমুখ থেকে চ'লে গিয়েছিলাম। এখন আমার কথা শোন, তুমি আমাকে যে কথা বলেছ, তারপর আর তোমার ঘরে থাকা আমার চলে না। আমি ছেলেটার হাত ধ'রে যে দিকে হয় চলে যাব। যে আল্লা আমাদের পয়দা করেছেন, তিনি আমাদের দুজনকে দুমুঠো খেতে দিতেও পারবেন। তোমার দেওয়া দানা-পানি আর আমরা খাব না। কিন্তু যাবার আগে তোমাকে একটা কথা মনে করিয়ে দিই: কাঁচা ছেলের যা কিছু ছিল, তা এমন করে ঠকিয়ে নিয়ে তুমি ভোগ কর্তে পার্বে না—আল্লা আছেন, তুমি কিছুতেই পার্বে না—। আমি যদি সতী নারীর মেয়ে হই, আমি যদি সর্দারের বউ হই, তা হলে তোমায় ব'লে যাচ্ছি, ছেলে-মানুষের ঠকিয়ে নেওয়া বিষয় তোমার থাক্বে না—থাক্বে না। আরও শোন, যে মুখে তুমি

আমার ছেলেকে বেজন্মা বলেছ, সেই মুখের যে কি হয়, তা দশজনে দেখ্‌বে, আমি আর সে কথা মুখে আন্‌ব না।"

স্ত্রীর মুখে এমন কথা শুনিয়া জমির ক্রোধে ফুলিয়া উঠিল; তাহার আর তখন কাণ্ডজ্ঞান থাকিল না। সে বাঘের মত এক লম্ফ দিয়া তাহার স্ত্রীর উপর পড়িল এবং "তবে রে হারামজাদি, যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা" বলিয়া সেই অসহায়া রমণীকে এক পদাঘাত করিল।

তাহার স্ত্রী তখন "হা আল্লা" বলিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল; এবার আর সে কোন কথা বলিল না। জমির রাগে অধীর হইয়া বলিল "এখনই আমার বাড়ি থেকে দূর হ'য়ে যা; নইলে তোর ভাল হবে না—তোকে কেটেই ফেল্‌ব।"

"আর বলিতে হইবে না; তোমার বাড়িতে আর এক লহমাও থাকিব না। এর ফল তোমাকে ভুগ্‌তে হবে।"

এই বলিয়া জমিরের স্ত্রী জন্মের মত সেই বাড়ি হইতে চলিয়া গেল। পরদিন প্রাতঃকালে অলিমদ্দী বা তাহার মাতাকে কেহ আর সে গ্রামে দেখিতে পাইল না।

তাহার পর—তাহার পর—আর কি! সতীবাক্য কি কখন অন্যথা হয়। একবৎসর যাইতে না যাইতেই জমিরের শরীরে কুষ্ঠের লক্ষণ প্রকাশ পাইল। সতী রমণীর কথা ফলিয়া গেল; সর্বাগ্রে জমিরের মুখেই কুষ্ঠের ক্ষত দেখা দিল।"

তাহার পর—যাহা হইল তাহা আর শুনিয়া কাজ নাই।

—ভারতবর্ষ ১ম বর্ষ ১৩২০, ১ম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা, আশ্বিন।

"জল—একটু জল—"

সংস্কৃত উপাধি-পরীক্ষার ফল রাজকীয় গেজেটে প্রকাশিত হইলে দেখিলাম—অথবা ঠিক বলিতে গেলে বলিতে হয়, শুনিলাম—আমি উত্তীর্ণ হইয়াছি এবং কাব্যতীর্থ উপাধি লাভ করিয়াছি। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া আমার মাতৃদেবী এবং বড়দিদি ঠাকুরানি আনন্দিতা হইলেন। পিতৃদেব বিশেষ আনন্দ প্রকাশ না করিয়া এই অভিমত প্রকাশ করিলেন, "কাব্যতীর্থ উপাধি লাভ অপরের পক্ষে বিশেষ শ্লাঘ্য হইতে পারে, কিন্তু ৺রামকান্ত তর্কবাগীশের পৌত্র, জয়চন্দ্র তর্কসিদ্ধান্তের পুত্রের ইহাতে গৌরবের কথা কিছুই নাই। কাব্য সকলেই অধিগত করিতে পারে। আগামী বর্ষে তুমি যদি স্মৃতির পরীক্ষায় সর্বোত্তম স্থান অধিকার করিতে পার, তাহা হইলে বুঝিব যে, তুমি আমাদের বংশগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিবে।" আমার কিন্তু আর পরীক্ষা দিবার ইচ্ছা ছিল না। পিতৃদেবের সম্মুখে কথাটা বলিবার সাহস পাইলাম না। সৌভাগ্যক্রমে আমার দিদি ঠাকুবাণি অন্য ভাবে সেই কথাটা বলিয়া ফেলিলেন । তিনি বলিলেন, "বাবা, হরচন্দ্রের আর পরীক্ষা দিয়ে কাজ নেই। তোমার কাছে যা স্মৃতি পড়েছে, তাতে তুমিই একটা উপাধি দিয়ে ওকে টোলে বসিয়ে দাও। বয়স্থা দেখে একটা মেয়ে এনে বিয়ে দিয়ে দাও—আমার মেয়েটারও একটা গতি কর—তার পর ওদের ঘর-গৃহস্থালিতে স্থিতি করে চল তুমি, আমি আর মা কাশী চলে যাই।"

পিতৃদেব ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "যতগুলি কর্তব্য অসম্পূর্ণ আছে, তা সমস্তই তুমি বলে ফেল্লে মা—একটি কথা তুমি প্রণিধান কর নাই। ইদানীং আমাদের প্রদত্ত উপাধির আর তেমন সম্মান নাই। বাবাজীবন স্মৃতি-শাস্ত্র যা অধ্যয়ন করেছেন, তা একজন পণ্ডিতের পক্ষে যথেষ্ট, তত্রাপি তাঁহার স্মৃতি-শাস্ত্রে উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার প্রয়োজন আছে। রাজকীয় উপাধি লাভ করিলে অধ্যাপকের গৌরব বৃদ্ধি হয়, চতুষ্পাঠীরও শ্রীবৃদ্ধি হয়। অতএব মা, আর একটি বৎসর ধৈর্য ধারণ কর। বাবাজীবন স্মৃতির উপাধি লাভ করিলে, তাঁহার উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন করিব। আর তোমার কন্যার জন্য যদি উৎকৃষ্ট পাত্রের সংযোজন না হয়, তাহা হইলে এই বৃদ্ধ বয়সে আমাকেই পুনরায় বরের আসন গ্রহণ করিতে হইবে।"

এই কথোপকথনের পর যখন এক বৎসর চলিয়া গেল, তখন আমি স্মৃতিশাস্ত্রের উপাধি পরীক্ষা প্রদান-করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলাম। মনে করিলাম এইবার নিশ্চিন্তমনে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিব। মাথার উপর পিতা মাতা রহিয়াছেন, গৃহে মাতৃসমা বিধবা জ্যেষ্ঠা সহোদরা রহিয়াছেন, শিষ্য যজমান যথেষ্ট আছে, জমিজমাও নিতান্ত কম নাই; আর ভাই ভগিনীও নাই—আমার অভাব কি! পৃথিবীতে যাহা কিছু প্রার্থনীয়, সে সমস্তই আমার আছে। ভবিতব্য অলক্ষ্যে থাকিয়া বলিলেন, "সব আছে!"

পরীক্ষার ফল বাহির হইবারও অবকাশ সহিল না—একদিন প্রাতঃকালে পিতৃদেব বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইলেন, অপরাহ্ণ কালেই তাঁহার দেহাবসান হইল। সন্ধ্যার পরে তাঁহার পবিত্র দেহ শ্মশানে লইয়া গেলাম; রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইলে গৃহে ফিরিয়া দেখি

মাতৃদেবীও উক্ত রোগাক্রান্তা হইয়াছেন। পূর্বদিন যে সময়ে পিতৃদেব চক্ষু মুদ্রিত করেন, পরদিন ঠিক সেই সময়ে মাতৃদেবীও আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। তৎপরদিন অপরাহ্নকালে ঠিক সেই সময়েই সংবাদ পাইলাম, আমি স্মৃতি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছি। দিদি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "এ সংবাদটা বাবা, মা শুনেও যেতে পারলেন না!"

পিতৃকার্য শেষ করিলাম। মহাসমারোহেই কার্য শেষ হইল। পিতার যেমন দেশজোড়া নাম ছিল, তাঁহার শ্রাদ্ধকার্য সেই ভাবেই সম্পন্ন করিতে হইল; তাহার জন্য আমাকে বিপন্ন বা ঋণগ্রস্ত হইতে হয় নাই; বর্ধিষ্ণু শিষ্যগণই সে ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন।

এই সমস্ত ব্যাপার শেষ হইয়া গেলে আমি অধ্যাপনা কার্যে ব্রতী হইলাম। একদিন সন্ধ্যার পর দিদির সহিত গল্প করিতে করিতে বলিলাম, "দেখ দিদি, বাবার তিনটি ইচ্ছা এখনও অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। প্রথম—আমার বিবাহ। দ্বিতীয়—তোমার কন্যার বিবাহ। তৃতীয় তোমাকে কাশীধামে প্রেরণ। বাবা মা ত কাশীশ্বরের চরণে পৌঁছিয়াছেন, এখন তোমাকে কাশীতে পাঠাতেই পারিলেই হয়। তবে তার পূর্বেই সুরমার বিবাহ কার্যটা শেষ করিতে হইবে।"

দিদি বলিলেন, "আর তোমার বিবাহ!"

আমি বলিলাম। "এত বড় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতের কন্যা হইয়া তুমি এমন অশাস্ত্রীয় কথাটা বলিলে দিদি! এটি যে আমার মহাগুরু নিপাতের বৎসর, এই কালাশৌচের মধ্যে অরক্ষণীয় নয় এবং কালাশৌচের মধ্যে তাহার বিবাহ হইতে পারে, স্মৃতিশাস্ত্রে ত তাহার বিধান নাই দিদি! অতএব এক বৎসরের জন্য তোমাকে ধৈর্যধারণ করিতেই হইতেছে। তাই বলিয়া সুরমার বিবাহে বিলম্ব করা যাইতে পারে না। আজ জ্যৈষ্ঠ মাসের পনরই, যাহাতে এই আষাঢ় মাসের মধ্যে শুভকার্য সম্পন্ন করিতে পারি, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।"

দিদি বলিলেন, "মেয়ের বিয়ে যাতে শীঘ্র হয়, তার চেষ্টা ত করতেই হবে; কিন্তু এই কয়দিন হল বাবা-মায়ের শ্রাদ্ধে যথেষ্ট ব্যয় হয়ে গেল, এখন আবার এতগুলি টাকা কোথায় থেকে আস্‌বে?"

আমি বলিলাম, "দিদি, তুমি সে জন্য ভাবিও না। শ্রাদ্ধের সময় যে সব বড় বড় শিষ্য এসেছিলেন, তাঁদের আমি বলেছিলাম বাপ মায়ের শ্রাদ্ধ পুত্রের শক্তিসাপেক্ষ, কিন্তু কন্যার বিবাহ শক্তিসাপেক্ষ নয়। পারি আর না পারি, মেয়ের বিয়ে দিতে গেলেই টাকা খরচ করিতেই হইবে। তা তাঁরা আমাকে ভরসা দিয়ে গিয়েছেন যে, দুই তিন হাজার টাকার জন্য কিছুই আট্‌কাবে না। তাই ত সাহস করে বলছি, আষাঢ় মাসের মধ্যেই সুরমার বিয়ে দেব।"

দিদি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "সবই হবে! কিন্তু মা-বাবা যে দেখে যেতে পারলেন না, এ দুঃখ আর যাবে না!"

আষাঢ় মাসেই সুরমার বিবাহ দিলাম। কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ সুধাংশুভূষণের সহিত সুরমার বিবাহ হইল। সুধাংশু তখন রিপন কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণিতে অধ্যয়ন করিতেছিল। তাহাদের অবস্থাও খুব ভাল—ঘর, বর, বিষয়, সম্পত্তি, সম্ভ্রম যাহা কিছু দেখিয়া কন্যার বিবাহ দিতে হয়, আমি

একবারে তাহাই পাইয়াছিলাম। বরকর্তা যদিও একটি পয়সাও গ্রহণ করেন নাই, তবুও আমাকে যথেষ্ট ব্যয় করিতে হইয়াছিল। যে চায়, যে দর করে, অবস্থায় কুলাইলে তাহার সহিত পারিয়া উঠা যায়; কিন্তু যে দরদস্তুর করে না, 'আপনার জামাই মেয়ে, যা দিতে হয় দিবেন' বলিয়া এক কথায় সারিয়া দেয়, তাহার সহিত ব্যবহার করিতে বড়ই বিবেচনা করিতে হয়;—আমারও তাহাই হইয়াছিল। সেই জন্যই আমার খরচ কিঞ্চিৎ অধিক হইয়াছিল। বিশেষত দিদির একমাত্র কন্যা—বাবা মা থাকিলে তাঁহারা যতদূর করিতেন, তাহার অপেক্ষা আমাকে অধিকই করিতে হইল। আপাতত সমস্ত দায় উদ্ধার হইল মনে ভাবিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইলাম। ব্যাপারের মধ্যে রহিল আমার বিবাহ!—সে ত আর দায় নহে। যখন তখন করিলেই হইবে—আর না করিলেই বা কি! ভবিতব্য অলক্ষ্যে থাকিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, তাই-ই!"

আষাঢ় মাসে সুরমার বিবাহ দিলাম—আশ্বিন মাসে তাহার শাশুড়ি বিশেষ অনুরোধ করিয়া তাহাকে লইয়া গেলেন। বড়মানুষের বাড়ি, যথাসাধ্য পূজার তত্ত্ব পাঠাইলাম। পূজার কয়দিন পরে সুরমাকে আনিতে চাহিলাম; কিন্তু তাহার শাশুড়ি তাহাকে কিছুতেই ছাড়িয়া দিলেন না, বলিলেন, "কার্তিক মাসটা এখানেই থাকুক; অগ্রহায়ণ মাসে শীত পড়িলে লইয়া যাইবেন।" সুরমাকে বুঝাইয়া সুজাইয়া রাখিয়া আসিলাম। দিদির ঐ একমাত্র সন্তান,—তিনি দুঃখ করিতে লাগিলেন। আমি তাঁহাকে অনেক করিয়া বুঝাইয়া শান্ত করিলাম।

অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম সপ্তাহে একদিন অপরাহ্ণ কালে আমার চতুষ্পাঠী গৃহের বারান্দায় বসিয়া আছি—এমন সময়ে একজন পিয়ন আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এই কি হরচন্দ্র স্মৃতিতীর্থের টোল?" আমি বলিলাম, "হাঁ, কেন?"

পিয়ন বলিল, "তাঁহার নামে একটি টেলিগ্রাম আছে।" এখন পল্লিগ্রামে চিঠিপত্র সর্বদা আসিয়া থাকে; কিন্তু টেলিগ্রাম অতি অল্পই আসে এবং যাহা আসে তাহাতে প্রায়ই বিপদের সংবাদ থাকে। সুতরাং টেলিগ্রামের নাম শুনিয়া আমার মুখ শুকাইয়া গেল, বুক কাঁপিতে লাগিল। আমি ভীতস্বরে বলিলাম, "আমারই নাম হরচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ—দেখি কি টেলিগ্রাম!"

পিয়ন আমার হাতে টেলিগ্রাম দিলে আমি তাহার কাগজে সহি দিলাম এবং সে কিঞ্চিৎ পারিশ্রমিক প্রার্থনা করায় তাহাকে তাড়াতাড়ি চারি আনা পয়সা দিয়া আমার প্রতিবেশী বসুদিগের বাড়ি টেলিগ্রাম পড়াইতে লইয়া গেলাম। বসুদের ছেলে খগেন্দ্র টেলিগ্রাম পড়িয়া বলিল যে, টেলিগ্রামে লেখা আছে সুধাংশু অত্যন্ত পীড়িত, আমাকে অবিলম্বে যাইতে লিখিয়াছে। এই-সংবাদ পাইয়া আমার মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। আমি কেমন করিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিব তাহা ভাবিতে লাগিলাম; কিন্তু আর বিলম্ব করিবার সময় ছিল না। দিদির নিকট গোপন করিবারও প্রয়োজন বুঝিলাম না; কারণ অদৃষ্টে কি আছে বলা যায় না, তাঁহাকে সঙ্গে লইয়াই যাইব।

তখনই বাড়িতে আসিয়া দিদিকে টেলিগ্রামের কথা বলিলাম। তিনি এই সংবাদ শুনিয়া চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। প্রতিবেশিনীরা আসিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। সকলেই বলিতে লাগিলেন, "অসুখ হয়েছে, সেরে যাবে। আগে কেঁদে কেটে অকল্যাণ করতে নাই,—এখন তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাবার আয়োজন কর।"

দিদিকে লইয়া তৎক্ষণাৎ কলিকাতা যাত্রা করিলাম। গাড়ি যখন হাওড়া ষ্টেশনে পৌছিল, রাত্রি তখন সাড়ে এগারোটা। তাড়াতাড়ি একখানি গাড়ি ভাড়া করিয়া সুধাংশুদের বাড়ি ভবানীপুরে উপস্থিত হইলাম। বাড়ির নিকট যাইয়া দেখি, অত বড় বাড়ি একবারে অন্ধকার—কেবল সদর দরজায় একটি আলো জ্বলিতেছে। বাড়ি নিস্তব্ধ এবং অন্ধকার দেখিয়াই আমি বুঝিলাম—সব শেষ হইয়াছে। বাড়ির সম্মুখে গাড়ি লাগিল। আমি নামিয়া পড়িলাম;—দিদিরও বিলম্ব সহিল না—তিনিও আমার সঙ্গে সঙ্গে নামিয়া পড়িলেন। গিরিশবাবু তখন জাগিয়া ছিলেন। তিনি গাড়ি থামিবার শব্দ পাইয়াই বাহিরের দিকে চলিয়া আসিতেছিলেন। দ্বারের নিকট আমাকে দেখিয়াই চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া বলিলেন, "বেয়াই, আমার সুধা আর নাই।"—এই বলিয়া তিনি আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। এই কথা শুনিবামাত্র দিদি "বাবা গো" বলিয়া দ্বারের সম্মুখে পড়িয়া গেলেন। আমি ও গিরিশবাবু তাড়াতাড়ি তাঁহাকে তুলিতে গেলাম—দেখিলাম তিনি মূর্ছিতা হইয়াছেন। তখন তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া বাড়ির মধ্যে লইয়া যাওয়া হইল। সুরমা কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া তাঁহার বুকের উপর আছড়াইয়া পড়িল—বাড়িময় কান্নার রোল পড়িল।

বাড়ির স্ত্রীলোকেরা আসিয়া তাঁহাদিগকে উপরে লইয়া গেলেন। তাহার পর গিরিশবাবুর নিকট শুনিলাম সেই দিন প্রাতঃকালে সুধাংশুব কলেবা হয়। শহরে যত বড় বড় চিকিৎসক আছে—সকলকেই দেখান হয়, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না—সন্ধ্যার সময় সকলকে ফাঁকি দিয়া সুধাংশু কোথায় চলিয়া গেল। হায় কলেরা, তুমি কি আমার যথাসর্বস্ব লইবার জন্যই প্রতিজ্ঞা করিয়াছ। ঐ রোগে বাবা গেলেন, ঐ রোগে মা গেলেন, ঐ রোগে সুধা গেল; এখন আমাকে আর দিদিকে লইলেই তর্কালঙ্কারের বংশ লোপ হয়; আমরাও বাঁচি!

দুই দিন সেখানে থাকিয়া তৃতীয় দিনে দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা সুরমাকে সঙ্গে লইয়া বাড়ি ফিরিলাম। গিরিশবাবু শ্রাদ্ধের দিন পর্যন্ত সুরমাকে রাখিতে চাহিয়াছিলেন—আমি বলিলাম, "সে যা হয়, আমি ওখানেই করিব।"—গিরিশবাবু আর আপত্তি করিলেন না।

মনে করিয়াছিলাম ভাগিনেয়ীটির বিবাহ দিলাম, এখন দিদিকে কাশীতে পাঠাইতে পারিলেই কিছুদিন হাত পা ছাড়াইয়া বিশ্রাম করিব। তাহার পর যদি দুর্মতি হয়, তাহা হইলে বিবাহ করিয়া ঘোর সংসারী হইব। এখন দেখিতেছি, সে সকল কল্পনাতেই রহিয়া গেল যে কয়দিন বাঁচিয়া আছি, বার বৎসর বয়সের বিধবা বালিকাকে লইয়া জ্বলিতে হইবে, পুড়িতে হইবে। দিদির যে প্রকার শরীরের অবস্থা দেখিলাম, তাহাতে তিনি যে অধিক দিন বাঁচিবেন, তাহার সম্ভাবনা খুবই কম। দিদির ভাল মন্দ হইলে সুরমাকে লইয়া কি করিব, সেই ভাবনাই আমার প্রবল হইল। শ্বশুরবাড়ি! সে সম্বন্ধ ত গঙ্গার তীরে চিতাভস্মে বিলীন হইয়া গিয়াছে। সেখানে শাস্ত্রাধ্যয়নে নিরত করিব। আমাদের ধর্মশাস্ত্র যাহা পড়িয়াছি, তাহা তাহাকে পড়াইব;। —যাহা পড়ি নাই তাহা নিজে পড়িয়া তাহাকে পড়াইব—চতুষ্পাঠী তুলিয়া দিব—সুরমাকে শিক্ষা প্রদান করাই আমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হইবে। এই সংকল্পে আমার মন স্থির হইল—বর্তমান গভীর শোকে আমি কিঞ্চিৎ শান্তি লাভ করিলাম।

মানুষের কি বুদ্ধি। সে মনে করে, সেই বুঝি তাহার কার্যের কর্তা, তাহার সঙ্কল্পসিদ্ধি

তাহারই হাতে রহিয়াছে; কিন্তু আর একজন আছেন, যিনি তোমার কল্পনা, তোমার সঙ্কল্প কিছুরই ধার ধারেন না। তুমি ইচ্ছা কর বা না কর—তাঁহার কার্য তিনি করাইয়া লইবেন। আমারও তাহাই হইল, দশদিনও বিলম্ব সহিল না—ইহার মধ্যে আমার কল্পনা কোথায় উড়িয়া গেল, আমার জীবনের উদ্দেশ্য কোথায় ভাসিয়া গেল। অদৃষ্টদেবীর নির্মম কঠোর বিধানে আমার কি হইয়াছিল তাহাই বলিতেছি।

সুরমাকে বাড়ি লইয়া আসিবার তিন দিন পরেই একাদশী তিথি আসিয়া উপস্থিত হইল। একাদশীর পূর্ব দিন দিদি আমাকে বলিলেন "হরচন্দ্র, কাল যে একাদশী। কেমন করিয়া ঐ কচি মেয়েকে এই সময়ে উপবাসী রাখব।" কথাটা আমি ভাবি নাই—কথাটা আমার মনেও হয় নাই। দিদি যখন একাদশীর কথা তুলিলেন, তখন আমি বুঝিতে পারিলাম বার বৎসরের মেয়ের পক্ষে একাদশীর ব্যবস্থা কি ভয়ানক! পাঁচদিন পূর্বে যাহাকে দিনের মধ্যে কতবার খাওয়াইলেও তাহার ক্ষুধার নিবৃত্তি হইত না, আজ এই পাঁচদিন পরে তাহার জন্য একাদশীর ব্যবস্থা করিতে হইবে;—ব্রাহ্মণের বিধবা—নিরম্বু একাদশী; স্মৃতিশাস্ত্রে পণ্ডিত আমি—অনেকের অনেক ব্যবস্থা দিয়াছি, কিন্তু আজ বিধবা ভগিনীর দ্বাদশ বর্ষীয়া বিধবা কন্যার নিরম্বু একাদশীর ব্যবস্থা দিতে আমার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। আমি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলাম, "ও কথা আর আমার কাছে তুলছ কেন দিদি? যা ব্যবস্থা হয় তুমিই কর।"

পরদিন একাদশী;—সুরমার জন্য নিরম্বু উপবাসের ব্যবস্থা হইল। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পরিবার, মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় জয়চন্দ্র তর্কালঙ্কারের ভাগিনেয়ীর জন্য অশাস্ত্রীয় ব্যবস্থা হইবে কেন? শাস্ত্রের আদেশ অমান্য করিলে আমাদের চলিবে কেন? আর যে হয় ম্লেচ্ছাচারপরায়ণ হইতে পারে, কিন্তু আমরা শাস্ত্রের বিধান কিছুতেই লঙ্ঘন করিতে পারি না। তাহার জন্য যদি জীবন বিসর্জন দিতে হয়, তাহাও অকাতরে দিতে হইবে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া, দেশপূজ্য পণ্ডিতের দুহিতা আমার দিদি তাঁহার দ্বাদশ বর্ষীয়া বিধবা কন্যার জন্য নিরম্বু একাদশীর ব্যবস্থা করিলেন—আমি নীরবে তাহার অনুমোদন করিলাম।

বেলা তৃতীয় প্রহর পর্যন্ত সুরমা ক্ষুধার জ্বালায় ছটফট করিতে লাগিল। সেদিন বাড়িতে হাঁড়ি চড়ে নাই; দিদির একাদশী; কচিমেয়ে সুরমার একাদশী—আর আমার জন্য আহার প্রস্তুত হইবে? শাস্ত্রে ইহার ত বিধি নাই—আমারও সেদিন নিরম্বু একাদশী। পর পর তিন দিন উপবাসেও দিদিকে কাতরা করিতে পারে না;—হিন্দু বিধবা, ব্রাহ্মণের বিধবার সে সব সয়। যাজক ব্রাহ্মণ আমি—আমাকে অনেক সময় উপবাসী থাকিতে হয়—বাল্যকাল হইতে আমরা ব্রাহ্মণ সন্তান, এ সংযম অভ্যাস করিয়া থাকি। আগে যদি জানিতাম্ সুরমা দ্বাদশ বৎসর বয়সে বিধবা হইবে, তাহা হইলে তাহাকেও উপবাস করিতে শিক্ষা দিতাম। সে শিক্ষা ত তাহাকে দেওয়া হয় নাই; তাই সুরমা ক্ষুধার জ্বালায় ছটফট করিয়া বেড়াইতে লাগিল। আমি সে দৃশ্য দেখিতে না পারিয়া বাড়ির বাহির হইয়া পড়িলাম;—মনে স্থির করিলাম, সুরমা ঘুমাইয়া গেলে অধিক রাত্রিতে বাড়ি ফিরিব। তাহার শুষ্ক মুখ, তাহার কাতর দৃষ্টি অসহ্য—একান্তই অসহ্য—আমার ন্যায় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরও অসহ্য।

এ-পাড়া ও-পাড়া, এ-বাড়ি ও-বাড়ি ঘুরিয়া রাত্রি নয়টার পর গৃহে ফিরিলাম। মনে

করিয়াছিলাম সুরমা ঘুমাইয়াছে; কিন্তু বাড়ির মধ্যে প্রবেশ কবিয়া দেখি দক্ষিণের বারান্দায় সুরমা শুইয়া আছে, আর তাহার পার্শ্বে দিদি বসিয়া আছেন। আমি বারান্দায় উঠিবামাত্র সুরমা আমার দিকে কাতর দৃষ্টিতে চাহিয়া অতি ক্ষীণস্বরে বলিল, "মামা গো, একটু জল।"

আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। বহু কষ্টে ক্রন্দন সংবরণ করিয়া আমি বলিলাম, "দাও দিদি, ওর মুখে একটু গঙ্গাজল;—ইহাতে যত পাপ হয় সব আমার। ইহার জন্য যদি নরকে যাইতে হয়, আমি সেখানেও যাইব, কিন্তু সুরমার এ কষ্ট আমি আর দেখিতে পারি না। দাও দিদি, ওর মুখে একটু গঙ্গাজল।"

দিদি সুরমাকে বলিলেন, "লক্ষ্মী মা আমার, রাত আর বেশি নাই, একটু ঘুমাও, ভোর হইলেই তোমাকে জল খেতে দিব।" আমি বলিলাম, "দিদি, শাস্ত্র এমন নির্দয়, নয়, বালিকা বিধবার জন্য এ কঠোর ব্যবস্থা শাস্ত্রে নাই, আমি বল্‌ছি শাস্ত্রে নাই; তুমি—"

আমার কথায় বাধা দিয়া দিদি বলিলেন, "হরচন্দ্র, এমন ব্যবস্থা দিও না। একদশীর দিনে ব্রাহ্মণের বিধবার জলগ্রহণ করিতে নাই,—বাবার কাছে একথা শুনেছি—দাদামহাশয়ের কাছে একথা শুনেছি। চোদ্দ বছর বয়সে সুরোকে কোলে নিয়ে বিধবা হয়ে এ ব্যবস্থা প্রতিপালন করেছি।"

আমি বলিলাম, "তবে তাই হউক—জল জল করে সুরমা মরুক—তুমি আমি তাই দাঁড়িয়ে দেখি।"

সুরমা আমার মুখের দিকে চাহিল, অতি ক্ষীণকণ্ঠে আর একবার বলিল, "মামা, জল—একটু জল"—

তাহার পরই সে কণ্ঠ নীরব। পরদিন প্রাতঃকালে দেখিলাম তাহার জ্বর হইয়াছে। তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডাকিলাম। তিন চারি দিন ধরিয়া চিকিৎসা করাইলাম; কিন্তু তাহাকে কোনও ক্রমে বাঁচাইতে পারিলাম না। সেই যে একাদশীর রাত্রে বলিয়াছিল, "জল—একটু—জল" তাহার পর আর সে মুখে একটি কথাও শুনিতে পাই নাই। ব্রাহ্মণের বিধবা—দ্বাদশ বর্ষীয়া বালবিধবা—একবিন্দু জলের জন্য ছটফট করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিল। আমরা সে দৃশ্য দাঁড়াইয়া দেখিলাম, একটি কথাও বলিতে পারিলাম না। শাস্ত্রের আদেশ কি লঙ্ঘন করা যায়? শাস্ত্রের আদেশ প্রতিপালিত হইল—অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হইল—বার বৎসরের মেয়েকে নিরম্বু একাদশীর নিকট বলি দিতে হইল। দিদি দিনরাত কাঁদিতেছেন,—কি বলিয়া তাঁহাকে প্রবোধ দিব। কাশী যাইতে বলিলাম; তিনি আমাকে ফেলিয়া কোথাও যাইবেন না।

কিন্তু বাড়িতে যে তিষ্ঠিতে পারি না, তাহার কি করি? প্রতিদিন সন্ধ্যার পর বাড়ির ভিতরের অঙ্গনে প্রবেশ করিলেই আমার কর্ণে সেই বালিকার কাতর আর্তনাদ প্রবেশ করে—"মামা, জল—একটু জল;" এ আর্তনাদ যে আর আমি সহ্য করিতে পারি না। হায় ভগবান্! এ কি ভীষণ শাস্তি!

—মানসী ষষ্ঠ বর্ষ, ১৩২০-২১, ১ম খণ্ড, ষষ্ঠ সংখ্যা, শ্রাবণ।

"না"

একটা কথা অনেক সময়ে অনেকেই আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন—"এই যে আপনি হিমালয় ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন, সেখানে কি কখন কোন ভাল লোকের সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই?" আমি সকলকে একই উত্তর দিয়াছি—"ভাল চোখ থাকিলে তবে ত ভাল লোক খুঁজিয়া বাহির করা যায়। আমার চক্ষু ছিল না, তাই ভাল লোক দেখিতে পাই নাই।" আমার এই উত্তর শুনিয়া সকলেই নীরব হইয়াছেন।

কিন্তু সত্যসত্যই কি আমি ভাল লোক দেখিতে নাই?—কথাটা অস্বীকার করিলে পাপ হয়। যাঁহাদের সহায়তায়, যাঁহাদের আশীর্বাদে, যাঁহাদের কৃপায় আমি অশেষ বিপদে রক্ষা পাইয়াছি, ঝড়-বৃষ্টিতে, অর্ধাশন-অনশনে ক্লান্তি বোধ করি নাই, গভীর অরণ্যে, জনহীন দুর্গম পর্বতক্রোড়ে, গভীর নিশীথে একাকী বাস করিতে অনুপাত ভীত হই নাই, তাঁহারা নিশ্চয়ই ভাল মানুষ—দেবতাস্থানীয়—দেবতা বলিতেও আমি সঙ্কুচিত নহি। এই সকল সাধু মহাত্মার যে অযাচিত অনুগ্রহ ও কৃপা লাভ করিয়াছি, তাহার কোন বিবরণ আমার "হিমালয়" "প্রবাস-চিত্র" বা "পথিকে' আমি প্রায়ই লিপিবদ্ধ করি নাই—ইচ্ছা করিয়াই করি নাই। কেবল একবার পরম স্নেহভাজন শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, সাহিত্য-সম্পাদক মহাশয়ের বিশেষ অনুরোধে 'সাহিত্য' পত্রে "অতিপ্রাকৃত কথা" শিরোনামে একটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম; তাহার পর এই এতকালের মধ্যে কোন দিন সে সকল কথার উল্লেখ করি নাই।

এখন মনে হইতেছে জীবনের শেষপ্রান্তে দণ্ডায়মান হইয়া আর সে কথা গুলি মনে রাখিয়া যাই কেন? এমন এক সময় ছিল, যখন দশজনের বিশ্বাস-অবিশ্বাস, আস্থা-অনাস্থার কথা মনে উঠিত। এখন এই খেয়াঘাটে দাঁড়াইয়া সে কথা আর বড় একটা মনে আসে না। তাই আজ পাঠকগণের নিকট একটি অতীত কাহিনী বলিব। ইহার মধ্যে "অতিপ্রাকৃত' কিছু নাই; তবুও কথাটা এতদিন বলি নাই। এমন অনেক কথা আমার মনে আছে।

সে অনেক দিনের কথা। হিমালয়প্রদেশে তখন আমার এক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। আমি দেরাদুনে থাকিতাম, অল্প বিস্তর এটা ওটা করিতাম! হঠাৎ এক এক দিন জঙ্গলে, পর্বতে মাথা দিতাম, দুই তিন দিন আর ফিরিতাম না; তাহার পর একদিন আসিয়া লোকালয়ে উপস্থিত হইতাম। আমার বন্ধু বান্ধবগণ আমার অদর্শনে ব্যস্ত হইতেন না; তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল, যদি মরিয়া না যাই তাহা হইলে তাঁহাদের স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করিয়া আমি একেবারে উধাও হইয়া যাইতে পারিব না।

এই প্রকার অবস্থায় একদিন অতি প্রত্যুষে আমি কাহাকেও কিছু না বলিয়া, কোনও সংবাদ না দিয়া দেরাদুন ত্যাগ করি। শহর হইতে কিছু দূরবর্তী টপকেশ্বর শিবের স্থান আমার বড়ই ভাল লাগিত; আমি যখন তখন সেখানে যাইতাম। অনেক সময়ে সেই শিবের পার্শ্বে বসিয়া সমস্ত রাত্রিও কাটাইয়া দিয়াছি। এখন যে বারের কথা বলিতেছি, সেবারেও বাসা হইতে বাহির হইয়া বরাবর টপকেশ্বর গিয়াছিলাম। কিন্তু সেদিন কি একটা উপলক্ষে অনেক গুর্খা নরনারী,

বালকবালিকা প্রাতঃকালেই টপকেশ্বরে সমবেত হইয়াছিল। অন্য দিন হইলে হয় ত আমি এ জনতায় অসুবিধা বোধ করিতাম না, সেই খানেই থাকিয়া যাইতাম। কিন্তু সেদিন কি জানি কেন, অথবা আমার সৌভাগ্যক্রমে, জনতা ভাল লাগিল না। আমি তখন টপকেশ্বরের বাঁধান উচ্চ পথ ছাড়িয়া নির্ঝরতীরে নামিয়া গেলাম। নির্ঝরে তখন অল্প জলই ছিল; তবে স্রোত কিঞ্চিৎ প্রবল ছিল। আমি নির্ঝরের পার্শ্ব দিয়া উত্তরাভিমুখে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া একটি স্থানে জলধারা সঙ্কীর্ণ দেখিয়া অতি সাবধানে নির্ঝর পার হইয়া গেলাম। দুই দিকে অত্যুচ্চ পাহাড়, তাহারই মধ্য দিয়া নির্ঝরই বলুন—আর নদীই বলুন, নিম্নাভিমুখে চলিয়া যাইতেছিল। অনেকের মুখে শুনিয়াছিলাম এই নির্ঝরতীরে পর্বতগাত্রে অনেকগুলি সুন্দর গহ্বর আছে। শুনিতাম মধ্যে মধ্যে দুই চারিজন সাধু সন্ন্যাসী সেই স্থানে আসিয়া থাকেন। টপকেশ্বর শিবের সম্মুখস্থ অপর পারের পর্বতগাত্রে এই প্রকার দুই একটি গুহা দেখিয়াছিলাম; কিন্তু সে গুলিতে সাধু সন্ন্যাসীর আবির্ভাব দেখি নাই। সেদিন যেখানে উপস্থিত হইলাম, সেখানে তিন চারিটি অতি সুন্দর গুহা ছিল। আমার তখন ইচ্ছা হইল, ইহারই একটি গুহায় সমস্ত দিন কাটাইয়া সন্ধ্যার সময় বাসায় ফিরিয়া যাইব।

এই স্থানে আমার বেশভূষার একটু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন মনে করিতেছি। তখন বর্ষাকাল, তাই আমাব পরিধানে একখানি ধুতি, গায়ে পাঞ্জাবি, মাথায় একটি প্রকাণ্ড পাগড়ি, হস্তে দীর্ঘ যষ্ঠি, পাদুকাও ছিল, কিন্তু ঝরনা পার হইবার সময় তাহা অপর পারে ফেলিয়া আসিয়াছিলাম। সে সময়ে আমাকে দেখিলে কেহই বাঙালি বলিয়া চিনিতে পারিতেন না।

এই অবস্থায় পর্বতগাত্রে দুই তিনটি গুহা দেখিয়া আমি সেই গুহাগুলির উদ্দেশ্যে উপরের দিকে উঠিতে লাগিলাম। পর্বতের পার্শ্ব তেমন ঢালু ছিল না, সুতরাং গুহাগুলির নিকটবর্ত্তী হইতে আমাকে বিশেষ আয়াস স্বীকার করিতে হইল না। আমি প্রথমে যে গুহার সম্মুখে গেলাম, সেটি একটু সঙ্কীর্ণ এবং অপরিচ্ছন্ন। তাহার মধ্যে প্রবেশ করা যায় এবং স্বচ্ছন্দে উপবেশন করাও যায়; কিন্তু তাহার মধ্যে দাঁড়াইবার স্থান হয় না। সেখান হইতে চাহিয়া দেখলাম অনতিদূরে একটু উচ্চে আর একটি গুহা রহিয়াছে। সেই গুহার নিকটে যাইযা দেখিলাম তাহার বহির্ভাগ বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। মনে হইল কে যেন সেই দিনই বা তাহার পূর্বদিন গুহার সম্মুখভাগ পরিচ্ছন্ন করিযাছে। আমি সেই গুহার সম্মুখে উপস্থিত হইবামাত্র গুহার অভ্যন্তর হইতে অতি কোমলকণ্ঠে কে বলিলেন "আসুন"।

এই হিমালয়ের নিভৃত প্রান্তে, নির্ঝরের পার্শ্বে জনশূন্য স্থানে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র গুহা হইতে আমারই মাতৃভাষায় কে আমাকে এমন মধুর স্বরে অভ্যর্থনা করিল,—আমি তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না।—বিস্ময়াকুল চিত্তে আমি সেই স্থানে দণ্ডায়মান হইলাম।

আমাকে নিশ্চল দেখিয়া পুনরায় তেমনই মধুর স্বরে গুহার ভিতর হইতে আহ্বান আসিল "আসুন।"

আর দাঁড়াইয়া থাকা অকর্তব্য মনে করিয়া আমি সেই গুহার দ্বারের নিকট গেলাম। আমাকে দেখিয়াই গুহার মধ্য হইতে একটি মূর্তি বাহির হইয়া আসিলেন। আমি সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলাম আমার সম্মুখে সহাস্যবদনে এক দেবীমূর্তি দণ্ডায়মান। পরিধানে গৈরিকবাস,

গলদেশে রুদ্রাক্ষমালা, মস্তকের বিপুল কেশরাশি আলুলায়িত! এ যে সত্যসত্যই দেবীমূর্তি-এ যে সত্যসত্যই মাতৃমূর্তি।

আমি তখন প্রণাম করিতে ভুলিয়া গেলাম, কথা বলিতে ভুলিয়া গেলাম, সেই জ্যোতির্ময়ী মূর্তির দিকে চাহিবারও শক্তি অপহৃত হইল। আমি নিশ্চলভাবে সেই দেবীমূর্তির সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলাম। আমাকে তদবস্থ দেখিয়া সেই দেবী বলিলেন "ভিতরে আসিয়া বসুন। আমি আপনারই আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলাম।"

"আমার—আমি—" আমি আর কিছুই বলিতে পারিলাম না। তখন সেই দেবী বলিলেন 'হাঁ, আমি কা'লই চলিয়া যাইতাম, কিন্তু আপনার জন্যই এখানে অপেক্ষা করিয়া আছি।"

আমার তখন বিস্ময়ের সীমা রহিল না। আমার হৃদয়ে সাহসের সঞ্চার হইল। সেই দণ্ডায়মানা দেবীর মুখের দিকে চাহিয়া অতি ধীর স্বরে বলিলাম, "আমার অপেক্ষায় আপনি রহিয়াছেন? আমি যে আজ এখানে আসিব, একথা দশ মিনিট পূর্বে আমিই ভাবি নাই।"

দেবী উত্তর করিলেন, "আপনি না ভাবিতে পারেন, আমি কিন্তু জানিতাম। আপনি ভিতরে আসিয়া বসুন; তখন কথাবার্তা হইবে।"—এই বলিয়া তিনি গুহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন, আমিও তাঁহার অনুসরণ করিলাম।

ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম কেবল একখানি মৃগচর্ম বিস্তৃত রহিয়াছে; ত্রিশূল, কমণ্ডলু বা অন্য কোন দ্রব্যই গুহার মধ্যে দেখিলাম না। দেবী সেই মৃগচর্ম খানি আমাব দিকে সরাইয়া দিযা বলিলেন, "এই খানিতে বসুন।"

"আসনের প্রয়োজন নাই"—বলিয়া আমি মাটিতে বসিয়া পড়িলাম, দেবীও আসনখানি সরাইয়া রাখিয়া মাটিতেই বসিলেন।

তখন আমিই প্রথমে কথা বলিলাম; আমি বলিলাম, "আমি যে বাঙালি, তাহা আপনি কেমন করিয়া বুঝিলেন?"

দেবী হাসিয়া বলিলেন, "আপনি আসিবেন, আপনার সহিত দেখা হইবে, ইহা যখন জানি, তখন আপনি যে বাঙালি তাহা আর জানি না! আমি আপনাকে চিনি।"

আমার বিস্ময়ের সীমা রইল না। এই হিমালয় প্রদেশে অনেক সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনী, ভৈরব-ভৈরবী দেখিয়াছি; কিন্তু এ মূর্তি ত কখনও দেখি নাই, কখনও কোন সন্ন্যাসিনীর সহিত বাক্যালাপও করি নাই। তবে ইনি আমাকে কেমন করিয়া চিনিলেন? আমি দেরাদুনে থাকি, কখন কোথায় যাই তাহার স্থিরতা নাই, কখন কি করিব তাহা আমিই জানি না। সে দিন যে ওখানে যাইব, সে দিন যে বাসার বাহির হইব—একথা পূর্ব রাত্রিতেও আমি চিন্তা করি নাই। প্রত্যুষে নিদ্রাভঙ্গ হইলে অকস্মাৎ আমার মাথায় খেয়াল চাপিল, আমি বাহির হইযা পড়িলাম। তখনও জানি না কোথায় যাইব; অথচ ইনি এই নির্জন গিরিগুহায় আমারই প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন বলিতেছেন। বিস্ময়ের বিষয় নহে কি?

আমাকে চিন্তাকুল দেখিয়া দেবী বলিলেন, "ও সব কথা থাক, আপনি আজ এখানে থাকিবেন?"

আমি বলিলাম, "না, আমি এই দিকে বেড়াইতে আসিয়াছিলাম, এখনই চলিয়া যাইব। আপনার কার্যের ব্যাঘাত উপস্থিত করিব না।"

তিনি হাসিয়া বলিলেন, "আপনার সহিত সাক্ষাৎ করা ব্যতীত এখানে ত আমার অন্য কোন কাজ নাই। আমি কালই চলিয়া যাইতাম। বলিয়াছি ঐ যে আপনার সহিত দেখা হইবে বলিয়াই এখানে অপেক্ষা করিতেছি।"

আমি তখন অতি ধীরভাবে বলিলাম, "ক্ষমা করিবেন, আপনার কথা আমি আদৌ বুঝিতে পারিতেছি না।"

তিনিও ধীরভাবে বলিলেন, "বুঝিবার বিশেষ প্রয়োজনও দেখিতেছি না।" সেই সময় আকাশে মেঘ করিয়া আসিল। তিনি এই মেঘাড়ম্বর দেখিয়া বলিলেন, "এখানে থাকা আর নিরাপদ নহে, একটু পবেই মুষলধাবে বৃষ্টি নামিবে এবং তাহার কিছুক্ষণ পরেই এই নদীতে জল স্রোত আসিবে। তখন আর পাব হওযা যাইবে না। আমি পূর্বে একবার এখানে আসিয়া তিন দিন এই গুহায় বন্দী হইয়া ছিলাম। তিন দিন পরে জল নামিয়া গেলে তবে পার হইয়া চলিয়া যাই। আজও তাহাই হইবে।"

আমি তখন জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখান হইতে বাহির হইয়া আপনি কোথায় যাইবেন?

তিনি বলিলেন, "শিভালিক পাহাড় পার হইয়া লাহোরের দিকে যাইব।"

আমি তখন অতি বিনীতভাবে বলিলাম, "যদি কিছু মনে না করেন তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি,—আপনি আমাকে কোথায় দেখিযাছেন?"

তিনি বলিলেন, "কলিকাতায়।"

আমি অধিকতর বিস্মিত হইয়া বলিলাম, "কলিকাতায়! কবে? কোথায়?"

তিনি বলিলেন, "আপনি কি আমাকে মোটেই চিনিতে পারিতেছেন না?"

আমি বলিলাম, "না। কখনও যে আপনার সহিত দেখা হইয়াছে, তাহা ত আমার মনে পড়ে না।"

তিনি তখন বলিলেন, "আমি মনে কবাইযা দিতেছি। সে বোধ হয় সাত আট বৎসর পূর্বের কথা। আপনি তখন কলিকাতায় পড়িতেন। আমি তখন কি করিতাম তাহা আর বলিব না। আমি কলিকাতাতেই বাস করিতাম। যেভাবেই হউক, আমার দিন কাটিয়া যাইত। একদিন বিকাল বেলায় ভয়ানক বৃষ্টি হইতেছিল। আমি যে গলিতে বাস করিতাম, আপনি বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে সেই গলি দিয়া বোধ হয় ঘরে ফিরিয়া যাইতেছিলেন। আপনার ছাতা ছিল না, বৃষ্টিতে কাপড় ভিজিয়া গিয়াছিল, বইগুলিও ভিজিয়া গিয়াছিল। আপনি যখন আমার বাড়ির সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, তখন বৃষ্টি আবও জোরে পড়িতে লাগিল। আমার ঝি কোন প্রয়োজনে বাহিরে গিয়াছিল। বুড়া মানুষ এই জলবৃষ্টিতে দুয়ারে আসিয়া দাঁড়িয়া না থাকে—এই মনে করিয়া আমি দুয়ার খুলিয়া কবাটের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিলাম। সেই সময়ে আপনি ভিজিতে ভিজিতে আমার দ্বারে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। আমি আপনার সেই সময়ের অবস্থা দেখিয়া আপনাকে বলি, "আপনি বড়ই ভিজিয়া গিয়াছেন; উপরে চলুন, কাপড় ছাড়িয়া, বিশ্রাম করিবেন। জল ছাড়িলে বাড়িতে যাইবেন।" আমার এই কথা শুনিয়া আপনি আমার দিকে চাহিলেন। আপনার সে দৃষ্টি এখনও আমার মনে আছে। তাহার পর হঠাৎ—

"না" এই কথাটি মাত্র বলিয়া সেই প্রবল বৃষ্টির মধ্যে বাহির হইয়া গেলেন এবং দেখিতে দেখিতে আমাদের গলির মোড় পার হইয়া গেলেন।

"ভাই, আর আপনি বলিতে পারিবেন না। তোমার সেই 'না' শব্দটা সেই মুহূর্তে আমার বুকে আসিয়া বাজল। কত পাপ করিয়াছি, কত ভালমন্দ কথা শুনিয়াছি, কিন্তু এমন 'না' শব্দ কোন দিন আমার কানে আসে নাই, এমন করিয়া আমার বুকের মধ্যে আঘাত করে নাই। আমি সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিলাম। আমার বোধ হইল প্রত্যেক বৃষ্টিবিন্দু বলিতেছে—'না';—আমার মনে হইল আকাশের মেঘ গর্জন করিয়া বলিতেছে—'না, না';—আমার মনে হইল সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এক স্বরে জলদগম্ভীর ধ্বনি করিতেছে—'না'।

আমি তখন অধীর হইয়া পড়িলাম। কি কঠোর শব্দ, কি ভয়ানক শব্দ, কি হৃদয়ভেদী বাণী—এ 'না'। আমার জ্ঞান অপহৃত হইবার মত হইল। আমি জানি না কেমন করিয়া উপরে উঠিয়া গেলাম, কেমন করিয়া মাটিতে পড়িলাম। যখন জ্ঞানসঞ্চার হইল, তখন ভাই, তোমার সেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আমার চক্ষুর সম্মুখে জাজ্বল্যমান হইল, তখনও আমি শুনিতে পাইলাম, তুমি বলিতেছ—'না'।

"সেই রাত্রিতেই আমি জ্বরে পড়িলাম। শুনিয়াছি বিকারের ঘোরে আমি না কি ক্রমাগত চিৎকাব করিয়াছি 'না, না'। তাহার পর আমি চিকিৎসার গুণে আরোগ্য লাভ করিলাম। কিন্তু সে আমি আর থাকিলাম না; কে যেন আমার মধ্য হইতে আমার পূর্বের আমিকে একবাবে সরাইয়া দিয়াছিল।

"তাহার পর কি হইল শুনিবে ভাই? আমি একদিন রাত্রিযোগে সমস্ত ফেলিয়া পথে বাহির হইলাম। কাহারও আশ্রয় গ্রহণ করি নাই কাহারও উপদেশ লই নাই, শুধু জপমন্ত্র হইয়াছিল ঐ 'না' শব্দ। আমি কত স্থান ভ্রমণ করিয়াছি, কত দেশে গিয়াছি, কত সাধু, কত মহাজন আমাকে আশীর্বাদ করিয়াছেন, কিন্তু কাহারও নিকট মন্ত্র গ্রহণ করি নাই আমি একই মন্ত্র পাইয়াছিলাম—সেই 'না'।

'তাহার পর কেমন করিয়া কি হইল আমি জানি না, আমি বুঝি না, আমি বলিতে পারিব না। আমি তখন মনে মনে তোমার অনুসন্ধান করিলাম, মনে মনেই দেশ খুঁজিয়া দেখিলাম। তোমাকে এই দেরাদুন শহরে দেখিতে পাইলাম—তাই আমি এখানে আসিয়াছিলাম।

"তাহার পর কেমন করিয়া দেখিলাম তাহা আমি জানিনা—তবে আমি জানিতে পারিলাম, তুমি আজ এখানে আসিবে তোমাকে আজ আমায় দর্শন দিবার জন্য এখানে আসিতেই হইবে। তাই আজ তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম! তোমায় দেখিলাম। তোমার সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নাই ত ভাই! তোমার মুখে সে 'না' শব্দ নাই ত ভাই! বেশ, বেশ! আমার সাধনা আজ সিদ্ধ হইল। তুমি তোমার পথে যাও ভাই! আমি চলিলাম।"

এই বলিয়া সেই দেবীপ্রতিমা পর্বতগাত্র বাহিয়া দ্রুতপদে নামিতে লাগিলেন; আমি তখন চিৎকার করিতে করিতে তাঁহার অনুসরণ করিলাম;—"দাঁড়াও, দাঁড়াও। একবার ফিরিয়া চাও।" আমি দ্রুতপদে অনুসরণ করিয়াও তাঁহাকে ধরিতে পারিলাম না। তিনি কোন্ দিক দিয়া

কোথায় চলিয়া গেলেন, আমি বুঝিতে পারিলাম না; ইতস্তত অনুসন্ধান করিলাম, কোথাও তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না।

তখন আকাশ ভাঙিয়া বৃষ্টি আসিল। আমি আশ্রয় লাভের জন্য টপকেশ্বরের গুহায় গেলাম। সেই স্থানে, সেই শিবের পার্শ্বে বসিয়া এই অলৌকিক ব্যাপারের কথা ভাবিতে লাগিলাম! এ কি ব্যাপার!

ঘণ্টাখানেক যাইতে না যাইতেই নদীতে জলস্রোত নামিয়া আসিল, ক্ষুদ্র নদী ফুলিয়া উঠিল, গর্জন করিতে করিতে জলস্রোত চলিল। তখন আমার মনে হইতে লাগিল দূর—অতি দূর হইতে কে যেন কাতর স্বরে বলিতেছে—

'না'

-মানসী ৫ম বর্ষ, ১৩১৯-২০, ৮ম সংখ্যা, আশ্বিন।

ভীষণ প্রায়শ্চিত্ত

আমি যখন আমাদের গ্রামের স্কুলে তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ি, তখন সতীশ আমাদের শ্রেণিতে প্রবিষ্ট হয়। তাহার বাড়ি ছিল, পাবনা জেলায়; সেখান হইতে মাইনর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সে আমাদের গ্রামে তাহার মামার বাড়িতে থাকিয়া পড়া আরম্ভ করে। সতীশের মামা হরিপদ ভট্টাচার্য মহাশয় হুগলীর কলেক্টরিতে কাজ করিতেন; তিনি স্ত্রী ও পুত্রকন্যা লইয়া, হুগলীতেই থাকিতেন। তাঁহার বাড়িতে তাঁহার বৃদ্ধা মাতা, নিঃসন্তান বিধবা ভগিনী ও একটি চাকর থাকিত। সতীশের মাসিমা ও দিদিমা তাহাকে যথেষ্ট আদরযত্ন করিতেন।

সতীশ খুব চালাক চতুর ছিল। কিন্তু পড়াশুনায় তাহার তেমন মন ছিল না; সে খেলাধূলা, আমোদ-আহ্লাদই ভালবাসিত। বাড়িতে কোন পুরুষ অভিভাবক ছিল না; সুতরাং সতীশ অনেকটা স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিল; দিদিমা ও মাসিমা তাহাকে পড়াশুনার জন্য তেমন তাড়নাও করিতেন না।

আমাদের শ্রেণিতে যে কয়েকজন ছাত্র ছিল, তাহার মধ্যে সতীশের সহিতই আমার বিশেষ ভালবাসা জন্মিয়াছিল। সে পড়াশুনায় অমনোযোগ করিত, দিনরাত শুধু আমোদ-আহ্লাদ করিয়াই বেড়াইত ; সকলে তাহাকে ভাল ছেলে বলিয়া প্রশংসাও করিত না। তবুও আমি তাহাকে ভালবাসিতাম; মধ্যে মধ্যে পড়ার জন্য তাহাকে তাড়নাও করিতাম, দুই চারিটা সদুপদেশও দিতাম। সে অন্যের কথায় মোটেই কর্ণপাত করিত না; কিন্তু আমি যখন বিষণ্ণমুখে গম্ভীরভাবে তাহাকে কোন কথা বলিতাম, তখন সে আমার কথা নীরবে শুনিত, আমি যেমন তাহাকে ভালবাসিতাম, সেও আমাকে তেমনই ভালবাসিত। কিন্তু তাহার প্রকৃতি অন্যরূপ ছিল। লেখাপড়া শিখিয়া বিদ্বান হইবে, দশজনের একজন হইবে, এ ইচ্ছাই যেন তাহার ছিল না। সে কোন রকমে দিন কাটাইতে পারিলেই নিশ্চিন্ত হইত। আমার অভিভাবকগণ এবং স্কুলের মাস্টার মহাশয়েরাও অনেক সময়ে আমাকে সতীশের সঙ্গে মিশিতে নিষেধ করিতেন। তাহার সঙ্গে থাকিয়া যে আমার পড়াশুনার ক্ষতি হইত, অনেক সময় যে তাহার সহিত গল্পেই কাটিয়া যাইত, তাহা আমিও বুঝিতাম; কিন্তু সতীশের কেমনই একটা আকর্ষণী-শক্তি ছিল যে, আমি অনেক চেষ্টা, অনেকবার প্রতিজ্ঞা করিয়াও তাহার সঙ্গ ত্যাগ করিতে পারিতাম না। একটু অবকাশ পাইলেই তাহার নিকট ছুটিয়া যাইতাম। সেও সময়ে অসময়ে আমাদের বাড়িতে আসিত এবং দুই তিন ঘণ্টা নানা গল্প করিয়া আমার পড়ার ব্যাঘাত জন্মাইত। আমাদের দুইজনের প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছিল; তবুও কি জানি কেন, আমরা পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলাম।

এই ভাবে আমরা দুই বৎসর কাটাইয়াছিলাম। দুই বৎসর পরে যে বার আমরা দুইজনেই প্রথম শ্রেণিতে উন্নীত হইলাম, সেই বার সতীশের মামা তাহাকে হুগলীতে লইয়া গেলেন। সতীশ ইহাতে প্রথমে আপত্তি করিয়াছিল; কিন্তু আমাদের গ্রামে থাকিলে সে কিছুতেই প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবে না বুঝিয়া, তাহার মামা তাহাকে হুগলীতে লইয়া গেলেন। এক বৎসরের জন্য আমাদের ছাড়াছাড়ি হইল।

সেই বৎসরের শেষে আমি আমাদের গ্রামের স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিলাম, সতীশও হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুল হইতে পরীক্ষা দিল। যথাসময়ে পরীক্ষার ফল বাহির হইল। গেজেটে দেখিলাম, সতীশ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে। আমিও পরীক্ষায় কৃতকার্য হইয়াছিলাম।

এই সময়ে সতীশ একদিন আমাদের গ্রামে আসিল। অনেকদিন পরে তাহাকে দেখিয়া আমার বড়ই আনন্দ হইল। সতীশ বলিল, সে যদি বৃত্তি পায়, তাহা হইলে সে কলিকাতায় পড়িবে, বৃত্তি না পাইলে তাহাকে অগত্যা মামার নিকট থাকিয়াই হুগলী কলেজে পড়িতে হইবে। আমিও কলিকাতায় পড়াই স্থির করিয়াছিলাম। তিন চারিদিন মামার বাড়িতে থাকিয়া সতীশ বাড়ি চলিয়া গেল।

সতীশ পরীক্ষায় বৃত্তিলাভ করিল। সে আমাকে পত্র লিখিল যে, সে কলিকাতায় জেনারেল এসেম্ব্লিজ কলেজে পড়া স্থির করিয়াছে। আমিও তাহাকে জানাইলাম যে, আমিও জেনারেল এসেম্ব্লিজ্ কলেজেই পড়িব; কিন্তু তাহার দ্বিতীয় প্রস্তাবে আমি সম্মত হইতে পারিলাম না;—সে আমাকে তাহার সহিত এক ছাত্রাবাসে থাকিবার প্রস্তাব করিয়াছিল। আমাদের অবস্থা ভাল নহে, আমি দশ টাকা বৃত্তি পাইয়াছিলাম; তাই আমি কলেজে পড়িবার সাহস করিয়াছিলাম। কিন্তু দশ টাকায় ত কলিকাতার খরচ চলে না; বাড়ি হইতে প্রতি মাসে খরচের টাকা পাওয়াও অসম্ভব; সুতরাং আমাকে কলিকাতায় কোন এক আত্মীয়ের আশ্রয় গ্রহণ করা ব্যতীত উপায়ান্তর ছিল না। আমার এই ব্যবস্থার কথা শুনিয়া সতীশ দুঃখিত হইল; কিন্তু সেও ত বড়মানুষের ছেলে নহে যে, আমার কলিকাতার খরচ সে চালাইতে পারে।

কলিকাতায় যাইয়া আমি কুমারটুলিতে এক আত্মীয়ের বাসায় থাকিয়া জেনারেল এসেম্ব্লিজে পড়া আরম্ভ করিলাম; সতীশ গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেনে একটা মেসে রহিল। এক বৎসর পরে আবার আমরা দুই বন্ধুতে মিলিত হইলাম। কলেজে আমরা এক সঙ্গে বসি, কলেজ হইতে এক সঙ্গে বাহির হই; প্রায় সর্বদাই সতীশের মেসে যাই; সে আমাকে বিশেষ যত্ন করে; অনেক বিষয়ে সাহায্যও করিতে লাগিল। বড় সুখে, বড় আনন্দে আমাদের দিন কাটিতে লাগিলে।

চারি পাঁচ মাস পরে একদিন সতীশ আমাকে বলিল যে, সে বাসা পরিবর্তন করিবে। তাহার পিতার ইচ্ছা যে, সে শ্যামবাজারে তাহার পিতার এক বন্ধুর বাড়িতে থাকে। তাহার নিকট শুনিলাম যে, তাহার পিতৃ-বন্ধু মারা গিয়াছেন; তাঁহাদের পরিবারের বিশেষ কষ্ট হইতেছে। সতীশ যদি সেখানে থাকে, তাহার পিতা তাহাকে উপলক্ষ করিয়া সেই দরিদ্র পরিবারকে সাহায্য করিতে পারেন। এমন কে আছে, যে এপ্রস্তাব অস্বীকার করিতে পারে; আমি সতীশকে সেই বাড়িতে যাইতেই পরামর্শ দিলাম ; সতীশও সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া, তাহার পিতাকে পত্র লিখিল এবং এক সপ্তাহ পরেই শ্যামবাজারের সেই বিপন্ন ব্রাহ্মণ-গৃহে গমন করিল।

সতীশ যখন গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেনে থাকিত, তখন প্রায়ই কলেজের ছুটির পর আমি তাহাদের ছাত্রাবাসে যাইতাম। কিন্তু শ্যামবাজার অনেক দূর, আমার পথেও নহে; সুতরাং আমি সতীশের এই নূতন বাসায় খুব কমই যাইতাম।

যাঁহার বাড়িতে সতীশ বাস করিত, তিনি একটি নাবালক পুত্র, বিধবা পত্নী ও একটি যুবতী বিধবা কন্যা রাখিয়া পরলোকগত হইয়াছিলেন। বাড়িটি তাঁহার নিজের। আমি যখন এই বাড়িতে সতীশের নিকট যাইতাম,—তখন বাড়ির নিম্নতলের কয়েকটি ঘর ভাড়া দেওয়া হইয়াছিল। উপরে যে চারি পাঁচটি ঘর ছিল, তাহাতেই বাড়ির সকলে বাস করিতেন। সতীশের নিকট শুনিয়াছিলাম যে, গৃহস্বামী এই বাড়িটি ব্যতীত নগদ টাকা বা অন্য কোন বিষয়সম্পত্তি রাখিয়া যান নাই। বাড়িব কিয়দংশ ভাড়া দিয়া যাহা পাওয়া যাইত, এবং সতীশ মাসে মাসে যাহা দিত, তাহার দ্বারাই কোন রকমে তাহাদের সংসার চলিয়া যাইত। সতীশের নানা অসুবিধা হইত; কিন্তু সে তাহা গ্রাহ্যই করিত না; একটি বিপন্ন ব্রাহ্মণ-পরিবারকে যে সে সাহায্য করিতে পারিতেছে, ইহাই মনে করিয়া সে হৃষ্টচিত্তে সমস্ত অসুবিধা সহ্য করিত। অন্তত সতীশের কথাবার্তায় ইহাই বুঝিতে পারিয়াছিলাম।

এই ভাবে দুই তিন মাস কাটিয়া গেল। ইহারই মধ্যে আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, সতীশ পড়াশুনায় তেমন মনোযোগ দিতেছে না, সর্বদাই সে যেন কি ভাবে; তাহাকে অনেক সময়ই অন্যমনস্ক দেখি। কাবণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলে যে, তাহার শরীর তেমন ভাল নাই। কোন প্রকার ঔষধ খাইতে বলিলেও সে তাহা গ্রাহ্য করে না। ক্রমে সে কলেজ কামাই করিতে আরম্ভ করিল; দুই তিন দিন কলেজে আসে, তাহার পরই হয় ত দুই দিন অনুপস্থিত। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, সেই একই উত্তর—"শরীর ভাল নাই, একটু একটু জ্বর হয়।" অথচ তাহার জন্য কোন ব্যবস্থাও সে করে না।

মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময়ে পাঁচ-ছয় দিন সে কলেজে আসিল না। দুই তিন দিন যখন তাহাকে কলেজে দেখিলাম না, তখন তাহার সংবাদ লওয়া কর্তব্য মনে করিলাম; কিন্তু নানা কাজের জন্য আরও দুই তিন দিন তাহার বাসায় যাওয়া হইল না। এক সপ্তাহের মধ্যে যখন সে একদিনও কলেজে আসিল না, তখন সেই রবিবার অপরাহ্নকালে আমি তাহার বাসায় গেলাম। বাড়ির বাহিরের দ্বার বন্ধ ছিল; আমি দ্বারে কড়া নাড়িতেই গৃহস্বামীর নাবালক পুত্রটি দ্বার খুলিয়া দিল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"সুরেশ, সতীশ বাসায় আছে?"

আমাকে দেখিয়া এবং আমার কথা শুনিয়া সে ছেলে মানুষ, কি জানি কেন, বেশ একটু থতমত খাইয়া গেল। তাহার পর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—"তিনি চলে গেছেন।"

আমি বালিলাম—"চলে গেছেন? কোথায় গেছেন? বাড়ি? তোমাদের কিছু ব'লে যান নাই?"

সুরেশ কি উত্তর দিতে যাইতেছিল, এমন সময তাহাদের বাড়ির ঝি আসিয়া বলিল—"কি জানি বাবু, সে কোথায় গেছে! তোমাদেরই বন্ধু, তোমরা খুঁজে দেখগে! আয় খোকা ভিতরে আয।" এই বলিয়া সুরেশকে ভিতরে টানিয়া লইয়া ঝি অতি দ্রুত দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

আমি ভাবিলাম, এ কি ব্যাপার! আরও কতদিন ত এ বাড়িতে আসিয়াছি; আমি ইঁহাদের নিতান্ত অপরিচিতও নহি। পূর্বে যখনই আসিয়াছি, তখনই বাড়ির সকলে বিশেষ আদরযত্ন

করিয়াছেন। আর আজ এ কি? এ রকম অপমান ত কখনও ভোগ করি নাই। সতীশ যদি না বলিয়া কহিয়াই কোথাও চলিয়া যাইয়া থাকে, তাহা হইলে সে জন্য আমার সহিত এ প্রকার রূঢ় ব্যবহারের ত কোন কারণ নাই। আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। হতভম্ব হইয়া দ্বারের বাহিরেই একটু দাঁড়াইয়া থাকিলাম। একবার মনে হইল, আর একবার ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করি; কিন্তু তাহাদের ব্যবহারের কথা স্মরণ করিয়া আর কাহাকেও পুনরায় ডাকিতে ইচ্ছা হইল না। পল্লিগ্রাম হইলে না হয় পাড়া-প্রতিবেশীদিগকে জিজ্ঞাসা করিতাম; কিন্তু এ কলিকাতা শহরে এক বাড়িতে দুই গৃহস্থ থাকিলেও কেহ কাহারও সংবাদ রাখে না। এখানে পাশের বাড়িতে অনুসন্ধান করিয়া কোনই লাভ নাই। তখন আর কি করিব, সেই বাড়ির সম্মুখ হইতে রাস্তায় গেলাম। একবার বাড়িটির দিকে চাহিয়া দেখিলাম, কিন্তু দ্বিতলের জানালায় কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। সতীশ কোথায় গেল, তাহার কি হইল। তাহার ত কোন দুর্ঘটনা হয় নাই, এই সকল কথা চিন্তা করিতে কবিতে বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

তাহার পর সতীশের সংবাদ জানিবার জন্য বাড়িতে পত্র লিখিলাম সেই পত্রের উত্তরে জানিলাম যে, সতীশের দিদি মা বা তাহাব মাসিমা তাহাব কোন সংবাদই রাখেন না। তাহার পরেই গ্রীষ্মের ছুটিতে যখন বাড়িতে গেলাম, তখন শুনিলাম, সতীশ নিরুদ্দেশ, সে বাড়িতে যায় নাই। এই দুই মাস তাহার পিতা অনেক স্থান অনুসন্ধান কবিযাছিলেন; কিন্তু কোথাও তাহার উদ্দেশ পান নাই। কেন যে সে এমন ভাবে নিরুদ্দেশ হইল, তাহাব কারণও কেহ জানে না। সতীশ যে এমন করিয়া পড়াশুনা ত্যাগ করিয়া, নিরুদ্দেশ হইবে, এ কথা আমি কোন দিনই ভাবি নাই। প্রথম প্রথম মধ্যে মধ্যে তাহার কথা মনে হইত, তাহার পর ধীরে ধীরে তাহার কথা ভুলিয়া গেলাম; সতীশ নামে যে আমার একজন পরম বন্ধু ছিল, সে কথা কালেভদ্রে মনে হইত।

*　　　*　　　*　　　*

তাহার পর দশ বৎসর অতীত হইয়া গেল। এ দশ বৎসবের মধ্যে আমি সতীশের কথা একেবারেই ভুলিয়া গেলাম। আমার জীবনের উপর দিয়া কত বিপদ, কত কষ্ট গেল। হৃদয়ের গভীর বেদনার জ্বালায় অস্থির হইয়া আমি দেশত্যাগ করিলাম। নানা স্থান ঘুরিয়া অবশেষে সুদূর পশ্চিম প্রদেশে হিমালয়ের বক্ষে দেরাদুনে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। সে সকল কথা আর বলিয়া কি হইবে? সে কথা বলিবার জন্যও এ প্রস্তাবের অবতারণা করি নাই। যাহা বলিতে বসিয়াছি, যে শোকাবহ কাহিনি বর্ণনা করিতে চাহিতেছি, সেই কথাই বলি।

আমি দেরাদুন যে বাড়িতে থাকিতাম, তাহা ত্রিতল ছিল। সর্ব নিম্নতলে গৃহস্বামী তাঁহার গরুমহিষাদি রাখিতেন; দ্বিতীয় তলে যে কয়েকটি ঘর ছিল, তাহাতেই আমরা বাস করিতাম; তৃতীয় তলে কেবল একটি ঘর ছিল। সেখানে কেহ বাস করিত না। সেটিকে আমরা উপাসনা-গৃহ করিয়াছিলাম। সেখানে দুই তিন খানা ব্যাঘ্র ও মৃগচর্ম বিস্তৃত থাকিত। সে ঘরের অন্যান্য আসবাবের মধ্যে একটি মৃণ্ময় আধারে একটি তৈলের প্রদীপ, একটি ধূপদান ও কিঞ্চিৎ ধূপ থাকিত। এতদ্ব্যতীত আর কোন দ্রব্যই সে ঘরে থাকিত না। কেহ এই বর্ণনা শুনিয়া মনে করিবেন না যে, আমি প্রতিদিন এই ঘরে বসিয়া উপাসনা করিতাম। আমার সঙ্গী মাস্টারজি

থিয়জফিষ্ট ছিলেন; তিনি প্রাতঃ কালে ও সন্ধ্যার পর এই ঘরে বসিতেন। আমি সে ঘরে অতি কমই যাইতাম। ভগবানের নাম করিবার মত কি তখন আমার অবস্থা ছিল? আমি কি তখন মনস্থির করিয়া বসিতে পারিতাম ? মাস্টারজির বিশেষ আগ্রহে এক আধ দিন সন্ধ্যার পর তাঁহার উপাসনা, জপতপ শেষ হইলে, আমি সেই ঘরে যাইতাম এবং তাঁহার সম্মুখে বসিয়া যাহা মনে আসিত, তাহাই গান করিতাম। আমাদের এই বাসাটা সাধু-সন্ন্যাসীর একটা আড্ডা ছিল। দেরাদুনে সাধুসন্ন্যাসী আসিলে অনেকেই কৃপা করিয়া আমাদের এই প্রবাসগৃহে পদধূলি প্রদান করিতেন এবং কেহ কেহ বা আতিথ্য-গ্রহণ করিতেন। সাধু-সন্ন্যাসী আসিলে তাঁহাদিগকে আমরা আমাদের এই ত্রিতলস্থ গৃহে স্থান দিতাম। পরলোকগত পূজনীয় কালীকৃষ্ণ ঠাকুর মহাশয় তখন অনেক সময় দেরাদুনে থাকিতেন। তিনি আমাদের এই গৃহ দেখিয়া একদিন বলিয়াছিলেন—"ওহে, তোমাদের এই বাড়িটা বেশ! ইহার নীচের তলায় পশ্বালয়, দ্বিতীয় তলে লোকালয়, আর তৃতীয় তলে দেবালয়।" এই বাড়িতে আমরা দুইটি জীব বাস করিতাম—আমাদের মাস্টারজি, আর আমি। আমিও তখন একজন মাস্টারজি। যখন দেরাদুনে থাকিতাম, তখন আমাদের মাস্টারজির স্কুলে আমিও মাস্টারজি-গিরি করিতাম—সময় কাটান ত চাই!

এই সময় এক রবিবার প্রাতঃকালে আমি এ পাড়া, সে পাড়া, এ বাড়ি, সে বাড়ি টো টো করিয়া বেলা প্রায় এগারটার সময় বাসায় ফিরিয়া কাপড় চোপড় ছাড়িতেছি, এমন সময় মাস্টারজি বলিলেন—"আজ আমাদের বাড়িতে একজন বাঙালি সাধু আসিয়াছেন।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"বাঙালি সাধু! কৈ কোথায়?"

মাস্টারজি বলিলেন—"সাধু কি আপনার মুক্তিমণ্ডপে বসিয়া চায়ের শ্রাদ্ধ করিবেন, না পরনিন্দার আসর জমকাইবেন। সাধু সাধুর স্থানেই আছেন।" আমি বুঝিতে পারিলাম, সাধু আমাদের দেবালয়ে আশ্রয়লাভ করিয়াছেন।

আমি বস্ত্রাদি পরিবর্তন করিয়া সাধুদর্শনের জন্য আমাদের ত্রিতলস্থিত দেবালয়ে গমন করিলাম। সেখানে যাইয়া দেখি, সন্ন্যাসী মহাশয়ের আপাদমস্তক কম্বল ঢাকা—তিনি নিদ্রাদেবীর আরাধনা করিতেছেন। এ অবস্থায় তাঁহাকে জাগাইয়া আলাপ করা কিছুতেই কর্তব্য নহে মনে করিয়া, নীচে আমাদের লোকালয়ে ফিরিয়া আসিলাম। আমাকে তখনই নামিয়া আসিতে দেখিয়া মাস্টারজি জিজ্ঞাসা করিলেন—"যাইতে যাইতেই চলিয়া আসলেন যে? সাধুকে মনে ধরিল না নাকি?"

আমি বলিলাম—"আপনার সাধু যে ঘোর নিদ্রায় মগ্ন, আলাপ করিবার উপায় দেখিলাম না।"

মাস্টারজি বলিলেন "আপনিও যেমন! এই অসময়ে বুঝি কেহ ঘুমায়। সাধু হয় ত ধ্যানে নিবিষ্ট আছেন।"

আমি বলিলাম—"কি জানি মশাই, আগাগোড়া কম্বল ঢাকা দিয়া চৌদ্দ পোয়া হইয়া ধ্যান করিতে ত বড় একটা দেখি নাই?"

মাস্টারজি বলিলেন—"একটু সাড়া দিলেই পারিতেন।"

আমি বলিলাম—"তার দরকার বোধ করিলাম না। সাধুসন্ন্যাসী দেখিতে দেখিতে এলিয়ে গিয়েছি মশাই! যাক, ক্ষুধার জ্বালা ধরিলে সাধুর আপনা হইতেই ধ্যানভঙ্গ হইবে; তখনই আলাপ করা যাইবে।"

তাহার পর আমরা স্নানাদি শেষ করিলাম। একাধারে ভৃত্য ও পাচক দেবানন্দ সংবাদ দিল যে, খানা প্রস্তুত। মাস্টারজি তখন দেবানন্দকে সাধুকে ডাকিয়া আনিবার জন্য আদেশ করিলেন। আমরা তাঁহার আগমনের অপেক্ষায় রহিলাম।

একটু পরেই সাধু নীচে নামিয়া আসিলেন। সাধুর বয়স উনত্রিশ-ত্রিশ বৎসর হইবে; গৌরবর্ণ পুরুষ, তবে শীতাতপে তাঁহার চেহারা মলিন হইয়া গিয়াছে; মাথায় দীর্ঘ কেশ, দুই চারিটি জটাও বাধিয়াছে, দাড়ি আছে। সাধু আমাদের ঘরের মধ্যে আসিয়া আমাকে দেখিয়াই স্তম্ভিতভাবে দণ্ডায়মান হইলেন; তাঁহার গতিশক্তি লোপ হইল। তাঁহার বদনমণ্ডলে মহা-বিস্ময়ের ভাব প্রকটিত হইল। আমি তাঁহার এই ভাব-পরিবর্তন লক্ষ্য করিলাম, কিন্তু কেন তাঁহার এপ্রকার ভাব-পরিবর্তন হইল, তাহা মোটেই বুঝিতে পারিলাম না।

সাধু ক্ষণকাল আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি—তুমি এখানে! আশ্চর্য ব্যাপার!"

আমি সাধুকে চিনিতেই পারি নাই। তাঁহার এই কথা শুনিয়া আর একবার তাঁহার মুখের দিকে চাহিলাম; কিন্তু কোথাও কখন যে তাঁহাকে দেখিয়াছি, তাহা ও মোটেই স্মরণ করিতে পারিলাম না।

সাধু বুঝিতে পারিলেন যে, আমি তাঁহাকে চিনিতে পারি নাই। তিনি তখন অগ্রসর হইয়া আমার হাত চাপিয়া ধরিলেন। তাহার পর অতি কাতরস্বরে বলিলেন, "ভাই জলধর, এই দশ বৎসরের মধ্যেই আমাকে ভুলিয়া গিয়াছ—আমাকে চিনিতে পারিতেছ না! আমি—আমি সতীশ!"

সতীশ! সতীশ!—যে সতীশকে আজ দশ বৎসর হইল হারাইয়াছি,—যে সতীশকে দশ বৎসর পূর্বে কত খুঁজিয়াছি,—যে সতীশের জন্য তখন মধ্যে মধ্যে প্রাণ কেমন করিয়া উঠিত, সেই সতীশ! সেই সতীশ এতকাল পরে—এই দীর্ঘ দশ বৎসর পরে কি না অকস্মাৎ আমারই হিমালয়-ক্রোড়-স্থিত প্রবাস-ভবনে আপনিই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে!

আমি তখন সতীশকে দৃঢ় আলিঙ্গন বদ্ধ করিলাম; আনন্দে আমি এতই অধীর হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, সে সময়ে একটি কথাও আমার মুখ দিয়া বাহির হইল না। কোথায় সেই সুদূর বাঙলা দেশের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র গ্রামের অধিবাসী আমি—আর সতীশ; আর কোথায় এই হিমালয় ক্রোড়স্থ দেরাদুন! কবে সেই ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দ, আর আজ ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দ। এতদিন পরে সতীশের সহিত সাক্ষাৎ!

আমাকে কোন কথা বলিতে না দেখিয়া সতীশ বলিল—"আশ্চর্য ব্যাপার! এই পাহাড়ের মধ্যে তুমি! তোমাকে যে এখানে দেখিব, এ কথা যে আমি কোন দিন স্বপ্নেও ভাবিতে পারি নাই। তুমি ত ভাই, আমাকে চিনিতেই পার নাই; আমি কিন্তু তোমাকে দেখিবামাত্রই চিনিয়াছিলাম।"

এইবার আমি কথা কহিলাম; বলিলাম—"সত্যই তোমার চেহারা ভয়ানক বদ্‌লে গিয়েছে। যারা দশ বছর আগে তোমাকে দেখেছে, তারা এখন দেখ্‌লে তোমাকে চিন্‌তেই পারবে না। তুমি একেবারে আর একজন হ'য়ে গিয়েছ। সতীশ! অ্যা—আমাদের সতীশ!"

মাস্টারজি দূরে দাঁড়াইয়া আমাদিগের এই অপ্রত্যাশিত মিলন দেখিতেছিলেন। তিনি এতক্ষণ কোন কথাই বলেন নাই। এখন তিনি বলিলেন, "আপনারা দেখিতেছি, পূর্বপরিচিত বন্ধু! হঠাৎ দেখা হওয়া খুব আশ্চর্যের বিষয়। তা, সে সব এখন থাক্; চলুন আহার করা যাক্। পাখি যখন আপনি এসে ধরা দিয়েছে, তখন সারা দিনরাত্রি কথা বল্‌বার সময় পাওয়া যাবে।"

মাস্টারজির আদেশক্রমে আমরা আহারে উপবিষ্ট হইলাম। আহার করিতে করিতেই আমি সতীশকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আচ্ছা সতীশ, কথা নাই বার্তা নাই, বলা নাই কওয়া নাই, তুমি হঠাৎ এমনভাবে নিরুদ্দেশ হলে কেন? আর সন্ন্যাসী হয়েই বা এমন দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন?"

আমার এই প্রশ্ন শুনিয়া সতীশের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল; সে আমার কথার কি উত্তর দিবে ভাবিয়া পাইতেছিল না। তাহার ভাব দেখিয়া মাস্টারজি বলিলেন, "খাবার সময় খেতেই হয়, আর বাজে কথা বল্‌তে হয় না। খেয়ে দেয়ে নিরিবিলি ব'সে কথা বল্‌বেন।"

মাস্টারজির এই কথা শুনিয়া সতীশ যেন অব্যাহতি লাভ করিল। কিন্তু সে ভাল করিয়া আহার করিতেও পারিল না। আমাকে দেখিয়া অবধিই সে যেন কেমন হইয়া গিয়াছিল। আমি আর কোন কথা বলিলাম না। আহার শেষ করিয়াই সতীশ উপরে আমাদের দেবালয়ে চলিয়া গেল; আমি একটু পরেই তাহার নিকট গেলাম। যাইয়া দেখি, সতীশ শুইয়া পড়িয়াছে। এবার ত আর সাধু নহে যে, নিদ্রা বা ধ্যানভঙ্গ করিতে সঙ্কোচ বোধ করিব,—এবার যে আমাদের সতীশ!

আমি দেবালয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সতীশকে ডাকিলাম। সতীশ আমার ডাক শুনিয়াই উঠিয়া বসিল; আমি তাহার নিকট উপবেশন করিলাম।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়াই সতীশ বলিল, "ভাই, আমাকে তুমি কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিবে না? আমি তোমাকে কিছুই বলিব না। ইহাতে যদি সম্মত হও, তাহা হইলে তোমাদের এখানে দুই একদিন থাকিতে পারি; নতুবা আমি এখনই বাহির হইয়া পড়িব।"

আমি বলিলাম, "সেকি কথা? তুমি এখনই কোথায় যাইবে? তোমাকে ত আমি ছাড়িয়া দিতেছি না। এতকাল পরে যখন তোমাকে পাইয়াছি, তখন তোমাকে আমি কিছুতেই ছাড়িব না। তোমার কথা জিজ্ঞাসা করিতে নিষেধ করিতেছ; বেশ, কোন কথা জিজ্ঞাসা করিব না। তা হ'লে ত তোমার কোন আপত্তি নেই। আমার কথা ত তুমি শুন্‌বে?"

সতীশ কাতরবচনে বলিল, তোমার কথাও আমার শুনে কাজ নেই, আমার কথাও তোমার শুনে কাজ নেই। যে দিন গিয়েছে, তা গিয়েছে। এই বলিয়াই সতীশ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল।

আমি বলিলাম, "তুমি ত সন্ন্যাসী; আমিও একরকম তাই। তবে তোমার মত ভেক ধরিতে

পারি নাই, সে ইচ্ছাও নাই। যাক্, সে সব কথা যাক্। পূর্বের কথা জিজ্ঞাসা করছিনে; আজ তুমি কোথা থেকে এলে?"

সতীশ বলিল, "হরিদ্বার থেকে বেরিয়ে মনে হ'ল, একবার দেরাদুন হয়ে যমুনোত্রীর দিকে যাবো। এখানে এসে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম; এর মধ্যে তোমাদের বাসার ঐ বাবুটির সঙ্গে দেখা হ'ল। তিনি আমাকে এখানে নিয়ে এলেন। এতদিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা হবে ব'লেই হয় ত আমি এখানে আস্তে সম্মত হয়েছিলাম, নইলে আমি গৃহস্থের বাড়িতে মোটেই যাই না। ভাই, আর একটা কথা এখনই ব'লে রাখি। সারাদিন তোমার এখানে থাক্তে রাজি ; কিন্তু সন্ধ্যা হলেই আমাকে ছেড়ে দিতে হবে।"

আমি বলিলাম—"কেন?"

সতীশ বলিল "তা আমি তোমাকে বল্‌ব না। আমি রাত্রিতে লোকালয়ে বাস করি না" এই বলিয়া সতীশ কেমন যেন বিমর্ষ হইয়া গেল, তাহার মুখ মলিন হইয়া গেল, তাহার দৃষ্টি উদ্ভ্রান্ত হইল।—আমি তাহার ভাবগতি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আমি বলিলাম, "আমাদের বাড়িতে থাকলে তোমার সাধন-ভজনের ব্যাঘাত হবে মনে ক'রে কি তুমি সন্ধ্যার সময় যেতে চাচ্ছ। দেখ, আমাদের এ দেবালয় অতি নির্জন স্থান; এখানে কেহই থাকে না; কেহই তোমাকে বিরক্ত কর্‌তে আস্‌বে না। তুমি এখানে বসে নিশ্চিন্তমনে সাধনভজন, যা ইচ্ছে তাই কর্‌তে পার; তোমার কোন অসুবিধাই হবে না।"

সতীশ পূর্ববৎ কাতর স্বরে বলিল—"না, না, সে সব কিছু নয়, সে সব কিছু নয়। কথা এই যে, আমি রাত্রিতে লোকালয়ে থাকি না।"

আমি বলিলাম—"বেশ ত, আমাদের এটা ত লোকালয় নয়—এটা যে দেবালয়। এখানে থাক্‌তে তোমার আপত্তি কি? না, তোমাকে আমি ছাড়ছি না। তুমি ঐ ব'লে বেরিয়ে যাবে, আর আস্‌বে না।"

সতীশ বলিল—"না ভাই, আজ সন্ধ্যায় সময় যাবো, আবার কা'ল সকালে আস্‌বই। তোমার সঙ্গে কি ছলনা করতে পারি।"

আমি বলিলাম—"একবার করেছিলে ভাই! আমাকে একটা কথাও না ব'লে চলে এসেছিলে।"

সতীশ আবার একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। তাহার পর বলিল—"না, আর তা হবে না। আমার ভাই, ঘুম পাচ্ছে। আমি রাত্রিতে ঘুমোতে পারি না, দিনেই ঘুমাই।"

আমি বলিলাম—"তা হ'লে আমি নীচে যাই, তুমি একটু ঘুমোও। কিন্তু আমাকে না ব'লে তুমি চলে যেও না। তোমার সঙ্গে কত সুখদুঃখের কথা বল্‌তে বাকি আছে।"

সতীশ মলিনমুখে বলিল, "আর সুখদুঃখ!" এই বলিয়াই সে শয়ন করিল; আমি নীচে নামিয়া আসিলাম।

নীচে নামিয়া আমি কোন কাজেই মনঃ-সংযোগ করিতে পারিলাম না। শুধু মনে হইতে লাগিল—এই সেই সতীশ! কি আশ্চর্য পরিবর্তন! কি অভাবনীয় ব্যাপার! সে কোন কথাই বলিতে চায় না—আমাকেও না। যে সতীশ আমার পরম বন্ধু ছিল, এখন আমি তাহার পর

হইয়া গিয়াছি। তাহার ভাব দেখিয়া মনে হইল, সে আমার সঙ্গ ত্যাগ করিতে পারিলেই যেন বাঁচে। এতদিন পরে দেখা হইল—এই হিমালয়ের মধ্যে দেখা হইল; অথচ আমি কেন এখানে আসিয়াছি, কি করিতেছি, আমার দেশের খবর, আমার নিজের কোন কথা,—কিছুই শুনিবার জন্য, কিছুই জানিবার জন্য তাহার আগ্রহ নাই। নিজের কথাও সে বলিবে না। এ কি পরিবর্তন! দশ বৎসরে মানুষ কি এমন বদল হইয়া যায়? কৈ, আমার ত কিছুই হয় নাই। আমি কি কম কষ্ট, কম যন্ত্রণা পাইয়াছি—পাইতেছি। কিন্তু তাতে ত আমার কোনই পরিবর্তন হয় নাই—আমি যেমন তেমনই আছি। সব ছাড়িয়া আসিয়াছি—অথচ কিছুই ত ছাড়িতে পারি নাই। এখনও ত সেই ছায়ায় ঢাকা, পাখি-ডাকা পল্লিভবনের কথা মনে হইলে সেখানে ছুটিয়া যাইবার জন্য প্রাণ আকুল হইয়া পড়ে;—এখনও শতদিক হইতে শত গ্রন্থি আমাকে আটক করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে; সে সকলের মায়া ত একটুও কাটাইতে পারি নাই। আর সতীশ—বাড়িতে তাহার বাপ আছে, মা আছে, ভাই ও ভগিনী আছে, কত আত্মীয়স্বজন আছে। তাহাদের কাহারও কথা কি তাহার একবারও মনে হয় না! এ কি মানুষ! বসিয়া বসিয়া এই সকল কথাই চিন্তা করিতে লাগিলাম; কিছুই ভাল লাগিল না। তখন একখানি বই লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিলাম। অন্য সময় হইলে পথে বাহির হইয়া পড়িতাম; কিন্তু আজ তাহা পারিলাম না; কারণ আমার অনুপস্থিতির সময়ে সতীশ যদি চলিয়া যায়—আর যদি না আসে। কিছুক্ষণ পড়িবার পরই শুনিতে পাইলাম দেবালয়ে গান হইতেছে—সতীশই গান করিতেছে। আমি তখন পা টিপিয়া টিপিয়া ত্রিতলে যাইবার সিঁড়ি দিয়া উঠিতে লাগিলাম এবং দ্বারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিলাম। সতীশ গায়িতেছে,—

'ভোলা মন, কি করিতে কি করিলি
সুধা ব'লে গরল খেলি।
সংসারে সোনার খনি, পরশমণি
রতনমণি না চিনিলি;
কি ব'লে অবহেলে, সোনা ফেলে,
আঁচলে কাঁচ বেঁধে নিলি।'*

গানের এই একটা অন্তরাই সে বার বার গায়িতে লাগিল; আমিও অতৃপ্ত হৃদয়ে গানটি শুনিতে লাগিলাম। সতীশ গায়িতে পারিত; তাহার গান দশ বৎসর পূর্বেও শুনিয়াছি; কিন্তু এমন প্রাণ খুলিয়া, এমন সব ভুলিয়া তন্ময় হইয়া গান করিতে কখনও শুনি নাই।

একটু পরেই সতীশ চুপ করিল। আমি তখন ধীরে ধীরে দেবালয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলাম—"সতীশ, তুমি ঘুমাও নাই?"

সতীশ বলিল—"না, ঘুমাইবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু ঘুম হইল না। তুমি আমার সব ওলটপালট করিয়া দিয়াছ। আগে জানিলে তোমার এখানে আসিতাম না।"

আমি বলিলাম—"তুমি কি ইচ্ছে ক'রে এসেছ? যাঁর আন্‌বার দরকার হয়েছিল, তিনিই তোমাকে আমার কাছে এনে দিয়েছেন।"

* গানটি কাঙাল হরিনাথের 'আত্ম-শিক্ষা' পর্যায়ের।

সতীশ বলিল—"বোসো ভাই! আমার আজ ভাল লাগ্‌ছে না। তোমার সঙ্গে এতদিন পরে দেখা হ'ল; তোমার সঙ্গেও দুটো কথা বল্‌তে ইচ্ছা করছে না। আমি এখনই বেরিয়ে পড়ি?"

আমি বলিলাম—"তুমি কোথায় যাবে?"

সতীশ বলিল—"এই বন-জঙ্গলের দিকে, লোকালয়ের বাহিরে।"

আমি বলিলাম—"লোকালয় দেখে তোমার এত ভয় কেন?" আমার এই প্রশ্ন শুনিয়া সতীশ শিহরিয়া উঠিল; তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল; সে পাগলের মত চাবিদিকে চাহিতে লাগিল। পরক্ষণেই আবার আত্মসংববণ কবিয়া বলিল—"আমি বড় কষ্ট পাচ্ছি! বড় কষ্ট, বড় যন্ত্রণা, এমন নরক-ভোগ কারও কখন হয় নাই। বড় পাপের বড় শাস্তি।"

আমি বলিলাম—"সতীশ, আমি তোমার ছেলেবেলাব বন্ধু। আমাকে তোমার কষ্টের কথা, তোমার যন্ত্রণার কথা, তোমার বেদনার কথা বলিবে না ভাই! দুঃখকষ্টের কথা অন্যের কাছে বল্‌লে বেদনা অনেকটা কমে যায়, তা কি তুমি জান না?"

সতীশ বলিল। "না, না,—আমার কথা তোমাকে বল্‌তে পাবব না—কাউকেই না—কাউকেই না—কোন দিন না। কখনও না।" এই ব[illegible]যা সতীশ দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বসিল। আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

প্রায় দশ মিনিট পরে সতীশ মুখ তুলিয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিল, "তুমি কোন কথা জিজ্ঞাসা করিও না। বেলা গেল, আমি এখন উঠি।"

আমি বলিলাম, "নিতান্তই তুমি যাবে? কা'ল সকালে আবার আসবে, প্রতিজ্ঞা কর।"

স[illegible]তীশ একটা ভীষণ হাসির সহিত বলিল, "প্রতিজ্ঞা—প্রতিজ্ঞা! এ কথা আবার তুমি কোথায় শিখ্‌লে; এ কথা আবার তোমাকে কে বলিল? প্রতিজ্ঞা—না, না, প্রতিজ্ঞা আর করছি নে—আর না। আমি যাই। আমি ব'লে যাচ্ছি, কা'ল আবাব তোমার কাছে আস্‌ব। যে কয়দিন ভাল লাগে, তোমার কাছে থাক্‌ব। ওগো বল্‌ছি,—আমি থাকব্‌।" এই বলিয়াই সতীশ উঠিয়া দাঁড়াইল; তাহার পর তাহার কম্বলখানি গায়ে জড়াইয়া সে সিঁড়ির নিকট গেল;—তাহার সঙ্গে আর কোন দ্রব্য ছিল না।

সিঁড়ির নিকট দাঁড়াইয়া সে বলিল, "ভাই, তুমি মনে কিছু কোরো না। তোমার সে সতীশ আর নাই; এ তার প্রেতাত্মা! বুঝেছ ভাই, প্রেতাত্মা—প্রেতাত্মা!" এই বলিয়া সে বিকট হাস্য করিয়া উঠিল; সে হাসি শুনিয়া আমার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল;—সে ত হাসি নহে; আমার মনে হইল, পিশাচের চিৎকার! তাহার পরই সে দুম দুম করিয়া সিঁড়ি দিয়া নামিয়া চলিয়া গেল। আমি তাহার অনুসরণ করিতে পারিলাম্‌ না—তখন ইচ্ছাও হইল না।

সতীশ যাহা বলিয়াছিল তাহাই করিল, পরদিন বেলা আটটার সময় সে ফিরিয়া আসিল এবং বরাবর দেবালয়ে যাইয়া, তাহার সেই কম্বলখানি দিয়া আপাদমস্তক ঢাকিয়া শয়ন করিল। সে দেবালয়ে যাওয়ার একটু পরেই উপরে যাইয়া আমি তাহাকে তদবস্থায় দেখিলাম। তখন তাহাকে বিরক্ত করা অকর্তব্য মনে করিয়া নীচে নামিয়া আসিলাম। আহারাদি প্রস্তুত

হইলে তাহাকে ডাকিয়া আনা হইল; সে নীরবে আহার করিতে লাগিল। আমি বলিলাম—"সতীশ, আমি ত এখন স্কুলে চলিলাম। চারিটার পরই আসিব। আমি না এলে তুমি বাহির হইও না। আজ যে তোমার সঙ্গে মোটেই কথা হ'ল না।"

সতীশ আমার দিকে চাহিয়া বলিল, "চারটা পর্যন্ত আমি শুয়েই থাক্‌ব। আর যদি চলেই যাই, তা হ'লেও আজকার মত ঠিক ফিরে আস্‌ব। তোমাকে না ব'লে আমি এখান থেকে চলে যাবো না ।"

উপর্য্যুপরি তিন দিন সতীশ সমস্ত দিন আমাদের দেবালয়ে ঘুমায়, আর সন্ধ্যার পূর্বেই বাহির হইয়া যায়। কোথায় যায়, কি করে, জিজ্ঞাসা করিলে এমন মলিনমুখে, এমন কাতরনয়নে চায় যে, কথাটা দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করিবার উপায় থাকে না।

চারি দিনের দিন স্থির করিলাম যে, সতীশ কি করে, কোথায় যায়, দেখিতে হইবে। রাত্রিতে বনে জঙ্গলে যাইতে আমারও তেমন ভয় ছিল না। তখন বৈশাখ মাস, রাত্রিতে শীতও তেমন প্রবল ছিল না। সে দিন আমি একটু সকালে সকালেই স্কুল হইতে চলিয়া আসিলাম। বাসায় আসিয়া দেখি, সতীশ দেবালযে নিদ্রা যাইতেছে। আমি নীচে বসিয়া তাহার অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। সতীশ অন্য দিন অপেক্ষা সে দিন বেশি ঘুমাইল। সে যখন জাগিয়া উঠিল, তখন প্রায় সন্ধ্যা। ইহাতে আমাব একটু সুবিধা হইল; কারণ সে যদি বেলা থাকিতে বাহির হইত, তাহা হইলে তাহার অনুসরণ কবা সুবিধাজনক হইত না।

আমি প্রস্তুত হইয়া বসিয়া ছিলাম। সতীশ যখন সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল, আমি তখন তাহার অনুসরণ করিলাম।

আমি মনে করিয়াছিলাম, সে হয় ত শহরের পশ্চিম দিকে টপকেশ্বরের দিকে যাইবে; কিন্তু বাহির হইয়া দেখি, সে আমাদের বাসার সম্মুখ দিয়া যে পথ পূর্বমুখে গিয়াছে, সেই পথ ধরিয়া চলিতে লাগিল। আমিও একটু দূরে থাকিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। আমাদের বাসা হইতে পূর্ব দিকে কিছু দূর গেলেই রিচপানা নদী। এ নদীতে সকল সময় জল থাকে না। যখন পাহাড়ে খুব বৃষ্টি হয়, তখন এই নদীতে ঢল নামে, তাহার পর আবার নদীগর্ভ শুষ্ক হইয়া যায়, তখন জুতা পায়ে দিয়া নদী পার হওয়া যায়।

সতীশ ধীরে ধীরে সেই নদীর তীরে উপস্থিত হইল। আমি মনে করিলাম, হয় ত সে নদী-তীরে বসিয়া রাত্রি কাটাইবে। কিন্তু নদীর তীরে বসিল না, নদীর মধ্যে নামিয়া গেল। তখন অন্ধকার হইয়াছে; কিন্তু সে অন্ধকার এত গভীর নহে যে, নিকটের মানুষ দেখিতে পাওয়া যায় না। সতীশ নদীর মধ্যে নামিলে আমিও অগত্যা নদীর মধ্যে নামিলাম। নদীর মধ্যেই একস্থানে কয়েকখানি প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ড পড়িয়া ছিল। সতীশ তাহারই একখানির উপর বসিল। আমি কি করি; একটু দূরে বালুকারাশির উপরই চাপিয়া বসিলাম। দাঁড়াইয়া থাকিলে পাছে সতীশ আমাকে দেখিতে পায়, এই ভয়ে আমাকে বসিয়া পড়িতে হইল।

এই ভাবে প্রায় আধঘণ্টা কাটিয়া গেল। সতীশ সেই প্রস্তরখণ্ডের উপরই বসিয়া রহিল। সে জপ-তপ করিতেছিল কি না, তাহা আমি অন্ধকারে দেখিতে পাইলাম না। আধঘণ্টা পরে হঠাৎ সে একটা বিকট চিৎকার করিয়া উঠিল। সেই চিৎকার ধ্বনি শুনিয়া আমি ভয়ে

শিহরিয়া উঠিলাম। এমন আর্তনাদ' আমি কখনও শুনি নাই—আমার বুকের মধ্যে কাঁপিয়া উঠিল। আমি তখন কি করিব, তাহা প্রথমে ভাবিযাই পাইলাম না; আমি ভয়ে এতদূর অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, সে সময়ে সতীশের নিকট উপস্থিত হইবার শক্তিও আমার ছিল না।

সতীশ সেই বিকট চিৎকার করিয়াই চুপ করিল—আবার চারিদিক নিস্তব্ধ হইল। আমি তখন একটু যেন সাহস পাইলাম । একবার মনে করিলাম, সতীশের নিকট উপস্থিত হই; কিন্তু পরক্ষণেই সে সঙ্কল্প ত্যাগ করিলাম। সতীশ কি করে দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া রহিলাম।

প্রায় আধঘণ্টা চলিয়া গেল, সতীশের কোন সাড়াই পাইলাম না। তখন আমার মনে হইল, হয়ত সতীশ ভয়ে চিৎকার করিয়াই অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া থাকিবে। এই কথা মনে হইবা মাত্রই আমি সতীশের দিকে অগ্রসর হইলাম। কিন্তু দুই তিন পদ যাইতে না যাইতেই সতীশ পুনরায় চিৎকার করিয়া উঠিল; এবার তাহার কথা বেশ শুনিতে ও বুঝিতে পারিলাম। সতীশ চিৎকার করিয়া বলিল—"ছেড়ে দাও—ওগো ছেড়ে দাও।" তাহার পরেই আবার চুপ করিল। আমি আর অগ্রসর হইতে পারিলাম না—আমার পা দুইখানিতে কে যেন দশ মন লোহা বাঁধিয়া দিল। বনে জঙ্গলে, পাহাড়-পর্বতে একাকী অনেক সময় ভ্রমণ করিয়াছি, অনেক বিনিদ্র রজনী পর্বত-গহ্বরে একাকী কাটাইয়াছি, অনেক জনশূন্য স্থানে গভীর অন্ধকারে বৃক্ষমূলে রাত্রি কাটাইয়াছি; কিন্তু তাহাতে ত কোন দিন হৃদয়ে আতঙ্কের সঞ্চার হয় নাই। কিন্তু আজ সতীশের কার্য দেখিয়া, তাহার বিকট আর্তনাদ শুনিয়া, সত্যসত্যই আমার বক্ষঃস্থল স্পন্দিত হইতে লাগিল। একবার মনে হইল, আর এখানে থাকিয়া কাজ নাই, বাসায় ফিরিয়া যাই; আবার মনে হইল, সতীশের নিকট উপস্থিত হই। কিন্তু এখন তাহার যে অবস্থা, তাহাতে তাহার নিকট উপস্থিত হইতে ভয় হইল,—সে ত এখন প্রকৃতিস্থ নাই। অথচ এমন অবস্থায় থাকাও আমার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িল।

সেই সময় সতীশ পুনরায় চিৎকার করিয়া উঠিল—"রক্ষা কর—বাঁচাও।" এবার আর আমি স্থির থাকিতে পারিলাম না। আমার ভয়-ডর তখন আর রহিল না—আমার মনে হইল, বড়ই বিপন্ন হইয়া, সতীশ কাহারও আশ্রয়-প্রার্থনা করিতেছে। আমি তখন এক দৌড়ে সতীশের নিকট উপস্থিত হইয়া, তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলাম, "ভয় নাই—আমি আসিয়াছি।" আমি দেখিলাম—সতীশ থরথর করিয়া কাঁপিতেছে; আমার মনে হইল, তাহার সংজ্ঞা-লোপের মত হইয়াছে।

আমি সতীশকে একেবারে আমার বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিলাম; সতীশ তখনও কাঁপিতেছিল; তাহার কথা বলিবার শক্তি অপহৃত হইয়াছিল; আমি যে তাহাকে কোলের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়াছি, তাহাও বোধ হয় সে বুঝিতে পারে নাই। আমিও আর কথা বলিতে পারিলাম না।

একটু পরেই সতীশ হঠাৎ বলিয়া উঠিল—"কে, কে? কে তুমি? তুমি কে? ছাড়—ছাড়! কে তুমি?"

হইলে তাহাকে ডাকিয়া আনা হইল; সে নীরবে আহার করিতে লাগিল। আমি বলিলাম—"সতীশ, আমি ত এখন স্কুলে চলিলাম। চারিটার পরই আসিব। আমি না এলে তুমি বাহির হইও না। আজ যে তোমার সঙ্গে মোটেই কথা হ'ল না।"

সতীশ আমার দিকে চাহিয়া বলিল, "চারটা পর্যন্ত আমি শুয়েই থাক্‌ব। আর যদি চলেই যাই, তা হ'লেও আজকার মত ঠিক ফিরে আস্‌ব। তোমাকে না ব'লে আমি এখান থেকে চলে যাবো না।"

উপর্যুপরি তিন দিন সতীশ সমস্ত দিন আমাদের দেবালয়ে ঘুমায়, আর সন্ধ্যার পূর্বেই বাহির হইয়া যায়। কোথায় যায়, কি করে, জিজ্ঞাসা করিলে এমন মলিনমুখে, এমন কাতবনয়নে চায় যে, কথাটা দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করিবার উপায় থাকে না।

চারি দিনের দিন স্থির করিলাম যে, সতীশ কি করে, কোথায় যায়, দেখিতে হইবে। রাত্রিতে বনে জঙ্গলে যাইতে আমারও তেমন ভয় ছিল না। তখন বৈশাখ মাস, রাত্রিতে শীতও তেমন প্রবল ছিল না। সে দিন আমি একটু সকালে সকালেই স্কুল হইতে চলিয়া আসিলাম। বাসায় আসিয়া দেখি, সতীশ দেবালযে নিদ্রা যাইতেছে। আমি নীচে বসিয়া তাহার অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। সতীশ অন্য দিন অপেক্ষা সে দিন বেশি ঘুমাইল। সে যখন জাগিয়া উঠিল, তখন প্রায় সন্ধ্যা। ইহাতে আমার একটু সুবিধা হইল; কারণ সে যদি বেলা থাকিতে বাহির হইত, তাহা হইলে তাহার অনুসরণ করা সুবিধাজনক হইত না।

আমি প্রস্তুত হইয়া বসিযা ছিলাম। সতীশ যখন সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল, আমি তখন তাহার অনুসরণ করিলাম।

আমি মনে করিয়াছিলাম, সে হয় ত শহরের পশ্চিম দিকে টপকেশ্বরের দিকে যাইবে; কিন্তু বাহির হইয়া দেখি, সে আমাদের বাসার সম্মুখ দিয়া যে পথ পূর্বমুখে গিয়াছে, সেই পথ ধরিয়া চলিতে লাগিল। আমিও একটু দূরে থাকিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। আমাদের বাসা হইতে পূর্ব দিকে কিছু দূর গেলেই রিচপানা নদী। এ নদীতে সকল সময় জল থাকে না। যখন পাহাড়ে খুব বৃষ্টি হয়, তখন এই নদীতে ঢল নামে, তাহার পর আবার নদীগর্ভ শুষ্ক হইয়া যায়, তখন জুতা পায়ে দিয়া নদী পার হওয়া যায়।

সতীশ ধীরে ধীরে সেই নদীর তীরে উপস্থিত হইল। আমি মনে করিলাম, হয ত সে নদী-তীরে বসিয়া রাত্রি কাটাইবে। কিন্তু নদীর তীরে বসিল না, নদীর মধ্যে নামিয়া গেল। তখন অন্ধকার হইয়াছে; কিন্তু সে অন্ধকার এত গভীর নহে যে, নিকটের মানুষ দেখিতে পাওয়া যায় না। সতীশ নদীর মধ্যে নামিলে আমিও অগত্যা নদীর মধ্যে নামিলাম। নদীর মধ্যেই একস্থানে কয়েকখানি প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ড পড়িয়া ছিল। সতীশ তাহারই একখানির উপর বসিল। আমি কি করি; একটু দূরে বালুকারাশির উপরই চাপিয়া বসিলাম। দাঁড়াইয়া থাকিলে পাছে সতীশ আমাকে দেখিতে পায়, এই ভয়ে আমাকে বসিয়া পড়িতে হইল।

এই ভাবে প্রায় আধঘণ্টা কাটিয়া গেল। সতীশ সেই প্রস্তরখণ্ডের উপরই বসিয়া রহিল। সে জপ-তপ করিতেছিল কি না, তাহা আমি অন্ধকারে দেখিতে পাইলাম না। আধঘণ্টা পরে হঠাৎ সে একটা বিকট চিৎকার করিয়া উঠিল। সেই চিৎকার ধ্বনি শুনিয়া আমি ভয়ে

শিহরিয়া উঠিলাম। এমন আর্তনাদ' আমি কখনও শুনি নাই—আমার বুকের মধ্যে কাঁপিয়া উঠিল। আমি তখন কি করিব, তাহা প্রথমে ভাবিয়াই পাইলাম না; আমি ভয়ে এতদূর অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, সে সময়ে সতীশের নিকট উপস্থিত হইবার শক্তিও আমার ছিল না।

সতীশ সেই বিকট চিৎকার করিয়াই চুপ করিল—আবার চারিদিক নিস্তব্ধ হইল। আমি তখন একটু যেন সাহস পাইলাম । একবার মনে করিলাম, সতীশের নিকট উপস্থিত হই; কিন্তু পরক্ষণেই সে সঙ্কল্প ত্যাগ করিলাম। সতীশ কি করে দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া রহিলাম।

প্রায় আধঘণ্টা চলিয়া গেল, সতীশের কোন সাড়াই পাইলাম না। তখন আমার মনে হইল, হয়ত সতীশ ভয়ে চিৎকার করিয়াই অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া থাকিবে। এই কথা মনে হইবা মাত্রই আমি সতীশের দিকে অগ্রসর হইলাম। কিন্তু দুই তিন পদ যাইতে না যাইতেই সতীশ পুনরায় চিৎকার করিয়া উঠিল; এবার তাহার কথা বেশ শুনিতে ও বুঝিতে পারিলাম। সতীশ চিৎকার করিয়া বলিল—"ছেড়ে দাও—ওগো ছেড়ে দাও।" তাহার পরেই আবার চুপ করিল। আমি আর অগ্রসর হইতে পারিলাম না—আমার পা দুইখানিতে কে যেন দশ মন লোহা বাঁধিয়া দিল। বনে জঙ্গলে, পাহাড়-পর্বতে একাকী অনেক সময় ভ্রমণ করিয়াছি, অনেক বিনিদ্র রজনী পর্বত-গহ্বরে একাকী কাটাইয়াছি, অনেক জনশূন্য স্থানে গভীর অন্ধকারে বৃক্ষমূলে রাত্রি কাটাইয়াছি; কিন্তু তাহাতে ত কোন দিন হৃদয়ে আতঙ্কের সঞ্চার হয় নাই। কিন্তু আজ সতীশের কার্য দেখিয়া, তাহার বিকট আর্তনাদ শুনিয়া, সত্যসত্যই আমার বক্ষঃস্থল স্পন্দিত হইতে লাগিল। একবার মনে হইল, আর এখানে থাকিয়া কাজ নাই, বাসায় ফিরিয়া যাই; আবার মনে হইল, সতীশের নিকট উপস্থিত হই। কিন্তু এখন তাহার যে অবস্থা, তাহাতে তাহার নিকট উপস্থিত হইতে ভয় হইল,—সে ত এখন প্রকৃতিস্থ নাই। অথচ এমন অবস্থায় থাকাও আমার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িল।

সেই সময় সতীশ পুনরায় চিৎকার করিয়া উঠিল—"রক্ষা কর—বাঁচাও।" এবার আর আমি স্থির থাকিতে পারিলাম না। আমার ভয়-ডর তখন আর রহিল না—আমার মনে হইল, বড়ই বিপন্ন হইয়া, সতীশ কাহারও আশ্রয়-প্রার্থনা করিতেছে। আমি তখন এক দৌড়ে সতীশের নিকট উপস্থিত হইয়া, তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলাম, "ভয় নাই—আমি আসিয়াছি।" আমি দেখিলাম—সতীশ থরথর করিয়া কাঁপিতেছে; আমার মনে হইল, তাহার সংজ্ঞা-লোপের মত হইয়াছে।

আমি সতীশকে একেবারে আমার বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিলাম; সতীশ তখনও কাঁপিতেছিল; তাহার কথা বলিবার শক্তি অপহৃত হইয়াছিল; আমি যে তাহাকে কোলের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়াছি, তাহাও বোধ হয় সে বুঝিতে পারে নাই। আমিও আর কথা বলিতে পারিলাম না।

একটু পরেই সতীশ হঠাৎ বলিয়া উঠিল—"কে, কে? কে তুমি? তুমি কে? ছাড়—ছাড়! কে তুমি?"

আমি বলিলাম—"ভয় নাই সতীশ, আমি আসিয়াছি।"

সতীশ বলিল—"তুমি—তুমি—কে তুমি? তুমি ত সে নও—তোমাকে তা আর কোন দিন দেখি নাই। কে তুমি?"

আমি বলিলাম—"সতীশ, তোমার কি হইয়াছে? তুমি অমন করিতেছ কেন? আমাকে কি চিনিতে পারিতেছ না?"

আমার এই কথা শুনিযা সতীশের জ্ঞান সঞ্চার হইল; সে বলিল—"তুমি এসেছ!—কেন ভাই, তুমি আমার এ নরকযন্ত্রণা দেখ্‌তে এলে। কেন তুমি এলে ভাই!" বড় কাতরভাবে, বড়ই মর্মভেদী করুণস্বরে সতীশ এই কয়েকটি কথা বলিল।

আমি বলিলাম—"সতীশ, তোমার কি হইয়াছে? তুমি অমন করিতেছ কেন? ভয় কি, আমি যে তোমার কাছে রহিয়াছি।"

সতীশ তখন অতি কাতরবচনে বলিল—"ভাই, আজ আট বৎসর আমি ভয়ানক নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতেছি—আট বৎসর—এক দিন দুই দিন নয়—আট বৎসর। এই আট বৎসর রাত্রিতে আমার নিদ্রা নাই—বাত্রিতে আমি ঘুমাইতে পারি না। সারা রাত্রি আমি এমনই করিয়া বনে জঙ্গলে চিৎকার কবিয়া ফিরি। সে যে আমায় কিছুতেই ছাড়ে না—কিছুতেই না—কিছুতেই না। রাত্রি হইলেই সে আমাকে পাইয়া বসে, সারারাত কতবার কত রকমে আমাকে কষ্ট দেয়। বড় যন্ত্রণা—বড় কষ্ট!" এই বলিয়াই সতীশ পার্শ্বের অন্ধকারের মধ্যে উঠিয়া যাইতে চাহিল। আমি তাহাকে জোর করিয়া বসাইলাম; বলিলাম—"কে সে? কে তোমার উপর এমন অত্যাচার করে?"

সতীশ পাগলের মত চিৎকার করিয়া বলিল—"কে—কে? ঐ দেখ, কে? ছাড়—ছাড়—ওগো ছাড়!" এই বলিয়া সতীশ মাটির উপর শুইয়া পড়িল। আমি তাড়াতাড়ি তাহাকে তুলিয়া বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিলাম; বলিলাম—"কৈ, কে? আমি ত কাকেও দেখ্‌তে পাচ্ছি না—এখানে ত কেউ নেই।"

সতীশ আমার কথার কোন উত্তর দিল না। সে কি যেন ভাবিতে লাগিল। তাহার পর একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিল—"ভাই, তুমি এখানে কেন এলে? তুমি আমার কিছুই করতে পার না—কাহারও সাধ্য নাই—আমাকে উদ্ধার করে। আমি যে পাপ করিয়াছি—তাহার শাস্তি আমাকে ভোগ করিতেই হইবে। কি ভীষণ শাস্তি! কি ভীষণ! কি ভয়ানক!"

আমি বলিলাম—"সতীশ, আর এখানে নয়, বাসায় চল। সেখানে গিয়ে স্থির হ'য়ে সব কথা আমাকে খুলে বল। দেখি, আমি তোমার এ যন্ত্রণার অবসান করতে পারি কি না।"

সতীশ নিরাশভাবে বলিল—"তুমি পাগল! আমার এ যন্ত্রণা আমার আজীবনের সঙ্গী—এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত এমন করিয়া যে করিতে হইবে, তাহা আমি জানিতাম না। এ রোগের ঔষধ নাই! যে দিন প্রাণ বাহির হইবে—যদি সেই দিন আমি শান্তি পাই! তা ত হবে না—আমার ত মরণ নাই। আমি মরলে প্রায়শ্চিত্ত কর্‌বে কে? তুমি ফিরে যাও ভাই! আমি রোজ রাত্রেই এ কষ্ট পাইয়া থাকি; তাই আমি রাত্রিতে লোকালয়ে থাকি না। তুমি বাসায় যাও। প্রাতঃকালে তোমার বাসায় যাইব। তুমি যাও।"

আমি বলিলাম—"তোমাকে এ অবস্থায় রেখে আমি কি ক'রে যাই। আমি যেতে পারব না। আমি—"

আমার কথায় বাধা দিয়া সতীশ বলিল—"থেকে কি করবে? তাকে কেউ তাড়াতে পারবে না। সে আমাকে কিছুতেই ছাড়বে না। তুমি যাও; তোমার পায়ে পড়ি, তুমি যাও।"

আমি বলিলাম—"সতীশ, তোমার যন্ত্রণার কথা না শুনে আমি এখান থেকে নড়ব না।"

সতীশ একটু চিন্তা করিয়া বলিল—"তুমি বাসায় যাও। আমি বল্‌ছি, কাল তোমাকে সব কথা বল্‌ব। তুমি যদি থাক, তাহা হইলে আর আমার সঙ্গে দেখা হবে না, তুমি আমাকে ঠেকিয়ে রাখ্‌তে পারবে না। আমি ঠিক কথা বল্‌ছি। যদি আমার পাপের কাহিনি শুন্‌তে চাও, তবে আজ তুমি ফিরে যাও; কা'ল তোমাকে সব বল্‌ব। যে কথা কাউকে কোন দিন বলি নাই, সে কথা তোমাকে বল্‌ব—স্বীকার করছি তোমাকে বল্‌ব। আর দেরি কোরোনা ভাই! ঐ সে আস্‌ছে।" এই বলিয়াই সতীশ "বাবা গো—" বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল। আমি তাহাকে পুনরায় বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিলাম।

একটু পবেই আবার প্রকৃতিস্থ হইয়া সতীশ বলিল—"যাও ভাই, তুমি বাসায় যাও। আর দেরি কবিও না।"

আমি আব কি করিব। সতীশকে সেই অবস্থায়, সেই নদীর মধ্যে একাকী অন্ধকারে ফেলিয়া আমাকে চলিয়া আসিতে হইল। পাগলের সঙ্গে সারারাত্রি সেই স্থানে অতিবাহিত করিতে পারিলাম না। আমি তাহার এই শোচনীয় অবস্থার কথা ভাবিতে ভাবিতে বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। সে রাত্রিতে আমার নিদ্রা আসিল না; সমস্ত রাত্রি সতীশের ভীষণ যন্ত্রণার কথাই ভাবিতে লাগিলাম—তাহার সেই বিকট আর্তনাদ ক্রমাগত আমার কর্ণে ধ্বনিত হইতে লাগিল। হায় হতভাগ্য সতীশ!

পরদিন যথাসময়ে সতীশ ফিরিয়া আসিল। আমি সে দিন আর স্কুলে গেলাম না; সতীশের কথা শুনিবার জন্য বাসায় থাকিলাম।

আহারান্তে সতীশ আমাকে দেবালয়ে যাইবার জন্য আহ্বান করিল। আমি বলিলাম, "আগে একটু বিশ্রাম করিয়া লও, তাহার পর আমি যাইব।"

সতীশ বলিল—"আমি আজ আর ঘুমাইব না—তুমি আমার সঙ্গে এস।"

আমি তখন তাহার সঙ্গে দেবালয়ে গেলাম এবং তাহার সম্মুখেই একখানি মৃগচর্মে উপবিষ্ট হইলাম। সতীশ প্রথমে খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিল। তাহার পর তাহাব জীবনের কথা যাহা বলিল, তাহা ঠিক তাহার ভাষায় এতদিন পরে বলিতে পারিব না; যতদূর মনে আছে, চেষ্টা করিয়া বলিতেছি। সতীশ ধীরে ধীরে বলিল—

"আমার কথা বড় বেশি নহে, অল্প কয়েকটি কথা শুনিলেই তুমি সব বুঝিতে পারিবে। আমি শ্যামবাজারে যে বাসায় ছিলাম, তাহা তোমার মনে আছে। ভট্টাচার্যের একটি বিধবা যুবতী কন্যা ছিল—না? সেই সৌন্দর্যই আমার কাল হইল। সে সকল কথা বর্ণনা করিয়া কাজ নাই। আমি তাহাকে ক্রমাগত প্রলোভন দেখাইয়া পাপের পথে লইয়া আসিলাম। তখন আমি

এমন দিশেহারা হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, অনেক দিন কলেজে পর্যন্ত যাইতাম না। তোমার মনে পড়ে, তুমি তার জন্য আমাকে কত বকিতে-কত উপদেশ দিতে। তখনও যদি তোমার কথা শুনিয়া সাবধান হইতাম! তা ত হোলো না। তারপর একদিন তাহাকে লইয়া পলায়ন করিলাম। একেবারে কাশীতে আসিলাম। তোমরা আমাকে খুঁজিয়া পাইলে না। বুঝেছ!" এই বলিয়া সতীশ নীরব হইল; আমিও চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলাম।

একটু পরেই একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া সতীশ বলিল—"তার পর আর কি? কাশীতে আমরা প্রায় এক বৎসর কাটাইলাম। তখন আমাদের সম্বলও ফুরাইয়া গেল, দিন চলা ভার হইল। আমারও হৃদয়ে কেমন একটা অবসাদ আসিয়া উপস্থিত হইল। এক একদিন মনে করিতাম, রজনীকে ফেলিয়া পলায়ন করি—আর ভাল লাগে না। কিন্তু তাহা পারিলাম না। শেষে কি হইল জান? রজনীর সন্তান সম্ভাবনা হইল। তখন আমার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। দুই জনেরই চলে না,—আবার আর একটি! আমি তখন কি করিব ভাবিয়া পাইলাম না—আমি হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হইলাম। শেষে কি করিলাম জান? একদিন বাজার হইতে বিষ কিনিয়া আনিলাম; রজনীকে আগে বিষ খাওয়াইয়া মারিব, তাহার পর আমিও সেই বিষ খাইয়া মরিব। তাহার ভাতের সঙ্গে বিষ মিশাইয়া দিলাম, বিষের কার্য আরম্ভ হইল। সে ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। সে যে কি যন্ত্রণা;—আমার ভয় হইল—আমি মরিতে পারিলাম না। তাহাকে সেই অবস্থায় ফেলিয়াই আমি পলায়ন করিলাম।" সতীশ আবার চুপ করিল। আমারও আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা হইল না।

একটু পরেই সতীশ বলিল—"তুমি একটু বোসো; আমি নীচে থেকে আস্‌ছি।" এই বলিয়া সতীশ নীচে চলিয়া গেল; আমি তাহার অপেক্ষায় বসিয়া রহিলাম।

কৈ, সতীশ ত আসে না! আমি মনে করিয়াছিলাম সে তখনই ফিরিয়া আসিবে। দশ মিনিট অপেক্ষা করিয়াও যখন তাহাকে দেখিলাম না, তখন আমার মনে হইল, সতীশ হয়ত কোথাও চলিয়া গেল। আমার কথাই ঠিক হইল। আমি নীচে আসিয়া অনুসন্ধান করিলাম, সতীশকে দেখিলাম না। রাস্তায় গেলাম, সেখানেও সতীশ নাই। তাহার পর তাহার কত অনুসন্ধান করিয়াছি। কত স্থানে ঘুরিয়াছি; কিন্তু সতীশকে আর খুঁজিয়া পাইলাম না। এখনও সে বাঁচিয়া আছে কি না, কেমন করিয়া বলিব। আহা! সে যদি মরিয়া থাকে, তবে সে বাঁচিয়াছে!

–ভারতবর্ষ ২য় বর্ষ ১৩২১-২২, ২য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা ফাল্গুন।

বিধবা

পিতার মৃত্যুর তেরদিন পরে একমাত্র জ্যেষ্ঠভ্রাতা যোগেশকে নিমতলার মহাশ্মশানে চিরবিদায় দান করিয়া রমেশ বাড়িতে আসিয়া দেখিল, তাহার বৌদিদি মৃতপ্রায় অবস্থায় পড়িয়া আছেন এবং তাহার স্ত্রী ও পুত্র তাহার পার্শ্বে মলিন বদনে বসিয়া আছে। রমেশ কাতর কণ্ঠে ডাকিল, "বৌদিদি!"

আজ দশবৎসর কমলা এই "বৌদিদি" ডাক শুনিয়া আসিতেছে; পাঁচ বৎসর পূর্বে যখন বমেশের মাতা মারা যান, তখন ত রমেশ এমন করুণ কণ্ঠে বৌদিদি বলিয়া ডাকে নাই; তেরদিন পূর্বে যখন রমেশের পিতা চিরদিনের জন্য চলিয়া গেলেন, তখনও ত রমেশ এমন স্বরে তাহার বৌদিদিকে ডাকে নাই; কিন্তু আজ সে দাদাকে হারাইয়া, একেবারে চারিদিক অন্ধকার দেখিল; তাহার যে আজ বৌদিদি ভিন্ন ডাকিবার আর কেহ নাই; বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আজ সে অপর কোন আশ্রয়ই দেখিল না! তাই সে আজ এমন হৃদয়ভেদী স্বরে ডাকিল 'বৌদিদি'!

রমেশের স্ত্রী লক্ষ্মী কত কাঁদিয়া 'দিদি', 'দিদি' বলিয়া চিৎকার করিয়াছে; রমেশের একমাত্র পুত্র নারায়ণ, কমলার কত আদরের, কত সোহাগের নারায়ণ, তাহাব জেঠাইমাকে কত ডাকিয়াছে; কোন উত্তরই তাহারা পায় নাই;—কমলা মৃতপ্রায় ধরাসনে পড়িয়া ছিল; কিন্তু রমেশের সেই আকুল হৃদয়ের আর্তনিনাদ,—সেই অসহায় অবস্থার মর্মভেদী বৌদিদি ডাক তাহার হৃদয় দ্বারে আঘাত করিল। কমলা মাথা তুলিয়া চাহিয়া দেখিল, রমেশ তাহার মাথার কাছে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। পরক্ষণেই রমেশের মুখের দিকে চাহিয়া কমলা দেখিল, সেই সুন্দর মুখে কে যেন কালি মাখাইয়া দিয়াছে, যেই সদা প্রফুল্ল নয়নদ্বয় যেন জ্যোতিহীন হইয়াছে। কমলা তখন নিজের হৃদয়ভেদী শোকের আবেগ অতিকষ্টে সংবরণ করিয়া উঠিয়া বসিল। তাঁহার পর রমেশের দিকে চাহিয়া বলিল, "ঠাকুর পো এস।"

এই সম্বোধন শুনিয়া রমেশ চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল;—এমন সম্বোধন ত সে আজ দশবৎসর কমলার মুখে শোনে নাই;—যে কমলার বড় আদরের "হারাধন!"—"বৌদিদি, আজ তোমার হারাধনকেও দাদার সঙ্গেই গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়ে এসেছি গো!" রমেশ আর কিছু বলিতে পারিলনা, আর দাঁড়াইয়া থাকিতেও পারিল না। সে কমলার নিকট বসিয়া পড়িল।

কমলা তখন নারায়ণকে টানিয়া লইয়া রমেশের কোলের কাছে বসাইয়া দিয়া বলিল, "ভাই হারাধন, তুমি যে আমারই হারাধন!" তাহার শোকের সিন্ধু আবার উথলিয়া উঠিল; তাহার আর কথা বলিবার শক্তি থাকিল না।

লক্ষ্মী কমলার এই ভাব দেখিয়া অতি ধীরে বলিল, "দিদি, ওগো তুমি চেয়ে দেখ, তোমার নারায়ণ যে শুকিয়ে গিয়েছে। তুমি স্থির না হ'লে যে সব যায় দিদি!"

চারি বৎসরের ছেলে এতক্ষণ কথা বলে নাই। কথা বলিতে শিখিয়া অবধি, যতক্ষণ সে

না ঘুমাইত, ততক্ষণ তাহার কথা থামিত না। আজ এই সকল কান্নাকাটির মধ্যে এতক্ষণ তাহার বাক্‌রোধ হইয়া গিয়াছিল; সে বোধ হয় কথা খুঁজিয়া পাইতেছিল না।

তাহার মায়ের কথা শুনিয়া এতক্ষণ পরে তাহার মুখে কথা আসিল; সে বলিল, "না, না জ্যাঠামশাই চলে যাবে না—দিদিমণিকে আনতে গিয়েছে, না মা? জ্যাঠাইমা, চুপ কর, জ্যাঠামশাই এসে বকবে। আমি যে কিছু খাইনি জ্যাঠাইমা। বাবা তুমি আর বেড়াতে যেও না। বুদ্ধু বলে, তোমার বাবা মদ খায়; বুদ্ধু ভারি মিথ্যা কথা বলে, না জ্যাঠাইমা? জ্যাঠামশাই এলে বলে দেব। তা, জ্যাঠামশাই কাউকে কিছু বলে না, শুধু হাসে। জ্যাঠামশাই এত হাসে কেন, জ্যাঠাইমা? বাবা কিছু পড়ে না, জ্যাঠামশাই খুব পড়ে। আমিও পড়ি। বই আনব জ্যাঠাইমা! সেই যে—বল না জ্যাঠাইমা, সে কি বই! ঐ যে—"

নারায়ণের কথায় বাধা দিয়ার লক্ষ্মী বলিল, নারায়ণ, চুপ কর বাবা; তোমায় জেঠামার যে অসুখ করেছে।

এই কথা শুনিবামাত্র নারায়ণ পিতার কোলেব কাছ হইতে উঠিয়া কমলার নিকট আসিল এবং তাহার কপালে হাত দিয়া বলিল, "উঃ গবম যে! জ্যাঠাই মা, আজ তুমি কিছু খেতে পাবে না। জ্বর হোয়েছে। বুদ্ধু, বুদ্ধু জ্যাঠামশাইকে ডেকে আন, জ্যাঠাইমার যে জ্বর হয়েছে। তুমি শুয়ে থাক জ্যাঠাইমা। বাবা, আজ আর কোথাও যেও না।"

কমলা নারায়ণকে কোলের মধ্যে লইয়া বুকে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "না, বাবা, আমার জ্বর হয়নি । চল, তোমাকে খেতে দিই গে। আহা, বাবা আমার এতক্ষণ কিছুই খায় নাই।" এই বলিয়া নারায়ণকে কোলে করিয়া কমলা ঘবের বাহির হইয়া গেল। রমেশ ও লক্ষ্মী বসিয়া রহিল।

লক্ষ্মী বলিল, "এখন উপায় কি হবে? এ সংসার কি ক'রে চলবে?"

রমেশ বলিল, "এতদিন ত তা ভাবিনি লক্ষ্মী। আমার উপর বাবা ছিলেন, দাদা ছিলেন; আমি কিছুই করিনি। এমন যে হবে, তা ত স্বপ্নেও ভাবিনি। এখন কি করব, তাই বল।"

লক্ষ্মী বলিল, "যা হবার তা হয়ে গিয়েছে! এতদিন যে ভাবে কাটিয়েছ, তা সব ভুলে যাও। কতদিন তোমায় পায়ে ধরে কেঁদেছি, কত কথা বলেছি, কতদিন কত অন্যায় কথাও বলেছি। তুমি সে সকল কথা কানেই তোলনি। আর তোমাকে কিছু বললেই দিদি অমনি মুখ ভার করতেন, আমাকে বকতেন; আমি চুপ করে যেতাম। আর সে সব ভেবে কি হবে? কিন্তু এখন কি করবে? কে আমাদের আশ্রয় দেবে?"

রমেশ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "লক্ষ্মী, এতদিন কি ভুলই করেছি। মনে করেছিলাম, এমনি করেই বুঝি দিন যাবে। কুসঙ্গে পড়ে লেখাপড়া শিখলাম না, পাজি বদমায়েশ হয়ে গেলাম। বাবার মলিন মুখ, বৌদিদির উপদেশ, তোমার কথা, কিছুতেই আমাকে ফিরাতে পারে নাই। তাই বুঝি বাবা চলে গেলেন; মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য আমি থাক্‌লাম। এখন কি করব? কেমন করে সংসার চলবে? বাবা মরে যাবার পর দেখা গেল, তাঁর বাক্সে মোট সাড়ে তিনশ টাকা ছিল।"

লক্ষ্মী বলিল, "কর্তা কি করবেন? তিনি পঞ্চাশ টাকা পেনশন পেতেন, বই ত নয়।

বড়বাবু যে দেড়শ টাকা কলেজের মাইনে পেতেন, সে সবই এনে কর্তার হাতে ধরে দিতেন। একটা পয়সার দরকার হলে কর্তার কাছে, কি দিদির কাছে চেয়ে নিতেন। অমন মহাদেবের মত মানুষ কি আর হয়? তাই আমাদের অদৃষ্টে সইলনা।

রমেশ বলিল, "সবই বুঝতে পারছি; কিন্তু বড় বিলম্বে বুঝলাম। আমাকে লেখাপড়া শেখাবার জন্য বাবা কি কম চেষ্টা করেছেন। আমার তখন কি কুবুদ্ধিই হয়েছিল, সেকেণ্ড ক্লাস থেকে পড়া ছেড়ে দিলাম । দাদা এম. এ. পাশ করলেন; তারপর এই চারবছর প্রফেসারি করে যা পেয়েছেন, সবই বাবাকে দিয়েছেন। বাবা তাই দিয়ে সংসার চালিয়েছেন; এই বাড়িখানি করতে পাঁচ হাজার টাকা ধার হয়েছিল, তার তিনহাজার শোধ দিয়েছেন। এখনও দুই হাজার টাকা ধার আছে। সে ধারই বা কি ক'রে শোধ হবে, আমরাই বা কি করে বাঁচব।

লক্ষ্মী বলিল, "এই কথাই ত কত দিন বলেছি। লেখাপড়া কি সকলেই বেশি শেখে, না সকলেই এম. এ. পাশ করে। তোমার মত লোকে কি আর দশটাকা আনছেনা। কর্তা ত তাঁর অফিসের সাহেবদের বলে তোমার চাকরি করে দিয়াছিলেন, তুমি ত তা রাখতে পারলেনা। তা হলে কি আজ আর ভাবনা ছিল। যাক্, সে সব কথা থাকুক। আমার ভাবনা হয়েছে, দিদি আমাদের ফেলে বাপের বাড়ি না যান। তিনি বড় মানুষের মেয়ে, তাঁর কি এত কষ্ট সহ্য হবে। আর তাঁর বাপ ভাইয়েরা কি তাঁকে এখানে রাখবেন? মাসে মাসে তিনি যা হাতখরচ বাপের বাড়ি থেকে পেতেন, তার একটি পয়সাও ত তোমরা দুই বাপবেটায় রাখতে দেও নাই। তুমি যত পার উড়িয়েছ, আর তিনি নারায়ণের জন্য সব খরচ করেছেন। বড়বাবুও এমনি ছিলেন, তিনি কোনদিন একটি কথাও বলেননি। দিদি যদি একটু শক্ত হতেন, তা হলে কি তুমি এমন হতে পারতে। আমি কতদিন এই কথা দিদিকে বলেছি; তিনি হারাধন বলতেই অজ্ঞান। এখন যে সবই গেল।"

রমেশ বলিল, " লক্ষ্মী, তুমি বৌদিদিকে চেননা; তিনি আমাদের ছেড়ে যেতেই পারেন না; নারায়ণ যে তাঁর সব।"

লক্ষ্মী বলিল, "এমন ভাই, এমন বৌদিদি পেয়েও তুমি যে অমন হয়ে গিয়েছিলে, তাই ভেবেই আমার কান্না আসত।"

রমেশ বলিল, "সেই পাপের ফল ভোগবার জন্যই ত বাবা দাদা আমাকে ফেলে এমন করে চলে গেলেন। আর সে কথা ভেবে কি হবে; যা অদৃষ্টে আছে, তাই হবে।"

২

সেইদিনই অপরাহ্ণ কালে কমলার দাদা মোহিতবাবু অফিস হইতে ফিরিবার সময়ই রমেশদিগের বাড়িতে উপস্থিত হইলেন। শ্রীযুক্ত মোহিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় হাইকোর্টের অ্যাটর্নি। তাঁহার পিতা শ্রীযুক্ত হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বেঙ্গল সেক্রেটারি অফিসে উচ্চ বেতনে কর্ম করিয়া এখন অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। হরিমোহনবাবুর পুত্র মোহিত ও কন্যা কমলা ব্যতীত আর সন্তান নাই। তাঁহাদের অবস্থা খুব ভাল। কলিকাতায় তিনচারি খানি বাড়ি

আছে; কোম্পানির কাগজ ও অনেক কারবারের অংশে যথেষ্ট টাকা আছে; মোহিতবাবুর অফিসও খুব ভাল। মোহিতবাবুর কনিষ্ঠা ভগিনী কমলাকে বড়ই ভালবাসেন; প্রতি মাসে তাহার হাত খরচের জন্য ৫০টা করিয়া টাকা দেন এবং কমলা যখন যাহা চায়, দাদার নিকট তাহাই পায়।

মোহিতবাবুকে দেখিয়া রমেশ বলিল, "কি করি ভাই, বড় একটা 'কেস' ছিল। সেই তোমাদের সঙ্গে ঘাট থেকে বেরিয়েই বাড়ি যেতে হোল, এখানে আর আসতে পারলুম না। তাড়াতাড়ি বাড়িতে গিয়ে কাপড় ছেড়েই অফিসে যেতে হয়েছিল। শরীরটাও বড় ভাল নেই।"...

রমেশ বলিল, তা, তা হতেই পারে। সেই জন্যই ত কাল রাত্রিতে আপনাকে শ্মশানে যেতে নিষেধ করেছিলাম। আপনি ত সে কথা শুনলেন না।"

মোহিতবাবু বলিলেন, "রমেশ, যোগেশকে যে আমি কত ভালবাসতাম তা আর কি বলবো; যোগেশ আমার ভাইয়ের অধিক ছিল; কমলা যে আমার বড় আদরের বোন রমেশ! সব শেষ হয়ে গেল। এত করেও যোগেশকে বাঁচাতে পারলাম না। কমলাকে যে কি বলে প্রবোধ দেব, ভেবে পাচ্ছিনে। তোমাদের ত খাওয়া হয়েছে? মাকে আসতে বলেছিলাম, আমার স্ত্রীরও আসবার কথা ছিল; তাঁরা এসেছিলেন ত?"

রমেশ বলিল, "মা আর আসেনি, আপনার স্ত্রী এসেছেন; তিনি এখনও যান নাই। আমাদের কি আর খাওয়া আছে দাদা! বৌদিদির ত আজ উপবাস। তিনি কি আর আছেন?"

মোহিতবাবু বলিলেন, "আমার আর ভিতরে যেতে ইচ্ছে করে না; এইখানেই বসি।"

রমেশ বলিল, "না, না, আপনি বাড়ির মধ্যে চলুন। আপনাকে দেখলেও বৌ-দিদি মনে বল পাবেন, একবার চলুন।"

মোহিতবাবু কি করেন, রমেশের সহিত বাড়ির ভিতর গেলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই কমল 'দাদাগো' বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। মোহিতবাবু কমলার কাছে বসিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। কি তিনি বলিবেন? কি বলিয়া তিনি কমলাকে প্রবোধ দিবেন? তাঁর কি তখন কথা বলিবার শক্তি ছিল; তিনিও কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার স্ত্রীও সেই ঘরে নারায়ণকে কোলে করিয়া বসিয়াছিলেন।

মোহিতবাবু কমলাকে কিছু না বলিয়া রমেশের সহিত কথা বলাই সঙ্গত মনে করিলেন। তিনি অতি কাতর কণ্ঠে বলিলেন, "রমেশ, এখন ত আর তোমার চুপ করে বসে থাকলে চলবে না। অবস্থা তো সবই জানতে পেরেছ। আমার মনে হয়, রসিক মল্লিক বাকি দুই হাজার টাকার জন্য দু-এক দিনের মধ্যেই তাগাদা করবে। আর কি সে টাকা ফেলে রাখতে চাইবে? কার ভরসায় বা ফেলে রাখবে। তার কি করা যায়? আর তোমাদেরই বা চলবার উপায় কি হবে! যোগেশ নেই বলে ত তোমাদের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ উঠে যায় নাই, যাবেও না।"

রমেশ আর সে রমেশ নাই; এই বিপদে পড়িয়া দুই দিনের মধ্যে সে একেবারে সম্পূর্ণ পৃথক হইয়া গিয়াছে। সে বলিল, "আমি ত সংসারের কিছু বুঝিনা মোহিতদাদা! এতদিন বাবা ছিলেন, দাদা ছিলেন; আমি কিছু ভাবিও নাই, কিছু করিও নাই। লেখাপড়াও জানিনে। আমি

কি করবো? আপনিই এখন আমাদের একমাত্র আশ্রয় স্থান, আপনিই আমাদের বন্ধু। আপনি যা বলবেন, আমি তাই করব।"

মোহিতবাবু বলিলেন, "আমি কাল রাত্রি থেকেই ভাবছি, তোমাদের কি করা যায়। আমার পরামর্শ এই রমেশ, যে, তুমি কাল থেকেই আমার অফিসে বেরুতে আরম্ভ কর। তোমার হাতের লেখা ভাল আছে; ঐতেই আমাদের কাজ চলে যাবে। এখন তোমাকে আমরা মাসে মাসে গুটি ত্রিশেক টাকা দেব। তারপর মন দিয়ে ভাল করে কাজ করলে, পরে মাইনে আরও বাড়বে। তারপর দেনার কথা। আমি বলি কি, তোমাদের আর এখন এতবড় বাড়ির দরকার কি? বাড়িটা নূতন বললেই হল। অবশ্য এখন বেচলে, তোমাদের যা খরচ হয়েছে, তা উঠবে না। তবে আমি চেষ্টা করলে ১৪/১৫ হাজার টাকায় বাড়িটা বেচে দিতে পারবো। ধর, চোদ্দ হাজার টাকায় বাড়িটা বেচলে। তার থেকে দু'হাজার টাকা দেনা শোধ দিলে; রইল বারো হাজার টাকা। ঐ টাকা দিয়ে যদি মিউনিসিপাল ডিবেঞ্চার কি ঐ রকম কিছু 'শেয়ার' কেনা যায়, তা হ'লে যেমন করে হোক মাসে ৭০ টাকার সংস্থান আমি করে দিতে পারব। এ ভরসা বাখি। তা হলে মাসে তোমার সব জড়িয়ে একশ টাকা আয় আপাতত হোল। মোট একখানা বাড়ি ভাড়া করে, তুমি যদি তোমার স্ত্রী ও ছেলেটি নিয়ে থাক, ঐ টাকাতেই বেশ চলে যাবে। কমলা আমাদের কাছেই থাকবে। তারপর, তোমার ছেলে যদি মানুষ হয়, তখন বাড়ি কিনতে, কি বাড়ি করতে কতক্ষণ। আসল টাকা ত আর নষ্ট হচ্ছে না। আমার ত এই পরামর্শ। তুমি কি বল? রমেশ বলিল, "আমি আর কি বলব। বৌদিদি যদি এই করতে বলেন, তাই হবে।"

কমলা নীরবে দাদার কথা শুনিতেছিল। রমেশ যখন কমলার উপর ভার দিল, তখন সে বলিল, "দাদা তুমি ওকি কথা বলছ? আমাদের বাড়িখানি বিক্রয করতে হবে? সে কিছুতেই হবে না দাদা। তা কিছুতেই পারব না। এ বাড়ি কি ছাড়তে পারি। একি বাড়ি দাদা! এযে আমার দেবমন্দির! তুমিই ত আমাকে একথা শিখিয়ে দিয়েছিলে দাদা। তোমার কাছে উপদেশ পেয়েই ত আমি এ বাড়িকে স্বর্গ বলে মনে করে নিয়েছি। না, দাদা, আমি যতদিন বেঁচে আছি, ততদিন এ বাড়ি আমি ছাড়তে পারব না; ভিক্ষে করে খেতে হয়, তাও স্বীকার, তবুও এ বাড়ি দাদা! এ যে আমাদের বাড়ি। এ বাড়ির সব তাতে যে তাঁকে দেখতে পাচ্ছি দাদা! না, না, এমন কথা তুমি মনেও কোর না। যদি না খেয়ে মরতে হয়, তাতেও রাজি আছি; আমি এই বাড়ির মাটি কামড়ে পড়ে থাক্‌ব। ঐ উঠানে দাদা, ঐ উঠানের ঐখানটায় আমি শেষ নিঃশ্বাস ফেলব। তুমি ত আমাকে জান দাদা! ধারের কথা বলছ। তোমরা ত আমাকে কত দিয়েছ, আমার দুই তিন খানি অলংকার বিক্রয় করলেই ও দুহাজার টাকা ধার শোধ হয়ে যাবে। তারপর যা অদৃষ্টে থাকে তাই হবে। তুমি কিছু মনে কোরনা দাদা! আমি তোমাদের বাড়ি যাবো না, যেতে পারবোনা; আমি এই বাড়িতেই থাকব। হারাধন ও নারায়ণেরে ছেড়ে আমি কোথায় যাব? তিনি যে ওদের আমার হাতে—" কমলা আর কথা বলিতে পারিল না। সে কাঁদিয়া উঠিল। তাহার কান্না দেখিয়া নারায়ণ মোহিতবাবুর স্ত্রীর কোল হইতে তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া কমলার মুখের উপর পড়িয়া বলিল, জ্যাঠাইমা কেঁদোনা। জ্যাঠামশাই এসে

যে বক্‌বে। বাবা, তুমি বড় দুষ্টু, শুধু শুধু জ্যাঠাইমাকে কাঁদাও। দাদামণি বাড়ী এলে বলে দেব। চল জ্যাঠাইমা, আমরা এখান থেকে চলে যাই। ওরা শুধু কাঁদায় না জ্যাঠাইমা?"

কমলা নারায়ণের মুখে চুম্বন করিয়া বলিলেন, "না, বাবা আমি আর কাঁদবো না।"

নারায়ণ বলিল, জ্যাঠাইমা, তোমার ক্ষিদে পেয়েছে, না। তুমি কিছুই খেলে না। আমাকে খেতেও দিলে না।"

কমলা বলিল, "একটু বোস বাবা, এখনি তোমাকে খেতে দিচ্ছি, গোপাল আমার।" মোহিতবাবুর দিকে চাহিয়া বলিল, "দাদা, তুমি হারাধনকে কাল থেকেই অফিসে নিয়ে যাও। তুমি যা দেবে, আমরা তাই হাত পেতে নেব। আর দেখ, কাল একবার তুমি এসো; তোমার হাতে গয়না দেব; তাই বেচে তুমি আমাদের ধারটা শোধ করে দিও।"

মোহিতবাবু বলিলেন, "কমলা, তুই কি সব ভুলে গেলি বোন! তোর গয়না বিক্রি করে ধার শোধ দিতে হবে। ভগবান, এ কথাও আজ শুনতে হোল। ওসব কথা আর বলিসনে। কমলা! তোর দাদা এখনও দুইহাজার টাকা দিয়ে ধার শোধ করে দিতে পারে। তুই কাঁদিসনে বোন। আমারই ভুল হয়ে ছিল। আমি না বুঝে তোকে বড়ই ব্যথা দিয়েছি। না কমলা, তোকে কোথাও যেতে হবে না। তুই এখানেই থাক্‌বি—এই বাড়িতে তোকে থাকতে হবে। আমি বড়ই অন্যায় কথা বলে ফেলেছিলাম। কমলা, এত লোকের মধ্যেও আমার মনে যে কি হচ্ছে, তা আর তোকে কি বলব। তোর মত বোনের ভাই বলে আমার প্রাণে বল আসছে কমলা, তা আমি বলতে পারছিনে।" রমেশেব দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ভাই রমেশ, তুমি কাল সকালে একবার আমাদের বাড়িতে যেও, দুজনে গিয়ে তোমাদের ঐ ধারটা কালই শোধ করে দিয়ে আসব। আর তুমি কাল থেকেই অফিসে বেরিও। আর একটা কাজ করনা ভাই; গাড়িতে আমার ব্যাগটা আছে; সহিসকে বল ত যে, ব্যাগটা নিয়ে আসে।"

রমেশ চলিয়া গিয়া একটু পরে নিজেই ব্যাগটা হাতে করিয়া উপরে উঠিয়া আসিল। তাহার হাতে ব্যাগ দেখিয়া মোহিতবাবু বলিলেন, "তুমি আবার ওটা বোয়ে আনলে কেন? সহিসকে তো বললেই হোত।" "তাতে কি' বলিয়া রমেশ মোহিতবাবুর সম্মুখে ব্যাগটা নামাইয়া রাখিল। মোহিতবাবু ব্যাগটা তুলিয়া লইয়া তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন, "ওগো, তুমি আমার সঙ্গে পাশের ঘরে এস ত!"

মোহিতবাবু স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া পাশের ঘরে যাইয়া বলিলেন, "দেখ, আমি যতদূর জানি, বোধ হয় কমলার হাতে টাকা কিছু নেই। আমি তাকে এখন কিছু দিতে পারব না। তুমিও তার হাতে কিছু দিও না। আমি তোমার কাছে পঞ্চাশটি টাকা রেখে যাচ্ছি; তুমি চুপ করে রমেশের স্ত্রীর হাতে দিও; আর তাকে বলে দিও, কমলা যেন এ কথা কিছুতেই এখন না জানতে পারে। আর আমি বাড়িতে গিয়ে সন্ধ্যার পর গাড়ি পাঠিয়ে দেব; তুমি সেই গাড়িতে যেও। কমলাকে বাড়ি নিয়ে যাবার কথা কেউ মুখে এনোনা; আমি বাড়িতে গিয়ে বাবাকে মাকেও সে কথা বলে দেব।" এই বলিয়া মোহিতবাবু ব্যাগ খুলিয়া ৫০্ টাকা তাহার স্ত্রীর হাতে দিলেন। তাহার পর কমলা যে ঘরে ছিল, সেই ঘরে যাইয়া বলিলেন, "কমলা, আমি তাহলে এখন আসি। আমি না গেলে ত মা আসতে পারবেন না। আমি কাল সকালে যদি না পারি,

ত অফিস ফেরত আসবই। তুই মন স্থির কর কমলা! তোকে আমি আর কি বলব বোন!"

কমলা দাদার মুখের দিকে চাহিয়া একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল; মোহিতবাবু মলিনমুখে চলিয়া গেলেন।

৩

বিপদ একাকী আসে না, তাহা সকলেই জানেন; কিন্তু রমেশের জন্য যে এত বিপদ পুঞ্জীভূত হইয়াছিল, এবং একটার পর আর একটা এত শীঘ্র আসিবে, ইহা হয়ত কেহই মনে করেন নাই। রমেশের পিতা গেলেন; তাহার তেরোদিন পরেই কাল ওলাওঠা আসিয়া সংসারের একমাত্র অবলম্বন বড় ভাই যোগেশকে লইয়া গেল। ইহাতে বিপদের শেষ হইল না। যে দিনের কথা আমরা পূর্বে বলিলাম, সেইদিন রাত্রিতে নারায়ণকে কোলের কাছে রাখিয়া কমলা শয়ন করিযা আছে, নারায়ণ ঘুমাইতেছে; কিন্তু কমলার চক্ষে নিদ্রা নাই। সে কত কি ভাবিতেছে। হয়ত বাহিরের অন্ধকারের মত তাহাব হৃদয়ও অন্ধকার হইয়া গিয়াছে, হতভাগিনি বিধবা সেই ঘোর অন্ধকারে পথ পাইতেছে না, সামান্য একটু আলোক রশ্মির জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িতেছে, এমন সময় নারায়ণ 'জ্যাঠামশাই' বলিযা ভয়ানক চিৎকার করিয়া উঠিল। কমলা তখন তাড়াতাড়ি ষাট্ ষাট্ বলিয়া নারায়ণকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, বাবা, নারায়ণ কি হয়েছে বাবা।" নাবায়ণ পুনরায় জ্যাঠামশাই বলিয়া আরও উচ্চ চিৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। "বাবা, বাবা, নারায়ণ, কি হয়েছে বাবা!" বলিয়া কমলা নারায়ণকে কোলে করিয়া উঠিয়া বসিল। ঘরে আলোক নেই, ঘোর অন্ধকার। নারায়ণের কি হইল, বুঝিতে না পারিয়া কমলা তাহাকে কোলে করিয়া ঘরের বাহিরে আসিয়া পুনরায় ডাকিয়া বলিল, "বাবা, নারায়ণ।"

নারায়ণ তখনও কাঁপিতেছিল। তাহার সেই অবস্থা দেখিয়া কমলার ভয় হইল, সে তখন চিৎকার করিয়া ডাকিল, 'ও হারাধন, ও ছোট বৌ, শিগগির উঠে এস।" তাহার সে কণ্ঠস্বর, আর্ত, ভীত চিৎকার যে শুনিল, সেই কাঁপিয়া উঠিল! লক্ষ্মী বলিল, "দিদি, কি হয়েছে? তুমি অমন করছ কেন?" কমলা বলিল, "ওরে শিগ্‌গির একটা আলো নিয়ে আয়। বাবা, বাবা, নারায়ণ, বাবা গো।"

লক্ষ্মী সেইখানেই বসিয়া পড়িল, তাহার আর চলিবার শক্তি রহিল না। রমেশ দৌড়িয়া গিয়া লণ্ঠন লইয়া আসিল। তখন সকলে দেখিল যে, নারায়ণ কাঁপিতেছে, তাহার মুখে কে যেন কালি ঢালিয়া দিয়াছে, তাহার চক্ষুতারকা উর্ধ্বে উঠিয়াছে। "ওগো, আমার কি হোলো গো", বলিয়া কমলা নারায়ণকে কোলে করিয়া বসিয়া পড়িল।

এই গোলমাল শুনিয়া নীচ হইতে বৃদ্ধ ভৃত্য বুদ্ধু উপরে আসিল। তাহাকে দেখিয়া রমেশ বলিল, "বুদ্ধু, দৌড়ে রায় ডাক্তারের কাছে যা। গিয়ে বল্, খোকার কি হয়েছে। এখনই আসতে হবে, একটুও যেন দেরি না হয়। ডাক্তারকে খবর দিয়েই মোহিতবাবুদের বাড়ি যাবি; তাদেরও

এখুনি আসতে বলবি। দেরি করিসনে বুদ্ধু!" বুদ্ধু বলিল, "ভয় নেই মা, মুখমে জল দেও। আমি ডাগ্‌দার আন্‌তে যাচ্ছি।" এই বলিয়া বুদ্ধু চলিয়া গেল।

এই বলিয়া কমলা চক্ষু মুদ্রিত করিল। তাহার পর যাহা হইল, তাহা শুনিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়, হৃদয় স্বতই অবনত হয়—আর সতীর মহিমা, বিধবার প্রার্থনার বল দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। বিধবা কমলার মনে হইল, যোগেশ তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল; তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিল। সেই পবিত্র স্পর্শে কমলার হৃদয় অপূর্ব পুলকে পূর্ণ হইল; তাহার সমস্ত অবসাদ যেন চলিয়া গেল।

তাহার পর যোগেশ বলিল, "কমল, ভয় পাইওনা। এই ঔষধ নাও। নারায়ণকে এই ঔষধ বেঁটে খাইয়ে দেও। তোমার নারায়ণকে দিয়ে গেলাম।" তাহার পরক্ষণেই সব অন্ধকার—সব অন্ধকার!

কমলা সবিস্ময়ে চক্ষু চাহিয়া দেখিল, তাহার যুক্তকরের মধ্যে একখণ্ড শিকড় রহিয়াছে। কমলা চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, "প্রভু তোমার এত দয়া! এত দয়া!" এই বলিয়া সে দৌড়িয়া ঘরের মধ্যে যাইয়া লক্ষ্মীকে বলিল, "লক্ষ্মী দিদি শিগ্‌গির কাপড় ছেড়ে শিল ধুয়ে নিয়ে আয় ত', শিগ্‌গির যা। শিগ্‌গির যা।"

লক্ষ্মী নববস্ত্র পরিয়া শিল লইয়া আসিল। কমলা তখন গঙ্গাজল দিয়া শিকড় বাঁটিয়া অতি কষ্টে নারায়ণের মুখের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিল। ডাক্তার কত নিষেধ করিতে লাগিল। সে কাহারও কথা শুনিল না।

একটু পরেই নারায়ণ নিদ্রোত্থিতের ন্যায় পার্শ্ব পরিবর্তন করিয়া ডাকিল—"জ্যাঠাইমা!"

—ভারতবর্ষ ৪র্থ বর্ষ, ১৩২৩, ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, আষাঢ়।

বিচার

রামনাথ সন্ধ্যার সময় বাড়িতে আসিয়া দেখে অন্যদিনের মত তাহার দাদা হরিনাথ উঠানের পার্শ্বে তুলসীমঞ্চের সম্মুখে বসিয়া গান করিতেছে। দাদার হরিনামগান সে প্রতিদিন শুনিতে পায়; কিন্তু আজ যেন সে গানের মধ্যে একটা অতি করুণ, একটা আর্ত সুর বাজিয়া উঠিতেছে; সে গান যেন আজ তাহার দাদার মর্মস্থল ভেদ করিয়া বাহির হইতেছে বলিয়া রমানাথের বোধ হইল।

অন্যান্য দিন রামনাথ গানের দিকে কর্ণপাত না করিয়া বাড়ির মধ্যে চলিয়া যাইত, আজ সে যাইতে পারিল না; দাদার গান আজ তাহার নিকট আর এক রকম ঠেকিল। রামনাথ দাঁড়াইল। তাহার দাদা গায়িতেছে—

"তোমার প্রেমপাথারে যে সাঁতারে, তার মরণের ভয় কি আছে?
ঘৃণা লজ্জা মান অপমান, সকলি তার দূর হয়েছে।
পাগল নয় সে পাগলপারা, দুনয়নে বহে ধারা,
যেন সুবধনীর ধারা, ধারায় ধারা মিশে গেছে।
না মানে সে কোন ধর্ম, বেদবিধি কোন কর্ম,
তুমি ধর্ম, তুমি কর্ম, তোমার চরণ সার করেছে।"*

গান শুনিযা বামনাথের মনে হইতে লাগিল, তাহার দাদা কাঁদিয়া কাঁদিয়া গানটি করিতেছে। অন্য দিন ত তাহার দাদা গান করে, কিন্তু সে সবদিন ত এমন শোনায় না। বামনাথ আব অধিকক্ষণ দাঁড়াইল না; সে কি ভাবিতে-ভাবিতে বাড়ির মধ্যে চলিযা গেল।

বাড়ির মধ্যে যাইয়া দেখে তাহার ভ্রাতৃবধূর মুখ বিষণ্ণ; তাহার স্ত্রীও মলিনমুখে ঘবেব দাবায বসিযা আছে; তাহার ছেলে ও মেয়েটি জ্যাঠাইমার পার্শ্বে চুপ করিয়া বসিযা বহিযাছে, রামনাথ কিছুই বুঝিতে পারিল না। সে তখন ডাকিল—"ক্ষেন্তি!"

তাহার বয়ঃকনিষ্ঠা বিধবা ভগিনী ছোটদাদার আহ্বান শুনিয়া তাড়াতাড়ি রান্নাঘব হইতে বাহির হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ছোটদা, আমায় ডাক্‌ছিলে?"

রামনাথ বলিল "কি হয়েছে রে। সবাই যে চুপ ক'রে বসে আছে, কারও মুখে যে কথা নেই।"

ক্ষান্তমণি বলিল, "আজ খাজনার জন্য কাছারির সর্দার এসে বড়দাকে বড়ই অপমান, বেইজ্জত করে গেছে।"

রামনাথ চিৎকার কবিয়া বলিল, "বল্‌তে পার্‌বিনে কি! কাছারির সরদার এসে অপমান করে গেল, আর তোরা সে কথাটা মুখ দিয়েও বা'র করতে পারবিনে।"

রামনাথকে উত্তেজিত দেখিয়া বড়বৌ আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, "ঠাকুর-পো, এদিকে এস। ওকে আর কি জিজ্ঞাসা করছ। যা হয়েছে আমিই বল্‌ছি।"

---

* পদটি কাঙাল হরিনাথের রচনা।

রামনাথ পূর্বের মত উচ্চৈঃস্বরেই বলিল, "তাই বল না, একজন বল্লেই হ'ল।"

বড়বৌ বলিলেন, "সে আর বল্‌বার কথা নয় ঠাকুরপো! ভাগ্যি তুমি বাড়ি ছিলে না, নইলে ত একটা খুনোখুনি হয়ে যেত। তুমি বাড়ি থাক্‌লে কি আর রক্ষা ছিল।"

রামনাথ চিৎকার করিয়া বলিল, "আরে, আসল কথাটা কি খুলে বল না ছাই, তারপর 'ভাগ্যি' 'রক্ষে' সব বুঝে নেবো।"

বড়বৌ বলিলেন "ঠাকুর-পো, তুমি একটু স্থির হয়ে বস। এই মাঠ থেকে এলে, একটু জিরোও; কথা ত আর পালিয়ে যাচ্ছে না; যা হবার তা ত হয়েই গেছে। তখন আর সে সব কথা শুনবার জন্য তাড়াতাড়ি কি।"

রামনাথ বলিল, "যাক্, তোমাদের কাছে আর কিছু শুনতে চাইনে। যাই দেখি দাদার কাছে, তিনি কি বলেন।"

বড়বৌ তখন তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া রামনাথের হাত চাপিয়া ধরিলেন, বলিলেন, "ঠাকুর-পো, তোমার হাত ধরে বল্‌ছি, তাঁর কাছে আর যেও না। যা বল্‌তে হয়, আমিই বল্‌ছি। তুমি ত জান, বছরের খাজনা একটা পয়সাও দেওয়া হয় নি। তাই কাছারির সর্দার আজও এসেছিল। আজ সে একেবারে আগুন। সে এসেই বল্‌ল, আজ টাকা না নিয়ে সে উঠ্‌বে না। উনি বল্‌লেন 'টাকা কোথায় পাব সর্দারের পো! অবস্থা ত দেখতে পাচ্ছো; একসের পাটও বিক্রয় হোলো না। ছেলেপুলে নিয়ে কি করে সংসাব চল্‌বে, তাই ভেবে পাচ্ছি না।' এই কথা শুনে সর্দার আরও রেগে উঠ্‌লো; বল্‌ল 'সে সব আমি জানিনে; নায়েব মশাই বলেছেন, যেমন করে হোক আজ খাজনার টাকা আদায় করতেই হবে।' উনি বল্‌লেন 'কি করে হবে সর্দাব! দিতে পারলে কি তোমায় এত হাঁটতে হয়, না আমি এত কথা শুনি।' তখন সর্দার যে কথা বল্‌ল ক্ষান্তর নাম ক'রে—তা ঠাকুরপো, তোমার কাছে আমি বল্‌তে পারব না, তোমার শুনেও কাজ নেই। তোমার দাদা সেই কথা শুনে একেবারে যেন মরে গেলেন; শুধু একবার বল্‌লেন, 'হরি হে।' তার পরেই চুপ কবে গেলেন; আর কোন কথা বল্‌লেন না। সর্দার তখন বলে গেল যে, কা'ল সে আমাদের বেইজ্জত ক'রে তবে ছাড়বে।"

রামনাথ এতক্ষণও সহিয়াছিল; যখন শুনিল সর্দার ক্ষান্তর কুৎসা করেছে, আবার কাল এসে মেয়েদের বেইজ্জত করবার ভয় দেখিয়ে গেছে, তখন সে আর স্থির থাকিতে পারিল না; চিৎকার করিয়া বলিল, "সে বেটা এত বড় কথা বলে যেতে পারল, আর তোমরা তাই দাঁড়িযে শুন্‌লে, দাদা একটা কথাও বল্‌লে না। কি বল্‌ব বড়বৌ, আমি তখন বাড়ি ছিলাম না, নইলে সে পাজিটা প্রাণ নিয়ে কেমন করে যায়, দেখে নিতাম। এখনই কি তাকে ছাড়ব; আজ রাত্রিতেই আমি তাকে দেখে নেব—সে কেমন ছলিম সর্দার, তার লাঠির কেমন বহর। অপমান, বেইজ্জত—রমানাথ বেঁচে থাক্‌তেই! দেখি শালার ঘাড়ে কটা মাথা।" এই বলিয়াই রামনাথ একলম্ফে দক্ষিণদ্বারী ঘরের দাওয়ায় উঠিল। দাওয়ার উপরেই বেড়ায় হেলান দেওয়া তিনচারিখানি পাকা বাঁশের লাঠি ছিল; রমানাথ তাহার একখানি লইয়া আর এক লম্ফে উঠানে যাইয়া দাঁড়াইল।

বড়বৌ দেখিলেন, রামনাথ এখনই কাছারিতে একটা বিষম ব্যাপার বাধাইয়া তুলিবে। তিনি তখন দৌড়াইয়া গিয়া রামনাথকে চাপিয়া ধরিলেন, বলিলেন, 'ঠাকুরপো,' আগে আমাকে

খুন কর, তাপর যা হয় করবে, আমার কথা শোন ভাই! আমি তোমার মায়ের মত, ছেলের মত তোমাকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছি, আমার ছেলে পিলে নাই, তুমিই আমার ছেলে। আমার কথা রাখ, রাগের মাথায় কোন কাজ করো না ভাই। তোমার হাতে ধরে বলছি, আমার কথা রাখ।"

রামনাথ কি সে কথা শোনে, সে বড়বৌয়ের হাত ছাড়াইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল, চিৎকার করিয়া বলিল, "আজ আমি কারও কথা শুন্‌ব না; আজ তারই একদিন কি আমারই এক দিন। এত বড় সাহস তার! সে বাড়ির মেয়েদের বেইজ্জত করতে চায়!"

বাড়ির মধ্যে এই গোলযোগ, এই চিৎকার হরিনাথের কর্ণে পৌছিল; সে আর ভগবানকে ডাকিতে পারিল না। তুলসী মঞ্চে প্রণাম করিয়া একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগপূর্বক হরিনাথ গাত্রোত্থান করিল এবং ধীরপদবিক্ষেপে বাড়ির মধ্যে আসিয়া বলিল, "কি হয়েছে রামনাথ?"

রামনাথের তখন জ্ঞান ছিল না। যে দাদাকে সে দেবতার মত ভক্তি করিত, যে দাদাব সম্মুখে সে মাথা তুলিয়া কথা বলিতে পারিত না, বড় রাগের সময়ও সে দাদা আসিয়া 'রামনাথ' বলিয়া ডাকিলেই সে স্থির হইয়া দাঁড়াইত, সেই ভ্রাতৃভক্ত রামনাথ আজ আর মাথা ঠিক রাখিতে পারিল না, চিৎকার করিয়া বলিল, "আর কি হবে? তোমার সম্মুখে মেয়েদের অপমান কবে গেল, তোমাকে অপমান করে গেল, তুমি একটা কথাও বললে না; বেটাব মাথাটা ঘাড় থেকে ছিঁড়ে ফেল্‌তে পারলে না। আর কি হবে?"

হরিনাথ বুঝিল। রামনাথ রাগে একেবাবে জ্ঞানশূন্য হইয়াছে। সে তখন ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া রামনাথের হাত চাপিয়া ধরিল, বলিল "ভাই, দণ্ডের কর্তা কি তুমি, আমি; আর কি কেউ নাই ভাই!"

"না, আর কেউ নেই! গরিব বলে কি আমাদের মান ইজ্জত নেই, সে বেটা কেমন সর্দার, আজ তা আমি দেখে নেব! এত বড় সাহস তার! আমার বোনকে, আমার দাদাকে অপমান, এখনও আমি বেঁচে আছি!"

হরিনাথ বলিল, "স্থির হও, রাম! আমার কথা শোন। কে কাঁর অপমান করে ভাই! মান অপমান মিছে কথা— মিছে কথা ভাই,—মিছে কথা! মান অপমান নিজের কাছে। আজ তুমি রাগের মাথায় যা করতে চাচ্চো, তাতেই অপমান। গরিবকে অনেক সইতে হয়। তুমি স্থির হও, তোমার দাদাকে কেউ মানও দিতে পারে না, কেউ অপমানও করতে পারে না। তোমাব ভুল ভাই, তোমার ভুল। আমার সঙ্গে বাইরে এস। এতকাল তোমাকে যা শিখালাম, সে সবই কি আজ ধুয়ে মুছে ফেল্‌বে। না, না, তুমি পাগল হয়ো না ভাই! আমার সঙ্গে এস; চল, মান অপমানের যিনি কর্তা, তাঁর কাছে তোমাকে নিয়ে যাই।"

ভিতরে যখন এই সকল কথা হইতেছিল, সেই সময় একটি ভদ্রলোক বাহিরে দাঁড়াইয়া কথাগুলি শুনিতেছিলেন। ভদ্রলোকটি সন্ধ্যার সময় বেড়াইয়া ঐ পথে বাড়ি যাইতেছিলেন। হরিনাথের বাড়িতে গোলমাল হইতেছে শুনিয়া তিনি ধীরে ধীরে বাহিরের উঠানে আসিযা দাঁড়াইয়াছিলেন এবং রামনাথ চিৎকার করিয়া যাহা যাহা বলিতেছিল, সে সমস্তই তিনি শুনিতে পাইতেছিলেন। শেষে হরিনাথ যখন বলিল, 'চল, মান অপমানের যিনি কর্তা, তাঁর কাছে তোমাকে নিয়ে যাই', তখন ভদ্রলোক ডাকিলেন, "হরিনাথ!"

মূর্তি—এ চণ্ডী মূর্তি ত তিনি কখন দেখেন নাই। তাই তিনি মনে করিয়া ছিলেন, কমলা ছলিমকে ডাকিয়া ভর্ৎসনা করিবেন, এবং হরিনাথ, রামনাথের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বলিবেন। ছলিম যে অনেকদিনের বিশ্বাসী ভৃত্য।

মুখোপাধ্যায় মহাশয় অতি সঙ্কোচের সহিত বলিলেন, "মা, ছলিম যে অনেককালের চাকর।"

কমলা তেমনই দৃঢ়ভাবে বলিলেন, "অনেক দিনের চাকর ব'লে কি এমন অপরাধেও তাকে ক্ষমা করতে হবে। ছলিম কেন, আমার এই খোকা, যদি এমন কথা বল্‌ত, তা হলে আমি তার মুখ ভেঙ্গে দিতাম—মেয়ের অপমান!"

মুখোপাধ্যায় মহাশয় আর কথা বলিলেন না। হরিনাথ এতক্ষণ কিছু বলে নাই; এখন সে হাতজোড় করিয়া বলিল, "মা, আমার একটা কথা শুন্‌বেন কি? ছলিম আমাদেরই অপমান করেছে; তার বিচারের ভারটা আমাদের উপর দিলে কি ভাল হয়না?"

কমলা হরিনাথের সেই ধীর গম্ভীর কথা শুনিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিলেন; দেখিলেন তাঁহার সম্মুখে এক সৌম্যমূর্তি ধীর শান্ত ব্যক্তি দণ্ডায়মান। তাহার মুখের দিকে চাহিয়াই কমলার হৃদয়ে কি যেন এক অপূর্ব ভাবের সঞ্চার হইল; তাঁহার সে চণ্ডিকামূর্তি যে কোথায় আত্মগোপন করিবে, তাহার পথ খুঁজিয়া পাইল না। কমলা তখন অতি কোমল স্বরে বলিলেন, "বেশ, তাই হোক।"

তখন মুখোপাধ্যায় মহাশয় ছলিমকে ডাকিবার জন্য একজন লোক পাঠাইয়া দিলেন। ছলিম সর্দার ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে আসিয়া করজোড়ে দণ্ডায়মান হইল।

তাহাকে দেখিয়াই কমলা কি বলিতে যাইতেছিলেন; তাঁহাকে বাধা দিয়া হরিনাথ বলিল, "রাধারানি, হুকুম হয় ত সর্দারের সঙ্গে এই দাসই কথা বলে।" কমলা আর কথা বলিবার অবকাশ পাইলেন না। হরিনাথ তখন অতি ধীরস্বরে বলিল, "সর্দারের পো, ভাই অমন ক'রে কি কথা বলতে আছে? যে মুখে হরিনাম করতে হবে, আল্লার নাম করতে হবে ব'লে এত দুর্লভ মানবজন্ম পেয়েছি, সে মুখ দিয়ে কি কুচ্ছ কথা বার করতে হয় ভাই! তুমি মুসলমান হলেও আমার দয়াল হরির দাস; আমিও তাঁরই দাস বলেই ত মনে ভাবি। তুমি যে আমার হরির সম্পর্কে ভাই হও। ভাই হয়ে কি বোনের কথা অমন করে বল্‌তে হয়? আর অমন কথা বলে হরিমন্দির অপবিত্র করো না। এস তোমাকে ভাই বলে, হরিদাস বলে বুকে নিই।" এই বলিয়া হরিনাথ ছলিম সর্দারকে আলিঙ্গন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, "হরি হরিবোল" হরি হরিবোল।" হরিনাথ তখন দেশ-কাল পাত্র ভুলিয়া গেল, সম্মুখে যে মুখোপাধ্যায় মহাশয় ও কমলা রহিয়াছেন, তাহা ভুলিয়া গেল, সেটি যে জমিদার-বাড়ির অন্দরমহল, তাহাও ভুলিয়া গেল। সে তখন মধুর কণ্ঠে গান ধরিল—

যাদের হরি বল্‌তে নয়ন ঝুরে,
ওরে, তারা দুভাই এসেছে রে।
যারা মার খেয়েও হরি বলে
এসেছে রে।*

---

* পদটিও কাঙাল হরিনাথের রচনা।

অপমান

(অরুণকুমারের কথা)

আমার নাম শ্রীঅরুণকুমার মিত্র। পিতার নাম জিজ্ঞাসা করিতেছ? তাহা আমি বলিব না,—ঘরজামাইয়ের পিতৃপরিচয় দিতে নাই। শ্বশুরের নাম?—সে নাম আমি এ জীবনে আর উচ্চারণ করিব না—সে বংশের নাম-ধাম বলিব না; গুণের কথা যাহা বলিব, তাহা শুনিয়াই সেই ভদ্র-আখ্যাধারী ধনবান্ ঘোষপুঙ্গবের না শুনিতে আর কাহারও ইচ্ছা হইবে না।

আমার শ্বশুর খুব বড়লোক,—ধনে বড়, মানে বড়, জমিদারিতে বড়, সরকারের কাছে সম্মানে বড়;—আর ছোট যে কত, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না;—হৃদয় অতি ক্ষুদ্র,—ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র; অহঙ্কার-—তার আব বিশেষণ নাই—বিশেষণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

গুরুনিন্দা করিতেছি? হাঁ, গুরুব কথা বলিতেছি, পরিচয় দিতেছি,—নিন্দা করিতেছি না। তিনি আমার উপকার করিয়াছেন? তাহা অস্বীকার করিব কেমন করিয়া! কিন্তু যতটুকু উপকার করিয়াছেন, জীবন দিলে যদি সে ঋণমুক্ত হইতে পারা যায়, তাহা হইলে এখনই সে গুরুভার হইতে মুক্তিলাভ করিযা, 'আমি তোমার কোন ধার ধারি না' বলিয়া অন্তিম-নিশ্বাস ত্যাগ করিতে পারিলে সৌভাগ্য মনে করিতাম।

তোমরা আমার কথা কয়টি শোন। শরীর বড় দুর্বল—রোগে জীর্ণ; মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়া বড় দুঃখে, বড় কষ্টে কথা কয়টি বলিতেছি।

আমি গরিবের ছেলে। বাবা অতিকষ্টে আমার লেখা পড়ার ব্যয় চালাইয়াছিলেন। গ্রামেই একটি ইংরেজি স্কুল ছিল; তাই আমি প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে পারিয়াছিলাম। এইস্থানেই পড়া শেষ করিতে হইবে, তাহা আমি জানিতাম। কিন্তু অদৃষ্ট আমাকে অন্য পথে লইয়া যাইবাব জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। পল্লির স্কুল হইতে প্রথম-বিভাগে পাশ করিয়া আমি পনেরোটাকা বৃত্তি পাইলাম। তখন কি আর পড়া ছাড়া যায়? বাবা বলিলেন, "পনেরোটাকা জলপানি যখন পেয়েছ, তখন আর কি? মাসে মাসে আমি যেমন ক'রে হোক আর পাঁচটা টাকা গুছিয়ে দিতে পারব। তুমি পড়।" পিতৃ-আজ্ঞা, আমি হুগলীতে পড়িতে গেলাম।

আমি যখন দ্বিতীয়-বার্ষিক শ্রেণিতে পড়ি, সেই সময় বাবা মারা গেলেন। সংসাবে তখন মা ব্যতীত আমার আর কেহই রহিল না। বাবা জমিদারের সেরেস্তায় সামান্য চাকরি করিতেন; কোনদিন অন্যায় উপায়ে একটি পয়সাও উপার্জন করেন নাই; জমিজমা অতি সামান্য ছিল। তাহারই আয়ে ও বাবার সামান্য বেতনে কোনরকমে দিন চলিয়া যাইত।

বাবার মৃত্যুর পর সংসার আমার স্কন্ধে পড়িল। একবার মনে করিলাম, পড়া ত্যাগ করি; আবার মনে হইল পনেরোটাকার ত সংস্থান আছে; এল. এ. পরীক্ষাটা দিই, তাহার পর আর পড়িব না। তখন একটা চাকবি লইয়া মায়ের ভরণ-পোষণ করিব। মা বলিলেন, "পড়া কি ছাড়তে আছে। তোমার খরচটা যদি তুমি চালিয়ে নিতে পার, তা হ'লেই হোলো। যে জমিটুকু

আছে, তাতে একটা বিধবার একসন্ধ্যার দুটো আলোচা'ল, একটা কাঁচাকলা, আর একটু লবণ হয়ে যাবে। আমার জন্য ভেব না বাবা! তুমি মন দিয়ে পড়।" তাহাই করিলাম, আর একবৎসর পরে এল. এ পরীক্ষা দিলাম, প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইলাম, কিন্তু বৃত্তি পাইলাম না।

তখনও যদি পড়া ছাড়িয়া দিই, তবে কি আর এত কষ্ট, এত অপমান ভোগ করিতে হয়? কিন্তু তখন আরও পাশ করিবার ঝোঁক হইল। মনে হইল, আমি কোনপ্রকার সাহায্য পাইলে অনায়াসে এম. এ পাশ করিতে পারি, আইন-পরীক্ষা দিয়া উকিল হইতে পারি। তখন আমি ভবিষ্যতের উজ্জ্বল চিত্র আমার সম্মুখে দেখিতে পাইলাম; পরীক্ষা পাশ করিয়া বড়লোক হইব, অনেক উপার্জন করিব, দশজনে মানিবে চিনিবে; এই উচ্চাভিলাষ আমাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিল। যেমন করিয়া হউক, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চউপাধি লাভ করিতেই হইবে— যেমন করিয়াই হউক! মাতাঠাকুরানিও আমার এই সঙ্কল্পের পোষকতা করিলেন। "চার পাঁচটা বৎসর বাবা, আমি যেমন করিয়া পারি কাটাব, তুমি তোমার পড়ার একটা উপায় কর।"

উপায় উপস্থিত হইল—অতি সহজ উপায়। এক জমিদার তাঁহার একমাত্র কন্যার বিবাহের জন্য বর খুঁজিতেছিলেন। আমারই মত গরিবের ছেলে তিনি চান; নিজের ব্যয়ে তাহাকে লেখাপড়া শিখাইয়া লইবেন। তাহার পর তাঁহার বিস্তৃত জমিদারি, অগাধ টাকা, জামাই-মেয়েকেই দিয়া যাইবেন। আমি বড় কুলীনের ছেলে, প্রথম বিভাগে এল. এ পাশ করিয়াছি; কলেজের অধ্যাপকেরা বলিয়াছেন, আমি খুব ধারালো ছেলে; দেখতে দেখ্‌তে বিশেষ সম্মানের সহিত এম. এ পাশ করিতে পারিব; আমার স্বভাব-চরিত্রও ভাল। জমিদার মহাশয় যাহা যাহা খুঁজিতেছিলেন, তাহা নাকি তিনি একাধারে পাইলেন। এদিকে আমিও দেখিলাম, আমার উচ্চ আশা ফলবতী হইবার আর কোন বিঘ্নই নাই। ঘরজামাই হইতে হইবে? না, তেমন কথা ত কিছু তখন হয় নাই। সকল দিক কি আর সে সময় ভাবিবার অবকাশ ছিল? লেখাপড়া শিখিবার সুযোগ উপস্থিত; আর কোন দিক ভাবিলাম না। মাতাঠাকুরানি সেকেলে মানুষ; তিনিও অত-শত বুঝিলেন না, সম্মতি দিলেন। আমি জমিদার মহাশয়েব রূপবতী বিদুষী যোড়শী কন্যাকে বিবাহ করিয়া একরাত্রির মধ্যেই গরিব-বিধবার সন্তান হইতে একেবারে বড়মানুষ জমিদারের "জামাইবাবু" হইয়া পড়িলাম। তখন কি ভাবিয়াছিলাম যে, জমিদারের কাছে দাসখত লিখিয়া দিয়াছি। হায়, অপদার্থ যুবক, হায় কাণ্ডজ্ঞানহীন, আত্মসম্মানবর্জিত বাঙালির সন্তান।

আমার শ্বশুর যখন আমাকে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াইবার ব্যবস্থা করিলেন, তখন আমি উল্লাসে অধীর হইলাম।। বিবাহের পরে যে জমিদার মহাশয় তাঁহার কন্যাকে আমার ক্ষুদ্র কুটিরে পাঠাইলেন না, লোকজন পাঠাইয়া আমাকে মাতাঠাকুরানিকে কয়েকদিনের জন্য তাঁহার বাড়িতে লইয়া আসিয়া পুত্রবধূর মুখদর্শনের আশা মিটাইয়া দিলেন, তাহাতেও আমার আত্মসম্মানে আঘাত লাগিল না। তাহার পর পুত্রবিক্রয়ের বিনিময়ে আমার শ্বশুর যখন আমার মাতাকে মাসে মাসে পনেরোটি করিয়া টাকা দিতে লাগিলেন, তখন সে

টাকা হাত পাতিয়া লইতেও আমার মনে একটু সঙ্কোচ বা ঘৃণা হইল না। হায় এম. এ. পাশ,—হায় মান-যশের নেশা!

আমি কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়িতে আরম্ভ করিলাম, বড় ছুটির সময় শ্বশুরবাড়িতেই যাইতে হয়, নতুবা তাঁহারা রাগ করেন; বলেন "গরিব লোকের বাড়িতে ঘনঘন যাওয়া-আসা করলে মন ও চালচলন বড় ছোট হয়ে যায়।" কথাগুলি শুনিয়া মনে বড় ব্যথা লাগিত; কিন্তু ঐ যে নেশা—বড় হইবার আকাঙ্ক্ষা! হৃদয়ের বেদনা ঝাড়িয়া ফেলিতাম। কি অপদার্থই তখন হইয়া গিয়াছিলাম!

শ্বশুর-শাশুড়িকে লুকাইয়া এক এক শনিবার বাড়িতে যাইতাম, আবার রবিবারেই চোরের মত চলিয়া আসিতাম। হস্টেলের কেহ জিজ্ঞাসা কবিলে কখন বলিতাম কালীঘাটে এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়াছিলাম. কখন বলিতাম শ্বশুরবাড়ি গিয়াছিলাম। মায়ের যে আমি একমাত্র সন্তান—বিধবার যে আমা বই আর কেহ নাই!

এক বৎসর পরেই আমার একটি ছেলে হইল। তখনও আমি বি. এ. পাশ করি নাই। পৌত্রের মুখ দেখিবার জন্য মা বড়ই ব্যাকুল হইলেন। শাশুড়িকে বলিলাম; তিনি বলিলেন, "তোমাদের বাড়িতে ত আমি খোকাকে কিছুতেই পাঠাতে পারব না। কর্তাকেও সে কথা বল্‌তে পারব না। তোমার মা এসে দেখে গেলেই পারেন। তাঁকে ত আর আমরা আসতে বারণ করি না; দুটো খেতে দিতেও কাতর নই। এত লোক বাড়িতে খাচ্ছে, তোমার মায়ের কি আর দুটো ভাত আমরা দিতে পারি না।" কথা শুনিয়া আমি পৃথিবী অন্ধকার দেখিলাম। অনেক সহ্য করিয়াছি, অনেক অপমান গায়ে মাখি নাই; কিন্তু এ অপমান একেবারে অসহ্য বোধ হইল! আমার দুঃখিনী মা কি দুটো ভাতের জন্য এ বাড়িতে আসিবেন! বড়মানুষের গৃহিণীর কি নীচ হৃদয়! আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম। আমার কান্না দেখিয়া শাশুড়ি, সেই জমিদার-গৃহিণী একটু তীব্রস্বরে বলিলেন "এমন কি কথা বলেছি যে, তোমার কান্না পেল। ওসব বাছা, ভাল লাগে না।' এই বলিয়া তিনি কার্যান্তবে চলিয়া গেলেন। সৌভাগ্যের কথা যে, তখন সে ঘরে আর কেহ ছিল না। আমি চক্ষের জল মুছিয়া বাহিরে চলিয়া গেলাম, কাহাকেও কিছু বলিলাম না—আমার স্ত্রীকেও না। এতদিন এত কথা শুনিয়াছি, কিন্তু কোনদিন আমার স্ত্রীকে কোন কথা বলি নাই; মনে হইত, বড় মানুষের মেয়ে যদি তাহার মায়ের মত আমাকে দশকথা শুনাইয়া দেয়, তাহা হইলে যে আমার যন্ত্রণা একেবারে অসহনীয় হইবে। সেদিন বাহিরে বসিয়া অনেকক্ষণ ভাবিলাম। একবার মনে হইল, আর ইহাদের আনুগত্য করিব না। একটা ছেলে পড়াইলে কি আমার খরচ চলিবে না? কিন্তু তখনই মনে হইল, পরীক্ষা নিকটবর্তী। এখন 'টুইসনিই' বা কোথায় পাইব, আর পাইলেও সময় নষ্ট করা ঠিক হইবে না। এত অপমান যদি এতদিন সহ্য করিয়াছি, আরও কয়টা দিন সহ্য করি। কত কথা যে তখন ভাবিয়াছিলাম, তাহা এখন মনে নাই। শেষে এ অপমানও সহ্য করাই স্থির করিলাম—এমনই অপদার্থ হইয়া গিয়াছিলাম!

কলিকাতায় যাইয়া পরের শনিবারেই বাড়ি গেলাম। মা আমার ছেলে দেখিবার জন্য জিদ করিতে লাগিলেন। আমি ঐ একই কথা বলি "তোমার গিয়ে কাজ নেই।" অবশেষে মা

বলিলেন "অরুণ, আমি তোমার কথা কি বুঝি নাই। তা বাবা, আমি গরিব মানুষ; অপমানে আমার কি হবে? গরিবের আবার মান-অপমান কি? আমি কত অপমান সহ্য করেছি; তা কি তোমায় একদিনও বলেছি। কি করব বাবা, ভগবান যদি দিন দেন, তখন সব ভুলে যাব। আমি একবার খোকার মুখখানি দেখে আস্‌তে চাই।" আমি বলিলাম "না মা, কাজ নেই সেখানে গিয়ে। খোকা একটু বড় হ'লে তাকে বাড়ি নিয়ে আস্‌ব।" মা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন "বুঝলাম বাবা, ভগবান আমার অদৃষ্টে সে সুখ লেখেন নাই। যাক্‌, খোকা বেঁচে থাক, এই আশীর্বাদ করি।" মায়ের দীর্ঘনিঃশ্বাসে আমার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল; কিন্তু কাপুরুষ আমি, মায়ের এই গভীর হৃদয়বেদনা দূর করিবার কোন পথই তখন খুজিয়া পাইলাম না।

ছয়মাস চলিয়া গেল। আমার ছেলের—না, না, জমিদার মহাশয়ের একমাত্র দৌহিত্রের অন্নপ্রাশনের সময় উপস্থিত হইল। বাছিয়া বাছিয়া কবে দিন স্থির হইল জানেন। আমার বি, এ পরীক্ষার দ্বিতীয় দিনে। শুনিলাম পাঁজিতে সেই একদিনই অতি শুভদিন, তাহার পূর্বে আর ভাল দিন নাই, পরে চারিমাস অকাল। সুতরাং আমার উপস্থিতির জন্য দিন পরিবর্তন করা কোন প্রকারেই হইতে পারে না। কথাটা সত্যই ত ! এ ত আর দরিদ্র অরুণকুমার মিত্রের পুত্রের অন্নপ্রাশন নহে—এ যে বড় জমিদারের দৌহিত্রের অন্নপ্রাশন; তাহাতে পুত্রের দরিদ্র, ঘরজামাই পিতার উপস্থিত থাকার এমন কি প্রয়োজন আছে?

এ উপলক্ষে তাঁহারা আমার মাতাঠাকুরানিকে স্মরণ করিয়াছিলেন। বাড়ির একজন কর্মচারীকে আমাদের বাড়িতে পাঠাইয়াছিলেন। মাতাঠাকুরানির যাইতে সম্মত হন নাই; কর্মচারীর মুখে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন "আমি এখান হইতেই খোকাকে আশীর্বাদ করিতেছি।" বড় দুঃখেই মা এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন নাই। এমন মায়ের পেটে এমন ছেলে কেমন করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তোমরা কেহ বলিতে পার?

যথাসময়ে মহা-আড়ম্বরে জমিদার-দৌহিত্রের অন্নপ্রাশন হইয়া গেল। পরীক্ষা যে দিন শেষ হইবে, সেইদিনই শ্বশুর বাড়ি যাইবার জন্য আমার উপর আদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল। কিন্তু তাহা হইল না। যেদিন পরীক্ষা শেষ হইল, সেইদিনই সংবাদ পাইলাম, মা ভয়ানক জ্বরে শয্যাগত হইয়াছেন। তখন আর বিলম্ব না করিয়া বাড়ি চলিয়া গেলাম।

বাড়িতে যাইয়া দেখি, মায়ের অবস্থা ভাল নহে। যেদিন খোকার অন্নপ্রাশন, সেইদিন মা সমস্ত দিন কাঁদিয়াছিলেন। তাহার পর সেই রাত্রিতেই তাঁহার জ্বর হয়। সেই জ্বর ক্রমে বাড়িতে থাকে। পাছে আমার পরীক্ষার প্রতিবন্ধক হয়, এইজন্য মায়ের আদেশেই প্রতিবেশীরা আমাকে পূর্বে সংবাদ দেন নাই।

বাড়িতে পৌছিয়া ডাক্তারের মুখে শুনিলাম, মায়ের অবস্থা ভাল নহে, এ যাত্রা রক্ষা পাইবার সম্ভাবনা নাই, বিশেষ তাঁহাকে কিছুতেই কেহ ঔষধ সেবন করাইতে পারিতেছেন না। আমিও কত চেষ্টা করিলাম; কিন্তু তাঁর সেই একই কথা "আমার যাবার সময় হয়েছে, আর কেন?"

সেইদিন অপরাহ্নকালে মা আমাকে বলিলেন "বাবা অরুণ, একটা সাধ আমার পূর্ণ হল না। খোকার মুখখানি একবার দেখ্‌তে পেলে আমি আনন্দে মরতে পারতাম।"

আমি বলিলাম, "মা তুমি ভেব না; আমি খোকাদের আন্‌বার ব্যবস্থা করছি।" এই বলিয়া বাহিরে আসিয়া প্রতিবেশীদিগের সহিত পরামর্শ করিলাম। কেহ বলিলেন লোক পাঠাইয়া দেওয়া হউক; কেহ বলিলেন পাল্‌কি-বেহারাও পাঠিয়ে দেওয়া হউক; আমাদের স্কুলের বৃদ্ধ হেডমাস্টার মহাশয় বলিলেন, "না, না, তাতে হবে না; অরুণ, তুমি নিজে না গেলে তারা কিছুতেই ছেড়ে দেবে না। তুমি গেলেই বা কতদূর কি হয়, তাতেও সন্দেহ। তবুও আমার মতে তোমারই যাওয়া উচিত। তোমার মায়ের যে রকম অবস্থা দেখ্‌ছি, তাতে দুই-একদিন কোন ভয় নেই। তুমি এক কাজ কর, এখনই একখানা গাড়ি যাওয়া-আসার ভাড়া করে তোমার শ্বশুরবাড়ি যাও। সাতক্রোশ পথ বই তো নয়; এখন রওনা হ'লে রাত্রি আটটার মধ্যে পৌছতে পারবে। তারপর তাদের নিয়ে যদি খুব ভোরে যাত্রা কর, তা হ'লে কা'ল বেলা আটটা-নটার মধ্যে বাড়ি এসে পড়তে পারবে। তাই কর, এখনই ব্যবস্থা কর।" হেডমাস্টার মহাশয় আমার গুরু; তাঁহারই পরামর্শমত কাজ করাই স্থির হইল। আমাদের গ্রামে তিনখানি ভাড়াটিয়া ঘোড়ারগাড়ি আছে; সৌভাগ্যক্রমে তাহার একখানি তখনই পাওয়া গেল। প্রতিবেশীরা পূর্বের মত সেদিনের জন্যও মাতাঠাকুরানির সেবার ভার লইলেন, ডাক্তার বাবুও রাত্রিতে আমাদের বাড়িতে থাকিতে সম্মত হইলেন। আমি স্ত্রী-পুত্র আনিবার জন্য যাত্রা করিলাম।

আমি নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে চলিলাম, কি জানি কেন, কেবলই মনে হইতে ছিল, যাওয়া বৃথা; তাঁহারা আমার স্ত্রীকে আসিতে দিবেন না; হয় ত আমাকে অনেক কথা শুনিতে হইবে। একবার মনে হইল বাড়ি ফিরিয়া যাই। কিন্তু তখনই মৃত্যুশয্যাশায়িনী মাতাঠাকুরানির কথা মনে হইল। এমন হতভাগ্য সন্তান আমি যে, মায়ের কোন বাসনাই পূর্ণ করিতে পারি নাই; তাঁহার এই অন্তিম ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য কি একবার চেষ্টাও করিব না? তার জন্য অপমানের ভয় করা কি কর্তব্য? না—যাইতেই হইবে!

রাত্রি প্রায় আটটার সময় আমি শ্বশুরগৃহে পৌছিলাম। এমন অসময়ে আমাকে দেখিয়া সকলেই আশ্চর্যবোধ করিলেন। আমার শ্বশুরমহাশয় অনুযোগ করিয়া বলিলেন "একটা খবরও কি পাঠাতে নেই; স্টেশনে গাড়ি পাঠিয়ে দিতাম। কি করে এলে?" আমি বলিলাম "আমি কলিকাতা থেকে আস্‌ছিনে। মায়ের ব্যায়রামের খবর পেয়ে আজ সকালে বাড়ি পৌছে দেখি মায়ের জীবনের আর আশা নেই; তাই—

আমার কথায় বাধা দিয়া আমার শ্বশুরমহাশয় বলিলেন, "তাঁকে কি নিয়ে এসেছ?"

আমি বলিলাম, "না, নিয়ে আসি নাই; তাঁর সে অবস্থা নেই। তাঁর বড় ইচ্ছা যে, মরবার পূর্বে একবার খোকাকে দেখেন। তাই—"

আবার আমার কথায় বাধা দিয়া নিতান্ত রহস্যপূর্ণ তাচ্ছিল্যের স্বরে তিনি বলিলেন, "তাই বুঝি লোকলস্কর নিয়ে খোকাদের নিতে এসেছ?"

আমি একটু উত্তেজিত হইয়াছিলাম; কিন্তু বহু চেষ্টায় সে উত্তেজনা সংবরণ করিয়া বলিলাম "আজ্ঞা হাঁ।"

জমিদার মহাশয় বলিলেন "তোমার কি কাণ্ডজ্ঞান নেই! আমার মেয়ে তোমার বাড়িতে

যাবে! আস্পর্দ্ধা ত কম নয়। যাও, যাও, ছেলেমানুষি কোরো না। এসেছ, বেশ; বল ত তোমার মাকে এখানে নিয়ে আস্‌বার ব্যবস্থা করি। যত সব গেরো!"

আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না, তীব্রস্বরে বলিলাম "আমি ভেবেচিন্তে কথা বল্‌বেন, আমার স্ত্রী, আমার ছেলেকে আমি বাড়ি নিয়ে যাব, কেউ আমাকে বাধা দিতে পারবে না।"

আমার শ্বশুরমহাশয় বলিলেন "সত্যি না কি, ভারি ত মরদ হয়েছ দেখ্‌ছি। এত তেজ কবে হোলো?"

আমিও তখন বলিলাম, "আমি আপনার চাকর নই, সাবধানে কথা বল্‌বেন। আমার স্ত্রীকে আমি বাড়ি নিয়েই যাবো। বলুন, এখনই পাঠিয়ে দেবেন কি না?"

জমিদার মহাশয় গর্জ্জিয়া উঠিলেন "না, পাঠিয়ে দেব না। বেশি বাড়াবাড়ি কোরো না, এখনই কান ধরে বাড়ির বার করে দেব।"

"কি, কান ধরে—" রাগে আমার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না; আমি তখন দৌড়াইয়া অন্দরের দিকে যাইবার চেষ্টা করিলাম।

জমিদার মহাশয় বলিলেন "খবরদার, ওদিকে যেও না; অপমান হবে বল্‌ছি!"

আমি তখন রাগে অধীর হইয়াছিলাম; আমার তখন কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান ছিল না। আমি বলিলাম—"কে অপমান করবে, আসুক না।"

এই কথা শুনিয়া তিনি স্বয়ং আসিয়া আমার ঘাড় চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন "রাস্কেল, যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা।" এই বলিয়া তিনি আমাকে টানিয়া লইয়া চলিলেন। আমার তখন চিৎকার করিবার শক্তিও অপহৃত হইয়াছিল।

আমাকে বাড়ির বাহির করিয়া দিয়া তিনি সদরদ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন। আমি সেই দ্বারপ্রান্তে বসিয়া পড়িলাম। তখন আমার যে কি হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না।

একটু পরেই আবার সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। আমি দরিদ্র, আমি অসহায়, আমি নিরাশ্রয়! আর উপায় কি? মাথায় হাত দিয়া কিছুক্ষণ সেই দ্বারপ্রান্তে বসিয়া থাকিলাম। তাহার পর ধীরে ধীরে একটু আসিয়াই আমার গাড়ি পাইলাম। গাড়িতে উঠিয়া গাড়োয়ানকে তখনই বাড়ি যাইতে বলিলাম। তাহার পর যে কি হইল, তাহা আর আমার মনে নাই।

আমার যখন চৈতন্যোদয় হইল, তখন চাহিয়া দেখিলাম, আমি আমার সেই ক্ষুদ্র কুটিরে মলিন-শয্যায় পড়িয়া আছি। আর দেখিলাম—কি দেখিলাম—দেখিলাম আমার পার্শ্বে খোকাকে কোলে করিয়া আমার স্ত্রী 'সুষমা' মলিনবদনে বসিয়া আছেন। এদৃশ্য আমার মাথায় সহিল না—আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম।

* * * *

(সুষমার কথা)

এই কাহিনির শেষ অংশ বল্‌বার জন্য স্বামী আমাকে রেখে গিয়েছেন। তিনি যখন রোগশয্যায় ছিলেন, তখন শরীর যেদিন একটু ভাল থাকত, সেই দিন লিখতেন। তারপর আর

লেখা হইল না—সকল জ্বালা, সকল যন্ত্রণা, সকল অপমান এপারে রেখে তিনি পরপারে চলে গেলেন। আমি আজ সাশ্রুনয়নে এই শোকাবহ কাহিনির উপসংহার করছি।

আমার বাবা যখন আমার স্বামীকে অপমান করে তাড়িয়ে দিলেন। নিজের হাতে বাড়ির বা'র করে দিলেন। তখন ত সে খবর আমরা কেউ পাইনি; পেলে কি হোতো ভগবানই জানেন। একটু পরেই কথাটা অন্দরে বেজে উঠ্‌ল; সবাই শুনতে পেল, আমারও কানে গেল। আমার বুকের ভিতর তখন যে কি ক'রে উঠল, তা মাথার উপর যিনি আছেন, তিনিই জানেন। আমার ইচ্ছা হতে লাগল, তখনই গলায় দড়ি দিয়ে মরি। চোখ দিয়ে জল এল না, জল যে শুকিয়ে গিয়েছিল, বুক যেন ফেটে যেতে লাগল। এক একবার ইচ্ছা করতে লাগল, চেঁচিয়ে বাড়ি ফাটিয়ে দিই; দোতালার বারান্দা থেকে লাফিয়ে পড়ি। এ প্রাণ রেখে কি হবে। কিন্তু খোকা—

মরা হোলোনা, রাগ করা হোল না। কার উপর রাগ করব। এরা আমার কে? কেউ নয়—কেউ নয়! যারা আমার স্বামীকে অপমান করতে পারে, বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতে পারে, তারা আমার কেউ নয়, তাদের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নেই।

একবাব মনে হোল। ঘরের দুয়ার বন্ধ করে দিই, কাউকে ঘরে আস্‌তে দেব না। কিন্তু খোকা যে ঝিয়ের কাছে বাইরে রয়েছে। তখন তাড়াতাড়ি বাইরে গিযে খোকাকে এনে বুকে চেপে ধরলাম। সেই ছ মাসের ছেলেকে বল্‌লাম "খোকা রে, কি কবব, ব'লে দে বাবা। ব'লে দে!" খোকা কেঁদে উঠ্‌ল।

তখন ঘরের দুয়ার বন্ধ করে অনেকক্ষণ চিন্তা করলাম। খোকা আমার কোলে ঘুমিয়ে পড়ল। তার মুখের দিকে যত চাইতে লাগলাম, ততই তাঁর মুখ আমার মনে পড়তে লাগলো। তিনি প্রাণে কি ব্যথা পেয়েই চলে গিয়েছেন, কি দারুণ মনঃকষ্টই তিনি ভোগ করছেন। আবার মনে হইল, তিনি ত কোথাও চ'লে গেলেন না? না, তা তিনি যাবেন না;—বাড়িতে মা যে রুগ্নশয্যায় !

তখন স্থির করলাম, কাউকে কিছুনা বলে, বাড়ির সকলে ঘুমিয়ে গেলে খোকাকে কোলে ক'রে আমি শ্যামনগরে চ'লে যাব। যেতেই হবে—যেখানে তিনি আছেন, সেখানেই আমি যাব। বাপ মা আমাকে কিছুতেই আট্‌কে রাখ্‌তে পারবে না।

কিন্তু এই রাত্রিতে সাত ক্রোশ পথ কেমন ক'রে যাব, কার সঙ্গে যাব? পথ ত চিনিনে, একলা বেরুব কি করে! তখন মনে হোলো, বামাকে সঙ্গে নেব। বামা আমাকে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছে, খোকাকেও সেই মানুষ করছে। তাকেই সঙ্গে নেব। সে কি স্বীকার করবে না? যেমন করে পারি, হাতে ধরে, পায়ে ধরে তাকে স্বীকার করাব। সে নিশ্চয়ই স্বীকার করবে। এ বাড়িতে থাক্‌ব না, শাশুড়ির মৃত্যুশয্যার পাশে যাব। আর তিনি—তাঁর পায়ে ধরে বলব, 'আমার কোন অপরাধ নেই; আমি সব ফেলে এসেছি; আমি তোমার অপমানের ভাগ নিতে এসেছি।' তিনি কি আমাকে ক্ষমা করবেন না? করবেন—নিশ্চয়ই করবেন। আমার এই খোকার, এই সোনার চাঁদের মুখ চেয়ে আমাকে পায়ে স্থান দেবেন। স্থান না দেন, খোকাকে তাঁর কোলে দিয়ে, আমি তাঁর পায়ের কাছে মাথা রেখে মরব!

তখন বামাকে ডেকে আন্‌লাম; তাকে সব কথা খুলে বল্‌লাম। সে প্রথমে অস্বীকার করল; তারপর আমি যখন তাকে মিনতি করতে লাগলাম, তার হাত ধরে কাঁদতে লাগলাম, তখন সে আমার সঙ্গে যেতে স্বীকার করল। কিন্তু আর এক কথা, কি করে এই রাত্তিরে যাই। সাত ক্রোশ রাস্তা কি আমি হেঁটে যেতে পারব? আর রাত্রের ঠাণ্ডা লেগে যদি খোকার অসুখ করে? কে যেন বুকের মধ্যে থেকে বলে উঠল "কোন ভয় নাই।" না, আর কোন ভয় নেই। কিসের ভয়—সাত ক্রোশ পথ খুব হাঁটতে পারব। তিনি যে পাগলের মত হয়ে এই রাত্রিতে সাত ক্রোশ পথ একেলা হেঁটে গেছেন; আমি কেন পারব না—খুব পারব। খোকার কোন অসুখ করবে না—তার কিছু হবে না—কিছু না। আমাকে যেতেই হবে। বামাকে সাহস দিলাম; বামা অগত্যা সম্মত হ'ল।

রাত্রি এগারটার পর সকলে ঘুমিয়ে গেলে, আমি বামার সঙ্গে খিড়কির দুয়ার দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। গায়ে যে গহনা ছিল, সব খুলে বালিশের নীচে রাখলাম; এদের কোন কিছু নিয়ে যাব না। গরিবের স্ত্রী আমি, আমার সোনাদানার দরকার নেই। একখানি মোটা চাদর দিয়ে খোকাকে বেশ করে ঢেকে নিয়ে একবস্ত্রে বড়মানুষ বাপের বাড়ি ত্যাগ করলাম। রাস্তায় এসে গা কেমন ছমছম করতে লাগ্‌ল। কখন ত ঘরের বাহির হইনি, পথও চলিনি; আর আজ এই রাত্রিতে সাতক্রোশ পথ চলবাব জন্য বাড়ি থেকে পালিয়ে বেরিয়েছি। প্রায় একক্রোশ পথ হেঁটে আর চল্‌তে পারিনে। পা ভেঙে আস্‌তে লাগল; তবুও ত খোকা বামার কোলে ছিল। আমি কাতবভাবে বললাম "বামা, আর যে আমি চল্‌তে পারি নে।" বামা বলল, "দিদি, সে কথা ত আমি তখনই বলেছিলাম; তুমি ত তা শুনলে না। এখন কি করি! এ রাত্রে পথে জনমানব নেই, কি করি বল?" আমি তখন বল্‌লাম "বামা, পথের ধারে, এস, একটু বসে জিরিয়ে নিই; তা হলেই আমি আবার চল্‌তে পারব।" এই ব'লে আমি বসে পড়লাম।

কিন্তু আর যে উঠ্‌তে পারি নে। মনে হোল আমার পা দুখানি একেবারে অসাড় হয়ে গিয়েছে। তখন একমনে ভগবানকে ডাক্‌তে লাগ্‌লাম; চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগ্‌ল। হঠাৎ দূরে একখানি গাড়ি আসবার শব্দ পেলাম। আমরা যে দিক থেকে এসেছি, সেই দিক থেকেই গাড়িখানি আস্‌ছে ব'লে মনে হোল। আমার বুকে যেন বল এল; আমি বল্‌লাম "বাবা, ভগবান আমার প্রার্থনা শুনেছেন। ঐ শোন একখানা গাড়ির শব্দ পাওয়া যাচ্ছে!"

আমরা পথের ধারে বসে গাড়ির প্রতীক্ষা করতে লাগ্‌লাম। গাড়িখানি আমাদের কাছে এলে বামা গাড়োয়ানকে বল্‌ল "ওগো, ভাড়ায় যেতে পারবে?" গরুর গাড়ির গাড়োয়ান যখন শুন্‌লে যে, আমারা শ্যামনগরে মিত্রদের বাড়ি যাব, তখন সে স্বীকার করল; বল্‌ল "আমারও শ্যামনগরের গাড়ি। আমি মুখুয্যে বাবুদের প্রজা, মিত্তির বাবুদের বাড়ির কাছেই আমাদের ঘর গো! তা ভাড়া বার আনা দিতে হবে।" আমরা তাইতেই স্বীকার করে গাড়িতে উঠ্‌লাম। বুকে তখন বল এল।

গাড়ি যখন বাড়িতে পৌঁছিল, তখন রাত্রি প্রায় চারিটা। আমরা ভিতরে প্রবেশ করে দেখি, সব শেষ হয়ে গেছে। আমার শাশুড়িকে উঠানে শুইয়ে রাখা হয়েছে; সকলে শ্মশানযাত্রার

ব্যবস্থা করছে। আমি আর তখন স্থির থাক্‌তে পারলাম না; শাশুড়ির বুকের উপর পড়ে কেঁদে উঠলাম "মাগো, একবার চাও, একবার দেখ, আমি যে সব ফেলে ছুটে এসেছি মা! একবার খোকাকে কোলে কর মা গো! একটা কথা ব'লে যাও—ওগো একটা কথা!"

সকলে তখন আমাকে ধরে বারান্দায় বসিয়ে দিল। একজন প্রতিবেশিনী বললেন "সেই আসাই এলে মা, সন্ধ্যাবেলা যদি আস্‌তে, তা হলেও গিন্নিকে দেখ্‌তে পেতে। আহা! খোকা খোকা বল্‌তে বল্‌তেই প্রাণটা বেরিয়ে গেল গো! শুধু 'ওরে খোকা, ওরে খোকা'।" এই হৃদয়ভেদী কথা শুনে আমার বুক ফেটে যেতে লাগ্‌ল!

প্রতিবেশিনী বলিলেন, "আর কেঁদে কি করবে মা! বিপদের উপর বিপদ! অরু গিয়েছিল তোমাদের আন্‌তে; সে রাত্তির এগারটার সময় ফিরে এল। সবাই গাড়ির কাছে গিয়ে দেখে অরু গাড়ির মধ্যে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। এখনও তার জ্ঞান হয়নি।"

এই কথা শুনে আমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হ'ল। আমি তাড়াতাড়ি বল্‌লাম "কৈ কৈ, কোথায় তিনি?" আমার আর তখন লজ্জাশরম ছিল না। প্রতিবেশিনী আমাকে তখন ঘরের মধ্যে নিযে গেলেন! দেখি তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন।

স্বামী অজ্ঞান অবস্থাতেই তিনদিন কাটালেন; তারপর ক্রমে তিনি অনেকটা সুস্থ হলেন। এব মধ্যে একটু সুস্থ হয়ে স্বামী একদিন আমাকে বল্‌লেন "সুষমা, এত কষ্ট সহ্য করে কি তুমি এখানে থাক্‌তে পারবে?"

আমি বল্‌লাম "খুব পারব। আর শোন; আমি তোমার সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করছি, সে বাডির নাম মুখে আন্‌ব না। তুমি ত যাবেই না, খোকাকেও সেখানে যেতে দেব না; ভিক্ষা করে খেতে হয়, তাও খাব, না খেয়ে মরতে হয়, এই ভিটেয় পড়ে মরব; তুবও কোনোদিন তাদের সাহায্য চাইব না—কিছুতেই না। খোকা যদি বড় হয়ে তাদের সাহায্য চায়, তবে—তবে আমি অভিসম্পাত করছি, তাব—" তিনি আমার মুখ চাপিয়া ধরিলেন।

তার কযেকদিন পরেই তাঁর অসুখ আবার বেড়ে উঠ্‌ল। সে অসুখ আর কিছুতেই সারল না; সেই অসুখেই তিনি চ'লে গেলেন। মৃত্যুব পূর্বদিন আমার দিকে চেয়ে অতি ক্ষীণস্বরে তিনি বল্‌লেন "সুষমা, আমি ত চল্‌লাম। তুমি অপমান, অভিমান ভুলে যাও। খোকাকে পথের ফকিব কোরো না। আমার ত কেউ নেই, কার হাতে তোমাদের দিয়ে যাব। সব ভুলে যাও, আমি ভুলে গিয়েছি। খোকাকে নিয়ে তোমার বাপমায়ের কাছে যেও; অপমানের কথা মনে বেখ না।"

আমি বল্‌লাম "এ জীবনে নয়। ক্ষমা! এ জীবনে নয়। তুমি দেবতা—তুমি ক্ষমা করতে পার—তুমি ভুলে যেতে পার; কিন্তু আমি স্বামীর অপমান কিছুতেই ভুলতে পারব না—আমাকে যদি তারা অপমান করত, আমি তা উড়িয়ে দিতে পারতাম; কিন্তু তারা তোমার অপমান করেছে। তাদেব ক্ষমা! ও কথা বোলোনা।" তিনি যেন কি বল্‌তে যাচ্ছিলেন; কিন্তু বল্‌তে পারলেন না। পরদিনই সব শেষ হয়ে গেল।

* * * *

তাঁর কথা বলা হয়েছে, আর কেন? আমাদের দুঃখের কথা আর শুনে কাজ নেই!

মাথার উপর তিনি আছেন, তিনিই দেখ্‌ছেন, তিনিই শুন্‌ছেন। মা বাবা এসে কত কেঁদেছেন, কত অনুরোধ করেছেন—কিন্তু আমি যাই নাই—যাব না;—এই ভাঙা ঘরে পড়ে আছি—ভিক্ষা ক'রে খাব, তবুও এইখানেই থাক্‌ব— এ যে আমার স্বামীর মন্দির। আমি এই তীর্থেই মরব!

কি বল্‌ছ? আমার বুকে বড় বেজেছে, তাই এ কথা বল্‌ছি। না, না—ওগো না। আমার বুকে কৈ বড় বেজেছে! বুকে বেজেছিল সেই দক্ষরাজার মেয়ে সতীর; তাই তিনি পতির নিন্দা শুনেই প্রাণত্যাগ করেছিলেন। আর আমি;—পতিনিন্দা নয়—পতির অপমান—পতির বড় বেদনায় দেহত্যাগ দাঁড়িয়ে দেখেও বেঁচে আছি। মা শিবসোহাগিনি! সেই বড় দুর্দিনে তোর এই হতভাগিনি মেয়েকে যদি তোর সতী-তেজের একটু দিতিস্‌ মা, তা হ'লে তাঁর অপমানবিষ আকণ্ঠ পান ক'রে, তাঁর আগে পার হ'য়ে গিয়ে আমার এই নারীজন্ম সার্থক করতাম! এতটুকু করুণাও তোর হলো না করুণাময়ি!

—ভারতবর্ষ ৩য় বর্ষ, ১৩২২-২৩, ২য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা ফাল্গুন।

আমার মাষ্টারি

পর-পর তিনবার প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়াও যখন অকৃতকার্য হইলাম, তখন বুঝিলাম আমাকে ফেল করাবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষকগণ "জোটবন্দি" হইয়াছে। আমি গরিব মানুষ চাষী গৃহস্থের ছেলে; মা সরস্বতীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া বাড়িতে আসিয়া বসিলাম। বৃদ্ধ পিতা বড়ই ক্ষুণ্ণ হইলেন। বড়দাদা ক্যাম্বেল স্কুলে পাশ করিয়া ডাক্তারবাবু হইয়াছেন। বাড়িতে ডিসপেনসারি; পসারও মন্দ হয় নাই। মাসে যেমন করিয়াই হউক, ত্রিশ চল্লিশ টাকা নগদ এবং মাছটা তরকারিটা কখন বা এক আধমন গুড় পাইয়া থাকেন। দাদার উপার্জনে এবং যে কয়েক বিঘা জমি আছে, তাহার উপসত্ত্বে সংসার একরকম চলিয়া যায়।

চাষের কার্য বৃদ্ধ পিতাকেই দেখিতে হয়। দাদা ডাক্তার বাবু, তিনি কি আর মাঠে-মাঠে ঘুরিতে পারেন? আর তাহা করিলে কি তাঁহার পদ-প্রসারই থাকে?

বৌদিদি ডাক্তার বাবুর স্ত্রী, পত্নী—প্রিয়তমা মহিষী; তিনি গৃহস্থালির কর্ম করিলে তাঁহার স্বামীর মর্যাদা নষ্ট হয়। সুতরাং গৃহস্থালির ভার মাতাঠাকুরানিকে গ্রহণ করিতে হইয়াছে।

এমন অবস্থায় পরীক্ষায় ফেল করিয়া আমি যখন বাড়িতে আসিয়া বসিলাম, তখন একমাত্র কনিষ্ঠ ভ্রাতা হইলেও দাদার স্নেহ আমার প্রতি ধাবিত হইল না; নিঃসন্তান বৌদিদিও আমাকে প্রীতিভরে অভ্যর্থনা করিলেন না। আমি বাড়ির ছেলে হইলেও যেন অনাবশ্যক গলগ্রহ অথবা নিঃসহায়া বিধবা ভগিনীর ন্যায় গৃহে স্থান প্রাপ্ত হইলাম।

কি করিব, উপায় নাই। বৃদ্ধ পিতা উপযুক্ত জ্যেষ্ঠপুত্রের বা পুত্রবধূর আচরণের প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইতেন না। মাতাঠাকুরাণি ত "মাতৃত্ব" হইতে একেবারে "দাসীত্বে" নামিয়া পড়িয়াছিলেন। এই সুখের সংসারে আমি আসিয়া উপস্থিত হইলাম। মায়ের স্নেহে দুইবেলা দুইমুঠো অন্ন পাইতাম; কিন্তু ভদ্রলোকের ছেলে কাপড়, জামা, জুতার ত প্রয়োজন হয়। তখন নিজে উমেদারি করিয়া পিতার দ্বারা অনুরোধ করাইয়া, এক মাসের স্থলে তিন মাসে বৌদিদির দরবার হইতে মঞ্জুর করাইয়া লইয়া তবে কাপড় জামা কিনিতে পাইতাম। এই প্রকার কষ্টেই আমি কিছুদিন পশু-জীবন যাপন করিয়াছিলাম। আমার এক ভগিনী আছে। তিনি আমার জ্যেষ্ঠা, দাদার কনিষ্ঠা। তাঁহাদের অবস্থা ভাল। আমার ভগিনীপতি শিক্ষাবিভাগে চাকুরি করেন। তিনি স্কুলের ডেপুটি ইন্‌স্পেকটার। আমার কষ্ট দেখিয়া মা এক এক সময়ে বলিতেন "সুরেশ, এখানে থেকে কষ্ট পাস কেন? আর আমাকেই কষ্ট দিস্ কেন? সুশীলার কাছে গিয়ে থাক্‌না। সে তোকে কত যত্নে রাখবে।

কিন্তু এত যে কষ্ট পাইতেছি, তবুও "বহিন বা ভাই" অর্থাৎ জামাইবাবু নামে পরিচিত হইয়া ভগিনীপতির বাড়িতে থাকিতে আমার কেমন সঙ্কোচ বোধ হইল। এখানে কত কষ্টই পাইনা কেন, তবুও আমি বাপের বেটা, আমি দাদার ভাই;—এ আমার গৃহ। এত কষ্টেও আমি অভিমানটুকু ত্যাগ করিতে পারি নাই।

এই সময়ে একবার পূজা উপলক্ষে অবকাশ কালে আমার ভগিনী ও ভগিনীপতি দুই

দিনের জন্য আমাদের বাটীতে আসিয়াছিল। মায়ের নিকট আমার কথা শুনিয়া এবং দাদা বৌদিদির ব্যবহার দুই একদিনের মধ্যে বুঝিতে পারিয়া দিদি আমাকে তাঁহাদের সঙ্গে লইয়া যাইতে চাহিলেন। আমি বলিলাম। "আমি তোমাদের ওখানে যাইয়া মামাগিরি করিতে পারিতে পারিবনা।" দিদি এই কথা রহস্যচ্ছলে আমার ভগিনীপতি সতীশবাবুকে বলিয়াছিলেন।

সতীশবাবু শিক্ষিত লোক, তাঁহার হৃদয় উচ্চ। তিনি আমার এই অভিমানের কথা শুনিয়া অসন্তুষ্ট না হইয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন, এবং আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "সুরেশ, তুমি আমার সঙ্গে মেদিনীপুর চল, আমি তোমার চাকরি করে দেব। আমার বাড়িতে থেকে তোমাকে মামাগিরি করতে হবে না।"

আমি বলিলাম, "আপনার সঙ্গে গিয়ে কিছুদিন আপনার অন্নধ্বংস করি কেন? চাকরি তো আর রোজই খালি থাকে না। আপনি গিয়ে একটা চাকরি ঠিক করে চিঠি লিখলেই আমি যাব।

সতীশবাবু হাসিয়া বলিলেন, "বুঝেছি দু-চারদিনের জন্যও তুমি "মামাগিরি" করতে রাজি নও। তুমি সত্যসত্যই দত্ত—দত্ত কারু ভৃত্য নয় সঙ্গে এসেছে—একথাটা তুমিই ফলিয়ে দিলে ভাই! বেশ ! তাই হবে। আমি একটা মাস্টারি ঠিক করে একেবারে তোমার কাছে চিঠি পাঠিয়ে দেব। তবে কার্যস্থলে যাবার সময় আমার গরিবখানায় পায়ের ধূলো দিয়ে যেও—তাতে তোমার মর্যাদার লাঘব হবে না। তুমি পচা মৌলিক, দত্ত আর আমি কুলীন কায়স্থ শ্রীসতীশ চন্দ্র মিত্র।

পূজার পরে কার্তিক মাসের মাঝামাঝি সতীশবাবুর এক পত্র পাইলাম। তিনি আমাকে একটি মাইনর স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করিয়া নিয়োগপত্র প্রেরণ করিয়াছেন। সে গ্রামের নাম গোপন করিয়া আমি তাহাকে অনন্তপুর নামে অভিহিত করিব।

কার্যস্থলে যাইবার খরচের জন্য দাদাকে আর বিরক্ত করিলাম না। মা কোন এক প্রতিবেশীর নিকট হইতে বারোটি টাকা ধার করিয়া আনিয়া দিলেন। আমি পথে কলিকাতা হইতে ঐ টাকার কিছু ব্যয় করিয়া নিতান্ত আবশ্যক কাপড়-জামা ক্রয় করিয়া মেদিনীপুরে সতীশবাবুর বাসায় উপস্থিত হইলাম।

আমার নিয়োগপত্রে লেখা ছিল, আমি মাসিক ষোল টাকা বেতন পাইব। একজন এনট্রান্‌স ফেল শিক্ষকের পক্ষে ষোল টাকা বেতনই আমি যথেষ্ট মনে করিয়াছিলাম।

মেদিনীপুরে উপস্থিত হইলে সতীশবাবু বলিলেন, যে স্কুলের সেক্রেটারি মহাশয় তাঁহাকে লিখিয়াছেন যে, আমি যদি সেক্রেটারি মহাশয়ের একমাত্র বালক ভাগিনেয়কে বাড়িতে পড়াইবার ভার গ্রহণ করি, তাহা হইলে আমার আহার বা বাসস্থানের কোনও ব্যয় লাগিবেনা।

আমি দেখিলাম মন্দ কি,—আমার বেতনের ষোলটি টাকাই বাঁচিয়া যাইবে। আমার সঙ্গে সামান্য বস্ত্রাদি দেখিয়া আমার ভগিনী কয়েকখানি নূতন কাপড়, তিনচারিটা জামা, দুইখানি চাদর কিনিয়া দিলেন। আমি তাহা লইতে অস্বীকার করিলাম। ভগিনী ও ভগ্নিপতির নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া যথাসময়ে অনন্তপুর পৌছিলাম।

স্কুলের সেক্রেটারি মহাশয়ের বাড়িতে উপস্থিত হইলাম। তাঁহার নাম শ্রীঘনশ্যাম পট্টনায়ক। তিনি জাতিতে মাহিষ্য। বয়স পঞ্চাশের উপর বলিয়া বোধ হইল। লোকটি পরম বৈষ্ণব; অবস্থা খুব সচ্ছল; গ্রামের মধ্যে তাঁহারই অবস্থা সর্বাপেক্ষা ভাল । অপরাহ্নকালে পৌঁছিলাম; সুতরাং স্কুল দেখিতে পাইলাম না। সেক্রেটারি মহাশয়ের নিকট শুনিলাম, স্কুলে দুইজন ইংরেজি শিক্ষক এবং দুইজন পণ্ডিত আছেন। আমি দ্বিতীয় শিক্ষক ব্যতীত আর সকলেরই বাড়ি ঐ গ্রামে বা উহার নিকটবর্তী গ্রামে। তাঁহারা সকলেই মাহিষ্য। প্রধানশিক্ষক মহাশয় এল. এ. ফেল,—আজ প্রায় সাত আট বৎসর ঐ স্কুলে শিক্ষকতা করিতেছেন।

সেক্রেটারি মহাশয় মাহিষ্য, আমি কায়স্থ, সুতরাং আমাকে প্রতিদিনই স্বহস্তে রন্ধন করিয়া খাইতে হইবে। বাড়িতে যে কষ্টে ছিলাম, তাহাতে এখানে স্বহস্তে রন্ধন করিয়া তাহাদের বাড়িতে সকলকে খাওয়াইতেও প্রস্তুত ছিলাম। বাহিরের একখানি ঘরে ভৃত্যেরা আমার রন্ধনের আয়োজন করিয়া দিল; আমি রন্ধন শেষ করিয়া আহারান্তে সে দিনের মত বাহিরের বৈঠকখানায় বিশ্রাম করিলাম।

পরদিন প্রাতঃকালে হেডমাস্টার ও হেডপণ্ডিত মহাশয় আমাব আগমনবার্তা অবগত হইয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তাঁহাদিগের সৌজন্য ও ভদ্র ব্যবহারে আমি বড়ই আনন্দিত হইলাম;—বুঝিলাম এখানে মাস্টারি করিতে আমার কোনও কষ্ট বা অসুবিধা হইবেনা।

ঘনশ্যামবাবু নিঃসন্তান। তাঁহার বিধবা ভগিনীর একমাত্র পুত্রই তাঁর ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী। তাঁহার ঐ ভাগিনেয়টিকে বাড়িতে পড়াইবার ভার আমি প্রাপ্ত হইলাম।

এ বয়সে অনেক ছেলে দেখিয়াছি, অনেক দুরন্ত, আদুরে ছেলেকেও জানি; কিন্তু ঘনশ্যামবাবুর ভাগিনেয় দুলালচন্দ্রের মতো দুর্দান্ত ছেলে আমার ছাত্র জীবনে কখনও দেখি নাই। প্রথম মাস্টারি করিতে আসিয়াই আমার অদৃষ্টে দুলালচন্দ্রই জুটিয়া গেল। ভৃত্যগণের মুখে শুনিলাম শ্রীমান দুলালচন্দ্রের মাতাই এ বাড়ির সর্বেসর্বা। তাঁহার আদেশেই সমস্ত কার্য পরিচালিত হয়। ঘনশ্যামবাবু ভগিনীর সমস্ত উপদেশই শিরোধার্য করিয়া থাকেন। তাঁহার গৃহিণী ও ননদীর কর্তৃত্ব সভয়ে স্বীকার করিয়া থাকেন। ভৃত্যেরা আমাকে বুঝাইয়া দিল যে, দুলালচন্দ্রের মাতার মন যোগাইয়া চলিতে পারিলে আমার কোনই অসুবিধা হইবে না—আমি মহাসুখে বাস করিতে পারিব। এমনকি সময় সময় নানারকম সাহায্য প্রাপ্তির কথাও তাহারা আমাকে বলিয়া দিল। দুই—একজন ভৃত্য একটু চাপা রসিকতাও করিল; আমি কিন্তু তখন সে কথার তাৎপর্য বুঝিতে পারি নাই,—পরে বেশ বুঝিয়াছিলাম।

আমি বিষম প্রমাদ গণিলাম। পুরুষের মন যোগাইয়া চলিতে পারা যায়, কিন্তু একজন অশিক্ষিতা স্ত্রীলোকের মন কেমন করিয়া যোগাইতে হয়—সে শিক্ষা ত কখন লাভ করি নাই। যদি সে শিক্ষাই পাইতাম, তাহা হইলে এই দূর দেশে যোল টাকা বেতনের মাস্টারি করিবার জন্য আসিতে হইত না; বাড়িতে বৌদিদির মন যোগাইয়াই সুখে-স্বচ্ছন্দে দিনপাত করিতে পারিতাম। যাহা হউক, যখন আসিয়া পড়িয়াছি, তখন দেখি কি করিতে পারি।

যথাসময়ে স্কুলে গেলাম। হেড মাস্টার মহাশয় আমাকে আমার দৈনিক কার্য বুঝাইয়া

দিলেন; এবং আমি মাস্টারি কার্যে এই প্রথম ব্রতী হইতেছি শুনিয়া বন্ধুভাবে কয়েকটি উপদেশও দিলেন।

প্রায় এক সপ্তাহ চলিয়া গেল। আমার অধ্যাপনার প্রশংসা শুনিতে পাইলাম। স্কুলের অন্যান্য শিক্ষক ও ছাত্রগণ আমার অধ্যাপনায় বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন। সেক্রেটারি মহাশয় এই কথা শুনিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

স্কুলে সুনাম হইলে কি হয়, আমি বাড়িতে মহাবিপদে পড়িলাম। শ্রীমান দুলালচন্দ্র কিছুতেই পড়িতে চাহেনা। তেরো বৎসরের ছেলে, মাইনর স্কুলে পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ে,—পড়াও যা, সম্পূর্ণ অমনোযোগী; কিন্তু কি স্কুলে কি বাড়িতে কোথাও তাহাকে কিছু বলিবার যো নাই। দুলালকে লেখাপড়া শিখাইতে হইবে কিন্তু তাহাকে প্রহার করা দূরে থাকুক, মৃদু ভর্ৎসনাও করিতে পারিব না;—এদিকে সে দুষ্টামি করিলে তাহার জবাবদিহি আমাকেই করিতেই হইবে। প্রায় প্রতিদিনই দুলালচন্দ্রের মাতা দাসীদিগের দ্বারা জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান তাঁহার দুলাল কেমন পড়িতেছে। প্রতিদিনই চাকুরির দায়ে বলিতে হয়, ছেলে বেশ পড়িতেছে। তাহার মনোযোগ ক্রমেই বাড়িতেছে।

যে দেবতা যে নৈবেদ্যে সন্তুষ্ট হন, অগত্যা আমাকে তাহারই ব্যবস্থা করিতে হইল। দুলালের মাতার নিকট পুত্রের প্রশংসা গান প্রতিনিয়ত করিতে হইত।

ইহার ফলও ফলিল; আমার রন্ধনের ব্যবস্থা বাহির বাটি হইতে ভিতর বাটিতে স্থানান্তরিত হইল। দুলালচন্দ্রের মাতা স্বয়ং আমার আহারাদির পর্যবেক্ষণের ভার গ্রহণ করিলেন। সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়ি, কোন দ্রব্যেরই অভাব নাই; তারপর গৃহের সর্বময়ীকর্ত্রী দুলালচন্দ্রের মাতা আমার প্রতি অনুগ্রহ-পরায়ণা; এ অবস্থায় ক্রমেই আমার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য নানা প্রকারে বর্ধিত হইতে লাগিল।

এদিকে কর্তাও আমার প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন; তাহারও কারণ ছিল। আমি প্রতিদিন সন্ধ্যার পর দুলালচন্দ্রের নামমাত্র পড়ামাত্র পড়া শেষ করিয়া কর্তার নিকটে গিয়া বসিতাম, এবং তাহাকে রামায়ণ, মহাভারত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিয়া শুনাইতাম। প্রথম প্রথম বৈঠকখানাতেই পাঠ হইত। কয়েকদিন পরেই পাঠের স্থান বাড়ির মধ্যে নির্দিষ্ট হইল।

দুলালচন্দ্রের মাতা ও ঘনশ্যামবাবুর স্ত্রী আমাকে আর লজ্জা করিতেন না, তাহারা আমার সঙ্গে কথাই বলিতেন। ক্রমে আমি বাড়ির ছেলের মত হইয়া গেলাম। আর গোপন করিয়াই বা লাভ কি, আমার রন্ধন কার্য দুলালচন্দ্রের মাতাই একপ্রকার গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমি নামমাত্র রন্ধনগৃহে উপস্থিত থাকিতাম।

দুলালচন্দ্রের মাতাঠাকুরানি যখন তখনই আমাকে বলিতেন, দেখ মাস্টার, ছেলেটার যদি ভাল করে লেখাপড়া শেখাতে পার, তাহালে আর তোমাকে কোথাও চাকুরি করতে হবে না। আমি তোমাকে জমিজমা করে দেব, বাড়ি-ঘর তৈরি করে দেবো। আর টাকাকড়ি,—দেখ মাস্টার, তোমার যখন যা দরকার হবে, আমার কাছে চেয়ে নিও,—বুঝলে।"

আমি মনে করিলাম, আমি তাহার ছেলের মাস্টার, আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করা, আমার সুখ সুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখা তাঁহার কর্তব্য। কিন্তু ক্রমেই যেন দুলালচন্দ্রের মাতা

আমার সহিত বেশি ঘনিষ্ঠতা করিতে লাগিলেন। সে সকল ব্যাপারে বিশেষ বর্ণনা করিয়া কাজ নাই।

এই পুরাণপাঠ কার্যে আমার অর্থাগমেরও সুবিধা হইল। সীতার বিবাহ, শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী শ্রীচৈতন্যদেবের জন্ম প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ পৌরাণিক ঘটনার কাহিনি যে দিন আমি পাঠ করিতাম, সেদিন ঘনশ্যামবাবু, তাঁহার পত্নী এবং তাঁহার ভগিনী আমার পাঠের পুরস্কার স্বরূপ অর্থ ও বস্ত্রাদি উপঢৌকন দিতেন। আসিয়াছিলাম মাস্টারি করিতে—মাস্টারি ত করিই, মধ্য হইতে কথক ঠাকুর হইয়া বসিলাম। তখন মধ্যে মধ্যে মনে হইত, দত্ত কায়স্থ না হইয়া যদি ভট্টাচার্য বা চক্রবর্তী ব্রাহ্মণ হইতাম, তাহা হইলে প্রণামি হিসাবে আরও কিঞ্চিৎ অধিক অর্থাগম হইত। ভাল গান করিতে জানিতাম না, কিন্তু আমার স্বর অতি মিষ্ট ছিল। আমি যখন সুর করিয়া পুরাণাদি পাঠ করিতাম, এবং যখন যে ভাব প্রকাশের প্রয়োজন পাঠের সময় সেই ভাব প্রকাশ করিতাম, তখন সকলেই মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। দুলালচন্দ্রের মাতা মধ্যে মধ্যে বলিতেন, "মাস্টার তুমি পূর্বজন্মে নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ ছিলে।"

কিন্তু এত সুখ, এত সৌভাগ্য, এত অর্থাগম গরিব মাস্টারের ভাগ্যে বেশি দিন সহিল না। আমার নবীন যৌবন, আমার সুকান্তি, আমার সুন্দর কণ্ঠস্বর, আর আমার পুরাণপাঠ আমার কাল হইল। কথাটা খুলিয়া বলিব না। যাঁহার অন্ন খাইয়াছি, যাঁহার নিকট আমার অনুগ্রহ লাভ করিয়াছি, তাঁহার পরিবারের কলঙ্ক ঘোষণা করিব না। যে কারণেই হউক দুলালচন্দ্রের মাতা অল্পদিন পরেই আমার উপর বিরূপ হইলেন। তিনি প্রচার করিয়া দিলেন, আমি অত্যন্ত অসচ্চরিত্র, আমাকে গৃহে স্থান দেওয়া কর্তব্য নহে। আমার অসচ্চরিত্রের প্রমাণ স্বরূপ তিনি ঘনশ্যামবাবুকে বুঝাইয়া দিলেন যে, তাঁহাদিগের গৃহের একটি যুবতী পরিচারিকার সহিত আমার অবৈধ সম্বন্ধ ঘটিয়াছে। ইহার ফলে সেই নিরাপরাধা পরিচারিকা তাড়িতা হইল,—আমার মাস্টারি শেষ হইল।

একদিন প্রাতঃকালে, আমার রং করা টিনের বাক্স ও ছোট বিছানা লইয়া একখানি গোযানে আরোহণ পূর্বক অনন্তপুর ত্যাগ করিলাম।

মেদিনীপুরে সতীশবাবুর নিকট যাইতে লজ্জা বোধ হইল। কি জানি, ঘনশ্যামবাবু যদি আমার বিরুদ্ধে কোন কথা তাঁহাকে লিখিয়া থাকেন, বাড়িতেও গেলাম না, সেখানে যাইয়া কি করিব?

হাতে কিছু টাকা ছিল; তাহাই সম্বল করিয়া কলিকাতায় আসিলাম। সাধ্যের মধ্যে শ্যামবাজারের পোলের নিকট একটি কাঠের গোলা খুলিলাম। আপনাদের আশীর্বাদে এই তিন বৎসর ব্যবসায়ে আমি আড়াই হাজার টাকা লাভ করিয়াছি।

কিন্তু এখনও থাকিয়া থাকিয়া আমার মাস্টারির কথা মনে পড়ে; এখনও কাজকর্ম শেষ করিয়া যখন কেরোসিনের হ্যারিকেন ল্যাম্পে, সম্মুখে লইয়া সুর করিয়া শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত পাঠ করি, তখন অনন্তপুরের সেই মাস্টারির কথা আমার মনে উদয় হয়, আর আমার শরীর শিহরিয়া উঠে। তখন ভগবানকে প্রণাম করি, তিনি বড় কঠিন সময়ে আমার মত নবীন যুবককে ভয়ানক পাপ প্রলোভনের হাত হইতে পরিত্রাণ করিয়াছিলেন, নতুবা এতদিনে কি দুর্গতি হইত, কে বলিতে পারে?

কূপের কথা

অমি কূপ। মহাসাগর নই, সাগর নই, উপসাগর নই, হ্রদ নই, তড়াগ নই, দীর্ঘিকা নই, ইঁদারাও নই, আমি দরিদ্র পল্লিবাসী দুঃখী পরিবারের আস্তাকুঁড়ের পার্শ্বের একটি অতি ক্ষুদ্র কূপ।

যখন আমার জন্ম হয় তখন গৃহস্থের বুড়া কর্তা বাঁচিয়া ছিলেন। তখন এ বাড়িতে সাতখানি লাঙ্গল ছিল, চারিজন কৃষাণ ছিল, দুইজন রাখাল ছিল, উঠানে দশবারটি মরাই ছিল, মস্ত লম্বা একখানি দোচালা গোয়াল ছিল, গোয়ালে ত্রিশ পঁয়ত্রিশটা গাই ছিল। তখন এ বাড়িতে প্রতি বেলায় চল্লিশখানি পাতা পড়িত; গরিব দুঃখী, অনাথ-অনাথা, অতিথি-অভ্যাগত, কেহ তখন নবীন সরকারের বাড়ি হইতে ফিরিয়া যাইতনা। তখন এই বাড়ির পশ্চাতে ঐ যে বাগানটা দেখিতেছ, উহা নবীন সরকারেরই বাগান ছিল। বাগানের মধ্যে ঐ যে দামদলে পরিপূর্ণ, জঙ্গলে ঢাকা ডোবা দেখিতেছ, উহা ডোবা ছিল না, উহা একটি সুন্দর পুষ্করিণী ছিল। ঐ পুষ্করিণীর কালো জল তখন থই থই করিত। কত মাছ লেজ নাড়িয়া আনন্দে খেলা করিয়া বেড়াইত। বাড়ির মেয়েরা ঐ পুকুরে ঘাট সারিত; পুরুষেরা ঐ পুকুরে স্নান করিত; ঐ পুকুর শুধু এ বাড়িতে নয়, নিকটবর্তী আরও কত বাড়ির পানীয় জল সরবরাহ করিত। বাগানে ঐ যে গাছগুলি রহিয়াছে, উহাদিগের তখন কত যত্ন ছিল। ঐ বাগানের জাম, কাঁঠাল, পেয়ারা, জাম, জামরুল, তাল, খেজুর, আমড়া, কামরাঙা, চালতা, সজনা, পুঁই, কুমড়া, লেবু, শাকপাতা, তরিতরকারি সরকার বাড়ির বার মাসের অভাব পূরণ করিত। এ সকলের জন্য কোনও দিন বাজারে যাইতে হইত না।

কর্তা নবীন সরকার তখন গ্রামের দশজনের একজন ছিলেন। সেই সুসময়ে আমার জন্ম। বাড়ীতে ইটের সম্বন্ধও ছিলনা; কিন্তু সরকার মহাশয় আমার চারদিক ইট দিয়া বাঁধাইয়া দিয়াছিলেন। ক্ষুদ্র কূপ হইলে কি হয়, সরকার মহাশয়ের তখন অবস্থা ভাল ছিল, তাই তিনি শুধু পুরোহিত ডাকিয়াই আমার প্রতিষ্ঠা কার্য শেষ করেন নাই; এই উপলক্ষে দ্বাদশজন ব্রাহ্মণ এবং প্রতিবেশীদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইয়াছিলেন। এখন সেই দিনের কথা ভাবি, আর দুঃখে কষ্টে আমার ক্ষুদ্র হৃদয় উথলিয়া উঠে।

জন্মিয়া কি দেখিয়াছিলাম, আর এই ষোল বৎসর পরে এখন বা কি দেখিতেছি; ভোজবাজির মত সব যেন ওলট-পালট হইয়া গেল।

২

শুনিয়াছি পরিবর্তন জগতের নিয়ম; কিন্তু তাহাও রহিয়া সহিয়া হয়,—এমন করিয়া দেখিতে দেখিতে কেহ লক্ষ্মীছাড়া হয়না; এমন করিয়া কাহারও সর্বনাশ হয়না। আমি আস্তাকুঁড়ের পার্শ্বে বসিয়া সমস্ত দেখিলাম, সমস্ত বুঝিলাম; দুঃখে কষ্টে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলাম। কেন এমন হইল, কেন দেখিতে দেখিতে নবীন সরকারের সোনার সংসার ছারখার হয়ে গেল। কেন পর্বতপ্রমাণ গোয়াল ভূমিসাৎ হইল, কেন লক্ষ্মীর সংসারে অলক্ষ্মী প্রবেশ

লাভ করিল?—তাহা আর কেহ জানেনা, জানে শুধু একজন,—সে আমি এই আস্তাকুড়ের ক্ষুদ্র কূপ। কোন্ দিন আমার পাটগুলি ভাঙিয়া পড়িবে। কোন দিন মাটি-চাপা পড়িয়া আমি লোকলোচনের বহির্ভূত হইব—তাই আজ বড় কষ্টে এই সরকার পরিবারের কথা বলিতেছি। তোমরা কত স্থানে কত কথা শুনিয়াছ, মহাসাগরের গভীর কল্লোল শুনিয়াছ, মেঘের গর্জন শুনিয়াছ, তটিনীর কলতান শুনিয়াছ, অনেক বড় কথা শুনিয়াছ—দরিদ্রের গৃহপ্রান্তস্থ ক্ষুদ্র কূপ আমি—আমার দুইটা কথা শোন!—ওগো, তোমরা শোন! আর যদি পার, একবিন্দু করুণার অশ্রু আমার বক্ষে নিক্ষেপ কর। অনেকদিন পূর্বে যে কয়েকবিন্দু তপ্ত অশ্রু আমাব বক্ষে পতিত হইয়া এক আগ্নেয়গিরির সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে, তাহার উপর তোমাদের করুণার অশ্রু একবিন্দু পড়ুক—আমার হৃদয় একটু শীতল হউক।

৩

তবে এখন কথাটা শোন। আমার জন্মের পর ছয় বৎসর বেশ কাটিয়া গেল; নবীন সরকারের দুই পুত্র—মোহন ও রসিক—পিতার আজ্ঞাবহ ছিল। নবীন সরকারের এই দুইটি বই আর সন্তান ছিল না। তিনি মোহনকে অধিক লেখাপড়া শিখিতে দেন নাই; বাংলা স্কুলের পাঠ শেষ করিযাই তাহাকে বিষয়কার্যে লিপ্ত করিযাছিলেন। মোহন পিতার উপদেশ ও শিক্ষায় অল্প দিনের মধ্যেই বেশ কাজের লোক হইযাছিল। নবীন সরকারের ছোটছেলে রসিক গ্রামের বিদ্যালয় হইতে যখন ছাত্রবৃত্তি পাশ করিল, তখন গ্রামের দশজনের পরামর্শে তাহাকে হুগলী নর্মাল স্কুলে প্রেরণ করা হইল।

রসিক যখন হুগলীতে গেল, তখন তাহার বয়স সতেরো বৎসর, তাহার বড় ভাই মোহনের বয়স তখন বত্রিশ বৎসর। নবীন সরকার মোহনকে অতি অল্পবয়সেই বিবাহিত করিয়াছিলেন। মোহনের স্ত্রী যোগমাযার চোদ্দ বৎসব বয়সে একটি পুত্র সন্তান হইয়াছিল; কিন্তু তেরোদিন যাইতে না যাইতে আঁতুড় ঘরেই ছেলেটি মারা যায়। তাহার পর মোহনের স্ত্রীর আর সন্তানাদি হয় নাই। রসিক যে বার হুগলী যায়, তখন মোহনের স্ত্রীর বয়স আঠাশ বৎসর।

সরকার মহাশয়ের বড় ইচ্ছা ছিল যে, রসিকের বিবাহ অল্প বয়সে দেন, কিন্তু মোহন ও পাড়ার দশজনের অনুরোধে একটা পাশ না হওয়া পর্যন্ত রসিকের বিবাহ বন্ধ রাখিতে বাধ্য হন! রসিক যখন ছাত্রবৃত্তি পাশ করিয়া ভবিষ্যতে পণ্ডিত মহাশয় হইবার আশায় হুগলী চলিয়া গেল, নবীন সরকার তখন তাহার বিবাহেব ব্যবস্থা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

পিতার অবস্থা ভাল, ছেলে একটা পাশ, হুগলীতে পড়াশোনা করে,—এমন ছেলের বিবাহের আবার ভাবনা। নবীন সরকার পুত্র মোহনকে সঙ্গে লইয়া অনেক মেয়ে দেখিলেন; বড় ঘর, মাঝারি ঘর অনেক ঘরের মেয়ে দেখিলেন; কিন্তু একটিও তাঁহার মনের মত হইল না।

অবশেষে একদিন দূর গ্রাম হইতে বাড়ি আসিবার সময় সন্ধ্যাকালে ঝড়-বৃষ্টিতে তাহারা দুইজনে মণিরামপুরের এক গৃহস্থের বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

সে বাড়িতে পুরুষ কেহ ছিলনা। একটি বিধবা রমণী গোলাপ ফুলের মত সুন্দরী একটি কুমারী কন্যা লইয়া সেই বাড়িতে বাস করিতেন।

বিধবা অতিথিদ্বয়কে পরম সমাদরে স্থান দিলেন এবং যথাসাধ্য অতিথি সৎকারের ব্যবস্থা করিলেন। বৃদ্ধ নবীন সরকার মেয়েটিকে ডাকিয়া তাহাদের পরিচয় গ্রহণ করিলেন, তাহাদের দুরবস্থার কথা শুনিলেন। তাহারা জাতিতে কায়স্থ শুনিয়া, এবং মেয়েটির সুলক্ষণ দেখিয়া তাহাকেই পুত্রবধূ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। মেয়েটি দেখিয়া মোহনেরও খুব পছন্দ হইয়াছিল। মেয়েটি যেমন শান্ত, তেমনই গৃহকর্মে নিপুণা, তেমনই সুলক্ষণা;—আর সৌন্দর্য তাহা অতুলনীয় বলিয়াই মোহনের মনে হইল।

পরদিন প্রাতঃকালে মণিরামপুরের পরিচিত দুই চারিজনের নিকট এই পরিবারের সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া, নবীন সরকার বিধবার নিকট, তাহার কন্যার সহিত নিজ কনিষ্ঠপুত্রের বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। নবীন সরকারের পরিচয় পাইয়া এবং গ্রামের আত্মীয়গণের সম্মতি লইয়া রসিকের সহিত বিধবা তাঁহার কন্যার বিবাহ দিতে সম্মত হইলেন।

তাহার পর শুভদিনে, শুভক্ষণে রসিকের বিবাহ হইয়া গেল। নবীন সরকার নববধূ গৃহে আনিলেন।

৪

বধূ যে দিন গৃহে আসিল, তাহার পরদিনই আমার বক্ষে তাহার সেই সুন্দর মুখের ছায়া পড়িল। চারিদিকে আনন্দ কোলাহল, সকলে উৎসবে মগ্ন; কিন্তু ঐ নিরুপমা কিশোরীর সুন্দর মুখের ছায়া আমার ক্ষুদ্রবক্ষে প্রতিবিম্বিত হইবা মাত্র, কি জানি কেন, আমি কাঁপিয়া উঠিলাম; কি জানি কেন আমার তরল বক্ষস্থল ফাটিয়া যাইতে লাগিল। কি জানি কেন ইচ্ছা হইতে লাগিল যে হৃদয়ের সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ঐ কুসুম কোমল মুখখানিকে বলি, "ওমা, যা, চলে যা, এ বাড়িতে তুই থাকিস না। এখানে তোর স্থান হবে না, মা, স্থান হবে না।"

সেই শুভদিনে কেন একথা আমার মনে হইয়াছিল, তাহা আমি জানিনা; কেন এমন মর্মভেদী কথা বলিবার জন্য আমার ক্ষুদ্র হৃদয় ব্যগ্র হইয়াছিল, তাহাও বলিতে পারি না। হায়! কেন ভগবান ঐ কিশোরীকে সেই মুহূর্তে এই গৃহ হইতে অপসারিত করিবার শক্তি আমাকে দেন নাই, তাহাই এখন বসিয়া বসিয়া ভাবি।

রসিকের বিবাহের এক বৎসর পরে নবীন সরকার দেহত্যাগ করিলেন। তাহার পতিপ্রাণা সহধর্মিণী অধিক দিন বৈধব্য ক্লেশ সহ্য করিতে পারিলেন না। পতির মৃত্যুর তিনমাস পরেই সমস্ত গৃহস্থালির ভার জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ যোগমায়ার হস্তে সমর্পণ করিয়া তিনি পতির উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন।

মোহন পরিবারের কর্তা হইল। যোগমায়া গৃহের কর্ত্রী হইলেন বটে, কিন্তু সংসারের কার্য দেখিবার মত শক্তি-সামর্থ্য তাঁহার ছিলনা। তিন বৎসর পূর্বে তাঁহার হাঁপানি ব্যাধি দেখা দেয়।

সেই রোগ ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে কঙ্কালসার ও সম্পূর্ণ অকর্মণ্য করিয়া ফেলিয়াছিল। তিনি সংসার দেখিবেন কি, তাঁহার রোগের সেবা করিবার জন্যই লোকের প্রয়োজন।

শাশুড়ির মৃত্যুর পর যোগমায়া বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। তখন ছোটবৌ কমলই তাহার একমাত্র অবলম্বন হইল। বয়স পনেরো বৎসর হইলেও গৃহস্থের মেয়ে কমলা অল্প সময়ের মধ্যেই শাশুড়ির মত গৃহস্থালির কাজকর্ম গোছাইয়া লইলেন। তাঁহার কার্য-কুশলতা দেখিয়া যোগমায়া বিশেষ প্রীত হইলেন এবং সংসারের সমস্ত ভার ছোট বউ কমলার উপর দিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন।

কিন্তু ভগবান তাঁহার ও কমলার অদৃষ্টে সুখ লিখেন নাই। তাই সকলের অজ্ঞাতসারে এই সরকার পরিবারের মস্তকের উপর একখানি কালো মেঘ ঘনাইয়া আসিল। সে মেঘ সুশীতল বারিধারা বর্ষণ করিতে ভুলিয়া গেল। তাহাব পরিবর্তে কঠোর বজ্রপাতে এমন সুখের সংসার ছারখাবে গেল। আমি একপার্শ্বে পড়িয়া সেই অশনি-নিনাদ শ্রবণ করিলাম—সেই বজ্রপতন দর্শন করিলাম। আর এখন সেই শোচনীয় ঘটনার কথা স্মরণ করিয়া নীরবে দীর্ঘনিঃশ্বাস

৫

মোহন সরকাব কাজকর্মে পিতার মতনই ছিল, কিন্তু তাহার স্বভাবচরিত্র নির্মল ছিলনা। যোগমায়া সুন্দরী ছিলেন না। তাহার পর তিনি একটি পুত্র বা কন্যারত্ন দিয়াও স্বামীকে বাঁধিতে পারেন নাই। অবশেষে এই কাল ব্যাধিতে তাঁহাকে এমন জীর্ণ-শীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিল যে, মোহন তাহার এই রুগ্না স্ত্রীতে অনুরক্ত হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহার প্রতি ঘোর বিরক্ত হইয়াই পড়িয়াছিল। হয়ত সে মনে-মনে যোগমায়ার মৃত্যু কামনা করিত। যতদিন পিতা বাঁচিয়া ছিলেন, মোহন ততদিন যাহা কিছু করিত তাহা গোপনেই করিত। তাহার অসৎ চরিত্রের কথা পিতামাতা বড় একটা জানিতে পারিতেন না; কিন্তু পিতার মৃত্যু পর যখন সে কর্তা হইয়া বসিল, তখন সে কোন কার্যই গোপন করিবার প্রয়োজন দেখিলনা। এতদিন যে সকল কুক্রিয়া গুপ্ত ভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছিল, সাবধানতার অপ্রয়োজন বশত ক্রমে ক্রমে তাহা প্রকাশিত হইয়া পড়িতে লাগিল। পূর্বে যেখানে দুই চারিটাকা অপব্যয়েই কুলাইয়া যাইত, এখন সেখানে বিশ পঁচিশ টাকা ব্যয় হইতে লাগিল। দুই চারি মাসের মধ্যেই মোহনের কুসঙ্গীসকল আসিয়া জুটিল। তখন আর লজ্জা ভয় কিছুই থাকিল না। অপব্যয়ের স্রোত ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। গ্রামময় মোহনের নিন্দা প্রচারিত হইতে লাগিল। মোহন অধঃপতনের পথে দ্রুতগতিতে নামিতে লাগিল।

রসিক সংবাদ পাইয়া একবার বাড়িতে আসিল, কিন্তু সে কি করিবে! বড়দাদাকে কোন কথা বলিতে তাহার সাহসে কুলাইল না। বধূঠাকুরানির রোগ-শয্যা পার্শ্বে বসিয়া সে তাহার অশ্রুর সহিত নিজের অশ্রু মিশাইল। বধূদ্বয়কে ভগবানেব উপর নির্ভব কবিতে বলিযা বসিকলাল ভগ্নহৃদয়ে হুগলী চলিয়া গেল। সে দিব্যচক্ষে দেখিল, সরকাব পরিবারেব পতন

অবশ্যম্ভাবী। তাহার দাদা সর্বস্ব উড়াইয়া দিয়া পথের ফকির হইবেন। এসময়ে তাহাকে বাধা দিবার শক্তি তাহার ছিল না। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও গুরুতর দণ্ড যে তাহার মস্তকে পড়িবে, তাহা সে স্বপ্নেও ভাবিতে পারি নাই।

পাপের পথে অগ্রসর হইয়া মানুষের যাহা হয়, মোহনের তাহাই হইল। কুপ্রবৃত্তির স্রোতে তাহার মনুষ্যত্ব নামিয়া গেল। দেশবিখ্যাত, পুণ্যশ্লোক, সদনুষ্ঠাননিরত, ধর্মপরায়ণ নবীন সরকারের পুত্র মোহন সরকার পিতার মৃত্যুর পর এক বৎসর যাইতে না যাইতেই একেবারে পাপ-পঙ্কে ডুবিয়া গেল। পল্লির কুলমহিলাগণ তাহাকে দেখিয়া সভয়ে লুকাইতে আরম্ভ করিল। দুই একটি দুঃখী পরিবারের কলঙ্ক কাহিনিও মোহন সরকারের সঙ্গে বিজড়িত হইল। কুসঙ্গীদিগের উৎসাহে তাহার কুকার্যের মাত্রা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। আর কি বলিব, সবশেষে তাহা সীমা অতিক্রম করিল।

কেমন করিয়া তোমরা —হে দেব শিশুগণ সে কাহিনি শ্রবণ করিবে। বুক ফাটিয়া গিয়াছে, তবুও মুখ ফোটে নাই। কতদিন বলিবার চেষ্টা করিয়াছি; কিন্তু সে অপবিত্র কাহিনি বলিতে পারি নাই। যাহা থাকে অদৃষ্টে আজ বলিয়া ফেলিব।

৬

দুরাত্মা মোহনের দৃষ্টি আজ দুই বৎসর হইতে তাহার ভাদ্রবধূর উপর পড়িয়াছিল। যেদিন সেই সোনার প্রতিমাকে গৃহে আনিবার জন্য নবীন সরকার ব্যগ্র হইযাছিলেন সেই দিনই এই সুন্দরী কুমারীকে দেখিয়া মোহনের হৃদয়ে পাপ-লালসা সঞ্চারিত হইয়াছিল। তাহার পর কমলা মোহনের ভাদ্রবধূ হইয়া তাহারই গৃহে আসিল। মোহন সুযোগের প্রতীক্ষা করিয়া রহিল। পিতা যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন, ততদিন মোহন চুপ করিয়া ছিল। পিতার মৃত্যুর পর এই একবৎসব সে বাহিরের নানা প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়াছিল। মধ্যে মধ্যে যদিও সে ঘরের দিকে লোলুপ দৃষ্টিপাত করিত, কিন্তু পরক্ষণেই বাহিরের মোহ তাহাকে চাপিয়া ধরিত।

অবশেষে একদিন সত্যসত্যই কুদিন আসিয়া পড়িল। মোহন প্রতিদিনই অনেক রাত্রিতে বাড়ি আসিত। বাড়িতে যে বুড়া ঝি ছিল, তাহাকে লইয়া কমলা সেই গভীর রাত্রি পর্যন্ত বসিয়া থাকিতেন, মোহনের আহারাদি হইলে তিনি বিশ্রাম করিতে যাইতেন।

আমি যে দিনের কথা বলিতেছি, সেদিন বুড়া ঝির শরীর অসুস্থ হইয়াছিল; তাই সে সকাল সকাল শয়ন করিতে গিয়াছিল; কমলা একাকিনী বসিয়া ছিলেন।

রাত্রি প্রায় এগারটার সময় মোহন বাড়ি আসিল; বাড়িতে তখন কেউই জাগিয়া নাই। যে ঘরে মোহনের ভাত ছিল, সেই ঘরের মধ্যে একটি প্রদীপ জ্বলিতেছিল। কমলা উন্মুক্ত দ্বারের সম্মুখে বসিয়া ছিলেন।

মোহনকে প্রাঙ্গণের মধ্যে দেখিবামাত্র অন্যান্য দিনের মত তিনি ঘরের বাহির হইয়া বারান্দার পার্শ্বে চলিয়া গেলেন। অন্যদিন বুড়া ঝি ঘরের পার্শ্বে বসিয়া থাকিত। আজ মোহন দেখিল ঝি উপস্থিত নাই; কমলা বারান্দার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছেন। মোহন এতদিন যে সুযোগ অনুসন্ধান করিতেছিল, আজ সেই সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে।

সে তখন ঘরের মধ্যে প্রবেশ না করিয়া যেদিকে কমলা দাঁড়াইয়া ছিলেন, সেই দিকে গেল এবং অস্পষ্ট স্বরে কি বলিয়া কমলার হাত চাপিয়া ধরিল। কমলার আর তখন কিছু বুঝিতে বাকি রহিলনা। তিনি তখন এক টানে হাত ছাড়াইয়া লইয়া অন্ধকারের মধ্যে কোথায় চলিয়া গেলেন।

আর কোথায় যাইবেন? গৃহবধূর জুড়াইবার স্থান, গৃহস্থ রমণীর আশ্রয় স্থান বাড়ির মধ্যে একা আমি। কমলা কাঁদিতে কাঁদিতে আমার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন, আমারই বক্ষের পার্শ্বে মাথা রাখিয়া অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন।

আমি ত সব দেখিয়াছি, সব বুঝিয়াছি, সব বুঝিতে পারি। আমার গাত্রে বক্ষসংলগ্ন করিয়া কেহ যখন দাঁড়ায়, তখন তাহার বক্ষ-স্পন্দনের মধ্য দিয়া আমি সে সব বক্ষ-স্পন্দনের মধ্য দিবা আমি সেসব কথা জানিতে পারি। সেদিনও কমলার সেই বক্ষস্পন্দনে তাহার হৃদয়ের সমস্ত বেদনা আমি আমার হৃদয়ের পরতে পরতে অনুভব করিলাম। ইচ্ছা করিতে লাগিল অভাগিনিকে আমার এই ক্ষুদ্র বক্ষের মধ্যে লইয়া চিরজীবনের-জন্য তাহার সকল দুঃখ যন্ত্রণার অবসান করিয়া দিই। কিন্তু ক্ষুদ্র কূপ আমি, —আমার সে শক্তি হইল না।

তখন একবার মনে হইল, আমার এই ক্ষুদ্র জলরাশি উদ্বেলিত করিয়া, উৎক্ষিপ্ত করিযা আবও উর্ধ্বে তুলিযা ঐ সাধ্বী যুবতীর মস্তকে বদনে হস্তে ছিটাইয়া দিই; পাপাত্মার স্পর্শ কালিমা ধুইয়া-মুছিয়া দিই; কিন্তু ক্ষুদ্র আমি ত—অতি ক্ষুদ্র কূপ না আমি—আমার মধ্যে সে বাণ ডাকিল না। আমার জল মৃত্তিকার বহু নিম্নে পড়িয়া রহিল। নিজের দুর্বলতার জন্য আমি তখন অধীব হইয়া পড়িলাম; তখন যুক্ত করে ডাকিলাম—হে ইন্দ্র, তোমার বজ্র কি এই দুরাত্মার মস্তকে পতিত হইবে না? সতী রমণীর—নিজের কন্যাসমা ভাদ্রবধূর গায়ে যে পাপ কলঙ্কিত হস্ত অর্পণ করিয়াছে, তাহার হস্ত কি খসিয়া পড়িবে না? ধর্ম কি নাই—ওগো ধর্ম কি নাই?

আমি আর বলিতে পারিলাম না। কমলা আমার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া করুণ কণ্ঠে হৃদয়ের সমস্ত বেদনা একত্রীভূত করিয়া সেই শেষবার বলিল—"মা গো" আর সেই মুহূর্তেই কয়েকটি তপ্ত অশ্রুবিন্দু আমার বক্ষে আসিয়া পড়িল। সে ত অশ্রুবিন্দু নয়। সে কি তাহা আমি বলিতে পারিব না; সেই কয়বিন্দুতে আমার হৃদয়ে যে আগ্নেয়গিরি সৃষ্টি হইয়াছে তাহার জ্বালা আজও আমি অনুভব করিতেছি।

তাহার পর—তাহার পর কি হইল শুনিবে? পরদিন শুনিলাম সতী-সাধ্বী কমলার দেবীদেহ ঐ পুকুরের জলে ভাসিয়া উঠিয়াছে। বহু পুণ্যফলে ঐ পুকুর সতী-সাধ্বীর সকল জ্বালা জুড়াইয়া দিয়াছে,—আমি পারি নাই।

তাহার পর—তাহার পর যাহা হইয়াছে, তাহা সকলে আসিয়া দেখিয়া যাও। যোগমায়া মরিয়া গিয়াছেন—রসিক পাগলা হইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। নবীন সরকারের গৃহ ভাঙিয়া পড়িয়াছে। সতীর দীর্ঘ নিঃশ্বাসে সব উড়িয়া পুড়িয়া গিয়াছে।

পাপাত্মা মোহনের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ? তাহার কুষ্ঠ ব্যাধি হইয়াছে;—সে এখন ঘরে ঘরে ভিক্ষা করিয়া খায়। যে হাতে সতী রমণীর পবিত্র দেহ স্পর্শ করিয়াছিল, সে হাত এখনও খসিয়া পড়ে নাই; এই জন্য মোহন এখনও বাঁচিয়া আছে।

মহৌষধি

গাঁয়ের সকলে বলে, সনাতন পালের হাতে অনেক টাকা আছে। সনাতন কিন্তু বলে, সে কায়ক্লেশে যা রোজগার করে, তাতে তার সংসারই চলেনা, টাকা জমাবে কোথা থেকে। যে মাগ্‌গির দিন, আটগণ্ডা পয়সার কমে বাজার-খরচই কুলায় না।

আমরা কিন্তু জানি, সনাতনের বাজার-খরচ অত লাগে না। তারা তিনটি মানুষ,—সনাতন,—তার, স্ত্রী আর একমাত্র বংশধর শ্রীমান প্রহ্লাদচন্দ্র;—বাপ মা ও প্রতিবেশীরা আদর করিয়া ডাকে পেল্লাদ। সনাতন কোনদিন দু পয়সার বেশি মাছ কেনে না। একদিন যদি আধসের বেগুন নিয়ে আসে, তাহলে তিন দিন আর সে তরকারির বাজারের দিকে ও যায় না। গ্রামের কেহ কোন দিন দেখে নাই যে, সনাতনের পরনের কাপড়খানি হাঁটুর নিম্নে নামিয়াছে। জুতা যে কেমন করিয়া পায়ে দিতে হয়, সনাতন তাহা জানিত না। বহুদিন পূর্বে, বোধ হয় তাহার পিতার আমলে—সে এক জোড়া খড়ম কিনিয়াছিল। কদাচিৎ কখনও রাত্রিকালে আহারান্তে পা ধুইয়া সে সেই খড়ম জোড়া পায়ে দিয়া বাড়ির উঠানে একটু-আধটু বেড়াইত।

সনাতনের বাড়িতে আড়াই-খানি ঘর,—একখানি শয়নঘর; তাহারই বাবান্দায় তাহাদের দোকান, আর একখানি রান্নাঘর, আর আধখানি কাট-খড় রাখিবার ঘর। আমাদের গাঁয়ের বাজারে তাহার একখানি ছোট চালা ছিল। সে চালাখানির চারিদিকেই খোলা। সেইখানে সনাতন দোকান সাজাইয়া বসিত।

বেলা আটটার সময় স্নান করিয়া অল্প দুটি চাউল ও এক ঘটি জল খাইয়া সনাতন একটা বড় ঝাঁকা মাথায় করিয়া বাজারে যাইত। ঝাঁকার মধ্যে গুটি পাঁচেক হাঁড়ি এবং একজোড়া 'দাঁড়ি-বাটখারা' থাকিত। কোন হাঁড়িতে গুড়ের মুড়কি, কোন হাঁড়িতে রাঙা চিনি এবং কোন হাঁড়িতে গুড় থাকিত। যে চটখানি দিয়া সে ঝাঁকা ঢাকিয়া লইয়া যাইত, সেই খানি দোকানে পাতিয়া এবং সম্মুখে হাঁড়ি কয়টি সাজাইয়া সনাতন বেচা-কেনা করিত। বেলা একটার সময়, যখন বাজারে একটিও খরিদ্দার দৃষ্ট হইত না, সেই সময়ে সনাতন দোকান পাট আবার গুছাইয়া ঝাঁকায় বসাইয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিত। যে সময় দোকান করিত, সেই সময়ের মধ্যে পার্শ্ববর্তী দোকানদারকে তাহার ঘরের দিকে একটু নজর রাখিবার অনুরোধ করিয়া সে হাটটা-বাজারটা করিয়া আসিত। অনেক সময় ইহার উহার দ্বারাও পানটা তামাকটা কিনাইয়া আনিত। কিন্তু যে একদিন তাহার আধ পয়সার তামাক কিনিয়া আনিয়া দিয়াছে, সে আর কোনদিন সনাতনের তামাক কিনিতে সহজে সম্মত হইত না। আধ পয়সার তামাক কিনিয়া আনিয়া আড়াই কুড়ি প্রশ্নের উত্তর দিতে, কৈফিয়ত দিতে কেহই বড় সহজে সম্মত হইত না। "সলিম ভাই, আধ পয়সায় এইটুকু তামাক! তুমি ভাল করে ওজনটা দেখে নিয়েছ ত! দাঁড়ি-পাল্লাটা দেখেছিলে ত? পাষাণ ছিল না ত?"—ইত্যাদি ইত্যাদি প্রশ্নে সলিম সেখকে অস্থির হইয়া উঠিতে হইত।

২

সনাতন দুই বেলাই বাজারে দোকান খুলিত। এদিকে গ্রামের ছেলেমেয়েরা সনাতনের বাড়ি হইতে মুড়কি, বাতাসা, চিনি, গুড় কিনিয়া আনিত; সনাতনের স্ত্রী বিক্রয় করিতেন। যতদিন পেল্লাদ জন্মগ্রহণ করে নাই, ততদিন সনাতনের স্ত্রীকে পাড়ার সকলে 'পালবৌ' বলিয়া ডাকিত। পেল্লাদের জন্মের পর হইতে, তিনি 'পেল্লাদের মা' হইয়া গেলেন।

পেল্লাদ জন্মগ্রহণ করায় সনাতন খুবই আনন্দিত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই; কিন্তু এই আগন্তুকটির নিমিত্ত তাহার যে কিঞ্চিৎ ব্যয়বাহুল্য ঘটিতে লাগিল, সে জন্য প্রায়ই তাহাতে চঞ্চল হইতে দেখা যাইত। ছেলের জন্য সে প্রথমে একপোয়া, কিছুদিন পরে আধসের দুধ যোগান করিয়াছিল। কিন্তু ছেলের জন্মের আট নয় মাস পরে যখন পালবৌ সনাতনকে বলিলেন, "ষেটের কোলে বাছা আমার বড় হ'ল—আধসের দুধে এখন আর কুলোয় না।"

তখন সনাতন রাগ করিয়া বলিয়াছিল, "ঐ আধসেরই ঢের। কতজন যে মোটেই দুধ পায়না, তাদের ছেলে বুঝি মানুষ হয়না। ছেলে হয়েছে বলে ত আর পয়মাল জেরবার হতে পারিনে।" পালবৌ আর প্রতিবাদ করিলেন না। সেইদিন হইতে ছেলেকে ভাত খাওয়াইতে আরম্ভ করিলেন।

একদিন দ্বিপ্রহরে সনাতন বাজার হইতে বাড়ি ফিরিয়া দেখে ঘরের দাবায় বসিয়া পেল্লাদ একখানি বাতাসা চাটিতেছে! আর যাবে কোথা—সনাতন পাল বৌকে এই মারে ত এই মারে! শেষে সে রাগিয়া বলিল, "এমনি করেই আমাকে ফতুর করবে। এই বাড়িতে আর দোকান রাখছিনে।" কিন্তু বাড়ির দোকান হইতে বিলক্ষণ দুই পয়সা আয় হইত; কাজেই সনাতন বাড়ির দোকান তুলিয়া দিতে পারিল না। পালবৌকে, বিশেষ সাবধান করিয়া দিল।

এ হেন সনাতনের হাতে যে বিলক্ষণ দশটাকা থাকিবার কথা, তাহা কেহই অস্বীকার করতে পারেন না। সনাতন কিন্তু একথা কিছুতেই স্বীকার করিত না। সে বলিত, "যে সামান্য বেসাত, তাতে কায়-ক্লেশে মাসে দশটাটাকাও লাভ হয়না। লাভের গুড় পিঁপড়েই খেয়ে যায়।" .

৩

সনাতনের ইচ্ছা ছিল যে, পেল্লাদকে গ্রামের পাঠশালায় অল্প কয়দিন পড়াইয়া জাতীয় ব্যবসায়ে তাহাকে নিযুক্ত করিয়া দিবে। হাতের লেখাটা দোরস্ত* হওয়ায়, আর হিসাব পত্রটা রাখা,—এইটুকু শিক্ষা হইলেই, তাহার ছেলের পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া মনে করিয়াছিল। কিন্তু প্রতিবেশী হলধর ভট্টাচার্য পেল্লাদের কর-কোষ্ঠী দেখিয়া যখন সনাতনকে বলিলেন, "দেখ বাপু

* পরিপাটি বা সুন্দর।

সনাতন, তোমার এই ছেলেটা দিগ্বিজয়ী পুরুষ হবে, খুব রোজগেরে হবে। একে মুখ্যু করে রেখোনা।"

এই কথা শুনিয়া কি জানি কেন সনাতনের মন ফিরিয়া গেল। সে ভট্টাচার্য মহাশয়ের পদধূলি লইয়া পেল্লাদের মাথায় দিয়া বলিলেন, "বেহ্মবাক্যি, ও আমাকে শুনতেই হবে। ছেলেটাকে তা হলে আর পাঠশালায় দেব না,—বাঙলা ইস্কুলে দেবো। তবে সেখানে শুনেছি মাসে মাসে দুই আনা করে মাইনে দিতে হবে, তাই ভাবছি।"

ভট্টাচার্য মহাশয় সনাতনের কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "বুঝেছ সনাতন, ছেলেটার পেছনে এখন দুটাকা, পাঁচটাকা খরচ কর; শেষে দেখবে, ঐ ছেলে শ'য়ে শ'য়ে টাকা রোজগার করে আনবে।"

সনাতন শ'য়ে শ'য়ে রোজগারের মনোমোহন চিত্র কল্পনা করিয়া মনটাকে বেশ নরম করিয়া ফেলিল। ভাল দিন দেখিয়া পেল্লাদকে বাঙলা ইস্কুলে ভর্তি করিয়া দিল, এবং বেহ্মবাক্যি অব্যর্থ বুঝিয়া পেল্লাদের পিছনে টাকাটা-সিকেটা খরচ করিতে আরম্ভ করিল।

পেল্লাদের বয়স যখন দশ বৎসর, তখন সে বাঙলা ইস্কুলের পঞ্চম শ্রেণিতে এমন আটকাইয়া গেল যে, পরবর্তী দুই বৎসরেও তাহাকে সেখান হইতে উপরেও তোলা গেল না, নীচেও নামান গেল না।

প্রতিবেশী হলধর ভট্টাচার্য মহাশয় তখন বাঁচিয়া ছিলেন। সনাতন তাঁহার পরামর্শ জিজ্ঞাসু হইলে ভট্টাচার্য মহাশয় বলিলেন, "যে রকম দিনকাল পড়েছে, বুঝেছ সনাতন, তাতে ছেলেদের বেশিদিন বাঙলা স্কুলে পড়িয়ে কোন লাভ নেই। এই দেখ না, আমার ছেলেটাকে ইংরেজি স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছি। এখন ইংরেজের মুল্লুক, ইংরেজিরই আদর বেশী। আর জগদম্বার কৃপায় বুঝেছ সনাতন, তোমার হাতেও কিছু আছে; আর আয়ও নিতান্ত মন্দ নয়। আমি বলি কি, বুঝেছ সনাতন, ছেলেটাকে ইংরেজি ইস্কুলে ভর্তি করে দাও। তোমার ছেলে খুবই কপালে পুরুষ, বুঝেছ সনাতন, ইংরেজি স্কুলে ওর মোটেই বাধবেনা। তুমি যদি আর দশটা বছর বেঁচে যাও, বুঝেছ সনাতন, তা হলেই দেখে যেতে পারবে, তোমার ছেলের কি হয়। এই যে করকোষ্ঠী, বুঝেছ সনাতন, এটা বিধাতার যেন হাতের লেখন—একেবারে শাস্ত্রবাক্যের মতন অব্যর্থ।"

তখন সনাতনের মনে নূতন আশার উদয় হইল। সে ছেলেটিকে ইংরেজি স্কুলে ভর্তি করিয়া দিল। আর সে নিজে ঝাঁকা মাথায় করিয়া প্রতিদিন যথানিয়মে বাজারে দোকান করিতে লাগিল।

এদিকে শ্রীমান পেল্লাদচন্দ্র ইংরেজি স্কুলে ছয় বৎসর পড়িয়া যখন চতুর্থ শ্রেণিতে উন্নীত হইল, তখন তাহার বয়স সতেরো বৎসর। সনাতন ছেলের জন্য কিছু-কিছু ব্যয় করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। শ্রীমান পেল্লাদচন্দ্র পিতার উপর ক্রমেই বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিল। তাহার পিতা ঝুড়ি মাথায় করিয়া বাজারে দোকান করিতে যায়, তাহার পিতা খালি-পায়ে হাঁটুর উপর কাপড় পরিয়া, গামছা কাঁধে করিয়া চলাফেরা করে, ইহা তাহার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। সে কাহারও কাছে মুখ দেখাইতে পারিতনা। সকলেই তাহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিত,—ইহা সে

কেমন করিয়া সহ্য করিবে। মাতার নিকট অনেকদিন সে একথা বলিয়াছে। কিন্তু তাহার মাতা কি করিবেন। প্রহ্লাদের ন্যায় ইংরেজি-পড়া পুত্রের পিতা হইবার জন্য যাহা-যাহা প্রয়োজন, সনাতন যে জীবনের সায়াহ্নকালে তাহা করিতে পারে না, একথা পালবৌ পুত্রকে অনেক বুঝাইলেন।

প্রহ্লাদচন্দ্র শেষে বলিল, "তাহলে আমি আর এখানে পড়ব না। আমাকে কলকাতায় কি কি কেষ্টনগবের স্কুলে ভর্তি করে দাও। মাসে কুড়ি টাকা খরচ হলেই আমার চলবে।"

মাসে কু-ড়ি-টা-কা! সনাতনকে বাঁধিয়া মারিলেও সে ছেলের জন্য মাসে-মাসে কুড়ি টাকা দিতে পাবিবে না।

পালবৌ এমন অসঙ্গত প্রস্তাব স্বামীব নিকট উপস্থিত করিতে সাহসী হইলেন না। সতেরো বৎসর বয়সের উপযুক্ত পুত্র শ্রীমান প্রহ্লাদচন্দ্র রাগে অধীর হইয়া কৃপণ পিতার কবল হইতে উদ্ধার লাভের উপায় চিন্তা করিতে লাগিল।

অনেক চিন্তার পর সে স্থির করিল, একদিন সুযোগ বুঝিয়া পিতার তহবিলের বাক্স ভাঙিবে এবং সেই বাক্সে যাহা পাইবে, তাহা লইযা দেশত্যাগ করিবে। তারপর যা থাকে অদৃষ্টে।

এই শুভ-সংকল্প কার্যে পবিণত কবিতে শ্রীমান প্রহ্লাদচন্দ্রের অধিকদিন অপেক্ষা কবিতে হইল না। একদিন সে পিতার বাক্স ভাঙিয়া নোটে ও নগদে সাড়ে তিনশত টাকা লইয়া কোথায় প্রস্থান করিল।

সনাতন পুত্রবিচ্ছেদে এবং ততোধিক অর্থশোক মাথায় হাত দিয়া বসিল; আব পাল-বৌ উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। "ওরে বাপ্ পেল্লাদরে , তুই কোথায় গেলি রে!"

৪

শ্রীমান প্রহ্লাদচন্দ্র একেবারে কলিকাতায় উপস্থিত হইল। পূর্বে সে কখনও বাড়ির বাহির হয নাই। শিয়ালদহ স্টেশনে নামিয়াই ত তাহার চক্ষু স্থির। এত বাড়ি, এত লোকজন, এত গাড়ি-ঘোড়া সে কখনও দেখে নাই।

স্টেশনের বাহির হইয়া সে ভাবিতে লাগিল, কোথায় যায়। তখন তাহার মনে হইল, তাহাদেরই গ্রামের চক্রবর্তীদিগের ছেলে রসিক কলিকাতায় পড়ে, এবং মুসলমান পাড়া লেনে—নং বাড়িতে একটি মেসে থাকে।

সন্ধ্যা হইবার বিলম্ব নাই, সঙ্গে কোন জিনিস পত্র ও নাই। সে একজনকে মুসলমান পাড়া লেনের কথা জিজ্ঞাসা করিল। সে লোকটি বলিল, "আমি জানি না।"

আর একজনকে জিজ্ঞাসা করিল—সে "ঐ দিকে"—বলিয়া লোয়ার সার্কুলার রোডের পথ দেখাইয়া দিল। প্রহ্লাদ সোজা পথ দেখিয়া সার্কুলার রোড ধরিয়া দক্ষিণ দিকে চলিতে লাগিল।

কিছুদূর যাইয়া একটি লোককে জিজ্ঞাসা করিল। সে বলিল, "মুসলমান পাড়া লেন। সে আবার কোথায়! আমি জানি না।"

তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে—রাস্তায় গ্যাস জ্বলিয়াছে। প্রহ্লাদচন্দ্রের মনে বড় ভয় হইল। এতবড় শহর—তাহার সম্পূর্ণ অজানা স্থান—সঙ্গে প্রায় সাড়ে তিনশত টাকা;—ভয়ে তাহার বুক কাঁপিতে লাগিল।

একবার মনে করিল, বাড়ি ফিরিয়া যায়। শিয়ালদহ স্টেশন সে চিনিয়া যাইতে পারিবেই। পরক্ষণেই ভাবিল, কোন মুখে বাড়ি ফিরিয়া যাইবে। কলিকাতায় কি একটু থাকিবার স্থান হইবে না?

রাস্তার উপরে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকা অকর্তব্য মনে করিয়া সে পুনর্বার দক্ষিণ মুখে যাইতে লাগিল। একটু যাইতেই এক যুবকের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। তাহাকে মুসলমান পাড়া লেনের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, যুবক বলিল, "মুসলমান পাড়া লেনে যাবেন, ত এদিকে এসেছেন কেন? আপনি ঠিক উল্টা পথে এসেছেন। আমার সঙ্গে আসুন, আমি বৈঠকখানা রোডে যাব; তার কাছেই মুসলমান পাড়া লেন—আমি আপনাকে দেখিয়ে দেব।"

প্রহ্লাদচন্দ্র অকূলে কূল পাইল। যুবকটি ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলে পড়ে। সে কথায় কথায় প্রহ্লাদের সকল বৃত্তান্ত জানিয়া লইল। তাহার পর সে বলিল, "আপনি ছেলে মানুষ,—মা বাপের উপর রাগ করে, কাউকে কিছু না বলে, কলকাতায় আসা ভাল হয়নি। তাঁরা হয়ত কত ভাবছেন, কত কান্নাকাটি করছেন। আপনি আজ রাত্রেই বাড়ি ফিরে যান।"

প্রহ্লাদ একটু ভাবিয়া বলিল, "কলকাতায় যখন এসেছি, তখন দুই একদিন থেকে, সব দেখে শুনে, তারপর না হয় বাড়ি ফিরে যাব।"

যুবক বলিল, "তা'হলে কালই বাড়িতে একখানি চিঠি লিখে দেবেন, না হয় একটা তার করবেন।"

প্রহ্লাদ বলিল, "আচ্ছা, তাই করা যাবে।"

তারপর প্রহ্লাদকে সঙ্গে লইয়া যুবক মুসলমান পাড়া লেনের সেই মেসে উপস্থিত হইল। রসিক চক্রবর্তীর অনুসন্ধাম করায় মেসের একটি ছাত্র বলিল, "রসিকবাবু আজ দুইটার ট্রেনে মামাবাড়ি চলে গিয়েছেন। বলে গিযেছেন যে, তাঁর ফিরতে পাঁচ সাতদিন দেবি হবে।"

যুবকটি প্রহ্লাদকে দেখাইয়া বলিল, "ইনি রসিকবাবুর গাঁয়ের লোক। তাঁর এখানে উঠবেন বলে আজ বাড়ি থেকে এসেছেন।"

মেসের ছাত্রটি বলিল, "রসিকবাবু ত তাঁর ঘর তালাবন্ধ করে গিয়েছেন। আর তিনি কিছু বলেও যাননি,—এ অবস্থায় একে আমরা কেমন করে স্থান দিই।"

প্রহ্লাদের মুখ শুকাইয়া গেল। সে কি করিবে, ভাবিয়া পাইল না।

তাহার অবস্থা দেখিয়া যুবকটি বলিল, "তা'হলে আপনি আমার সঙ্গেই চলুন, আমাদেব মেসে খাওয়া-দাওয়া করে নেবেন, তারপর আমি আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে শিয়ালদহ স্টেশনে গিযে গাড়িতে তুলে দিয়ে আসব।"

প্রহ্লাদ বিমর্ষভাবে বলিল, "তা হলে তাই হবে।"

যুবকটি প্রহ্লাদকে লইয়া তাহাদের মেসে গেল। আহারাদি হইয়া গেলে যুবক বলিল, "তা হলে চলুন, মেল ছাড়বার আর বেশি দেরি নাই।"

প্রহ্লাদ বলিল, "তাই ত, এত খরচপত্র করে কলকাতায় এলাম, শহরটা একবার দেখে-শুনেও যেতে পারলাম না।"

প্রহ্লাদের মনের ভাব বুঝিয়া যুবক বলিল, "যদি আপনি ইচ্ছে করেন, তাহলে দু-একদিন আমাদের মেসে থেকে সব দেখে শুনে যেতে পারেন।"

প্রহ্লাদ হৃষ্টমনে এই প্রস্তাবে সম্মত হইল। তাহার সঙ্গে যে এত টাকা আছে, সে কথা সে যুবকটির নিকট ভাঙে নাই, যুবকও সে বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করে নাই।

৫

রাত্রিতে শয়ন করিয়া প্রহ্লাদচন্দ্র ভাবিতে লাগিল, এখন কি করা যায়। স্কুলে পড়া আর ভাল লাগেনা; বাড়িতে ফিরিয়া যাইয়াই বা সে কেমন করিয়া সকলের নিকট মুখ দেখাইবে। এতগুলি টাকা সে বাক্স ভাঙিয়া লইয়া আসিয়াছে, টাকার জন্য তাহার পিতার নিকট তাহাকে যথেষ্ট লাঞ্ছনা ভোগও করিতে হইবে। তাহার সামান্য বুদ্ধিতে সে কোন উপায়ই খুঁজিয়া পাইলনা। ভাবিতে-ভাবিতে সে নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

প্রাতঃকালে তাহার নব-পরিচিত বন্ধু আশুতোষ বলিল, "আপনি এখন বাসাতেই একটু থাকুন;—আমাকে এখনই কলেজে যেতে হবে। নটার সময়-ই আজ আমাদের কলেজ শেষ হবে; তারপর সারাদিন ছুটি। আবার রাত্রি আটটার পর আমার ডিউটি আছে; তখন আবার যেতে হবে। খাওয়া-দাওয়ার পর আপনাকে শহর দেখিয়ে আনব।" প্রহ্লাদ তাহাতেই সম্মত হইয়া বাসায় বসিয়া থাকিল।

নয়টার পর আশুতোষ কলেজ হইতে আসিয়া প্রহ্লাদকে লইয়া স্নান-আহার শেষ করিল। তারপর সে বলিল, "এখন একটু বিশ্রাম করা যাক্—বেলা তিনটার সময় বাহির হলেই হবে।" প্রহ্লাদ তাহাতেই সম্মত হইল।

শয়ন করিয়া প্রহ্লাদ তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের আলোচনা আরম্ভ করিল। আশুতোষ বুঝিল তাহার আর পড়াশুনা করিবার অভিপ্রায় নাই। সে তাহাকে বলিল, "আপনি যদি একটা কাজ করেন, তবে বেশ হয়।"

প্রহ্লাদ আগ্রহ ভরে বলিল, "কি বলেন। আপনি যা বলবেন আমি তাই করব।"

আশুতোষ বলিল, "দেখুন আপনি হোমিওপ্যাথি শিখুন। কলেজেও পড়তে হবে না, মুখস্থও করতে হবে না। সোজা দেখে খান-দুই বাংলা বই কিনে নেন, আর এক বাক্স ওষুধ কিনে নেন। আপনি যদি পাঁচ-সাতদিন এখানে থাকেন, তাহলে আমিই আপনাকে কাজ চালাবার মত হোমিওপ্যাথি শিখিয়ে দিতে পারি। আমি বলি কি, আজ আপনি বাড়িতে চিঠি লিখে দিন যে, আপনি ৫/৭ দিন এখানে থাকবেন। আর আপনার বাবাকে যদি চিঠি লেখেন, তাহলে তিনি অবশ্যই বিশ-ত্রিশ টাকা পাঠিয়ে দেবেন। পঁচিশ-ত্রিশ টাকা হলেই সব কেনা হয়ে যাবে।"

প্রহ্লাদ সোৎসাহে বলিল, "টাকার জন্য বাবাকে লিখতে হবে না, দুশো তিনশো যদি লাগে তা আমার কাছেই আছে। আর বাড়িতে চিঠি লিখবার কথা যা বলছেন, আমি বলি কি চিঠি লিখে কাজ নেই। চিঠি লিখলেই বাবা অমনি এসে পড়বেন, তখন আমাকে তার সঙ্গে বাড়ি ফিরে যেতেই হবে। তার থেকে, পাঁচ-সাত দিন ত তাঁরা একটু না হয় ভাববেন। তারপরই ত বাড়ি ফিরে যাবো;—তাতে আর এমন কি হবে।"

প্রহ্লাদ দুইটি কথা ভাবিয়া এ প্রস্তাব করিয়াছিল; প্রথম তাহার পিতা আসিলে সেইদিনই তাহাকে বাড়ি লইয়া যাইবেন, আর তাহার ডাক্তার হওয়া হইবে না। দ্বিতীয়ত, সে এখানে আসিয়া ভদ্রলোক হইয়াছে। এ অবস্থায় তাহার বাবা যদি সেই হাঁটুর উপর কাপড় পরিয়া, খালি পায়ে, একখানি চাদর কাঁধে করিয়া আসিয়া উপস্থিত হন, তাহা হইলে প্রহ্লাদের লজ্জা ও অপমানের অবধি থাকিবে না।

আশুতোষ বলিল, "বেশ, তাহলে তাই হবে। আর আপনি বলেছিলেন, আপনার সঙ্গে দু-তিনশো টাকা আছে, সেগুলি এমন করে পকেটে রাখবেন না। এখানে লোকের পকেট থেকে টাকাকড়ি সর্বদাই চুরি যায়। আপনি টাকাগুলো কোঁচার খুটে বেঁধে রাখুন। আমার কাছে অত টাকা দিয়ে কাজ নেই। আজই হোমিওপ্যাথি বই ও ওষুধের বাক্স কিনে আনা যাবে। যা যা দরকার, সব আজই কিনে দেবো; তারপর মোটামুটি ওষুধগুলোর ব্যবহার আপনাকে শিখিয়ে দেব। তাহলেই আপনি বাড়ি গিয়ে চিকিৎসা করতে পারবেন।

আশুতোষের এই পরামর্শ শুনিয়া প্রহ্লাদচন্দ্র বড়ই আনন্দিত হইল, তাহার ভাবনা দূর হইল।

৬

বেলা দুইটার সময় বাহির হইয়া প্রথমে তাহারা আলিপুরের বাগান দেখিতে গেল। সেখান হইতে ফিরিয়া যাদুঘর, বড়বড় দোকান, মিউনিসিপ্যাল মার্কেট প্রভৃতি দেখিতে দেখিতেই বেলা অবসান হইল। তখন আশুতোষ বলিল, "আজ ত সন্ধ্যা হয়ে এল, আর আর বই-ওষধ কিনে কাজ নাই। কাল সকালে আমার একঘণ্টা কলেজ, আমি সাড়ে আটটার সময় ফিরব। তখনই বেরিয়ে সব কিনে ফেলা যাবে।"

প্রহ্লাদের যদিও এ বিলম্ব অসহ্য বোধ হইল, কিন্তু উপায় যখন নাই তখন অগত্যা তাই। পরদিন সুপ্রভাত হইতেই অর্ধ-জাগরিত প্রহ্লাদ শুনিল, ঘরের ভিতরে একটা কি সাঁই সাঁই শব্দ হইতেছে, ভাবিল এ ইঞ্জিনের আওয়াজ। তাহার বাবা বোধ হয় রাতারাতি ঘুমন্ত প্রহ্লাদকে রেলগাড়িতে তুলিয়া দেশে লইয়া যাইতেছেন। সে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বসিল, অমনি আশুতোষ বলিল, "উঠেছেন? কি ঠাওরালেন? হোমিওপ্যাথি শেখাই স্থির, না, এই সকালের ট্রেনে বাড়ি যাবেন? আটটায় ট্রেন আছে।"

প্রহ্লাদ বলিল, "না, হোমিওপ্যাথি শেখাই স্থির।"

"তবে যান তাড়াতাড়ি মুখহাত ধুয়ে নিন্। জল ফুটছে, আপনি এলেই চা ফেলে দেব। চা খাওয়ার, অভ্যাস আছে ত?"

প্রহ্লাদ ভাবিল, এটা নিশ্চয়ই শহুরে অভ্যাস। আর বোধ হয় হোমিওপ্যাথির একটা অঙ্গ।

'না' বলা হইবে না। অথচ 'হাঁ' বলিলে লোকটা যদি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বসে, টাটকা খান কি বাসি? অত গোলে কাজ কি? বলিল, 'বিলক্ষণ!''

আশু সোল্লাসে বলিল, ''বেশ বেশ। তবে আর দেরি করবেন না, আর যদি কড়া খাওয়া অভ্যাস থাকে ত বলুন, আমি এই বেলা পটে চা দিয়ে জল দি।''

বাতাসার ভিয়ান কেমন, তা প্রহ্লাদের জানা আছে। কড়া পাকও সে বোঝে; কিন্তু চায়ের ভিয়ানটা কেমন করিয়া হয়, তাহা দেখিতে হইবে। ঐ ত ঘরের কোণে একটা আকা না কি জ্বলিতেছে—তাহাতে কাঠের সম্পর্ক নাই। তার উপর আস্‌কে হাঁড়ির মত একটা কি চাপানো, তার সরুগলা আবার মুণ্ডিওয়ালা। অপর হাঁড়িটার গা থেকে একটা কি চোঙের মত বাহির হইয়াছে, সেটাকে হাঁড়ির শুঁড় বলা যাইবে কি লেজ, তাহাও ঠিক করা দায়! এ হেন হাঁড়িতে চায়ের ভিয়ান কিরূপে হয়, তাহা ত শিখিতে হইবে, আব দুদিন পরেই ত তাহারও এ সব চাই।

প্রহ্লাদ বলিল, ''তাড়া কি? আমি এলেই হবে এখন।''—বলিয়া সে প্রাতঃকৃত্য সারিতে গেল।

৭

বোধ করি সেদিন আর প্রহ্লাদের প্রাতঃকৃত্যটা ভাল হইল না। একে হোমিওপ্যাথির উৎসাহ, তদুপরি চা পানের আগ্রহ, প্রাতঃকৃত্য সময়ে তাহার কেবলই মনে হইয়াছে, আচ্ছা চা খাইতে কেমন? টক, ঝাল? না নোনতা? সহজে খাইতে পারা যাইবে ত, না, মুখ কুটকুট করিবে? বুনো ওল, বাঘা তেঁতুল, আর কাঁচালঙ্কার রসে যাহার রসনা সুরসিক, পৃথিবীতে আর তাহার ডরাইবার কিছু নাই।

প্রহ্লাদ তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আসিয়া দেখিল একখানা এনামেল রেকাবিতে মানকচুর মত চাকা-চাকা কাটা কি কতকগুলা সাজান রহিয়াছে। সে একেবারে ঠিক করিল, এই রে এই! এরেই বোধ হয় বলে পাঁউরুটি, চায়ে মাখিয়া খাইতে হয়! যাহাতে চাযের ভিয়ানের তিলমাত্র অনুষ্ঠান তাহার লক্ষ না এড়ায়, এমনি সতর্ক হইয়া প্রহ্লাদ একটা জরাগ্রস্ত টুলের উপর বসিল। আশুতোষ অতিথি সৎকারে মনোনিবেশ করিল।

প্রথমত পটের ঢাকনি খুলিয়া চা দেওয়া, তৎপরে ফুটন্তজল, খানিক পরে পটের শুঁড় বা লেজ দিয়া লোহিত বর্ণ জল বাহির করিয়া তাহা এনামেল পেয়ালায় ধরিয়া লওয়া, সবশেষে দুধ, চিনি প্রভৃতি মেশান, দেখিতে দেখিতে প্রহ্লাদ ভাবিতে লাগিল, ও হরি, এ যে দেখছি—সেই গাঁয়ের শুকনো পাটশাক বা নাল্‌তে, শহরে এসে চা হয়েছে। তাও আবার দুধ চিনি মেখে খেতে হয়, গরম, গরম! দেশেও ঢের পাওয়া যাবে, মিথ্যে কিনে দরকার নাই, তার চেয়ে পোষাক খুব জম্‌কাল গোছের করতে হবে।

ইত্যবসরে আশুতোষ চা-ভরা একটা পেয়ালা ও কয়েক টুকরা রুটি প্রহ্লাদের দিকে অগ্রসর করিয়া দিয়া বলিল—''আরম্ভ করুন।''

হাঁ! আরম্ভ কি করে করতে হয়, তাও শিখে নিতে হবে! আশুতোষ যেমন-যেমন করিতে লাগিল, প্রহ্লাদও ঠিক তেমনি-তেমনি অনুকরণ করিতে আরম্ভ করিল।

চা খাইতে খাইতে আশু বলিল, "হোমিওপ্যাথি ব্যাপারটা কি জানেন, এতে বিশেষ কিছু শেখবার নাই, কেবল জেনে রাখলেই হ'ল",—"বিষে বিষ ক্ষয়।" মনুষ্য শরীরে যেমন রোগের বিষ ঢোকে, সেই রকম আর একটা বিষ রোগীকে খাইয়ে দিয়ে আরাম করতে হয়—যেমন কাঁটায় কাঁটা তোলা—" বলিতে বলিতে আশুতোষ উঠিল। জানলার উপর তাক হইতে সাদা গুঁড়া ভরা একটি শিশি পাড়িল। একখানি ছোট এনামেল প্লেটে ছোট একটুকরা পাঁউরুটি রাখিয়া তাহার উপর স্বল্প পরিমাণে ঐ শ্বেত চূর্ণ সিঞ্চিত করিল। প্রহ্লাদ ভাবিল—ইহাই নিয়ম। সেও এক টুকরা রুটির উপর শ্বেত-চূর্ণ সিঞ্চন করিবার অভিপ্রায়ে আশুর হস্ত হইতে শিশি লইবার জন্য হাত বাড়াইল। আশু চমকিয়া উঠিয়া বলিল, "করেন কি, করেন কি।"

প্রহ্লাদ সবিস্ময়ে বলিল, "কেন? ও কি?"

আশু মনে মনে হাসিয়া ভাবিল, ভাল পাড়াগেঁয়ের পাল্লায় পড়া গেছে! তাহার মাথায় তখন একটা রসিক ভূত চাপিয়া বসিল, আর বলিল,—"ইটি হচ্ছে ইঁদুর রোগের মহৌষধি।"

কথাটা এই—ইদানীং মেসে ভারি ইঁদুরের উৎপাত হইয়াছে। বই কাপড়-চোপড় কাটিয়া তছনছ করিতেছে। শিশিতে যাহা আছে, তাহা আর্সেনিক অর্থাৎ সেঁকো বিষ চূর্ণ। আশু নিত্য চা খাইবার সময় সেই বিষ এক টুকরা রুটিতে মাখাইয়া ঘরে রাখিয়া দেয়—ইঁদুর মারিবার জন্য।

প্রহ্লাদ ভাবিতে লাগিল—ইঁদুর রোগ কি? শহরে ঘোড়া-রোগের একটা কথা শুনেছি। তাও শুনেছি, কেবল গরিবের ছেলের হয়। কিন্তু ইঁদুর রোগ কি? ও হো-হো! সেই যে গাল-গলা ফুলে জ্বর হয়, যা'কে বলে 'প'য়ে এ-কার, 'ল'-য়ে এ-কার, আর 'গ'—নিশ্চয়ই এ সেই ইঁদুরবাহন প্লেগের কথা বলিতেছে।

প্রহ্লাদের হোমিওপ্যাথ হইবার ঔষধ, পুস্তক, পোষাক কিনিবার দীপ্ত আগ্রহ এক মুহূর্তে নিবিয়া গেল। তথাপি নিশ্চিতকে সুনিশ্চিত করিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিল।—"ইঁদুর রোগের ঔষধ?"

আশুর মাথায় সেই ভূতটা উত্তর দিল, "শুধু ইঁদুর রোগ কি বলছ, ভায়া, এ ঔষধ একেবারে সকল ব্যাধির মহৌষধ। এ খেলে শুধু রোগ কেন, রুগী শুদ্ধ তৎক্ষণাৎ সেরে যায়। জীবনে আর কোন ব্যাধি হবার ঘুণাক্ষর সম্ভাবনাও থাকে না। একেবারে হাতে হাতে ফল।

এতো বড়ো অদ্ভুত কথা। একেবারে রোগ সেরে যায়, আর কখন কোন ব্যারাম হবার সম্ভাবনাও থাকে না। তার উপর আবার হাতে হাতে ফল। প্রহ্লাদ সকৌতূহলে প্রশ্ন করিল—"এটা কি প্যাটেন্ট?" ভাবিয়াছিল এমনি ঘুরাইয়া প্রশ্ন করিয়া ঔষধটির নাম জানিয়া লইবে। কিন্তু ভূতটা সেদিক দিয়াও গেলনা। দিব্য চাঁচা ছোলা, হাঁড়ি চাঁচা গলায় বলিল —প্যাটেন্ট কি, মশায়? এই প্যাটেন্ট,—পোটেন্ট—ওমনিপোটেন্ট।"

প্রহ্লাদ শেষ কথাটার অর্থ জানিত। তাহাদের স্কুলের হেডমাস্টাবকে এবং জমিদারকে ও কৃতবিদ্যেরা ঐ নামে অভিহিত করিতেন। Omnipotent অর্থাৎ সর্বশক্তিমান।

এমন সময় আশুর একজন সহপাঠী আসিয়া বলিল,—"ওহে আশু, ভাই, একবার চল ত, আমাদের মেসে একটা ছেলের গাল-গলা ফুলে জ্বর হয়েছে; প্লেগ কিনা সন্দেহ হচ্ছে। একবার চলনা ভাই, দেখবে।

আশু বলিল,—"আমার যে এখুনি লেক্‌চার। পরে ফিরে এসে দেখলে হবে না?"

"কাজ কি, ভাই। তুমি ঐ পথে একবার দেখেই কলেজে যেওনা।"

"তবে চল।" প্রহ্লাদকে, 'আপনি বসুন' বলিয়া বাহির হইবার সময়, আশু বোধকরি সেই পরিহাস-রসিক ভূতটাকে প্রহ্লাদের কাছে রাখিয়া গেল।

আশুতোষ মেসের দরজায় বাহির হইতেই প্রহ্লাদ ভাবিল, "কেল্লা মার দিয়া!" ঐ কাচের শিশি ত লাট গঙ্গামণ্ডল! কিন্তু নামটা কোনরকমে জেনে নিতে হবে কিন্তু—

কথাটা মনে উঠিতেই প্রহ্লাদের মুখ কালিবর্ণ হইয়া গেল!—কলকাতায় প্লেগ হচ্ছে! ও আবার প্লেগের রুগি দেখতে গেল। ছোঁয়া-লেপা করে আসবে। কাজ কি আপদ ডেকে এনে! ঘবের ছেলে ঘবে ফিরে যাই। ভিতর হইতে ভূতটা বলিয়া উঠিল, "যঃ পলায়তি স জীবতি। আটটায় ট্রেন।" তৎক্ষণাৎ কাপড়-চোপড় গুছাইয়া লইয়া স্টেশন উদ্দেশ্যে রওনা নয়—ছুট্।

সাড়ে আটটার সময় আশুতোষ আসিয়া দেখিল, তাহার ঘর খোলা ও খালি—দুই-ই। তাহার অতিথি নাই এবং সঙ্গে সঙ্গে ভবরোগের মহৌষধি সেই সেঁকো বিষের শিশিটিও অন্তর্ধান হইয়াছে। সে বিছানার উপর বসিয়া পড়িয়া আগাগোড়া কথাগুলি ভাবিতে ভাবিতে বারবার শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। প্রহ্লাদকে এই মহৌষধি সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দিবার নিমিত্ত কালি, কলম, কাগজ লইয়া বসিল, কিন্তু কোথায় যে তাব নাগাল পাইবে, ঠিক করিতে পারিলনা। ঠিকানা জানা নাই। ভোলা আশুতোষ বসিয়া বসিয়া ভাবিতে থাকুন, আমরা ততক্ষণ প্রহ্লাদেব পশ্চাদ্ধাবন করি।

৮

সেই ভূতটা প্রহ্লাদকে হাওয়ায উড়াইয়া লইয়া চলিল। পথ জিজ্ঞাসা করিতে কবিতে স্টেশনে হাজির। তারপর টিকিট কিনিয়া যেমন ট্রেনে ওঠা, অমনি গাড়ি ছাড়া। সাহেববা হইলে বলিতেন, "হুররে। পাড়াগেঁয়ে প্রহ্লাদ 'দুর্গা' বলিয়া নিঃশ্বাস ছাড়িল।

রেল চলিতে বিলম্ব হয়না, তথাপি প্রহ্লাদকে যে স্টেশনে নামিতে হইবে, সেখানে পৌছিতে দ্বিপ্রহর বাজিল। রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। হাওয়াটা সকালের সেই চাযেব মতনই গরম, কিন্তু তেমন মিষ্ট নয়। প্রহ্লাদ জানিত, স্টেশনের নিকট একটা গ্রামেই তাহার দূর সম্পর্কীয়া মাসির বাড়ি। স্থির করিল, সেইখানেই স্নান আহার সারিয়া নিজ গ্রামে যাইবে। স্টেশনে একবার ব্যাগ খুলিয়া মহৌষধি শিশিটা দেখিয়া লইল—ঠিক আছে। তারপরই মাসির গাঁয়ের মেঠো পথ ধরিল।

মাসি প্রহ্লাদকে দেখিয়াই চিৎকার করিয়া উঠিলেন—"ওমা, পেল্লাদ যে;" তারপর একটার

পর একটা প্রশ্ন। প্রহ্লাদ সে সব বাজে কথার উত্তর না দিয়া, কাজের কথার অবতারণা করিয়া বলিল, "মাসি, রান্নাবান্না সব হয়ে গেছে?"

মাসি শুষ্কমুখে বলিল, "আজ আর কি কর্তে হাঁড়ি চড়াব বাছা,—আজ যে একাদশী!"

প্রহ্লাদ জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার ত একাদশী, মাসি, কেষ্টারও কি তাই নাকি?" কেষ্টা ওরফে কৃষ্ণধন, মাসির পুত্ররত্ন।

মাসি বলিলেন, "তার ত আজ তিনদিন গাল-গলা ফুলে জ্বর হয়েছে।"

প্রহ্লাদ শিহরিয়া উঠিল! হাত হইতে ব্যাগটা পড়ে পড়ে, সেই সময় ভূতটা বলিল, "এই তা সুযোগ।"

প্রহ্লাদ বলিল, "তা এতক্ষণ বলতে হয়! তা মাসি, তুমি একেবারে আমার আর কেষ্টার মত চাল চড়িয়ে দাও! আর একটু তেল দাও, আমি ডুবটা দিয়ে আসি। এসে কেষ্টাকে নিয়ে একসঙ্গে খেতে বসব। এমন ওষুধ নয়, মাসি, হাতে হাতে ফল।"

মাসি বিস্মিত হইয়া বোনপোর মুখ দেখিতে দেখিতে ভাবিতে লাগিলেন, এই রোদ, মেঠো পথ, বাছার মাথা গরম হয়ে গেল নাকি? বলিলেন, কেষ্টা, ভাত খাবে কি রে? বললুম যে, তার গাল-গলা ফুলে জ্বর হয়েছে। জলটুকু গিলতে পারছেনা।"

বোনপো তাঁহাকে অধিকতর বিস্মিত করিয়া বলিল, "মাসি, তুমি বুঝি শোননি? আমি যে কোলকাতায় হুমোপ্যাথি পাশ দিতে গেছলুম। খুব ভাল ওষুধ শিখে এইছি, মাসি! ও গাল ফোলার কথা কি বলছো, মাসি, ফুলে ঢোল হলেও ভয় নেই। এক ওষুধে অমনি ঝিঝির পাত হয়ে যাবে। কইবে কেষ্টা, দেখি! কেমন তোর গাল-গলা ফুলেছে।" বলিতে বলিতে প্রহ্লাদ কৃষ্ণধনের কাছে গেল। ব্যাগ খুলিয়া মহোষধির শিশি বাহির করিয়া ভাবিতে লাগিল, বেশি খরচ করা হবে না। এইটুকু মাত্র সম্বল। নামও জানিনে যে ফুরুলে কিনে নেব। এইটুকুতেই আমার কোঠা বালাখানা, জমিদারি করে নিতে হবে।

প্রহ্লাদের এই কয়দিন অন্তর্ধানে বড় ডাক্তার হইয়া ফিরিয়া আসাটা মাসি বেশ বিশ্বস্ত চিত্তে লইতে পারিতে ছিলেন না। জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও কি ওষুধ, বাবা, বিষ-টিষ্ নয় ত?"

প্রহ্লাদও ততক্ষণ রোগীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া ভাবিতেছিল, তাইত যদি পেলেগই হয়! একেবারে বিছানার ধারে এসে ভাল করিনি। ভূতটা বলিল, ভয় কি? তোর হাতেই ত মহৌষধি রয়েছে। রোগ তোর ত্রিসীমানায় জীবনে কখনো ঘেঁসতে পাববেনা।

প্রহ্লাদ শিশি হইতে হাতের তেলোয় ঔষধ ঢালিয়া, তাহা হইতে কে চিমটি তুলিয়া লইয়া বলিল, "বিষ কি, মাসি? আচ্ছা তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না? এই দেখ, আমি খাচ্ছি," বলিয়া এক চিমটি নিজের আর এক চিমটি কেষ্টার জিহ্বায় দিল। মাসি আস্বস্ত হইলেন।

প্রহ্লাদ বলিল, মাসি, তেল দাও, চট্ করে ডুবটা দিয়ে আসি। এসে কেষ্টোর সঙ্গে একত্তরে খাব। আমি আসতে আসতে দেখবে, ফুলো সব চুপসে গেছে, যেন শুকনো কুল।"—বলিয়া মাথায় তেল দিয়া গামছা লইয়া স্নানে গেল।

কিছুক্ষণ যাইতে না যাইতে প্রহ্লাদ ভাবিতে লাগিল। ওঃ, কি চিনচিনে রোদ! শরীরের রক্ত

শুদ্ধ চিন চিন করছে! ক্রমে মস্তিষ্ক শুদ্ধ করিতে লাগিল; এবং প্রহ্লাদ ঘন-ছায়াচ্ছন্ন এঁদো ডোবা অন্বেষণ করিয়া ফিরিতে লাগিল।

মাসি দেখিলেন, ডুব দিয়ে আসি' বলিয়া প্রহ্লাদ গিয়েছে—ঘণ্টা দুঘণ্টা হইতে যায়,—তাহার দেখা নাই। ডুবে ম'ল না কি? না, কোনও পুকুরে ত ডোব্‌বার মত জল নাই।

এদিকে কৃষ্ণধন ক্রমে ছটফট করিতে-করিতে চিৎকার করিতে শুরু করিলে। "ওরে বাবারে, কি ওষুধ খাওয়ালে রে! জ্বলে মলুম, জিব্‌ শুকিয়ে ভেতর দিকে টানছে।"

পুত্রের নিদারুণ চিৎকারে জ্ঞানশূন্য হইয়া মাসি প্রহ্লাদকে ইতস্তত খুঁজিতে বাহির হইলেন। এখানে-সেখানে খুঁজিয়া গ্রাম-প্রান্তে একটা জঙ্গলময় আম বাগানের ভিতর এঁদো ডোবার কাছে গিয়া দেখিলেন,—কে একজন আকণ্ঠ ডুবাইয়া, মাথায় পাঁকের চাপড়া বসাইয়া কোশ কোশ করিয়া জল থাবড়াইতেছে। মাসি কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করিযা জিজ্ঞাসা করিলেন। "কে রে? পেল্লেদে না?"

প্রহ্লাদ কথা কহিল না।

"ওরে ও আবাগে! আমার বাছাকে কি খাইয়ে এলি?"প্রহ্লাদ নিরুত্তর। একদৃষ্টে ডোবার জল দেখিতে লাগিল।

"ওরে ও হতচ্ছেড়ে! এখন কথা কোস নি যে? কেষ্টা যে ছটফট্‌ করছে, জিব্‌ শুকিয়ে যাচ্ছে যে?"

এতক্ষণে প্রহ্লাদ কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল,—মাসি, আমিই বা কোন সুস্থ আছি!"

তুলসী

বেলা প্রায় বারোটা। তাঁতঘরে বসিয়া চৈতন বসাক কাপড় বুনিতেছে, আর গান করিতেছে—

"হৃদয় নিকুঞ্জে স্বরূপ একি অপরূপ হেরি।
নবীনা কিশোরী সনে নবীন কিশোর হরি।
রাই নাচে বাঁশির স্বনে, কৃষ্ণ নাচে রাধার সনে,
পবন-হিল্লোলে দোলে, পীতাম্বর, নীলাম্বরী।।"

দুয়ারের কাছে দাঁড়াইয়া একটি নবীনা কিশোরী গান শুনিতেছিল। চৈতনের সে দিকে দৃষ্টিই ছিল না; সে আপন মনে তাঁত চালাইতেছে, আর গান করিতেছে।

গীত যখন শেষ হইল, তখন সেই কিশোরী ঘরের মধ্যে আসিয়া বলিল, "নাওয়া-খাওয়া কি আজ হবে না দাদা'! তাঁত বুনলে আর গান করলেই কি পেট ভরবে?"

চৈতন মাথা তুলিয়া হাসিয়া বলিল, "তুলসী, তাঁত বুনলেও পেট ভরে, গান করলেও পেট ভরে; দিদি! বুনতে জানলে হয়,গাইতে জানলে হয়।"

তুলসী বলিল, "তা হোক, এখন ওঠ দাদা, বেলা যে দুপুর গড়িয়ে গিয়েছে, সে খবর রাখ?"

চৈতন বলিল, "কার খবর কে রাখে বোন! পৃথিবীতে কেউ কারও খবর রাখেনা, তা তোমার সূর্যই বল তার চন্দ্রই বল।"

তুলসী বলিল, "নেও, তোমার ধর্মকথা রাখ দাদা! ভাত যে শুকিয়ে চাল হয়ে গেল। কাল থেকে আর আমি সকাল-সকাল রাঁধবনা—সেই তিন পহরে খেতে হবে!"

চৈতন্য উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "তুই ত তিনপ্রহর না হলে পাতের কাছেই বসিসনা। এখন না হয় দুই ভাই বোনে এক সঙ্গেই খাব।"

তুলসী বলিল, "তা যা হয় কাল কবো, আজ ত এখন স্নান করে দুটো মুখে দেও। একে ত শুধু ডাল, ভাত, চচ্চড়ি, তাও যদি শুকিয়ে যায়, তা হলে কি খেতে পার?"

চৈতন।—লক্ষ্মী আমার, তবু ত এই ডাল ভাত রাধারানি মিলিয়ে দিচ্ছেন, কত লোকের যে তাও মেলেনা।"

তুলসী।—যাদের মেলে না, তাদের মেলে না, তা আর তুমি আমি কি কবব। তোমার যখন মেলে, তখন তুমি খাও। কিন্তু তোমার দাদা, ঐ যে কি গোঁ, মাছ খাবে না। কেন, মাছ খেলে কি তোমার ভাগবত পুঁথি অশুদ্ধ হযে যাবে? তোমার থেকে বড়-বড় পণ্ডিত মাছ খায় যে! হলধর কাকার চাইতে তুমি ত আর পণ্ডিত নও; তিনি ত মাছ খান, এদিকে হরি-সংকীর্তন করেন, ভাগবতও পড়েন, তিলক-ফোঁটা ও করেন। তোমারই যত বিদ্‌ঘুটে।

চৈতন এ কথার আর জবাব দিল না। কেন যে সে আমিষ আহার ত্যাগ করিয়াছে, কেন যে সে সামান্য একটু বিলাসদ্রব্য হইতেও নিজেকে বঞ্চিত করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছে,

কেন যে সে টাকা জমাইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছে, সে কথা ত তুলসীকে সে বলিতে পারে না;—সে কথা মনে হইলে যে তাহার বুকের মধ্যে আগুন জ্বলিয়া উঠে।

চৈতন মুখখানি মলিন করিয়া শুধু বলিল, "তুলসী, একটু তেল দে, আমি চট করে নেয়ে আসি। তাই ত, আজ বড় বেলা হয়ে গেছে। তা তুই সকাল-সকাল স্নান করে একটু জল খেয়ে তারপর রান্না করিস নে কেন? তিন প্রহর পর্যন্ত না খেয়ে থেকে-থেকে কি একটা অসুখ করে ফেলবি।"

তুলসী বলিল, "নেও, ঐ তোমার এক কথা দাদা! আমার আবার অসুখ। আমি ত বেশ আছি । যাক্ গে, এখন তুমি স্নান করে এস।" এই বলিয়া তুলসী বাড়ির মধ্যে চলিয়া গেল। চৈতনও তাঁত ঘরের দুয়ার বন্ধ করিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

২

চৈতনের পিতা কৃষ্ণদাস বসাক বড় ভাল লোক ছিল। গ্রামের সকলেই তাহাকে শ্রদ্ধা করিত। কৃষ্ণদাসের সময় অবস্থাও বেশ ভাল ছিল; সে যাহা উপার্জন করিত, তাহা ত ব্যয় করিতই, সময়-সময় ধার করিয়া মাসে-মাসে মচ্ছব দিত। তাহাদের অঞ্চলের যত বৈষ্ণব-বৈরাগী ছিল, সকলের জন্যই কৃষ্ণদাসের দ্বার অবারিত ছিল। একাদশীর দিন হরিবাসর, তার পরেব দিন বৈষ্ণব-সেবা না করিয়া কৃষ্ণদাস জলগ্রহণ করিত না। প্রতিদিন সন্ধ্যার পর কৃষ্ণদাসের বাড়ীতে হরি-সংকীর্তন ও হরির লুঠ হইতই ; তাহার পর, কোন বৈষ্ণব পর্ব ফাঁক যাইবার যো ছিল না। কৃষ্ণদাসের মত সাধু বৈষ্ণব হরিপুরে কেন, পার্শ্ববর্তী দশখানি গ্রামেও ছিল না।

কৃষ্ণদাসের গৃহিণীও লক্ষ্মী ছিল, স্বামীর ধর্মে-কর্মে সে কোন দিন বাধা দিত না। বাড়িতে অন্য স্ত্রীলোক ছিল না, কৃষ্ণদাসের গৃহিণী একাকিনী সংসারের সমস্ত কাজ করিত, সাধু বৈষ্ণবগণের সেবার আয়োজন করিত; দিবারাত্র তাহার অবসর ছিল না।

পুত্র চৈতন্যচরণও পিতার সমস্ত সদ্‌গুণই লাভ করিয়াছিল। কৃষ্ণদাস চৈতন্যকে গ্রামের পাঠশালায় লেখাপড়া শিখাইয়াছিল। ইংরেজি শিক্ষার উপর তাহার ভারি বিদ্বেষ ছিল; সে চৈতনকে কিছুতেই ইংরেজি পড়িতে দেয় নাই। কেহ সে সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলে কৃষ্ণদাস বলিত, "না, না, অমন কথা বোলো না; তাঁতির ছেলের ইংরেজি শিখতে নেই। অত লেখাপড়া শিখলে কি আর আমার ছেলে তাঁত বুনবে, না, এই সব বৈষ্ণবের সেবা করবে।"

চৈতন পাঠশালার পাঠ শেষ করিয়া তাঁতের কাজে নিযুক্ত হইয়াছিল; তাহার হাতে যে কাপড় উৎরাইত, তাহা তাহার পিতার হাতের কাপড় হইতেও উৎকৃষ্ট হইত। তাহার পর কৃষ্ণদাসের শিক্ষামত চৈতন বৈষ্ণব-ধর্মের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। রাত্রিতে পিতা বসিয়া তাঁত বুনিত, আব তাহার পার্শ্বে বসিয়া চৈতন শ্রীমদ্‌ভাগবত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, ভক্তমাল প্রভৃতি পুস্তক পাঠ করিয়া পিতাকে শুনাইত। আর হরি-সংকীর্তন সে ত লাগিয়াইছিল। চৈতন যেমন সখীসংবাদ, মান, মাথুর গাহিতে পারিত। তেমন অতি কম লোকেই সে গ্রামে পারিত। কৃষ্ণদাস পুত্রের এই সকল গুণ দেখিয়া পরম প্রীতি লাভ করিত।

কৃষ্ণদাস খরচের হিসাব ছিলনা; যার যাহাই হউক না কেন, খরচ সে কিছুতেই কমাইতে পারিত না। আত্মীয়েরা কেহ কিছু বলিলে সে বলিত, "কার জন্য সঞ্চয় করব, ঐ ত একটা ছেলে চৈতন; ওর—তা ও জোটাতে পাববে।"

সুতরাং যেদিন কৃষ্ণদাসের ডাক পড়িল, সে দিন চৈতন দেখিল, তাহার বাপের বাক্সে একটি পয়সাও নেই। আরও শুনিল যে গাঁয়ের মধ্যে তাহার প্রায় দুই তিনশত টাকা ধার।

চৈতনের বয়স তখন ২৭ বৎসর। চৈতনের মা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "বাবা উনি ত তোকে একেবারে পথে বসিয়ে গেছেন। এখন চল্‌বে কি করে?"

চৈতন্য কহিল, "তুমি ভেব না মা, আমার হাত পা চোখ যদি বজায় থাকে, তা হলে চলবার ভয় নেই।"

তাহার পর দশ জ্ঞাতির পরামর্শে চৈতন আরও তিনশত টাকা ধার করিয়া মহা সমারোহে পিতার শ্রাদ্ধাদি কার্য শেষ করিল।

মা বলিলেন, "চৈতন, এত টাকা ধার করে কি করে শোধ হবে বাবা! কর্তার ধারই তিনশো টাকা শুনেছি, তারপর তুমি আরও তিন শ্ টাকা ধার করলে। এত টাকা তুমি কোথা থেকে দেবে?"

চৈতন বলিল, "সে হবে মা! দিনরাত তাঁত চালালে এক বছরে ও টাকা শোধ কবে দেব। তবে একটু হিসেব করে চলতে হবে মা!"

মা বলিলেন, "কত্তাকে ত ও-কথা কত বলেছি, তিনি শুনতেন না।"

৩

মাতা-পুত্রে ঘর গৃহস্থালির যে ব্যবস্থা কবিলেন, বিধাতা তাহা উল্‌টাইয়া দিলেন। পিতার মৃত্যুর তিনমাস পরেই চৈতনের মাতা পুত্রকে এই সংসারে একাকী ফেলিয়া স্বামীর সহিত মিলিত হইলেন। চৈতন চারিদিক শূন্য দেখিল। বাপ গেলেন। মা গেলেন;—চৈতন স্থির করিল আর কেন? ঠাকুর তাহার সকল বন্ধন যখন ঘুচাইয়া দিলেন, তখন আর সে পৈতৃক ভিটা আগলাইয়া থাকে কেন? যা কিছু আছে, বেচিয়া পরের ঋণদায় হইতে মুক্ত হইয়া—সে বৃন্দাবনে চলিয়া যাইবে। প্রতিবেশীদিগের নিকট এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে সকলেই তাহাতে আপত্তি করিলেন।—"তা ও কি হয়? পিতামাতা কি চিরদিন কাহারও বাঁচিয়া থাকে? না চৈতন, ও অভিপ্রায় ত্যাগ কর। তোমার মাতার কার্য শেষ করিয়া একটি বয়স্থা মেয়েকে বিবাহ করিয়া ঘর-সংসার কর।"

চৈতন বলিল, "সে কি করে হবে? এটা যে মহাগুরু-নিপাতের বৎসর।"

পুরোহিত রামলোচন ভট্টাচার্য বলিলেন, "তাতে দোষ নেই, বৎসরের সপিণ্ডকরণ একেবার শেষ করে ফেল্‌লে বিবাহ করা যেতে পারে; শাস্ত্রে এ বিধান আছে।"

চৈতন কহিল, "দাদা ঠাকুর, শাস্ত্র-টাস্ত্র ত জানিনে, কিন্তু বাপ-মা মারা গেলে একবৎসর কিছুই করতে নেই, এই ত জানি। আর বিবাহেব কথা যা বলছেন, আমার তাতে মোটেই মত

নেই। আর সংসার-ধর্ম করছিনে। মায়ের শ্রাদ্ধের পরই দেশের মায়া কাটিয়ে শ্রীধামে চলে যাব।"

'চলে যাব' বলিলে যদি যাওয়া হইত, তাহা হইলে এ সংসারে অনেক ব্যাপার সোজা হইয়া যাইত। চৈতন মনে করিলে কি হয়, ভগবান তাহাকে দিয়া যে অনেক কাজ করাইয়া লইবেন; এখনও যে তাহার কিছুই হয় নাই। চৈতনের তাহাই হইল।

চৈতন দেখিল, বাড়িঘর বিক্রয় করিব বলিলেই ত বিক্রয় হয় না—ক্রেতা ত আর তাহার দ্বারে বসিয়া নেই; সুতরাং আপাতত কিছুদিন ত বাড়িতেই থাকিতে হইবে। বাড়িতে কেহই নাই; তাহার যে দুবেলা দুইটা ভাত রাঁধিয়া দেয়, ঘর-দ্বার গুলি দেখে, এমন লোক ও নাই। সে একবার মনে করিল, একটা ঝি নিযুক্ত করিলেই তাহার অসুবিধা দূর হইবে। কিন্তু দুবেলা রাঁধে কে?

তাহার তখন মনে পড়িল, হরিশঙ্করে তাহার এক দূর সম্পর্কীয়া পিসিমা আছেন। তাঁহার অবস্থা ভাল নহে, একটি মাত্র কন্যা লইয়া তিনি অতিকষ্টে সংসাব যাত্রা নির্বাহ করেন।

চৈতন স্থির করিল, যে কয়দিন তাহাকে দেশে থাকিতে হইবে, পিসিমাকে আনিয়া সেই কযদিন বাড়িতে রাখিবে; তাহার পর এদিকেব ব্যবস্থা হইয়া গেলেই পিসিমাকে স্বস্থানে পাঠাইয়া দিয়া সে বৃন্দাবনে চলিয়া যাইবে।

দুই তিনদিন পরেই পিসিমাকে আনিবার জন্য চৈতন একটি লোক পাঠাইয়া দিল। পিসিমা ভ্রাতুষ্পুত্রেব সাদর আহ্বান উপেক্ষা করিতে পারিলেন না; যদিও কষ্টেসৃষ্টে তাহার দিনপাত হইতেছিল, কিন্তু মেয়েটি যে তের বৎসর পার হইয়া চোদ্দ বৎসরে পা দিল,—এখনও যে তাহার বিবাহেব কোন ব্যবস্থাই হইয়া উঠে নাই। সুতরাং চৈতনের আশ্রয়ে গমন করিতে পিসিমা একটুও বিলম্ব করিলেন না।

চৈতনের বাড়িতে আসিবার দুইদিন পরেই পিসিমা একদিন সময় বুঝিয়া চৈতনকে মেয়ের বিবাহের কথা বলিলেন; "বাবা চৈতন, মেয়েটাকে ত আর ঘরে রাখা যায় না। আমি গরিব মানুষ, এতদিন কত চেষ্টা করেছি; ভাল ছেলে পেলাম না; পাঁচা-পাঁচির মধ্যে যা পাওয়া যায়, তারাও যে টাকা চায়, তা আমি কোনদিন চক্ষেও দেখি নাই। তাই এতদিন মেয়েটাকে পার করতে পারিনি। এখন তুমি যখন দয়া করে আশ্রয় দিলে, তখন তুলসী যাতে সুপাত্রে পড়ে, সে ভারও তোমাকেই নিতে হবে, বাবা! দাদা যদি আজ বেঁচে থাকতেন, তা হ'লে আর তোমাকে বলতে হ'ত না। তিনি ত এ ভার নিতেই স্বীকার হয়েছিলেন; আমিই ছেলে ঠিক করতে পারলাম না।"

চৈতন মহা বিপদে পড়িল। সে ঋণে ডুবিয়া আছে। বাড়িঘর বিক্রয় করিয়া ঋণ শোধ পূর্বক বৃন্দাবনে চলিয়া যাইবে, এই তার অভিপ্রায় ছিল; কিন্তু এত বড় অবিবাহিতা কন্যাসহ পিসিমা তাহার স্কন্ধে পড়ায় সে মহা বিব্রত হইয়া পড়িল। তাহার যে প্রকৃতি, তাহাতে পিসিমার অনুরোধ সে উপেক্ষা করিতে পারেনা; এদিকে তাহার অর্থাভাব। সে কাতর ভাবে বলিল, "পিসিমা, আমার অবস্থা ত তুমি জাননা। বাবা অনেক ধার রেখে গিয়েছিলেন, তারপর মায়ের শ্রাদ্ধেও অনেকগুলি টাকা ধার হয়েছে। এ ধার যে কি করে শোধ হবে; তাই আমি ভেবে পাচ্ছিনে।" এই বলিয়াই সে মৌনাবলম্বন করিল।

পিসিমা বলিলেন, "সে ত বুঝতেই পারছি। কিন্তু আমিই বা কার কাছে দাঁড়াই বল? যে ক'রেই হোক বাবা! তুমি মেয়েটার একটা গতি করে দাও।" এই বলিয়াই তিনি চৈতনের হাত জড়াইয়া ধরিলেন।

চৈতন তখন আর কি করে; বলিল, "ও কি পিসিমা! তুমি ব্যস্ত হয়ো না। তুলসীর বিবাহের যা হয়, করতেই হবে।"

কিন্তু কেমন করিয়া কি যে করা হইবে, চৈতন তাহা ভাবিয়া পাইল না। ভাল ছেলে পাইতে হইলে অনেক টাকার দরকার,—সে তাহার সাধ্যাতীত; অথচ তুলসীর মত এমন সুন্দরী, এমন কোমল-স্বভাবা মেয়েকে যার তার হাতেই বা কেমন করিয়া সে সমর্পণ করে। চৈতন অনেক অনুসন্ধান করিল; সামান্য একটু লেখাপড়া জানা ছেলের কাছেও সে অগ্রসর হইতে পারিলনা,—সে বিলক্ষণ দাবি করিয়া বসে। তিন চারি মাস সে কত স্থানে চেষ্টা করিল, কতজনের তোষামোদ করিল, কতজনের হাত জড়াইয়া ধরিল; কিন্তু কিছুতেই কিছু করিতে পারিল না। অবশেষে নিরুপায় হইয়া সে একটি অধিক বয়স্ক দোজবরের হাতে তুলসীকে সমর্পণ করিল।

যাহার সহিত তুলসীর বিবাহ হইল, তাদের অবস্থা তেমন ভাল ছিল না; তবে মোটা ভাত, মোটা কাপড়ের কষ্ট ছিলনা। অর্থের অভাবে তুলসীকে অযোগ্য পাত্রে সমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়া চৈতন মনে বড়ই ক্লেশ পাইল। কিন্তু, আর ত কোন উপায় ছিলনা।

চৈতন মনে করিল, এই বার সে নিশ্চিন্ত। কিন্তু, যখনই সে সংসারের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণের ব্যবস্থার কথা মনে করে, তখনই একে আর হইয়া যায়।

তুলসীর বিবাহের মাস তিনেক পরেই গ্রামে ভয়ানক ওলাওঠা দেখা দিল। চৈতনের বাড়িতে তাহার পিসিমাই প্রথম আক্রান্ত হইলেন। শাশুড়ির পীড়ার কথা শুনিয়া জামাতা তাঁহাকে দেখিতে আসিল। চৈতনের পিসিমা বাঁচিলেন না।

তাঁহার শ্মশান কার্য শেষ করিয়া রাত্রিতে সকলে বাড়িতে ফিরিয়া আসিল। শেষ রাত্রিতেই জামাইটিকে রোগে ধরিল। চৈতন যথেষ্ট চেষ্টা করিল; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না; পরদিন বেলা তিনটার সময় হতভাগিনি তুলসীর মাথায় বজ্রঘাত হইল,—বিবাহের তিন মাস পরেই তুলসী বিধবা হইল।

চৈতনের তীর্থবাসের বাসনা লুপ্ত হইল। একদিকে ঋণ, আর একদিকে কিশোরী বিধবা ভগিনী। চৈতনের সর্বদাই মনে হইত, সে যদি তুলসীকে সুপাত্রে অর্পণ করিতে পারিত অন্তত অবস্থাপন্ন গৃহস্থের ঘরেও তুলসীর বিবাহ দিতে পারিত, তাহা হইলে তুলসীর এ দশা হইত না,—সে তাহার গলগ্রহ হইত না।

তুলসীর শ্বশুরবাড়ির কেহই তাহার সন্ধান পর্যন্ত লইলনা। চৈতন তখন ঋণ শোধ এবং তুলসীকে ভালভাবে রাখিবার জন্য প্রাণপণ করিল। শ্রীগৌরাঙ্গের নাম করিয়া সে সংসার প্রতিপালন করিতে লাগিল। জীবনে বিবাহ করিবে না বলিয়া সে কৃতসঙ্কল্প হইল।

৪

চৈতন ঋণ শোধ করিয়া ফেলিয়াছে, কিছু টাকাও তাহার হাতে জমিয়াছে। কিন্তু সে এখন বৃন্দাবনে যাইতে চাহেনা। কেহ সে কথা বলিলে বলে, "তুলসীকে নিয়ে আমি বিদেশে যেতে পারব না। এখানে দশজন আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধব আছে। বিপদ আপদ কখন হয়, তা ত বলা যায়না। যদি আমিই মারা যাই, তা হ'লে বিদেশ জায়গায় তুলসীর কি হবে? রাধারানি আমার অদৃষ্টে এখন বৃন্দাবন-বাস লেখেন নাই;—আমি চেষ্টা করলে কি হবে? তার চাইতে বাবার মত বাড়িতে থেকেই প্রভুর নাম করা যাবে, আর সাধুসঙ্গ সৎপ্রসঙ্গ করা যাবে।"

চৈতন তাহাই কবিত। গ্রামের কোন সাধু-বৈষ্ণবের সমাগম হইলে চৈতন তাঁহাকে মহাসমাদরে বাড়িতে আনিয়া তাঁহার সেবা করিত। প্রায় প্রত্যহই সন্ধ্যাকালে গ্রামের দুচার দশজন চৈতনের তাঁত ঘরে আসিয়া জুটিত এবং দুই তিন ঘণ্টা হরিনাম সংকীর্তন হইত; মধ্যে মধ্যে চৈতন সওয়া পাঁচ আনার বাতাসা কিনিয়া হরির লুঠও দিত; কিন্তু সে তাহার পিতার মত অবস্থার অতিরিক্ত ব্যয় করিত না! তুলসীর ভবিষ্যৎ ভাবিয়াই সে হিসাব করিয়া খরচ-পত্র করিত; তাহার অভাবে তুলসীর যে দাঁড়াইবার স্থান নাই।

এইভাবে কিছুদিন গেল; হঠাৎ একদিন চৈতনের গুরুপুত্র আসিযা উপস্থিত হইলেন। এতদিন বৎসরান্তে গুরুদেব স্বয়ং শিষ্যগৃহে শুভাগমন করিতেন; গুরুপুত্র এই প্রথম শিষ্যালযে আগমন করিলেন।

গুরুপুত্রের বয়স বিংশ বৎসর। পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে তাঁহার পিতা তাঁহাকে নবদ্বীপে অধ্যয়ন করিতে প্রেরণ করেন। গুরুপুত্র পূর্বেই পিতার নিকট কিঞ্চিৎ ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়ছিলেন; নবদ্বীপে যাইয়া প্রথম দুই বৎসর ব্যাকরণ ও কাব্য পড়িতে আরম্ভ করেন, তাহার পর পিতার অনুমতি অনুসারে শ্রীমদ্‌ভাগবত পাঠ করেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে কথকতাও শিক্ষা করেন; সুতরাং গুরুপুত্রের কোন বিষয়ের শিক্ষাই তেমন সুন্দর হইল না; ব্যাকরণ, কাব্য, বৈষ্ণবগ্রন্থ সকলই উপর-উপর শিখিলেন। পাণ্ডিত্য কিছুই জন্মিলনা, কিন্তু পাণ্ডিত্যেব অভিমান ষোলআনা হইল। গুরুদেব পুত্রের নামকরণ করিয়াছিলেন গোপীজনবল্লভ। তিনি যাহা ভাবিয়াই পুত্রের নাম স্থির করুন না কেন, পুত্র কিন্তু নামেব সার্থকতা অন্য ভাবে কবিযা বসিলেন,—গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র বৃন্দাবনলীলার বিকৃত ব্যাখ্যা হৃদয়ঙ্গম করিযা তিনি ঐ বয়সেই নবদ্বীপে যথেষ্ট কলঙ্ক অর্জন করিলেন। পুত্রের অসচ্চরিত্রের সংবাদ পাইযা পিতা তাঁহাকে গৃহে লইয়া আসিলেন।

গোপীজনবল্লভ দেখিতে অতি সুন্দর ছিলেন। তাঁহার কণ্ঠস্বরও বড়ই মধুর ছিল। সংস্কৃত গ্রন্থাদি যাহা যৎকিঞ্চিৎ পাঠ করিয়াছিলেন, গুরুগিরি ব্যবসায় চালাইবাব জন্য এখন কার দিনে তাহার যথাতিরিক্ত। তাঁহার পিতার বযস হইযাছিল; শিষ্যসংখ্যাও নিতান্ত কম নহে; অনেক শিষ্যের বাড়ি বৎসরে একবারও পদার্পণ করিবার সময় তিনি পাইতেন না। পুত্রকে গৃহে আনিয়া তিনি অশিক্ষিত, অল্পশিক্ষিত মধ্যবিত্ত শিষ্যের গৃহে পুত্রকে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন। যে সকল শিষ্য শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত, যাঁহাদিগের নিকট হইতে অধিক প্রাপ্তির

সম্ভাবনা, সে সকল গৃহে নিজেই গমন করিবার সঙ্কল্প করিলেন। তাই গোপীজনবল্লভ প্রথমেই চৈতন বসাকের গৃহে আসিয়া গুরুগিরি কার্যে দীক্ষিত হইলেন।

শিষ্যগৃহে গমন করিয়া কি প্রকার আচরণ করিতে হইবে, শিষ্যদিগের শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণের জন্য কি কি করিতে হইবে, পিতা পুত্রকে তাহা বিশেষ ভাবেই বলিয়া দিয়াছিলেন। গুরুপুত্র চৈতনের গৃহে আগমন করিয়া প্রথম দিনেই সকলের শ্রদ্ধাভক্তি অর্জন করিলেন। সঙ্গে বহুকালের ভৃত্য রামানন্দ আসিয়াছিল; সে গুরুদেবের সহিত এতদিন নানা শিষ্যগৃহে গমন করিয়া গুরুগিরি সম্বন্ধ বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিল। সেও গুরুপুত্রকে তাঁহার কর্তব্য বিষয়ে সজাগ করিয়া দিয়াছিল; গুরুপুত্রের দুই চারিটি ত্রুটিও সে নিজের বুদ্ধি-কৌশলে সংশোধন করিয়া লইতে লাগিল।

চৈতন গুরুপুত্রের ব্যবহারে বড়ই আনন্দিত হইল; তাহার সেবার যথোচিত ব্যবস্থা করিল। তাহার পর সে যখন শুনিল যে, গুরুপুত্র অতি সুন্দর কথকতা করিতে পারেন, তখন সে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে দুই চারিদিন তাহার গৃহে করিয়া শ্রীমদ্‌ভাগবত কথা শ্রবণ করিবার বাসনা গুরুপুত্রের নিকট জ্ঞাপন করিল।

গোপীজনবল্লভ বলিলেন, "আমাকে এ যাত্রায় অনেক শিষ্যবাড়িতে যাইতে হইবে, এখানে একরাত্রির বেশি আমি থাকিতে পারিব না; আগামী কল্য অপরাহ্ণেই যাইতে হইবে।"

চৈতন অনেক অনুনয় বিনয় করিল, গুরুপুত্র কিছুতেই সম্মত হইলেন না। রামানন্দও গুরুপুত্রেরই কথায় সায় দিল।

৫

সেইদিন সন্ধ্যার পর গুরুপুত্র যখন জলযোগ কবিতে বসিলেন, তখন তুলসী তাহার জলযোগের দ্রব্যাদি আনিয়া দিল। মধ্যাহ্নের পূর্বে গুরুপুত্র চৈতনের বাড়িতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার মধ্যাহ্ন সেবার আয়োজন চৈতন নিজেই করিয়া দিয়াছিল। তাহার বাড়িতে তুলসী ব্যতীত অন্য স্ত্রীলোক ছিল না, রামানন্দ তাহা জানিত; সুতবাং গুরু সেবার আয়োজনে সেও সাহায্য করিয়াছিল। তুলসীকে একবার মাত্র গুরুপুত্রকে প্রণাম করিবার জন্য তাঁহার সম্মুখে আসিতে হইয়াছিল। গুরুপুত্র তখন তুলসীকে ভাল কবিয়া দেখিতে পান নাই। তাঁহার জলযোগের সময় তুলসী যখন তাঁহার সম্মুখে আসিল, তখন তিনি তাহাকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহার মনে হইল, এমন রূপ তিনি জীবনে কখন দর্শন করেন নাই। সত্যসত্যই তুলসী পরম রূপবতী ছিল, তাঁহাকে দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়।

সৌন্দর্য দর্শন করিলে কাহারও মনে সেই চিরসুন্দরের কথা জাগিয়া উঠে; হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার হয়; আবার কাহারও মনে পাপ বাসনা জাগিয়া উঠে;—যাহার যেমন চক্ষু, যাহার যেমন শিক্ষা,—যাহার যেমন সাধনা! যাহার হৃদয় পবিত্র, সে সুন্দরীর মুখে মহামায়ার সৌন্দর্য দেখিয়া অবনতমস্তক হয়—সকল সৌন্দর্যের যিনি দেবতা ও স্রষ্টা তাঁহারই দিকে আকৃষ্ট হয়; আর যাহার হৃদয় কলুষিত, যাহার চিত্ত মলিনতাপূর্ণ, যাহার বাসনা ঘৃণিত, সে সুন্দরী রমণীমূর্তি দেখিয়া কি মনে করে, তাহা আর বলিয়া কাজ নাই। শ্রীমান গোপীজনবল্লভ যে এই শেষোক্ত শ্রেণির জীব, সে কথা না বলিলেও পাঠকগণ বুঝিতে পারিয়াছেন।

গুরুপুত্র একবার তুলসীর মুখের দিকে চাহিয়াই মস্তক অবনত করিলেন, সে মুখের দিকে আর চাহিতে পারিলেন না। যেটুকু তিনি দেখিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল।

জলযোগান্তে বহির্বাটীতে আসিয়া উপবেশন পূর্বক তিনি অতি গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "রামানন্দ, কালই এখান থেকে যাওয়ার ব্যবস্থাই করেছিলাম, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, চৈতন যখন কথকতা শুনবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করছে, তখন তাকে নিরাশ করাটা ভাল হয়না। বাবা বারবার বলে দিয়েছিলেন যে, চৈতন্য বড় ধার্মিক শিষ্য। তার পিতা পরম ভক্ত ছিল; সেও খুব ভক্ত। ভক্তের বাসনা অপূর্ণ রেখে চলে যাওয়া সঙ্গত বোধ হচ্ছে না রামানন্দ। স্বয়ংপ্রভুই বলেছেন, তিনি ভক্তাধীন। আমরা তাঁর দাস—আমরাও ভক্তাধীন। না, রামানন্দ, চৈতনের বাসনা অপূর্ণ রেখে যাওয়া হবেনা—তাতে তার মনে কষ্ট হবে।"

গুরুপুত্রের এমন জ্ঞানগর্ভ, সুন্দর কথা শুনিয়া চৈতনও উপস্থিত অন্যান্য সকলে বড়ই আনন্দিত হইল। রামানন্দও আর কোন আপত্তি করিল না; সে বরঞ্চ ঠাকুরের এমন বাক্য-বিন্যাসে বিশেষ আনন্দলাভই করিল; তাহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইল, গুরুপুত্র গুরুগিরিতে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবেন। সে খুব চালাক চতুর হইলেও গুরুপুত্রের অকস্মাৎ এমন মতপরিবর্তনের অন্য কারণ অনুধাবন করিতে পারিল না।

সকলেই আনন্দ প্রকাশ করিল। কিন্তু কেহই দেনা-পাওনার কথা বলে না দেখিয়া রামানন্দ বলিল, "কয়দিন পাঠ ও কথকতা হবে, সেটা ত স্থির হওয়া চাই।"

গুরুপুত্র বলিলেন, 'দিন ত আগে থাকতেই ঠিক করে বলা যায় না! তবে ভগবানের একটা লীলা—এই যেমন রাসলীলা—এর বর্ণনা করতে গেলে যেমন করে হোক পনের দিনের কমে আর হয় না; রাসলীলার গূঢ় তত্ত্ব বর্ণনা করতে হবে, নিগূঢ় রসের ব্যাখ্যা করতে হবে, অনেক বিষয়ের অবতারণা করতে হবে, পনেরো দিনের কম কি হয়?"

রামানন্দ গুরুপুত্রের কথা শুনিয়াই বড়ই সন্তুষ্ট হইল। মনে মনে বলিল—"ভ্যালা মোর ভাই! ছেলেটা তো খুব পয়সা লুঠতে পারবে।"

হায়! মূর্খ বৃদ্ধ! তুমি শুধু আর্থিক লাভের কথাই ভাবিলে। কিন্তু তোমার শহর ফেরত, নরকের কীট ঠাকুর-পুত্র যে মনে মনে কি চিন্তা করিয়া একথা বলিল, তাহা তুমি মোটেই বুঝিতে পারিলে না।

তখন চৈতন বলিল, "পনেরোদিন কথকতা করিতে গেলে ঠাকুরপুত্রকে যে পরিমাণ প্রণামী দেওয়া উচিত, তাহা ত আমার মত গরিবের সাধ্যে কুলাইয়া উঠিবে না।"

এই কথা শুনিয়া উপস্থিত ব্যক্তিরা বলিয়া উঠিল, "তা কেন, আমরা সকলেই ঠাকুরের শ্রীমুখের পাঠ শুনিয়া যথাযোগ্য প্রণামি দিব। সকলেই প্রত্যহ কিছু কিছু প্রণামি দিলেই ত হইবে। তাহার পর চৈতনের যাহা সাধ্য হয়, সে তাহা দিবে।"

গুরুপুত্র বলিলেন, "অর্থের আশা আমি করি না। তোমরা শ্রদ্ধাপূর্বক যাহা দিবে, আমি তাহাই গ্রহণ করব। ও কথা বলতে নেই।"

গুরুপুত্রের কথা শুনিয়া সকলে মুগ্ধ হইল এবং একবাক্যে তাঁহার নির্লোভতা, তাঁহার মহত্ত্বের প্রশংসা করিতে লাগিল।

৬

গ্রামময় প্রচারিত হইল যে, চৈতন বসাকের গুরুপুত্র পরদিন অপরাহ্নকালে তাহার বাটীতে কথকতা আরম্ভ করিবেন এবং পনেরোদিন পর্যন্ত কথকতা চলিবে।

যথাসময়ে গ্রামের অনেকেই কথকতা শুনিতে আসিল। গুরুপুত্র অতি সুন্দর কথকতা করিতে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। তাহার প্রথম দিনের কথকতা শ্রবণ করিয়া সকলেই বিশেষ আনন্দ লাভ করিলেন। কথক মহাশয় কথকতার মধ্যে মধ্যে যে কয়েকটি গান করিলেন, তাহা বড়ই সুন্দর হইয়াছিল।

যেখানে কথকতা হইতেছিল, তাহার পাশের গৃহের বারান্দা চিক দিয়া ঘিরিয়া দেওয়া হইয়াছিল; গ্রামের স্ত্রীলোকেরা সেই চিকের অন্তরাল হইতে কথকতা শুনিতেছিলেন। গুরুপুত্র পাঠ করিবার সময় মধ্যে মধ্যে সেই বারান্দার দিকে সতৃষ্ণ নয়নে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, এবং মহা উৎসাহে শাস্ত্রের মর্ম ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন।

প্রথম দিনের পাঠ শেষ হইলে সন্ধ্যাবন্দনাদির পর গুরুপুত্র চৈতনের বাড়ির মধ্যে জলযোগ করিবার জন্য গমন করিলেন। চৈতন পূর্বেই তুলসীর সাহায্যে সমস্ত আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিল।

এই দুইদিনের মধ্যে গুরুপুত্র তুলসীর সহিত কথা বলিবার কোন সুযোগই করিয়া উঠিতে পারেন নাই। আজ তিনি জলযোগ করিতে বসিয়া তুলসীকে বলিলেন, "তুমি আমায় দেখে লজ্জা কর কেন? আমি তোমাদের গুরু; আমাকে কি লজ্জা করতে আছে?"

চৈতন বলিল। "প্রভু, আমার এই ভগিনীটির বড়ই লজ্জা। ও এই গ্রামের মেয়ে, কিন্তু অদৃষ্ট মন্দ হইবার পর ও গ্রামের কারও সম্মুখে বের হয়না। তুলসী, উনি আমাদের গুরুদেবের ছেলে; ওর সম্মুখে লজ্জা করতে নেই। আব উনি যখন কয়েকদিন এখানেই সেবা নেবেন, তখন তোর ত লজ্জা করলে চলবে না। বাড়িতে এক তুই আর আমি; আর ত কেউ নেই। আজ কেমন কথকতা হোলো?"

তুলসী তখন অতি ধীর ভাবে বলিল, "এমন গান, এমন কথা কখনও শুনিনি দাদা!"

গুরুপুত্র সহাস্য বদনে বলিলেন, "তোমরা শুনে যে আনন্দলাভ করেছ, এতেই আমার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে। তোমরা রাধারানির অংশ; তোমাদের গান শুনিয়ে আমাদের ও আনন্দ হয়।"

চৈতন বলিল, "তুলসী, খুব মনদিয়ে গুরুর সেবা করো। ওঁর সেবায় যে ত্রুটি না হয়। সেবাপরাধের চাইতে মহা-অপরাধ আর নেই, বাবা একথা সকল সময়ই বলতেন।"

তুলসী বলিল, "আমার যা শক্তি তা আমি করব। তুমি কিছু ভেবনা দাদা!"

চৈতন বলিল, "আমাকে নানা কাজে ব্যস্ত হতে হয়; তাই তোমাকে সাবধান করে দিলাম।"

ভ্রাতা-ভগিনীর এই কথোপকথন শুনিয়া গুরু-পুত্র বড়ই সুখী হইলেন; এবং জলযোগান্তে বাহিরে গমন করিলেন।

গুরুপুত্র সাত-আট দিন কথকতা করিলেন; গ্রামের লোকেরা যথাসাধ্য প্রণামী প্রতিদিনই দিতে লাগিল, অনেকে বস্ত্রাদিও প্রদান করিল; কেহ কেহ সিধাও দিল। গুরুপুত্রের যথেষ্ট অর্থাগম হইতে লাগিল।

অষ্টম দিনে গুরুপুত্র ভৃত্য রামানন্দকে বলিলেন, "আনন্দদা, বাড়িতে পত্র লিখিয়াছি। এখানে যে দশ পনেরো দিন থাকিতে হইবে, তাহাও জানাইয়াছি, কিন্তু তোমাকে একটা কাজ করিতে হইতেছে। জিনিসপত্র অনেক জমিয়াছে; বিলম্ব হইলে ইহার মধ্যের অনেক দ্রব্য নষ্ট হইয়া যাইবে। আমি বলি কি, তুমি একবার এই সব জিনিস নিয়ে বাড়ি যাও। সমস্ত পৌছিয়ে দিয়ে তিন চারদিন পরে আবার এস। যাতায়াতে চারপাঁচ টাকা খরচ হবে, তা বলে উপায় কি। তুমি যে কয়দিন অনুপস্থিত থাকবে, সে কয়দিন আমার কোনই অসুবিধা হবে না। তুমি ত দেখতেই পাচ্ছ, চৈতন ও তুলসী আমার কেমন যত্ন করছে।"

বুড়া রামানন্দ এই কথাই বুঝিল। সে পরদিন প্রাতঃকালে দ্রব্যাদি এবং পথখবচেব টাকা লইয়া দেশে চলিয়া গেল। চৈতনের গ্রাম হইতে গুরুগৃহ প্রায় একদিনের পথ, নৌকায় কিছুদূর যাইতে হয, তাহার পর স্টিমার, তাহার পর গো-যান।

গোপীজনবল্লভ সেদিন আরও স্ফূর্তির সহিত কথকতা কবিলেন। বিগত আটদিন অপেক্ষা এইদিনেই তাঁহার কথকতা অধিক হৃদয়গ্রাহী হইল; সমাগত শ্রোতৃবৃন্দ ঘন ঘন হবিধ্বনি করিতে লাগিল। তিনি যখন গান ধরিলেন—

জনম অবধি হাম রূপ নেহারলু
নয়ন না তিরপিত ভেল,
যুগ-যুগ ভরি হিয়ে-হিয়ে রাখনু,
তবু হিয়া জুড়ান না গেল।"*

তখন একেবারে সকলে আনন্দে উন্মত্ত হইল। চিকের অন্তরালে যাঁহারা বসিয়া ছিলেন, তাঁহাদের হৃদয় পর্যন্ত আর্দ্র হইয়া গেল। সকলেই একবাক্যে বলিলেন, এমন গান তাঁহারা কখনও শোনেন নাই। সেদিন গুরুপুত্র অন্যদিন অপেক্ষা অনেক অধিক প্রণামি পাইলেন।

পাঠ শেষ হইলে সংকীর্তন আরম্ভ হইল। সে সংকীর্তনই বা কি প্রাণস্পর্শী! ভক্তগণ গুরুপুত্রকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে; দুই খানি খোল ও তিনচারি জোড়া করতাল বাজিতেছে; আর গুরুপুত্র ভাবে বিভোর হইয়া দুই বাহু তুলিয়া নাচিয়া-নাচিয়া গান কবিতেছেন—

"আমায় বলে দে রে নিতাই,
আর কতদূর মধুর বৃন্দাবন।"

গুরুপুত্র গান করিতেছেন, আর সকলে দোহারকি করিতেছে। গান জমিয়া উঠিল; শেযে শুধু শোনা যাইতে লাগিল—

* পদটি কবিবল্লভের পূর্বরাগ ও অনুরাগ পর্যায়ের পদ। মূল পাঠটি এরূপ—"লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলুঁ / তবু হিয়া জুড়ন না গেল।"

'আর কতদূর—ওরে নিতাই!'
'আর কতদূর—ওরে নিতাই!'
শেষে 'আর কতদূর' ও থাকিলনা—শুধু রহিল
ওরে নিতাই! ওরে নিতাই!"

সে সময়ের দৃশ্য দেখিলে, ভক্তগণের প্রাণস্পর্শী 'ওরে নিতাই' শুনিলে পাষাণ-প্রাণ ও গলিয়া যায়। সত্যসত্যই দুইতিন জন প্রকৃত ধার্মিক ব্যক্তির গভীর ভাবাবেশ হইল। চৈতনও উন্মত্তের ন্যায় এক-একবার ধূলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিল; কখনও বা কাহাকে আলিঙ্গন করিতে লাগিল, কখন বা গুরুপুত্রের পাদমূলে পড়িতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পরে সকলেই ক্লান্ত হইয়া পড়িল; সংকীর্তন শেষ হইল। তখন আলিঙ্গন, প্রণাম আরম্ভ হইল। সকলেই গুরুপুত্রের পদধূলি গ্রহণ করিয়া মাথায় ও জিহ্বায় স্পর্শ করাইতে লাগিল। সকলেই বলিল, গুরুপুত্রের ন্যায় ধার্মিক ও প্রেমিক ব্যক্তি তাঁহারা কখনও দেখে নাই। এই অল্প বয়সেই তাঁহার হৃদয়ে প্রকৃত প্রেমের সঞ্চার হইয়াছে। কেহ বলিল, "হবে না কেমন পিতার পুত্র।" কেহ বলিল, "ঠাকুর প্রভুর অংশাবতার; নতুবা কি এমন প্রেম হয়।"

চিকের অন্তরালে অবস্থিতা রমণীবৃন্দ কে কি বলিল, তাহা শুনিবার সুযোগ আমাদের হয় নাই; তবে একবার এইটুকু মাত্র দেখিয়াছিলাম যে, তুলসী বাহ্যজ্ঞানশূন্যা হইয়া বসিয়াছিল।

চৈতন তখন হরির লুঠ দিল; সকলে লুঠ-প্রসাদ গ্রহণ করিয়া সে রাত্রির মত ঘরে চলিয়া গেল। আনন্দের হাট ভাঙিয়া গেল।

৭

চৈতনের বাড়িতে দালান কোঠা ছিলনা; সবই মাটির দেওয়াল ও খড়ের চালওয়ালা ঘর। বাহিরে যে ঘরখানি ছিল, তাহা ছোট; তাহার মধ্যে এক পার্শ্বে তাঁত বসান ছিল; সুতরাং সে ঘরে যে স্থানটুকু ছিল, তাহাতে গুরুপুত্রের বাসের ব্যবস্থা হইতেই পারে না। সেইজন্য চৈতন গুরুপুত্রকে বাড়ির মধ্যের ভাল ঘরখানি ছাড়িয়া দিয়াছিল। এই ঘরখানিতে তুলসী থাকিত; চৈতন কি শীত, কি গ্রীষ্ম, ঐ ঘরের বারান্দায় শয়ন করিত। তুলসী ছেলেমানুষ, সে কি একলা এক ঘরে থাকিতে পারে?

গুরুপুত্র ঐ ঘরখানিতে রাত্রিবাস আরম্ভ করিলেন; বামানন্দও সেই ঘরে শয়ন করিত। পাশেই একখানি ঘর ছিল; সেই ঘরে তুলসীর থাকিবার ব্যবস্থা হইল। চৈতন বাহিরের তাঁতঘরের বারান্দায় এ কয়দিন শয়নের ব্যবস্থা করিয়াছিল।

রামানন্দ যে দিন চলিয়া গেল, সেদিন চৈতন গুরুপুত্রকে বলিল "ঠাকুর মশাই, আজ ত রামানন্দ নেই, আমিই আপনার ঘরের বারান্দায় থাকি। রাত্রিতে কখন কি দরকার হয়, বলা ত যায় না।"

গুরুপুত্র বলিলেন "তার দরকার কি? এ ত আমার বাড়ি। আর রাত্রিতে আমার উঠিবার অভ্যাস নাই; কোন দরকারই প্রায় হয় না। তুমি আর কেন কষ্ট করিয়া এখানে থাকিবে।

আর এমনই যদি কিছুর প্রয়োজন হয় পাশের ঘরেই ত তুলসী থাকে, তাহাকেও ডাকিতে পারিব; তুমিও ত আর বাড়ি ছাড়িয়া যাইতেছ না; তোমাকেও ডাকিতে পারিব।"

চৈতন গুরুবাক্য অবহেলা করিতে পারিল না; সে পূর্বের মতই বাহিরের ঘরেই শয়ন করিতে গেল।

পরদিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া চৈতন বাড়ির মধ্যে আসিয়া কাহারও সাড়া পাইলনা। সে মনে করিল, সকলেই বুঝি ঘুমাইতেছেন। আস্তে আস্তে গুরু পুত্র যে ঘরে শয়ন করিয়াছিলেন, সেই ঘরের বারান্দায় উঠিয়া দেখে দুয়ায় খোলা রহিয়াছে। ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখে, গুরু পুত্র শয্যায় নাই। চৈতন মনে করিল গুরুপুত্র হয় ত বাহিরে গিয়াচেন।

তখন সে উঠানে নামিয়া ডাকিল, "তুলসী, ও তুলসী! বেলা হয়েছে যে! এখনও ঘুমুচ্ছিস্।

তুলসী যে ঘরে শয়ন করিয়াছিল, সে ঘর হইতেও কোন শব্দ পাওয়া গেল না। চৈতন ঘরের মধ্যে যাইয়া দেখে তুলসীও ঘরে নাই।

সে তখন বাহিরে আসিয়া ডাকাডাকি করিতে লাগিল; বাড়ির চারিপার্শ্বে দেখিল। কোথাও কাহাকেও দেখিল না। প্রায় পনেরো মিনিট বাহিরে বসিয়া রহিল; তখনও কাহাকেও দেখিতে পাইলনা। গুরুপুত্রের দ্রব্যাদি যে ঘরে ছিল, সেখানে যাইয়া দেখিল, গুরুপুত্রের জামা জুতা চাদর নেই; একপাশে একটা সিন্দুকের উপর গুরুপুত্রের ব্যাগটি থাকিত; তাহাও সেখানে নাই। তুলসীর ঘরে যাইয়া দেখিল, সে ঘর হইতে কোন জিনিসই স্থানান্তরিত হয় নাই। সে তখন মাথায় হাত দিয়া বসিল। তাহার আর কিছুই বুঝিতে বাকি রইল না। তাহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তুলসী—তাহার জীবনের একমাত্র অবলম্বন, তুলসী এমন কাজ করিল। একবারও কি তাহার দাদার কথা মনে হইল না;—একবারও কি সে ভাবিয়া দেখিল না, তাহার পরিণাম কি হইবে!

আর গুরুপুত্র! গুরুপুত্রের এই কাজ!—শিষ্যাহরণ! শিষ্যাকে কুপথে লইয়া যাওয়া! পৃথিবীতে এ কি হইল? ধর্ম কি নাই? সবই কি ভণ্ডামি? সবই কি কথার কথা? যে গুরুপুত্র এই কযদিন ধর্মের কথা বলিয়া নিজে কাঁদিয়াছেন, সকলকে কাঁদাইয়াছেন, সে সবই কি কৃত্রিম? হায়! গুরুদেব, এ কি করিলে! এখন উপায়! চৈতন চারিদিক অন্ধকার দেখিল;—কোন উপায়ই তাহার মাথায় আসিলনা। সে জড়ের মত চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

৮

এমন করিয়া বসিয়া থাকিলে ত চলিবে না; এখনই যাহা হয় একটা উপায় করিতে হইবে। এই কথা মনে হইবা মাত্র চৈতনের চমক ভাঙ্গিল।

করিতে হইবে ত? কিন্তু কি করা যায়? কোন পথই ত সে দেখিতে পাইতেছে না। আর বিলম্ব করাও কিছুতেই কর্তব্য নহে।

সে প্রথমে মনে করিল, স্টেশনে যাইবে; কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিল, তাহারা কি এতই মূর্খ যে, রেলস্টেশনে যাইয়া গাড়ির অপেক্ষা করিবে? তাহারা নিশ্চয়ই স্টেশনে যায় নাই। অন্য কোন পথে পলায়ন করিয়াছে। পথ ত অনেক আছে, কোন পথে সে যায়।

তখনই তাহার মনে হইল, কেন সে তাহাদের অনুসরণ করিবে। যে তুলসী তাহার মায়া কাটাইয়া এমন করিয়া চলিয়া যাইতে পারে, তাহার খোঁজে সে কেন যাইবে? আর তাহাকে পাইলেই বা সে কেন তাহাকে পুনরায় ঘরে ফিরাইয়া আনিবে? সেই বা আসিতে চাহিবে কেন?

সে কথা না হয় গেল; কিন্তু এই যে লোক-জানাজানি হইবে, সমাজে সে মুখ দেখাইতে পারিবে না, কলঙ্কে দেশ ভরিয়া যাইবে, তাহার কি? আর গুরুদেব? তিনি যখন শুনিবেন তাঁহার পুত্র এমন কাজ করিয়াছে, তখন তাঁহার মনে কি কষ্ট হইবে! তিনি কি আর এ অঞ্চলে কখন আসিতে পারিবেন? হায়, সর্বনাশী তুলসী, তুই এ কি করলি? সব যে যায়! কোন দিকেই যে পথ দেখিতে পাই না। এই জন্যই কি তোকে মানুষ করিয়াছিলাম?

পরক্ষণেই আবার মনে হইল, ইহার জন্য প্রধান অপরাধী কে? সে দেখিল, সর্বাপেক্ষা প্রধান অপরাধ তাহার নিজের। চৈতন বলিতে লাগিল, 'আমারই ত অপরাধ! কেন আমি তুলসীকে সাবধানে রাখি নাই? গুরুপুত্র,—হোক না গুরুপুত্র। যুবক ত বটে। তার বয়সই বা এত কি? তাহার সহিত তুলসীকে কেন অবাধ মিশিতে দিলাম। গুরুপুত্র আছেন গুরুপুত্রই আছেন। তার স্বভাব-চরিত্র কেমন, সে সংবাদ আমি কি রাখিয়াছি? তবে তাকে বাড়ির মধ্যে আশ্রয় দিলাম কেন? তাহার সেবা করিবার ভার তুলসীর উপর দিলাম কেন? তুলসী বিধবা-যুবতী; তাহার সম্মুখে এমন প্রলোভন আনিয়া দিলাম কেন? কত লেখাপড়া-জানা পণ্ডিত লোককেও ত দেখিয়াছি; তিনকাল চলিয়া গিয়া শেষ কালে তাহারাও কত কীর্তি করিয়া বসিয়াছে; তুলসী ত সেদিনকার মেয়ে, লেখাপড়া জানে না। এসব কথা ত আমারই মনে হওয়া উচিত ছিল! আমারই বুদ্ধির দোষে এমন কর্ম হইয়াছে; আমারই বিবেচনার দোষে গুরুপুত্রের এরূপ অধঃপতন হইল; আমারই জন্য তুলসী, আমার কত আদরের তুলসী পাপে ডুবিয়া গেল,—একেবারে নরকে গেল। আর আমাকে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য রাখিয়া গেল। গুরুপুত্রের দোষ নাই, তুলসীর অপরাধ নাই,—সব দোষ,—সব অপরাধ আমার।"

"তা যেন হইল, কিন্তু এখন করি কি? কি করিলে সবদিক রক্ষা পায়? "চৈতন আবার চিন্তামগ্ন হইল।

একটু পরেই সে যেন কূল পাইল; সে যেন পথ দেখিতে পাইল। সে বলিয়া উঠিল, "নাঃ—ও সব সত্যমিথ্যা ভাবলে চল্‌বে না। সবদিক বাঁচানো চাই। গুরুদেবের নাম, তাঁর যশ বাঁচাতে হবে, তুলসীকে বাঁচাতে হবে, সমাজের কাছে নিজেকে বাঁচাতে হবে। এতকাল যা করি নাই, আজ তাই করব। গুরুদেব, তুমি সাক্ষী,—আজ আমি মিথ্যা কথা বলব,—আজ আমি প্রবঞ্চনা করব। এর জন্য যত পাপ্ হয়, আমার হবে। এরজন্য আমাকে যদি নরকে যেতে হয়, তাও আমি যাব। কিন্তু আমি আমাব গুরুদেবের নামে কালি মাখাতে পারব না; আমার বড় আদরের ভগিনী তুলসীকে সমাজের কাছে চিরকলঙ্কিনী করতে পারব না। তুলসীকে আমি খুঁজে বার করবই, তাকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে আসবই। এরপর যা হয় হবে। এখনকার কাজ ত করি।"

এই বলিয়া চৈতন বাড়ির বাহির হইল। হলধর বসাক তাহার স্বজাতীয় ও প্রতিবেশী। সে তাহার বাড়িতে উপস্থিত হইল।

এত সকালে তাহাকে দেখিয়া, হলধর বলিল, "কি চৈতন, এত সকালে কি মনে করে?"

চৈতন বলিল, "কাকা, বড় বিপদে পড়েছি। কাল রাত্রিতেই শ্রীপাট থেকে এক লোক এসে উপস্থিত। তার কাছে শুনলাম গুরুদেবের ভয়ানক অসুখ। তিনি বাঁচেন কিনা সন্দেহ। গুরুদেব বার বার বলে দিয়েছেন, গুরুপুত্রকে সঙ্গে নিয়ে আমি যেন তখনই রওনা হই। গুরুপুত্র ত এই কথা শুনে কেঁদেই আকুল। যে লোকটা এসেছিল, সে বলল যে, সে যাতায়াতের ভাড়া করে নৌকা নিয়ে এসেছে। তখন কাকা, তোমাকে আর খবর দেওয়ার সময় পেলামনা। কিন্তু আমি ত আর তখনই যেতে পারিনে; ঘরদুয়ারের, জিনিসপত্রের ত ব্যবস্থা করতে হবে, বাড়ি দেখবার জন্য লোক ও রাখতে হবে। তারপর মুশ্‌কিল হোলো, তুলসীকে কোথায় রেখে যাব। একবার মনে করলাম, তোমার কাছেই তাকে রেখে যাই। সে তাতে মোটেই সম্মত হোল না, বলল 'দাদা' তোমার সঙ্গে আমিও যাব। গুরুদেবকে শেষ দেখা দেখে আসি।' কথাটা আমারও মনে লাগল। তখন গুরুপুত্র ও সেই লোকের সঙ্গে তুলসীকে নৌকায় তুলে দিয়ে এই আসছি। তাদের বলে দিয়েছি, আমি বাড়ির একটা ব্যবস্থা করে, এই ঘণ্টা-খানেকের মধ্যেই হাঁটা-পথে গিয়ে রঘুনাথপুরে তাদের নৌকা ধরব। তাই এখন তোমার কাছে এসেছি কাকা, তুমি আমাকে এই বিপদে রক্ষা না করলে আর কোন উপায় দেখিনা। আর এক ঘণ্টার মধ্যেই আমাকে চলে যেতে হবে। তুমি যদি আমার ঘর-বাড়ি দেখবার ভার না নেও, তাহলে আমার আর কোন উপায় নাই কাকা!"

হলধর বলিল, "তাই ত! তোমার দেখছি ভারি বিপদ। তোমার গুরুপুত্রের কথকতা আর শুনতে পাওয়া গেল না। যাক্‌, তা ভেবে আর কি হবে। তুমি এক কাজ কর। তোমার বাক্স পেটরাগুলো আমার বাড়িতে এখনই পাঠিয়ে দেও, বাসনপত্রগুলোও বাড়িতে রেখে কাজ নেই। সেগুলো ও এখানেই এনে রাখছি। রাত্রিতে তোমার বাড়িতে আমাদের দুই একজন লোক গিয়ে থাকবে, তা হলেই হোলো। এর জন্য তুমি ব্যস্ত হোয়োনা। বাড়িঘর আছে, আমরা আছি। চল, আর দেরি কোরনা। নৌকো যত এগিয়ে যাবে, তোমাকে ততই বেশি হাঁটতে হবে।"

হলধর তাড়াতাড়ি লোকজন ডাকিয়া চৈতনের বাড়িতে উপস্থিত হইল। চৈতন বলিল, "এই দেখ কাকা! কোন জিনিসই গোছাতে পারিনি। গুরুপুত্র যে রকম ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, তাতে আর কি করা যায়।"

তখন সকলে মিলিয়া চৈতনের বাক্স সিন্দুক ও বাসনপত্র হলধরের বাড়িতে লইয়া গেল। টাকাকড়ি যাহা ছিল, তাহার কিছু চৈতন সঙ্গে লইল; অবশিষ্ট সমস্ত হলধরের নিকট রাখিয়া গেল। হলধরের চাকর রাত্রিতে চৈতনের বাড়িতে থাকিবে স্থির হইলে, চৈতন হলধরকে প্রণাম করিয়া বাড়ির বাহির হইল।

হলধর বলিল, "বাড়ির জন্য কিছু ভেবোনা। পৌছেই একখানা চিঠি লিখো, তোমার গুরুদেব কেমন থাকেন। তারপর, অবস্থা বুঝে, যত শীঘ্র পার, তুলসীকে নিয়ে বাড়ি ফিরে এস।"

চৈতন "আচ্ছা, তাই হবে" বলিয়া যাত্রা করিল।

৯

গ্রামের বাহিরে নদীতীরে উপস্থিত হইয়া চৈতন একটা বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল, "এখন যাই কোথায়? তুলসীকে লইয়া গুরুপুত্র কোথায় গেল, তাহা ত মোটেই স্থির করিতে পারছিনে। নিজের গ্রামে সে কখনই যেতে পারবেনা; নবদ্বীপেও যাবে না। সেখানে তার অনেক চেনা লোক আছে। কোন একটা শহরেই হয়ত তারা গিয়েছে। কিন্তু শহর ত একটা নয়; কত শহর আছে। কোন্ শহরে যাই, আর এই বাংলাদেশের মধ্যে কোথায় তারা গেল, আমি কোথায় গিয়ে তাদের খুঁজে বার করব। তা কাজ নেই, গুরুদেবের বাড়িতেই যাই। তাঁকে সব কথা খুলে বলি। তারপর তিনি যা উপদেশ করবেন, করা যাবে। সেই ভাল। কিন্তু এখান থেকেই নৌকা ভাড়া করা হবে না। রঘুনাথপুর পর্যন্ত হেঁটেই যেতে হবে।" এই বলিয়া চৈতন রঘুনাথপুর অভিমুখে গমন করিল।

চৈতনের গ্রাম হইতে রঘুনাথপুর নদীতীর পথে প্রায় চারিক্রোশ। বেলা দশটার সময় চৈতন রঘুনাথপুরের ঘাটে পৌঁছাইয়া দেখিল, ঘাটে একখানিও নৌকা নাই। চৈতন মহাবিপদে পড়িল; সমস্ত পথ হাঁটিয়া যাওয়া অন্য সময়ে তাহার পক্ষে সম্ভব হইলেও বর্তমান মনের অবস্থায় তাহার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব।

ঘাটের একটু উপরেই কয়েকজন লোক একখানি নৌকার জীর্ণ সংস্কার করিতেছিল; চৈতন সেইখানে যাইয়া তাহাদেরই পার্শ্বে নৌকার ছায়ায় বসিয়া পড়িল। তাহার দিকে চাহিয়া একজন বলিল, "তুমি কোথায় যাবে?"

চৈতন বলিল, "যাব অনেক দূর। ঘাটে ত নৌকা একখানাও নাই, কি করা যায়।"

"তোমার বাড়ি কোথায়?"

"সে তোমরা চিনবেনা। আমার বাড়ি রামনগর।"

"কোন রামনগর, কেশবপুরের কাছে সেই রামনগর।"

চৈতন বলিল, "হ্যাঁ; সেই রামনগরেই আমার বাড়ি। এখন বলত, একখানি নৌকা কেমন করে পাই।"

"নৌকা ত ঘাটে নেই। একখানি নৌকা ছিল। এই সকালবেলা একজন ভদ্রলোক তার পরিবার সঙ্গে করে এসে সেই নৌকাখানি ভাড়া করে চলে গিয়েছে।"

সেখানে যাহারা বসিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে একজন বলিল, "দেখ, রাজু, সেই বামুনটার বৌ কিছুতেই নৌকোয় উঠতে চাচ্ছিলনা, কাঁদছিল, তা দেখেছিস। ছোঁড়াটা বৌটাকে এক রকম টেনে-হিঁচড়ে নৌকায় তুলল। অতবড় ডাগরবৌ, স্বামীর সঙ্গে শ্বশুরবাড়ি যেতে কাঁদে, এ আর কখন দেখিনি। ছোট মেয়েরা কাঁদতে পারে, যেতে না চাইতে পারে। এত বড় ধেড়ে মেয়ে, বয়স ষোল সতেরো ত হবেই; সে কি না যেতে চায়না। আমার ত ইচ্ছে হচ্ছিল, বৌটাকে একটা তাড়া দিই।"

উপবিষ্ট তৃতীয় ব্যক্তি বলিল, "ছোঁড়াটা আর বৌটা প্রায় এক বয়সী। আমাদের মধ্যে এমন বিয়ে হয়না; ভদ্রলোক বামুন কায়েতের মধ্যেই মেয়ে ডাগর হয়, আর শেষে আঠারো

বছরের মেয়ের সঙ্গে সতেরো বছরের ছেলে বিয়ে দেয়। এদেরই তাই হয়েছে—একেবারে মানায় নেই।"

চৈতন একাগ্র মনে, কথাগুলি শুনিল। যে বেশ বুঝিতে পারিল, ইহারা আর কেউই নহে—তাহার গুরুপুত্র আর তুলসী। সে কোন প্রকার চঞ্চলতা না দেখাইয়া অতি ধীর ভাবে বলিল "একটু আগে এলে হয়ত তারা আমাকে তাদের নৌকায় নিয়ে যেতে পারত। তারা কোনদিকে গেল, উজানে না ভাটিতে।"

প্রথম ব্যক্তি বলিল, "ভাটিতে গিয়েছে। তা সে বৌটা যে রকম কান্নাকাটি করছিল, আর নৌকা থেকে নেমে পড়বার মত করছিল, তাতে ভদ্রলোক যে তোমার মত অচেনা লোককে নৌকায় নিয়ে যেত, তা বোধ হয় না। আচ্ছা রাজু, বৌটা যেতে চাচ্ছিল না কেন রে? সোয়ামি ত দেখতে খুব ভাল। গৌরবর্ণ মুখ, চোখ কেমন সুন্দর। দেখলেই বোধ হয় গোঁসাই-গোবিন্দ। বৌটাও সুন্দরী, তা মানি কিন্তু এমন সোয়ামি মনে ধরে না, সে কেমন বৌ রে!"

চৈতনের আর শুনিবার প্রয়োজন হইলনা। সে এই কথোপকথন হইতে অনেক কথা জানিতে পারিল, অনেক বুঝিতে পারিল; এবং তাহারা গুরুপুত্র ও তুলসী সে বিষয়েও তাহার সন্দেহ রহিল না।

সে তখন উঠিয়া বলিল, "আর বসে থেকে কি করব; ধীরে ধীরে হেঁটেই যাই। পথে যদি কোন নৌকা পাই, ত ভালই।" এই বলিয়া চৈতন ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। তাহার পর যেই সে ঐ লোকগুলির দৃষ্টিবহির্ভূত হইল, অমনি উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়িতে আরম্ভ করিল। মাথার উপর সূর্যদেব অগ্নি বর্ষণ করিতেছে। সর্বাঙ্গ ঘর্মাক্ত হইয়া গিয়াছে, ঘন-ঘন নিঃশ্বাস পড়িতেছে, চলিতে কষ্ট হইতেছে, কিন্তু কিছুতেই চৈতন অপেক্ষা করিলনা। তাহার মনে হইতে লাগিল, তুলসী নৌকার মধ্যে বসিয়া কত না কাঁদিতেছে।

১০

প্রায় তিনক্রোশ এই ভাবে চলিয়া চৈতন নদীব একটা বাঁকের মাথায় উপস্থিত হইয়া দেখিল, কিছু দূরে একখানি নৌকা তীরসংলগ্ন রহিয়াছে। চৈতন ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল মাঝিরা নৌকায় বসিয়া আছে, গোপীজনবল্লভ বালির চরের উপর দিয়া একটি ঘটি হস্তে নৌকার দিকে আসিতেছে।

দূর হইতে গুরুপুত্রকে দেখিয়াই চৈতন তাহার দিকে দৌড়িল এবং দেখিতে দেখিতে তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়া একেবারে তাহাকে চাপিয়া ধরিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল, "ওরে বেটা পাজি, আজ তোরই একদিন কি আমারই একদিন।" এই বলিয়াই সে গুরুপুত্রকে এমন এক চপেটাঘাত কবিল যে, সেই আঘাতের চোটেই ঠাকুর ধবাশায়ী হইল।

চৈতন রাগে অধীর হইয়া গুরু পুত্রকে সেই বালুকার উপর চাপিয়া ধরিল। নৌকার মাঝিরা তখন নৌকা হইতে লম্ফ দিয়া তীরে আসিয়া ঠাকুরের সাহায্য করিবার জন্য অগ্রসর হইল।

চৈতন তখন জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। গোপীজনবল্লভ যে তাহার গুরুপুত্র, সে কথা

আর তখন তার মনে স্থান পাইল না। সে ঠাকুরকে বালুকার মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া বলিতে লাগিল "ওরে বেটা বামুন, তুমি বুঝি বদমাইসি করবার আর জায়গা পাওনি। ভদ্রলোকের মেয়ে নিয়ে পালানোর কি শাস্তি, তা আজ তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি, পাজি, বদমায়েস!"

মাঝিরা ঠাকুরের সাহায্যের জন্য আসিয়াছিল; কিন্তু চৈতনের কথা শুনিয়া তাহারা স্তম্ভিত হইয়া গেল।

সেই সময় তুলসী পাগলিনির মত নৌকার বাহির হইয়া একেবারে জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং দৌড়িয়া উপরে উঠিয়া আসিয়া চৈতনের পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া উঠিল—"দাদা আমাকে রক্ষা কর।"

চৈতনের তখনও রাগ পড়ে নাই? বলিল, "তুলসী, একটু অপেক্ষা কর। এ বেটার শাস্তিটা ভাল করেই দিই, তারপর তোকে রক্ষা করব।" এই বলিয়া ঠাকুরের গলা চাপিয়া ধরিল।

সম্মুখে ব্রহ্মহত্যা হয় দেখিয়া মাঝিরা আসিয়া চৈতনকে ধরিল; বলিল, "আরে, কর কি! বেহ্মহত্যে হয় যে ! শেষে কি খুনের দায়ে ঠেকবে । ছেড়ে দাও।"

তাহারা তখন চৈতনের কবল হইতে ঠাকুরকে ছাড়াইয়া লইল। একজন বলিল, "খুব শাস্তি হয়েছে। যেমনি কর্ম তেমনি ফল। এই বয়সেই ঠাকুর, তোমার এত বদমাইসি। এই বেলা পালাও, নইলে তোমাকে আমরা থানায় নিয়ে যাব। এখনকার দিনে মানুষ চেনা যায় না। দেখ্‌তে ত বেশ গোঁসাই-গোবিন্দের মত। যাও, পালাও।" এই বলিয়া সে ঠাকুরকে এক ধাক্কা দিল।

নির্লজ্জ গুরুপুত্র মুখ ভার করিয়া বলিল, "আমার ব্যাগ আর চাদর।"

"কিছু পাবে না ঠাকুর! ঐ একবস্ত্রে যেখানে খুশি চলে যাও। বেশি কথা বল ত হাড় ভেঙে দেব।"

ঠাকুর দেখিল, আর বাক্যব্যয় করা নিরাপদ নহে। সে তখন চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। চৈতনের হঠাৎ কি মনে হইল; সে একটু অগ্রসর হইয়া ঠাকুরের হাত চাপিয়া ধরিয়া দৃঢ় স্বরে বলিল, "একটা কথা বলে যাও, তুলসীর ধর্মনষ্ট করেছ কি না, ঠিক বল।"

গুরুপুত্র কাতরভাবে বলিল, "না—না আমি কোন দিন কোন অত্যাচার করি নাই—আমার কথা বিশ্বাস কর।"

"বেশ দাঁড়াও। তোমার জিনিসপত্র দিচ্ছি। কিন্তু খবরদার, আর কখন এ মুখো হয়োনা ঠাকুর।"

চৈতনের আদেশ অনুসারে একজন মাঝি ঠাকুরের ব্যাগ ও জুতা জামা চাদর আনিয়া দিল। শ্রীমান গোপীজনবল্লভ সেই দ্বিপ্রহর রৌদ্রের মধ্যে বালুকাময় চর অতিক্রম করিয়া আশ্রয় অন্বেষণে গমন করিল।

চৈতন তখন তুলসীকে বলিল, "চল তুলসী, নৌকায় চল।" তোর কোন অপরাধ নেই, সব অপরাধ আমার।" তুলসী কাঁদিতে লাগিল, একটি কথাও বলিতে পারিলনা।

চৈতন তখন তুলসীকে নৌকায় তুলিয়া মাঝিদিগকে বলিল, "আমাদের ঐ ওপারের

রেলস্টেশনে পৌঁছিয়ে দেও। তোমাদের যা ভাড়া আমি দেব, আরও কিছু জল খেতে দেব।"

তুলসী বলিল, "দাদা বাড়ি চল। ওপারে কোথায় যাবে। আমাকে কি তাহলে আর ঘরে নিয়ে যাবে না দাদা!" তুলসী কাঁদিয়া ফেলিল।

চৈতন বলিল, "কাঁদিসনে তুলসী। আমি ও মিথ্যা কথা বলে, গুরুপুত্রের গায়ে হাত তুলে অপরাধী হয়েছি; তুই ও বিধবা হয়ে পরপুরুষকে মনে স্থান দিয়ে অপবিত্র হয়েছিস্। চল্, দুই ভাই-বোন নবদ্বীপ গিয়ে গঙ্গাস্নান করে, আর শ্রীবাস-অঙ্গনের ধূলি মেখে পবিত্র হযে আসি, তোরও মন অপবিত্র হয়েছে, আমারও দেহ মলিন হয়েছে। চল্, নবদ্বীপ ধামে যাই। আমার পতিতপাবন শ্রীগৌবাঙ্গ কত পতিত কে উদ্ধার করেছেন—আমরাও উদ্ধার পাব। কিন্তু দেখ্ তুলসী, মন ঠিক কর, শ্রীগৌরাঙ্গের পাদপদ্ম ছাড়া আর কোন দিকে মন দিবিনে; তা হলে আর ভয় নেই।"

তুলসী বলিল, "দাদা,গাঁয়ে গিয়ে মুখ দেখাব কি করে?"

চৈতন বলিল, "তুলসী, তুই মুখ দেখাতে পাববি, আমি অনেক মিথ্যা কথা বলে তোব পথ ঠিক বেখেছি, এখন মহাপ্রভুর কাছে আমি মাপ পেলেই হয়। জীবনে কোন দিন মিথ্যা কথা বলিনি তুলসী—আজ তোর জন্যে তাও বলেছি।" চৈতনের চোখেব জলে বুক ভাসিযা গেল।

*　　　*　　　*　　　*

গঙ্গাস্নান কবিযা এবং শ্রীবাস অঙ্গনের ধূলি মাখিয়া চৈতন ও তুলসী পবিত্র হইল কি না,। তাহাব বিচাব করিবার অবসর আমাদের নাই;—ঐ শুনুন তাঁতঘরে বসিয়া চৈতন গায়িতেছে—

"অচেতন থেক না মন, চেতন থেক,
চেতনে চৈতন্য মিলে।"*

* পদটিও কাঙাল হরিনাথের রচনা।

কাঙ্গালের ঠাকুর

জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি সময়ে একজন জগন্নাথদেবের পাণ্ডা আমাদের গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমাদেব সোনাপুর গ্রামখানি খুব বড় নহে; বড়মানুষের বাসও তেমন বেশি নহে; প্রায় সকলেই আমাদেরই মত সামান্য অবস্থার গৃহস্থ; তাই প্রতি বৎসরই পাণ্ডা-ঠাকুরের শুভাগমন হয় না—জগন্নাথ-দর্শনার্থী যাত্রী বছরে-বছরেই পাওয়া যায় না; দুই চারি বৎসর অন্তর পাণ্ডা-ঠাকুর আসেন এবং যেমন করিয়া হুউক, দশ বিশ জন যাত্রী লইয়া যান।

আমি যেবারের কথা বলিতেছি, তাহার পূর্ব বৎসর আমার পিতাঠাকুর স্বর্গারোহণ করেন। আমার পিতৃব্য শ্রীযুক্ত দয়ালচন্দ্র দে মহাশয়—আমার মাতাঠাকুরানির তখন অভিভাবক। পিতাঠাকুর বর্তমানেই কাকা পৃথক্ হন, বাড়িও পৃথক্ করেন। আমরা জাতিতে সুবর্ণ-বণিক্।

পূর্বে পিতাঠাকুর ও কাকা মহাশয় যখন একান্নভুক্ত ছিলেন, তখন আমাদের একখানি বেনে-মস্‌লার দোকান ছিল; পৃথক্ হইবার পর পিতা একখানি নূতন দোকান করেন, পূর্বের দোকানখানি কাকাকেই দান করেন। পিতার মৃত্যু-সময়ে আমার বয়স ১৩ বৎসর; সে সময়ে আমি কি আর নিজে দোকান চালাইতে পারি? তাই আমার এক মামাতো ভাই দোকানের ভার গ্রহণ করেন,—গিরিশ দাদা আর আমি দুজনে দোকানের কাজকর্ম করি। গিরিশ দাদা মাসে চোদ্দ টাকা পান, আর আমাদের বাড়িতেই থাকেন। এই খরচ বাদে যাহা লাভ হয়, তাহাতে আমাদের মাতাপুত্রের সংসার এক রকম চলিয়া যায়;—দিদির বিবাহ বাবাই দিয়া যান; দিদিদের অবস্থা ভাল। সংক্ষেপে এই আমাদের সাংসারিক অবস্থা।

জগন্নাথের পাণ্ডা-ঠাকুর গ্রামে আসিয়া বাড়ি-বাড়ি ঘুরিয়া যাত্রী সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। আমার কাকা জগন্নাথ দর্শনে যাইবেন, স্থিব কবিলেন। মা কি এমন সুযোগ ত্যাগ করিতে পারেন? তিনি কাকাকে ধরিয়া বসিলেন যে, তাঁহাকে সঙ্গে লইতে হইবে। কাকার আর তাহাতে আপত্তি কি? তিনি জানিতেন, মায়ের তীর্থভ্রমণের ব্যয়ভার তাঁহাকে বহন করিতে হইবে না; সুতরাং তিনি সম্মত হইলেন। কিন্তু গোলযোগ বাধিল আমাকে লইয়া; আমি বলিলাম, "মা, আমিও তোমার সঙ্গে যাব।"

কাকার তাহাতে আপত্তি, মায়েরও আপত্তি। আমি ছেলেমানুষ,—জগন্নাথের পথ বড় খারাপ; নানা বিপদের সম্ভাবনা; এক মাসের পথ হাঁটিতে হয়; রাস্তায় চোর-ডাকাত আছে; যাত্রীদের প্রায়ই নানা পীড়া হয়,—অনেকে প্রাণত্যাগ করে। এ অবস্থায় আমার মত ছেলেমানুষকে কিছুতেই সঙ্গে লইতে পারা যায় না। আমি যদি সঙ্গে যাইতে চাই, তাহা হইলে কাকা মাকে লইয়া যাইতে পারিবেন না—স্পষ্ট জবাব দিলেন। মা আমাকে অনেক বুঝাইলেন; কিন্তু আমি কাঁদিয়া আকুল হইলাম। অবশেষে মা বলিলেন, "তা হ'লে আমার অদৃষ্টে আর জগন্নাথ দর্শন নেই। যাক্,—আমি আর যাব না। পাপীর কি এমন ভাগ্য হয়।" তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া তীর্থযাত্রার বাসনা ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন।

লেখাপড়া অতি সামান্যই শিখিয়াছিলাম। বেনের ছেলে; একটু লিখিতে-পড়িতে পারিলে এবং হিসাব পত্র রাখিতে পারিলেই যথেষ্ট। তাই বাবা আমাকে স্কুলে দেন নাই,—পাঠশালার বিদ্যা কথঞ্চিৎ আয়ত্ত করিয়াই বারো বৎসর বয়সে আমি দোকানে যাইতে আরম্ভ করি। সে ভালই হইয়াছিল, নতুবা তাহার এক বৎসর পরেই যখন বাবা মারা গেলেন, তখন যদি আমি দোকানের কাজ মোটেই না জানিতাম, তাহা হইলে বড়ই বিপদ হইত। তা' লেখাপড়া জানি আর না-ই জানি—বিদ্যা না-ই থাকুক, মায়ের দীর্ঘনিঃশ্বাস আমার সেই চোদ্দ বৎসর বয়সেই বুকে বড়ই বাজিল। আমি দেখিলাম, মায়ের তীর্থধর্মের আমিই অন্তরায় হইলাম। তখন আর নিজের কথা ভাবিলাম না, মায়ের তীর্থধর্মে বাধা দিব না, এই কথা আমার মনে হইল। আমি মাকে বলিলাম, "আমি তোমার সঙ্গে যাব না মা! তুমি একেলাই কাকার সঙ্গে যাও। আমি আর গিরিশ দাদা বাড়িতে বেশ থাক্‌তে পারব। আর কতদিনই বা, বড় বেশি হ'লে মাস দুই —কেমন মা?"

মা বলিলেন, "তা বই কি। দুটো মাস তোরা দুই ভাই তোর কাকিমার কাছে থাকিস্, কোন কষ্ট হবে না। ছোট বৌ এতে অসম্মত হবে না, কি বল ঠাকুরপো?"

কাকা বলিলেন, "তার আর কথা কি! তুমি ত জান বড়বৌ, আমি কি আর ইচ্ছে ক'রে পৃথক্ হয়েছিলাম। দাদাই জোব ক'রে পৃথক্ ক'রে দিলেন; বল্লেন, যে দিন কাল পড়েছে, তাতে পৃথক্ হ'লেই মনের মিল থাক্‌বে। তাই ত পৃথক্ হয়েছিলাম—আমার কি আর ইচ্ছে ছিল। তারপর দাদা মারা গেলেও ত তোমাকে ব'লেছিলাম, আর কেন, দুই দোকান এক ক'রে ফেলে এক সঙ্গে থাকি। তখন তোমার ভাই-ই ত তাতে বাধা দিলেন। যাক্, সে কথা থাক্। সুবেশ আর গিরিশ আমাব ওখানেই থাক্‌বে। আর তুমি ত আমার সম্বন্ধী রাইচরণকে জান। সেই এ মাস দুই এখানে থেকে আমার দোকান দেখ্‌বে, বাড়িরও ভার নেবে।"

মা বলিলেন, "তা হ'লে ঠাকুরপো, ছোটবৌকেও নিয়ে যাই না। এমন সুবিধে কি তার আর মিল্‌বে! ছেলেপিলে ত হোলো না যে, তাই নিয়ে থাক্‌বে। তাকেও সঙ্গে নিয়ে চল।"

কাকা বলিলেন, "এই শোন কথা! আজ তিনদিন ধ'রে তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঠিক করেছি, এখন তুমি আবার তাল তোল। শেষে দেখ্‌ছি কারও যাওয়া হবে না। আর তার কি এখন তীর্থধর্মের সময়? সে পরে হবে। তুমি আর ও-গোল তুলো না বড়বৌ! সুরেশ বাড়ি রইল; তাকে দেখ্‌বে কে?"

"সে কথা ঠিক ব'লেছ ঠাকুরপো! তার হাতে ছেলেকে সমর্পণ ক'রেই ত আমি যাব। না, সে থাক্। বেঁচে থাক্, তোমার লক্ষ্মী-শ্রী বাড়ুক, সে কত তীর্থধর্ম করতে পারবে।"

২

২রা আষাঢ় শুভদিনে গ্রামের আরও আটদশজন মেয়ে-পুরুষের সঙ্গে কাকা ও মা জগন্নাথ দর্শনে যাত্রা করিলেন। এখনকার মত সে সময় রেল হয় নাই। তখন আমাদের গ্রাম থেকে হেঁটে গিয়ে রেলে কলিকাতায় যেতে হোত; সেখান থেকে নৌকায় উঠে উলুবেড়ে; তারপর যাদের অবস্থা ভাল নয়, তারা সারা-পথ হেঁটে যেত। পথে চটিতে থাক্‌তে হোতো। রাস্তা কি

কম! পাণ্ডা-ঠাকুর গল্প করত, সে দেশে আমাদের দেশের মত ক্রোশ নয়—ডালভাঙা ক্রোশ। রাস্তার কোন স্থানের গাছ থেকে একটা ডাল ভেঙে নিয়ে পথ হাঁটতে হাঁটতে যখন ডালের পাতাগুলো শুকিয়ে যেত, তখন এক ক্রোশ পথ চলা হোত। তাই, তখন লোকে বল্‌ত, বাবা জগন্নাথের কথা যেন মনে হয়, পথের কথা মনে না হয়। এই রকম কত কথা যে সে সময়ে শুনেছিলাম, তার সব কি আর মনে আছে।

মা চলে যাবার পর প্রথম-প্রথম প্রতিদিনই তাঁর কথা মনে হোত, গিরিশদাদার সঙ্গে মায়ের কথাই হোতো। দোকান বন্ধ ক'রে যখন কাকার বাড়িতে রাত্রিতে আহার করতে যেতাম, তখন কাকিমার কাছে ব'সে মায়ের কথাই বল্‌তাম।

একদিন কাকিমা বল্‌লেন, "দেখ্ সুরেশ, তুই যে রোজই কেবল মায়ের কথা বলিস্, তাতে তাঁর তীর্থধর্ম হবে না। এত কষ্ট ক'রে জগন্নাথে গিয়েও দিদি ঠাকুরের দর্শন পাবেন না।"

আমি বল্‌লাম, "ঠাকুরের দর্শন পাবেন না কেন? আমরা এখানে ব'সে কথা ব'লছি, তাতে কি দোষ হচ্ছে?"

কাকিমা বল্‌লেন, "ওরে হাবা ছেলে, তুই যখন এখানে ব'সে তোর মায়ের কথা ভাবিস্, তখন তিনি যেখানেই থাকুন, সেখানেই তাঁর তখন তোর কথা মনে হয়। শুনেছি,—অদেষ্টে নেই, নিজের কথা ব'ল্‌তে পারিনে—শুনেছি, ছেলে কাঁদলে, কি ছেলের কষ্ট হ'লে, যত দূরেই হোক না কেন, মায়ের প্রাণ অমনি কেঁদে ওঠে। ও নাড়ির বাঁধন বড় শক্ত বাঁধন। তুই যদি এখানে ব'সে তোর মায়ের জন্য এখন কাঁদিস্, তা হোলে সেই পুরীর পথে চটিতে বসে এই এখনই তোর মায়ের প্রাণ কেঁদে উঠ্‌বেই; তাঁর মনে তোর কথা জাগ্‌বেই। তাহ'লে তাঁর আর জগন্নাথ দর্শন হবে না।"

আমি বল্‌লাম, "সে কি করে' হবে কাকিমা!"

কাকিমা বল্‌লেন, "তাই হয় রে বাবা, তাই হয়। তুই তাঁর কথা যখন-তখন ভাবলে, তাঁকেও তোর কথা ভাবতেই হবে। তার ফল কি হবে শুন্‌বি? আমার বাপের বাড়ির গাঁয়ের একজন বিধবা—এই তোর মাযের মত—একবারে তোরই মত, কি তোর চাইতে হয় ত একটু ছোট, একটি ছেলেকে বাড়িতে রেখে জগন্নাথ গিয়েছিল। বিধবা সারা পথ শুধু ছেলের কথাই ভাব্‌ত, ছেলেব কথাই বল্‌ত;—এই আমার খোকা এখন ভাত খাচ্ছে, এই আমাব খোকা এখন হয়ত খেলা করছে, এই আমার খোকা বুঝি কাঁদ্‌ছে, এই আমার খোকার বুঝি ক্ষিদে পেয়েছে;—হতভাগি সারাটা পথ শুধু এই ক'রেই গিয়েছিল। সাথি যারা ছিল, তারা কত নিষেধ করত,—বল্‌ত, খোকার মা, খোকার কথা ভেব না, জগন্নাথদেবের কথা ভাব। সে কিন্তু তা পারত না,—তার মন পড়ে ছিল যে তার খোকার কাছে। তাবপর কি হোলো শুন্‌বি? পুরীতে পৌছে যখন তারা ধুলো-পায়ে জগন্নাথ দর্শন কর্‌তে মন্দিরে গেল, তখন আর সকলে ঠাকুরের চাঁদমুখ বেশ দেখ্‌তে পেলে, কিন্তু ঐ হতভাগি খোকার মা বল্‌তে লাগ্‌ল কি—কৈ, মন্দিরের মধ্যে ত জগন্নাথ দেখ্‌তে পাইনে; ও যে আমার খোকার মুখ।' তিনদিন উপরি-উপরি দেখ্‌তে গেল, খোকার মুখ ভিন্ন আর কিছু দেখ্‌তে পেলে না। রথে যখন ঠাকুরকে তোলা হোলো, তখনও দেখ্‌তে গেল; কিন্তু সে চাঁদমুখ আর তার দর্শন হোলো না,—সে তার খোকার

মুখই দেখ্‌লে। ঠাকুর তাকে দর্শনই দিলেন না। জগন্নাথ যে-সে ঠাকুর নয় সুরেশ! তাঁরই দিকে মন দিয়ে না গেলে তিনি দর্শন দেন না। আরও শুন্‌বি? গল্প শুনেছি, এক বুড়ি একবার জগন্নাথে গিয়েছিল। যাবার সময়ে তার বাড়ির উঠানে একটি সজ্‌নে গাছে ফুল ফুট্‌তে দেখে গিয়েছিল। বুড়ি সারা পথ সেই সজ্‌নের ফুল আর খাড়ার কথা ভাব্‌তে-ভাব্‌তে গিয়েছিল; মন্দিরে গিয়ে সে না কি সজ্‌নে খাড়াই দেখেছিল। জানিস্‌, এ সব সত্যি কথা। তাই তোকে বল্‌ছি, মায়ের জন্য অত কাতর হ'লে তোর মায়ের মনও তোর জন্য কাতর হবে; তখন তিনি মন্দিরে গিয়ে ঠাকুরের দর্শন পাবেন না, দেখ্‌বেন তোর মুখ। এত কষ্ট, এত খরচ, সব বৃথা হ'য়ে যাবে।"

কাকিমার কথা শুনে মনে বড়ই ভয় হোলো। তা হ'লে ত মায়ের কথা ভাবা ঠিক নয়! কিন্তু মন কি সে কথা বোঝে? সংসারে মা বিনে আমার যে আব কেউ নেই; এই চোদ্দ বৎসর তাঁরই স্নেহ-ধারায় যে আমি পুষ্ট, বর্ধিত। আমার সেই স্নেহময়ী জননির কথা যে সময়ে-অসময়েই আমার মনে হোতে চায়,—কোন বাধা-বিপত্তির কথা যে মনে থাকে না! দুই-এক দিনের পথ হোলেও না হয় মনকে প্রবোধ দিতে পারতাম; কিন্তু এ যে দীর্ঘ পথ; আর সে পথে কত বিপদ, কত কষ্ট। মা যে কোনদিন এত কষ্ট সহ্য করেন নাই। পথে তাঁর যদি অসুখ হয়, তা হ'লে কে তাঁকে দেখবে? কাকা কি তেমন করে তাঁর সেবা করবে? ডাক্তার-কবিরাজ কি আর মিলবে? মা যদি মারা যান! কথাটা আমি ভাবতেও যে পারি না। আমি তখন কাতর ভাবে জগন্নাথ দেবের কাছে প্রার্থনা করতাম, "হে ঠাকুর, আমার মাকে ঘরে ফিরে এনে দাও। এ সংসারে মা ছাড়া আমার কেউ নেই ঠাকুর!"

কাকিমার সঙ্গে কথা হওয়ার পর মুখ-ফুটে আর মায়ের কথা কাহাকেও বল্‌তাম না; তার ফল এই হোতো যে, মনে সর্বদাই তাঁর কথা উঠত; হাজার চেষ্টা ক'রেও আত্মসংবরণ কর্‌তে পারতাম না।

সেবার ২৪শে রথ। ২৪শে পর্যন্ত চুপ করেই ছিলাম। তারপর ত আর ভয় ছিল না,মায়ের জগন্নাথ দর্শন ত হয়ে গিয়েছে, এখন ত তিনি বাড়ি ফিববেন, এখন আর তাঁর কথা বল্‌লে তাঁর ঠাকুর দর্শনের কোন ব্যাঘাতই হবে না। তখন আমি দিন গোনতে আরম্ভ করলাম। ২রা তারিখে তাঁরা বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন; ২০শে, ২১শে নিশ্চয়ই পুরীতে পৌছে গিয়েছেন। তা হোলে যেতে লেগেছে আঠারো দিন। ২৪শে রথ হয়ে গেছে; তাঁরা না হয় আরও একদিন কি দুই দিনই সেখানে বাস করবেন। তা হোলে ২৬শে, নিতান্ত না হয় ২৭শে নিশ্চয়ই যাত্রা করেছেন। সেই ২৭শে থেকেই আমি দিন গোনতে আরম্ভ করে দিলাম! কোথায় সোনাপুর, আর কোথায় সেই অজানা-অচেনা পথ—পুরী। সে পথের কোন সংবাদই আমি জান্‌তাম না; তবুও প্রতিদিন আমি সেই পথের কথা ভাবতাম। এই একদিনে মা তিন ক্রোশ পথ এসে একটা চটিতে উঠেছেন; এই তার পর-দিন মা খুব জোরে পথ চল্‌ছেন; তাঁকে শীঘ্র বাড়ি আস্‌তে হবে, আমি যে তাঁর পথ চেয়ে বসে আছি, মা ত তা বেশ বুঝতে পারছেন। কাকিমা যে বলেছেন, মায়ে-ছেলের প্রাণ এক তাবে বাঁধা। আমি যে এত আকুল হয়েছি, মা সে কথা বেশ জানতে পারছেন। পথে বিলম্ব,—তা তিনি কিছুতেই করতে পারবেন না। যেতে যদি

আঠারো দিন লেগে থাকে, তা হ'লে ফিরতে পনেরো দিনের বেশি কিছুতেই লাগ্‌বে না—মা'কে যে ছুটে আস্‌তে হবে। যারা সঙ্গে গিয়েছে, তারাও ছুট্‌ছে বই কি; সবারই ত বাড়ি-ঘর আছে। কাকা কি আর পথে বিলম্ব করতে পারেন;—পরের উপর দোকান, সংসার ফেলে তিনি কি আর নিশ্চিন্ত আছেন। আমি সোনাপুরে আমাদের দোকানে বসে প্রতিদিন তাঁদের পথ-হাঁটা দেখি, তাঁদের জোরে পথ চলাই, পথে বিশ্রাম করতে দিই না; এক ঘণ্টা থেকে দেড় ঘণ্টা হোলেই চটি থেকে পথে নামাই, ঝড়-বৃষ্টি বা প্রখর রৌদ্র কিছুই মানি নে;—আমার যে গরজ বেশি।

পনেরো দিন চলে গেল, ষোল দিনও গেল। কৈ, মা ত ফেরেন না; গ্রামের যাঁরা গিয়েছিলেন, তাঁদেরও সংবাদ নাই। কাকারই বা কি বিবেচনা! সেই পুরী পৌঁছে একখানি পত্র লিখেছিলেন, তারপর এই এত দিনের মধ্যে একটা সংবাদও দিলেন না; দুই লাইন একখানি পত্র লিখ্‌তে এত আলস্য!

আঠারো দিনও গেল—উনিশ দিন এল। যেতে ত আঠারো দিনেব বেশি লাগেই নাই; তবে আসতে এত বিলম্ব হচ্চে কেন? কাকার ত কোন অসুখ করে নাই? মা ত ভাল আছেন? আমি যে আর ভাবতে পারি না!

৩

আরও দুই দিন কেটে গেল। তৃতীয় দিন সন্ধ্যার সময় দোকানে আছি, সংবাদ পেলাম, এইমাত্র পুরীর যাত্রীরা ফিরে এসেছেন। গিরিশ দাদাকে দোকান বন্ধ করে আসতে ব'লে আমি উর্ধ্বশ্বাসে বাড়ির দিকে ছুট্‌লাম।

আমাকে অধিক দূর যেতে হল না; পথের মধ্যেই কাকার সঙ্গে দেখা হল। তিনি বিষণ্ণ বদনে অতি ধীরে-ধীরে বাজারের দিকেই আস্‌ছিলেন। আমি তাড়াতাড়ি তাঁহার পায়ের ধূলা মাথায় নিয়ে বল্‌লাম, "কাকা, তোমরা কতক্ষণ এসেছ?"

কাকা আমার কথার উত্তরে 'হা হা' করে কেঁদে উঠে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তাঁহার এই অবস্থা দেখে আমি যে কি করব, ভেবে পেলাম না; তবে মায়ের যে কিছু হয়েছে, তা বেশ বুঝতে পারলাম। তবুও প্রাণপণ শক্তিতে জিজ্ঞাসা করলাম, "মা ভাল আছে ত?"

কাকা আর চুপ করে থাকতে পারলেন না, কাঁদতে-কাঁদতে বল্‌লেন, "ওরে বাপ আমার, বড়-বৌ আমাদের ছেড়ে গেছে।"

আর কি শুনব! শুনবার যা, তা শুনলাম! আমার তখন কি হল, আমি চিৎকার করে কাঁদতে পারলাম্ না—কে যেন আমার বুকের উপর দশ মন ভার চাপিয়ে দিল, কে যেন আমার গলা চেপে ধরল।

আমার এই অবস্থা দেখে কাকা আমাকে তাঁর কাঁধের উপর ফেলে বাড়ির দিকে ফিরলেন,—তখন সত্য সত্যই আমার চলবার সামর্থ্য ছিল না, কথা বলবার শক্তি ছিল না।

বাড়ি আসিলে কাকিমা আমাকে কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে কাঁদতে লাগ্‌লেন—আমাকে আর কি সান্ত্বনা দেবেন। একটু পরে নিজে কিঞ্চিৎ শান্ত হয়ে বল্‌লেন, "বাবা, আর কেঁদে কি কর্‌বে। জগন্নাথ তাঁকে টেনেছিলেন, তাই তিনি চলে গেছেন। তুমি ত সবই বোঝ বাবা, তোমাকে আর কি বল্‌ব। হায় হায়, বিদেশে-বিভুঁয়ে কেমন করেই তাঁর প্রাণটা বেরিয়ে গিয়েছে।"

তখনও কান্না থামে না; আমার শরীরের সব শুকিয়ে গিয়েছে; চক্ষে জল আস্‌বে কোথা থেকে!

রাত্রিতে কাকার মুখে যা শুনলাম, তার সংক্ষেপ কথা এই যে, ফিরবার সময় কোন্ একটা চটিতে এসে মায়ের ওলাউঠা হয়। সেখানে আর ডাক্তার-কবিরাজ কোথায় পাওয়া যাবে। চটিওয়ালা ঘর থেকে তাড়িয়ে দিতে চায়; সঙ্গীরা অন্য চটিতে চলে গেল, চটিওয়ালাকে বেশি পয়সা দিয়ে কাকা সাবারাত্রি মায়ের সেবা করলেন। কিছুতেই কিছু হোলো না, একেবারে সাক্ষাৎ কাল এসে ধরেছিল। ভোরের বেলায় মার দেহত্যাগ হলে, কাকা প্রায় ত্রিশ টাকা খরচ করে অনেক কষ্টে লোকজন ডেকে মায়ের সৎকার করেছিলেন। সঙ্গী যাত্রীরা ভোরেই সে চটি ছেড়ে এগিয়ে গিয়েছিল; কাকা অনেক কষ্টে এসে তাদের সঙ্গ পান। এ ৭ই শ্রাবণের কথা। যেদিন কাকা বাড়ি এলেন, সেদিন ১৫ই শ্রাবণ। ৮ দিন হইল মা দেহত্যাগ করেছেন।

সব মিটে গেল। বাবা গেলেন;—মা ছিলেন, তিনিও গেলেন। চোদ্দ বৎসর বয়সে আমি একেবারে অনাথ হলাম। আপনার বলতে এক দিদি;—সেও ত পরের ঘরে।

কাকাই কর্তা হয়ে মায়ের শ্রাদ্ধের আয়োজন করতে লাগলেন; দিদিকে তাঁর শ্বশুর-বাড়ি থেকে নিয়ে এলেন; বড় মামা ও মামিকে আনা হোলো; যেখানে যে কুটুম্ব ছিল, সকলকেই সংবাদ দেওয়া হোল,—এই যে আমার জীবনের শেষ কাজ। কাকা মায়ের শ্রাদ্ধের খরচ পত্র একটু কম করতে চেয়েছিলেন; কিন্তু আমার ভগিনী ও ভগিনীপতি তাতে সম্মত হলেন না। মায়ের বাক্সে কিছু টাকা পাওয়া গেল, কিন্তু সে খুব বেশি নয়—মোটে আটশত টাকা। দিদি বল্‌লেন, "আট-শ টাকা! সে হতেই পারে না; আমি বাবার শ্রাদ্ধের সময় নিজের চক্ষে দেখে গিয়েছি, নগদ প্রায় আড়াই হাজার টাকা ছিল, এর পর কিছু লগ্নিও ছিল। সে সব টাকা কোথায় গেল!".

কাকিমা বল্‌লেন, "বোধ হয় লগ্নি আরও বাড়িয়ে গেছেন। তারপর জগন্নাথে যাওয়ার সময়ও পাঁচ-শ টাকা নিয়ে গিয়েছিলেন; সে ত আমিই জানি। ওদের জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, মরবার সময় দিদির কাছে কি টাকা-কড়ি ছিল; তাতে শুনলাম, সে সব কি তখন খোঁজ নেবার সময়; যদি কিছু থেকে থাকে, তা দিদির সঙ্গেই গেছে।"

দিদি বল্‌লেন, "যাক্, মা-ই যখন গেলেন, তখন তাঁর টাকার কথা আর ভেবে কি হবে।"

কাকিমা বল্‌লেন, "কথা ত সত্যি, কিন্তু মরবার সময় দিদির কাছে নিশ্চয়ই দেড়শ-দুশো টাকা ছিলই ছিল। তোমার কাকার কি সে সব দেখা উচিত ছিল না; সে তার কিছুই জানে না বল্লে।"

আমি বল্‌লাম, "সে কথায় আর কাজ কি, আমার যা আছে তাই দিয়েই মায়ের কাজ ভাল করে হোক্—আর ত মায়ের জন্য কিছু খরচ কর্‌তে হবে না।" সেই ভাবেই আয়োজন হ'তে লাগল।

দেখ্‌তে-দেখ্‌তে শ্রাদ্ধের দিন উপস্থিত হ'ল। আত্মীয়-কুটুম্ব, প্রতিবেশীতে বাড়ি ভরে গেল; কাকার আর অবকাশ নাই। সমস্ত আয়োজনই যথারীতি হ'ল। আমাদের বৃষোৎসর্গ করতে নেই, পূর্বেও কোন শ্রাদ্ধে তাহা হয় নাই; সুতরাং সে আয়োজন করা হোল না।

যথাসময়ে সকলে সভাস্থ হলেন, পুরোহিত মহাশয় সমস্ত গোছাইয়া লইলেন। আমি সবে শ্রাদ্ধাধিকাবীর আসন গ্রহণ করতে যাব—বেলা তখন প্রায় দশটা—সেই সময় বাড়ির বাহিরে মহা গোলযোগ আরম্ভ হ'ল। কি হ'ল দেখ্‌বার জন্য কয়েকজন লোক বাহিরে ছুটে গেল, কাকাও গেলেন। একজন তাড়াতাড়ি ভিতরে এসে বলে উঠলেন, "ওরে শ্রাদ্ধ রাখ্; যাঁর শ্রাদ্ধ করতে বসেছ, তিনি এসে হাজির! সুরেশের মা মরেন নাই; ফিরে এসেছেন।"

মা মরেন নাই—ফিরে এসেছেন! সে কি কথা! এও কি হয়! আমার মাথাঘুরে গেল । আমি অজ্ঞান হয়ে প'ড়ে গেলাম।

আমার যখন জ্ঞান হোলো, তখন দেখ্‌লাম সত্যসত্যই মা আমাকে কোলে করে বসে আছেন, দিদি আমার পাশে। আমি অতি ধীরে বল্‌লাম, "মা, মা গো!"

"এই যে বাবা আমি।"—বলে' মা আমাকে বুকের মধ্যে চেপে ধরলেন। আর ত অবিশ্বাস নাই—সত্যই ত আমার মা ফিরে এসেছেন। সে যে কি আনন্দ, তা কি আমি বল্‌তে পারি। যে মা আজ একমাস মারা গিয়েছেন, সেই মা এসেছেন—ওরে আমার মা এসেছেন! আমার ইচ্ছা হতে লাগল, আমি প্রাণপণে চিৎকার করে বলি, "ওরে, আমার মা ফিরে এসেছেন।"

এই সময় কাকার বাড়ি থেকে একজন লোক এসে বল্‌ল, "ওগো, তোমরা শিগ্‌গির এস ছোট-কর্তা গলায দড়ি দিয়েছেন।"

এই কথা শুনেই মা ও কাকিমা তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন এবং দিদিকে আমার কাছে থাকতে বলে কাকার বাড়িতে চ'লে গেলেন। আমার যাবার শক্তি ছিল না;—আর শক্তি থাক্‌লেও আমি যেতাম না। কিন্তু কাকার কি হ'ল জান্‌বার জন্য বড়ই আগ্রহ হ'ল। দিদিকে বল্‌লাম, "দিদি, তুমি একবার খবর নিয়ে এস ত, কি হয়েছে।"

দিদি প্রথম আপত্তি করল; শেষে আমার অত্যন্ত আগ্রহ দেখে চলে গেল এবং একটু পরে এসে বল্‌ল, "আমরা তোমাকে নিয়ে বিব্রত ছিলাম। কাকা যে কখন চলে গিয়েছেন, কেউ বল্‌তে পারে না। তিনি বাড়ি গিয়েই গলায় দড়ি দিয়ে মরেছেন। পাড়ার সকলে দড়ি কেটে নামিয়েছে, ডাক্তার এসেছে, কাকার প্রাণ বেরিয়ে গিয়েছে। সকলেই বল্‌ছে, যেমন কর্ম তেমনি ফল। মা এখন আর আস্‌তে পারবেন না।" কাকার শোচনীয় পরিণাম শুনে তাঁর মহা অপরাধেব কথা ভুলে গেলাম, তাঁর জন্য বড়ই কষ্ট হোল।

৪

এই ঘটনার দুই দিন পরে এক সময় মাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, "মা, এ কয়দিন এই সব গোলমালে কোন কথাই জান্‌তে পারি নাই। তুমি কি করে বেঁচে এলে, বল না মা; কাকা ত তোমাকে মেরে ফেলে, তোমার সৎকার পর্যন্ত করে এসেছিল; তারপর কি হলো?"

মা বল্‌লেন, "সে কথা তোর আর শুনে কাজ নেই। আর যদি শুন্‌তে হয়, অন্যের কাছে শুনিস্‌—সকলেই শুনেছে। আমি আর সে কথা তোর কাছে বল্‌ব না।"

অনেক অনুরোধে মা বল্‌লেন, "নিতান্তই ছাড়বিনে। তবে শোন্‌। পথের কথা, আর জগন্নাথ দেবের কথা তোকে আর কি বল্‌ব,—তুই তার কি-ই বা বুঝ্‌বি! প্রথম রথের পরদিনই আমার বেরুবার ইচ্ছা,—তখন ত আর ঠাকুরের টান নেই—তোর টান। ঠাকুর তার খুব ফল দিয়েছেন—খুব সাজা দিয়েছেন। সঙ্গে যারা ছিল, তারা সকলেই আরও দু'দিন থাক্‌তে চাইলে। কি কর্‌ি, থাক্‌তে হোলো; কিন্তু প্রাণ তখন বাড়ির দিকে—তোর দিকে। তিন দিনের দিন সকলে মিলে বেরিয়ে পড়লাম। আমার তখন এমন হয়েছে যে, দুদিনের পথ এক বেলায় আমার চল্‌তেও আপত্তি নেই, আর সকলেরও প্রায় তাই। ঠাকুর বল্লেন, রও বেটি, তোর শিগ্‌গির বাড়ি যাওয়া ঘুচিয়ে দিচ্ছি! দশ দিন বেশ এলাম, এগার দিনের-দিন পথের মধ্যে আমার পেটের অসুখ হোলো। কাউকে সে কথা বল্‌লাম না; অতি কষ্টে পথ চল্‌তে লাগলাম। সন্ধ্যার সময় একটা চটিতে এসে আমি একেবারে অসাড় হয়ে পড়লাম। খুব ভেদ-বমি হতে লাগ্‌ল। আমরা যে ঘরটার আশ্রয় নিয়েছিলাম, আমার অবস্থা দেখে সঙ্গীরা সে ঘর ছেড়ে আর একটা ঘরে চলে গেল। তোর কাকা আমার কাছে বসে থাক্‌ল। কেমন করে চটিওয়ালা সেই খবর পেল। আর যাবে কোথা;—সে একেবারে একখানা লাঠি হাতে করে এসে বল্‌ল, 'এখনই বেরোও, নইলে মেরে তাড়িয়ে দেব।' ঠাকুরপো কত মিনতি করতে লাগ্‌ল, বেশি পয়সা দিতে চাইল, কিন্তু কিছুতেই সে রাজি হোল না। তখন কি আর আমার উঠবার শক্তি ছিল। অনেক কষ্টে বসে বসে কোন রকমে বাইরে এলাম। এখন এই রাত্রে যাই কোথায়! নিকটেই একটা গাছ ছিল, তারই তলায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম। ক্রমে আমার মনে হোতে লাগ্‌ল, আমার হাত পা যেন অবশ হয়ে আস্‌ছে; তখন আর কথা বল্‌বার শক্তি নেই। তোর কাকা আমাকে সেই অবস্থায় একলা ফেলে চটিতে গেল। সেখানে কি হোলো জানিনে। একটু পরেই দেখি, সকলে চটি থেকে সেই রাত্রেই বেরিয়ে পড়ল। বুঝলাম, আমাকে এই গাছতলায় একলা ফেলে রেখে সাথিরা সবাই পালাচ্ছে। তখনও কিন্তু মনে হয় নাই, ঠাকুরপোও চলে যাবে,—সে কি কখনও হয়! একটু পরেই দেখি ঠাকুরপো আমার কাছে এল। আমার মনে আশা হোলো, সে আমাকে এমনি করে ফেলে রেখে যাবে না। ঠাকুরপো এসে কি করল শুন্‌বি। সে এসে আমার নাকের কাছে হাত দিল—দেখ্‌ল, আমি বেঁচে আছি কি না। তারপর আমার কোমরে যে টাকার গেঁজে বাঁধা ছিল, সেইটি টেনে খুলে নিল। আমার তখনও বেশ জ্ঞান আছে, কিন্তু কথাও বল্‌তে পার্‌ছিনে, হাত-পাও নাড়তে পার্‌ছিনে। সে তখন চলে যায় দেখে আমি প্রাণপণে চিৎকার করবার চেষ্টা করলাম,—আমার কি তখন সে

শক্তি ছিল? সেই অন্ধকার রাত্রিতে গাছতলায় আমাকে ফেলে সে সত্যিই তাড়াতাড়ি চ'লে গেল। আমার বুকের ভিতর তখন যে কি করে উঠ্‌ল, তা তোকে কি করে বুঝাব বাবা! সে অবস্থা যেন অতি বড় শত্তুরেরও কখন না হয়। তখন আমি সব ভুলে গেলাম—তোর মুখখানিও ভুলে গেলাম—ঘর-সংসারের কথা তখন আমার মনে এল না। আমার মনে এল বাবা জগন্নাথের কথা।—আমি তখন মনে-মনে তাঁকেই ডাক্‌তে লাগ্‌লাম—তাঁরই পায়ে মন ঢেলে দিলাম। ক্রমে ক্রমে আমার যেন কি হোল; আমার চোখের সুমুখে সব আঁধার হয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল; কিন্তু মনের মধ্যে—ওরে আমার বুকের মধ্যে—তখন দেখ্‌তে পেলাম ঠাকুরের সেই মুখখানি। তারপর কি হোল তা জানিনে।

যখন আমার একটু জ্ঞান হোল—সে কতক্ষণ পরে তা কি করে বলব—যখন একটু জ্ঞান হোল, তখন যেন মনে হোলো, কে আমার গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে! সে যে কি, তা তোকে বল্‌তে পার্‌ছিনে। আমার শরীরে যেন সেই হাত লেগে সব শীতল করে দিচ্ছিল। চোখ আর চাইতে পারিনে,—চোখের উপর কে যেন দশ মন পাথর চাপা দিয়েছে ব'লে মনে হোল। অনেক চেষ্টা করে একবার চাইলাম। কি দেখ্‌লাম, শুন্‌বি বাপ আমার! মুখে যে সে কথা আসে না,—কেমন করে সে কথা তোকে বল্‌ব। আমি চেয়ে দেখ্‌লাম, ঠাকুর—সত্যিই ঠাকুর রে—সত্যিই জগন্নাথদেবের মুখ দেখ্‌লাম। তিনিই আমার পাশে ব'সে রয়েছেন—তাঁরই সেই চাঁদমুখ আমি দেখ্‌তে পেলাম। একবার—শুধু একবার দেখা;—তারপরই আবার চোখ বন্ধ হ'য়ে এল! আমি চিৎকার ক'রে ডাক্‌লাম—প্রভু দয়াল ঠাকুর, আর একবার আমার চোখ খুলে দাও—আর একবার তোমার চাঁদমুখখানি দেখ্‌তে দাও;—তারপর আর আমি চোখ খুলব না—আর আমি কিছুই চাইব না। হায় রে অভাগী, হায় রে আমার কপাল—ঠাকুরের আর দয়া হোল না—আমার চোখ আর খুল্‌ল না। কিন্তু তখনও সেই শীতল হাত আমার গাযে রয়েছে। আমার তখন মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল—আমি অতি ধীরে বল্‌লাম—একটু জল। সুরেশ, বাবা আমার, ভাল কোরে শোন্। সত্যিই আমার মুখে কে জল দিল। সে ত জল নয়—ে: চরণামৃত! তেমন জল ত কখনও খাইনি,—কি যে তার গন্ধ—আর কি যে তার স্বাদ! সে অমৃত রে বাপ—সে অমৃত। আমার সকল জ্বালা-যন্ত্রণা যেন দূর হযে গেল। এ স্বপন নয় বাবা! সত্যি কথা। আমার শরীর যেন জুড়িয়ে গেল—আমার রোগ যেন পালিয়ে গেল। যাকে সন্ধ্যার পর সকলে মড়া মনে করে ফেলে গিয়েছিল, সে যে ভাল হয়ে গেল! হঠাৎ গাছের উপর একটা পাখি ডেকে উঠ্‌ল। সেই ডাকে আমার বুকে যেন বল এল। আমার চোখ খুলে গেল। আমি চেয়ে-দেখি, ভোর হয়ে গেছে; পথে দিয়ে যাত্রীরা সব যাচ্ছে। কিন্তু, আমার কাছে ত কেউ নেই-সেই গাছতলায় আমি একেলা শুয়ে আছি। শরীরে কোন যন্ত্রণা নেই; রাত্রে যে মরতে বসেছিলাম, তেমন বোধও হোলো না;—আমার যে অসুখ হয়েছিল, তার চিহ্নমাত্রও নেই। আমি তখন উঠে বসে হাত জোড় করে ঠাকুরকেই ডাক্‌তে লাগ্‌লাম—প্রভু, কাঙালের ঠাকুর, এত দয়া তোমার এই অভাগীর উপর। বাবা, তোর মা কত ভাগ্যবতী! তোর মায়ের সব আশা পূর্ণ হয়েছে বাপ! আমার মত মহাপাপী ঠাকুরের চরণামৃত পেয়েছিল—তাই বেঁচে গেছে। তারপর আর কি? সঙ্গে পয়সা ছিল না;—তাতে কি? যাবার সময় এত টাকা সঙ্গে

থাক্‌তেও এক-এক দিন খেতে পাইনি; কিন্তু যখন একটা পয়সাও নেই, তখন দয়াল ঠাকুর আমার জন্য আগে হোতেই সব ঠিক কবে রেখে দিতেন—সব ঠিক! পথে যেখানে গিয়েছি, কাউকে বল্‌তে হয় নাই; আমাকে ডেকে ডেকে খেতে দিয়েছে। এ তাঁরই খেলা—ওরে তাঁরই। উলুবেড়ের নৌকার মাঝি আমাকে নিয়ে এল—পয়সা নিল না; বল্‌ল, 'তোমার কাছে ত কিছুই নেই বলে মনে হচ্ছে; তোমাকে ভাড়া দিতে হবে না।' কে তাকে একথা বলে দিল? কল্‌কাতায় এসে শিয়ালদহের স্টেশনে এক পাশে বসে আছি, একটি বাবু এসে বল্‌ল, 'মা, তুমি কোথায় যাবে?' আমি গ্রামের নাম বল্‌লাম। সে বল্‌ল, 'এখানে বসে কেন? টিকিট কিন্‌লে না?' আমি কোন উত্তর দিলাম না। বাবুটি কি ভেবে চলে গেল;—একটু পরেই এসে আমাকে একখানি টিকিট দিয়ে বল্‌ল, 'এস মা, তোমাকে গাড়িতে তুলে দিচ্ছি।' এ সব তাঁরই খেলা রে. তাঁরই খেলা। পথে যারা খেতে দিয়েছিল, উলুবেড়ের সেই নৌকার মাঝি, আর স্টেশনের সেই বাবু—এরা সব আমার সেই কাঙালের ঠাকুর। ঠাকুরই এই সব বেশ ধরে আমাকে তোর কাছে এনে দিয়ে গেলেন। বাবা, একটা কথা তোকে বলি;—কোন দিন মানুষের দিকে চাস্‌নি;—যখন বিপদে পড়বি, আমার সেই কাঙালেব ঠাকুরকে ডাকিস্—তোর কোন অভাব থাক্‌বে না। তোকে আজ আমার ঠাকুরেব চরণে নিবেদন করে দিই।" এই বলিয়া মা আমাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিলেন;—আমার বেশ মনে হইল, কোন্ এক দেবতা আমাকে বুকে করে নিলেন। মায়ের 'রথযাত্রা'র ফলে আমাব 'জীবন-যাত্রা'ব পথ ঠিক হয়ে গেল—সেই চোদ্দ বৎসর বয়সেই আমি পথ পেয়েছিলাম।

সে কথা আজ নয়—আর একদিন!

-ভারতবর্ষ ৭ম বর্ষ, ১৩২৬-২৭, ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা আষাঢ়।

মহামায়ার মায়া

একটু বৃষ্টি হইলে প্রায় সব বাড়ির আঙিনায় জল দাঁড়ায়, পথে এক-হাঁটু কাদা হয়,—গ্রামের নাম কিন্তু বৈকুণ্ঠপুর।

তা' এমন হয়,—কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন, তালপাতার সিপাহির নাম নরসিংহ—অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। বৈকুণ্ঠপুর সম্বন্ধে কিন্তু সে কথা বলা চলে না। যিনি গ্রাম প্রতিষ্ঠা করেন, তিনি এ স্থানের শোভা-সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া নামকরণ করেন নাই। তাঁহার নাম ছিল বৈকুণ্ঠনাথ মণ্ডল; তাই গ্রামের নাম বৈকুণ্ঠপুর। প্রত্নতাত্ত্বিকের বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য এখনও গোপীনাথ মণ্ডলের বাড়ি হইতে পুরাতন দলিলপত্র বাহির করিয়া প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে।

দুইদশ-ঘর সৌভাগ্যবান মানুষ ছাড়া প্রায়ই দেখা যায় যে, এক পুরুষ উপার্জন করেন, সঞ্চয় করেন,—দ্বিতীয় পুরুষ পায়ের উপর পা দিয়া ভোগ করেন, দুই হাতে টাকা উড়ান; তৃতীয় পুরুষের দিন-অন্ন জুটে না।

গোপীনাথ মণ্ডলেরও তাই হইয়াছে; তাহার পিতামহ বৈকুণ্ঠ মণ্ডল নীলকুঠির দেওয়ানি করিয়া বিলক্ষণ দশটাকা উপার্জন করিয়াছিলেন, জমাজমি বাড়ি-ঘর করিয়াছিলেন, নিজের নামে এই বৈকুণ্ঠপুর গ্রামখানি বসাইয়াছিলেন, সম্ভবমত খরচপত্র, দান-ধ্যানও করিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার পুত্র হরেকষ্ণ মণ্ডল একেবারে নবাব হইয়া বসিলেন; বাবুগিরি, ধুমধাম দেখে কে? সৎকার্যে সামান্যই খবচ হইল, অসৎ-কার্যে একেবারে জলের মত টাকা বাহির হইতে লাগিল।

হরেকৃষ্ণের আমলের জমাখরচের ফর্দ দাখিল করিয়া আর কাজ নাই। আর দশজন যেমন করিযা উচ্ছন্নে যায, হবেকৃষ্ণ সেই মহাজন-পন্থারই অনুসরণ করিয়াছিলেন। তাহার ফলে হরেকৃষ্ণ নন্দন গোপীনাথ পাইয়াছেন সামান্য একখানি জোত, কয়েকটি কোঠাঘর, এবং শূন্যগর্ভ পাঁচটি লোহার সিন্দুক; আর পাইয়াছেন, দেশজোড়া 'বড়মানুষ' নাম, পিতৃ-পিতামহ-কালাগত পালি-পার্বণ, গৃহ-দেবতা নারায়ণ-শিলা, আব একপাল পোষ্য,—তাহার মধ্যে কুপোষ্যই বেশি।

মণ্ডলেরা জাতিতে সদ্‌গোপ। গোপীনাথের যখন বিবাহের বয়স হইল অর্থাৎ যখন তাঁহার বয়স ১৫ বৎসর, তখন হরেকৃষ্ণ খুব ঘটা করিয়া ছেলের বিবাহ দিলেন; অতি গরিবের ঘরের সুন্দরী মেয়ে ঘরে আনিলেন, সুতরাং পুত্রবধূর সঙ্গে সঙ্গে বৌমার বিধবা মাতা, বিধবা ভগিনী এবং নাবালক ভ্রাতাকেও গৃহে স্থান দিলেন।

কলসির জল তখনই প্রায় তিনভাগ কমিয়া গিয়াছিল। অনেক বড়মানুষের ঘরে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যখন তাঁহাদের অবস্থা মলিন হইতে আরম্ভ হয়, তখন তাঁহারা সেই মলিনতা ঢাকিয়া রাখিবার জন্য ধুমধাম আরও বাড়াইয়া দেন; ভয়—পাছে কেহ দৈন্যের কথা টের পায়। হরেকৃষ্ণ শেষে তাহাই করিলেন। ছেলের বিবাহের পর তিনি যে বারো বৎসর বাঁচিয়া

ছিলেন, ততদিন সমানেই চালাইয়া ছিলেন; গোপীনাথও কিছু দেখেন নাই,—বড়মানুষের ছেলেরা যাহা করিয়া থাকেন, তাহাই করিয়া সময় কাটাইয়াছেন।

তাহার পর একদিন হরেকৃষ্ণের ডাক পড়িল; তিনি চলিয়া গেলেন। স্ত্রী, পুত্রবধূ এবং বড় আদরের আদরিণী একমাত্র পৌত্রী ইন্দিরা, একপাল আত্মীয়,—কেহই তাঁহাকে আটকাইয়া রাখিতে পারিল না।

দুইদিন যাইতে না যাইতেই প্রকাশ হইয়া পড়িল,—হরেকৃষ্ণ দেনায় ডুবিয়া গিয়া বহু আয়াসে বৈতরণী পার হইয়া গিয়াছেন। তা' বলিয়া ত আর এত-বড় লোকটার শ্রাদ্ধ. বালির পিণ্ড দিয়া শেষ করা যায় না। গ্রামের দশজন কল্যাণকামী, পুরোহিত মহাশয়, শুভানুধ্যায়ী শ্যালক নিধিরাম এবং অন্যান্য আত্মীয়-কুটুম্ব সকলেই গোপীনাথকে সাহস দিলেন—যাঁহা বায়ান্ন তাঁহা তিপান্ন—যে ষাট হাজার সেই সত্তর হাজার! ষাট হাজার টাকা ঋণ যদি শোধ হয়, তাহা হইলে আর দশহাজারও শোধ হইবে,—বাবা ত দ্বিতীয় বার মরিতে আসিবেন না! গোপীনাথ কি করিবেন; দশজনের পরামর্শই গ্রহণ করিলেন—দশহাজার টাকা ধার করিয়া মহাসমারোহে পিতার শ্রাদ্ধকার্য শেষ করিলেন। তাহার পর মহাজনেরা সব বেচিয়া-কিনিয়া লইল; যাহা থাকিল, সে কথা পূর্বেই বলিয়াছি।

২

চৈত্রমাসে হরেকৃষ্ণ মণ্ডল মারা গেলেন, বৈশাখ মাসেই গোপীনাথ সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া মহাজনদিগের ঋণ শোধ করিলেন। অনেকে পরামর্শ দিয়াছিল যে, খরচপত্র কমাইয়া ধীরে ধীরে কিছু কিছু করিয়া শোধ দেওয়া হউক;—গোপীনাথ কাহারও কথা শুনিলেন না। তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন, সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করা ব্যতীত ঋণ-শোধের অন্য উপায় নাই। বিলম্ব করিলে ঋণের পরিমাণ বাড়িবে ব্যতীত কমিবে না।

এই ঋণ শোধ করিতে গিয়া তাঁহার সর্বস্ব গেল। তিনি দেখিলেন, ভদ্রাসনও রক্ষা করা যায় না। তখন বাড়ির স্ত্রীলোকদিগের অর্থাৎ তাঁহার মাতার ও স্ত্রীর অলংকারগুলি পর্যন্ত বিক্রয় করিয়া ভদ্রাসন এবং ছোট একখানি জোত রক্ষা করিলেন। জোতেব আর আয় কত? খাজনা-ট্যাক্স বাদে সাত-আট শত টাকাতেই সংসার চালাইতে হইবে। আর ত উপায় নাই!

তাঁহার শ্যালক নিধিরাম একটা কিছু কারবার করিবার জন্য তাঁহাকে পরামর্শ দিল। তিনি বলিলেন, "কারবার করিতে মূলধন চাই। টাকা কোথায় পাইব? আর কারবারের আমি কি জানি?"

নিধিরাম কহিল, "দেখ গোপীবাবু, তুমি যাই বল—তোমার মায়ের হাতে, আর আমার দিদির হাতে নিশ্চয়ই কিছু টাকা আছে। তাঁরা এতদিন চাপিয়া রাখিয়াছেন। তোমার অবস্থার কথা ত তাঁরা বুঝ্‌ছেন। এখন যদি তুমি একটু কাঁদাকাটি ক'রে ধর, তা হ'লেই তাঁবা হাজার দু'হাজার টাকা নিশ্চয়ই বার ক'রে দেবেন।"

গোপীনাথ কহিলেন, "না নিধি, তাঁদের হাতে একটি পয়সাও নাই। তাঁদের কাছে টাকা থাক্‌লে কি তাঁরা গয়নাগুলো এমন ক'রে বেচ্‌তে দিতেন?

নিধিরাম কহিল, "আমার কিন্তু বিশ্বাস হয় না; তাঁদের হাতে টাকা আছেই।"

গোপীনাথ কহিলেন, "না নিধি, এটা তোমার ভুল। এত যে কষ্ট হচ্ছে, তা চোখে দেখেও কি তাঁরা চুপ করে থাক্‌তে পারতেন?"

নিধি তখন কোন মহাজনের নিকট হইতে টাকা ধার করিবার পরামর্শ দিল।

গোপীনাথ বলিলেন, "সপরিবারে অনাহারে মরিব, তাও স্বীকার; কিন্তু নিধি, আমি ধার করতে পারব না—কিছুতেই না।"

নিধি কহিল, "তা হ'লে চল্‌বে কি করে? এত বড় সংসার; তারপর মান-সম্ভ্রম আছে, বারোমাসে তেরো পার্বণ আছে, লোক-লৌকিকতা আছে; এসব হবে কি ক'রে?"

গোপীনাথ বলিলেন, "হবে না। যখন ছিল, তখন হয়েছিল; এখন যার সংসার চলাই ভাব, তার পক্ষে ও-সকল ত্যাগ করতেই হবে।"

নিধিরাম বলিল, "তা' হ'লে আমাদেরও ত পথ দেখ্‌তে হয়। সত্য কথা বল্‌তে কি গোপীবাবু, তোমাদের আশ্রয়ে এসে আমিও যে তোমাদের মতই হ'য়ে গিয়েছি। লেখাপড়া শিখ্‌লুম না, কাজকর্মও এতদিন কিছুই করি নাই। তুমিও যেমন কিছু ভাব নাই, আমিও ভাবি নাই। মনে করেছিলুম, সপরিবারে তোমাদের অন্ন ধ্বংস করেই জীবন কাটিয়ে দেব। এ যে তোমাদের বাড়ি, আমার বাড়ি নয়,—এ কথা তোমার বাবা ত এক দিনও আমাকে বুঝতে দেন নি। এখন আমাদেরই বা কি উপায় হবে? আমারই যে পাঁচ-ছয়টি লোক। এ সময় কোথায় তোমার সাহায্য করব, না তোমার উপরই বসে খেতে হচ্ছে। তার জন্যই ত বল্‌ছিলুম যে, কোন রকমে হাজার দুই তিন টাকা যোগাড় কর; দুই জনে খেটে খুটে সংসার চালাই। চাই কি মা লক্ষ্মী একদিন মুখ তুলেও চাইতে পারেন।"

গোপীনাথ বলিলেন, "ভাই, তোমার মনের কথা বুঝ্‌তে পেরেছি। সংসারের এই অবস্থা দেখে তুমি কাতর হয়েছ এবং এখানে থাক্‌তে তোমাদের কেমন সঙ্কোচ বোধ হচ্ছে। কিন্তু নিধি, তোমরা যেতে পারবে না; আমার আর কেহই নাই। এ সময় কি তুমি আমাকে ফেলে যাবে? সে হবে না ভাই! তোমার বয়স কম, তুমি লেখাপড়াও যা হয় কিছু শিখেছ; তুমি চেষ্টা করলেই কোন স্থানে একটা কাজকর্ম জুটিয়ে নিতে পারবে; কিন্তু আমার ত আর উপায় নেই। তুমি ত জান, আমি অতি সামান্যই লেখাপড়া শিখেছিলুম; পয়সার ভাবনা ছিল না, আমোদ-আহ্লাদেই দিন কাটিয়েছি। এই আমার বয়স ২৭ বৎসর; এতদিনের মধ্যে মদ, গাঁজা দূরে থাক, আমি তামাক, পান পর্যন্ত খাইনে। শিখ্‌বার মধ্যে শিখেছি গান-বাজনা;—আর ত কিছু জানিনে। যাত্রার দলে বেহালা বাজাবার কাজ ছাড়া আমি আর ত কিছুই করতে পারিনে। এতকাল পরে দুটো অন্নেব জন্য বৈকুণ্ঠ মণ্ডলের নাতিকে কি যাত্রার দলে যেতে হবে? শেষে কি আমার—"

তাঁহার কথায় বাধা দিয়া নিধিরাম বলিল, "না গোপীবাবু, সে হবে না; তা' তোমাকে কিছুতেই কর্‌তে দেব না। তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ি থাক, আমি এই সংসারের ভার নিলাম। যে ক'রে হোক্ আমি তোমাদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা কর্‌ব,—এ সময় তোমাদের ছেড়ে আমরা কোথায় যাব? আমাদের ত দাঁড়াবার স্থান নেই! তুমি ভেব না। আমি দুই-এক দিনের

মধ্যেই কল্‌কাতায় যাচ্ছি। সেখানে আমাদের কত পরিচিত লোক আছে। তাদের কাউকে ধ'রে নিশ্চয়ই একটা কাজকর্মের ব্যবস্থা কর্‌তে পার্‌ব।"

গোপীনাথ বলিলেন, "ভাই, যখন সময় ভাল ছিল, তখন অনেক বন্ধু ছিল; এখন কি আর কেউ সে কথা মনে কর্‌বে!"

নিধি বলিল, "দেখাই যাক্ না। তা ব'লে ত ঘরে বসে থাক্‌লে চল্‌বে না। আমার কিন্তু বড় ইচ্ছা যে, একটা ব্যবসা করি। দেখি কি হয়।"

গোপীনাথ বলিলেন, "দেখ ভাই নিধি, সব কাজ কোরো,—কিন্তু আমার অনুরোধ, ধার ক'রে কিছু কোরো না—ধারের মত শত্রু আর নেই।"

এই কথোপকথনের দুই দিন পরেই নিধিরাম কলিকাতায় চলিয়া গেল।

জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ গেল। গোপীনাথ কোন প্রকারে সংসার চালাইতে লাগিল।

নিধিরাম কলিকাতায় কাজ-কর্মের চেষ্টা করিতেছে, এখনও সফল মনোরথ হইতে পারে নাই।

ভাদ্র মাস পড়িল; আশ্বিনের প্রথমেই এবার মহামায়ার পূজা। গোপীনাথ স্থির করিয়া বসিয়া আছেন, এবার পূজা করা হইবে'না। মণ্ডল-বাড়ি দুর্গোৎসবে যে সমারোহ হইত, তাহা ত একেবারেই অসম্ভব,—কোন প্রকারে মায়ের পূজা করিতে গেলেও যে তিন-চার শত টাকা লাগে! এক টাকা তিনি কোথায় পাইবেন? এ তিন-চার শত টাকা থাকিলে যে তিনি সপরিবারে তিন-চার মাস খাইয়া বাঁচেন! না—এবার আর মণ্ডল-বাড়িতে মহামায়ার আগমন হইবে না।

এই সময় একদিন সন্ধ্যার পর গোপীনাথ বিষণ্ণ মনে বাহিরের বৈঠকখানায় একাকী বসিয়া আছেন, এমন সময় তাঁহার মাতাঠাকুরানি সেখানে আসিয়া বলিলেন, "গোপী, বাবা, অমন করে একেলা ব'সে আছ কেন? ঘরে যে একটা আলোও কেউ দিয়ে যায় নাই,—সন্ধ্যাদীপও বুঝি দেখান হয় নাই?"

গোপীনাথ বলিলেন, "না মা, আলোর দরকার নেই, আমি এই আঁধারেই বেশ আছি।"

কথাটা মায়ের বুকে বাজিল। তিনিও যে আজ কয়দিন হইতে আঁধার দেখিতেছেন! সম্মুখে পূজা!—এতকাল মা আসিয়াছেন,—আর এ বৎসর তাহার কোনই আয়োজন হইতেছে না,—এই কথা ভাবিয়া তিনিও কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। আজ সেই কথাটা উত্থাপন কবিবার জন্যই তিনি গোপীনাথের নিকট আসিয়াছিলেন। কিন্তু গোপীনাথের কথা শুনিয়া সে প্রসঙ্গ তুলিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না।

গোপীনাথ বুঝিলেন, মাতা কোন বিশেষ কথার জন্য আসিয়াছেন। তিনি বলিলেন, "মা, এ সময় তুমি এ দিকে এলে যে?"

মা বলিলেন, "না, তুমি কি কর্‌ছ, তাই দেখতে এলাম।"

গোপীনাথ বলিলেন, "মা, এবার পূজার কি হবে? আমি অনেক ভেবে দেখ্‌লাম, পূজা করা ত অসম্ভব!"

মা বলিলেন, "বাবা, সেই কথা বল্‌তেই আমি এসেছিলাম; কিন্তু এই আঁধারের মধ্যে তোমাকে চুপ করে বসে থাক্‌তে দেখে আমার আর সে কথা তুল্‌তে মন সরছিল না।"

গোপীনাথ বলিলেন, "যে রকম অবস্থা হয়েছে মা, তা ত তুমি দেখ্‌তেই পাচ্ছ; বুঝ্‌তেই পাচ্ছ; কেমন করে যে সংসার চল্‌বে, তাই প্রধান ভাবনা!"

মা বলিলেন, "তা কি আর আমি বুঝ্‌ছিনে বাবা! কিন্তু কি কর্‌বে! অদৃষ্ট মন্দ, তাই এই ছেলে-বয়সে তোমাকে এত কষ্ট পেতে হল, আর আমি দাঁড়িয়ে তাই দেখ্‌ছি।"

গোপীনাথ বলিলেন, "তা হ'লে পূজা এবার বন্ধ থাকুক; আবার যদি কখন সুদিন আসে, তখন দেখা যাবে। কি বল মা?"

মাতা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "এত কালের পূজা! কর্তার সঙ্গে-সঙ্গেই শেষ হ'য়ে যাবে। আর উপায়ও ত দেখ্‌ছিনে। আমার কি বৌমার যদি দু'চার-খানা অলংকার থাক্‌ত, তা হ'লেও না হয়, তাই দিতাম; কোন রকমে এবার মাকে আনা যেত। তাও ত নেই। এক ধার-কর্জ,—তা বাবা তোমাকে করতে দিচ্ছিনে।"

গোপীনাথ বলিলেন, "মা, কোন-রকমে পূজা সার্‌তে গেলেও তিন-চারশ' টাকার দরকার। এত টাকা কোথায় পাব!"

মা বলিলেন, "মা দুর্গা, তোর মনে এই ছিল মা! যাক্ গোপী, বাবা, তুমি আর ও-সব কথা ভেবে মন খারাপ কোরো না। তুমি বেঁচে থাক, তোমার ভয় কি? এ বছর নাই হোলো পূজা, আস্‌ছে বছরে হবে। তুমি কিছু ভেব না; জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি।"

এই সময় ইন্দিরা "বাবা বাবা" বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। বলিল, "বাবা, তুমি এ অন্ধকারে বসে কি করছ? আলো আন্‌ব?"

গোপীনাথ বলিলেন, "না মা, আলো এনে কাজ নেই। এই আমি মায়ের সঙ্গে দুটো কথা বল্‌ছিলাম।"

ইন্দিরা বলিল, "কৈ দিদি কৈ? আমি যে আঁধারে কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছিনে।" "এই যে দিদি, আমি এই জানালার পাশে দাঁড়িয়ে আছি।"

ইন্দিরা তখন ঠাকুরমার নিকটে যাইয়া বলিল, "আলোতে বুঝি তোমাদের কথা হয় না! আঁধারের মধ্যে ভূতের মত দাঁড়িয়েও তোমরা থাক্‌তে পার! আচ্ছা বাবা, ওরা সবাই বল্‌ছিল, এবার আমাদের বাড়ি পুজো হবে না। কেন হবে না—খুব হবে। দাদামশাই নেই, দিদিমা ত আছে, বাবা ত আছে! পুজো হবে না বল্‌লেই অমনি হ'লো! বুঝলে বাবা, মা সেই কথা শুনে কাঁদছিল। আমি বল্‌লাম, 'যাই দেখি বাবার কাছে; পুজো আবার হবে না!' পুজো করতেই হবে দিদিমা! তুমি কারো কথা শুনো না—বাবা বল্‌লেও শুনো না। দিদিমা, তুমি যে কথা বল্‌চ না?"

দিদিমা অতি ধীরে স্বরে বলিলেন, "দিদি, কি করে পুজো হবে। আমাদের যে কিছু নেই।"

ইন্দিরা বলিয়া উঠিল, "কিছু নেই কি, তুমি আছ, বাবা আছে, মা আছে, আমি আছি।"

ইন্দিরার কথা শুনিয়া গোপীনাথের যেন কি হইয়া গেল! তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া কন্যাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "মা আমার কিছু নেই কি? সব আছে। তুই যখন আছিস, তখন আমার সব আছে। মা এবার তোর পূজা। হাঁ, পূজা হবে বৈ- কি! তুই যখন আছিস্‌, তুই যখন আমাকে ছেড়ে যাস্‌নি মা, তখন পূজা হবে বৈ কি! যাও মা, তোমার মায়ের চোখের জল মুছিয়ে দেও গে! বোলো এবার পূজা হবে,—এবার আমার মা ইন্দিরার আদেশ, পূজা হবে।"

মায়ের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "মা ভেব না; যাঁর পূজা তিনি করবেন। শুন্‌লে না, মা-দুর্গা ইন্দিরার মুখ দিয়ে বল্‌লেন, 'আমি আছি!' ও ত ইন্দিরার কথা নয়, মা মহামায়া আজ কন্যারূপে এসে বল্‌ছেন, "ওরে আমি আছি!"

ঠিক সেই সময়ে এক দীর্ঘশ্মশ্রু বৃদ্ধ মুসলমান ফকির একটা বাতি হাতে করিয়া বৈঠকখানার প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া জলদ্‌গম্ভীর স্বরে বলিল,—'ইয়া পির মওলা মুশকিল-আসান, যাঁহা মুশকিল তাঁহা আসান।"

৪

পরদিন বেলা এগারোটার সময় গোপীনাথ যখন স্নানে যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন, সেই সময় একজন অপরিচিত লোক আসিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বলিল, বাবু, একখানি পত্র আছে।"

গোপীনাথ বলিলেন, "তুমি কোথা থেকে আসছ?"

লোকটি বলিল, "কলিকাতা থেকে,—সকালের গাড়িতে এসেছি।" এই বলিয়া সে গোপীনাথের হাতে একখানি পত্র দিল।

গোপীনাথ পত্রের শিরোনামা দেখিলেন—তাঁহার পিতার নাম লেখা রহিয়াছে। তিনি বলিলেন, "এ চিঠি ত আমার বাবার নামে। তিনি ত চৈত্র মাসে স্বর্গে গিয়াছেন! আহা, তুমি দাঁড়িয়ে রয়েছ যে! ঐ বেঞ্চখানার উপর বোসো। তুমি বুঝি আর কখন বৈকুণ্ঠপুরে আস নি? আগে খবর দিলে স্টেশনে লোক পাঠিয়ে দিতাম।"

লোকটি সবিনয়ে বলিল, "আজ্ঞে না, আর কখন আসি নি। তা' ইস্টিশেন থেকে এ আর কতটুকু পথ,—কোশ দেড়েক হবে; আর যাকে মণ্ডল বাড়ির নাম বলেছি, সেই পথ দেখিয়ে দিয়েছে। দু-কোশ পাঁচ-কোশ চল্‌তে আমাদের কষ্ট হলে কি বাবু চলে!"

গোপীনাথ তখন বলিলেন, "কে চিঠি লিখেছেন?"

লোকটি বলিল, "আমাদের বড় বাবু সিদ্ধেশ্বর রায় মহাশয়; তিনি কর্তা সর্বেশ্বর রায় মহাশয়ের বড় ছেলে। বড়বাবু মুখে ব'লে দিয়েছেন যে, তিনি আর কর্তা মহাশয় আজ দুইটার গাড়িতে এখানে আস্‌বেন। আমাকে খবর পাঠিয়েছেন, আর গাড়ির সময় স্টেশনে দু'খানি পাল্‌কি ঠিক করে রাখতে ব'লে দিয়েছেন। কর্তা মহাশয় বৃদ্ধ হয়েছেন, বয়স প্রায় ষাটের উপর, শরীরও ভাল নয়। তাই বড়বাবু আমাকে সব ঠিক করবার জন্য আগে পাঠিয়ে দিলেন।"

গোপীনাথ মহা চিন্তায় পড়িলেন। সর্বেশ্বর রায়, সিদ্ধেশ্বর রায়,—এ কোন নামই ত তাঁহার পরিচিত নহে। শুনিলেন, সর্বেশ্বর রায় বৃদ্ধ; তিনি কষ্ট করিয়া পুত্রকে সঙ্গে লইয়া এতদূরে তাঁহার বাড়িতে আসিতেছেন কেন, গোপীনাথ মোটেই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না।

লোকটিকে সে কথা জিজ্ঞাসা করিতেও কেমন সঙ্কোচবোধ হইল। যিনি এত আত্মীয়তা প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাকে মোটেই জানেন না, এ কথা প্রকাশ করা কিছুতেই কর্তব্য নহে। অথচ যাঁহারা আসিবেন, তাঁহারা কি প্রকার অবস্থার লোক, কেমন ভাবে তাঁহাদিগের অভ্যর্থনা করা কর্তব্য, ইহা জানিতে না পারিলে হয় ত অনেক ত্রুটি হইতে পারে।

তখন তিনি মনে করিলেন, এই লোকটির নিকট হইতে কৌশলে সমস্ত কথা জানিয়া লইতে হইবে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি?"

লোকটি বলিল, "আমার নাম শ্রীরজনীকান্ত দাস। আমি রায়-বাবুদের চাকর। যখন যেখানে চিঠিপত্র নিয়ে যেতে হয়, কি সঙ্গে যেতে হয়, তাই আমি করি। কর্তা, বড় বাবু, ছোট বাবু সকলেই আমাকে কৃপা করেন?"

"তুমি কত বেতন পাও?"

"আজ্ঞে সামান্য মাহিনা পাই, আর খেতে পাই। মফস্বলে চিঠিপত্র নিয়ে গেলে কিছু-কিছু পাই; তার পর বিপদ-আপদে কর্তাই আছেন। এই ত কর্তা কাশীবাস করতে যাবেন, তা আমাকে বলেছেন, 'রজনী, তোকে আমার সঙ্গে যেতে হবে।' কর্তার ত কাশী যাওয়ার সব ঠিক; এই দু'চার দিনের মধ্যেই যাবেন; বাঁধা-ছাঁদা সব হচ্ছে। সেখানে বাড়ি পর্যন্ত কেনা হয়েছে। তার মধ্যে কি না, আজ খুব ভোরে উঠে বড় বাবু আমায় ডেকে বললেন, 'দেখ্ রজনী, তোকে এখনি বৈকুণ্ঠপুর যেতে হবে,—এই সাতটার গাড়িতে।' তার পর পথ-ঘাটের কথা বলে দিলেন। কর্তা বুড়ো মানুষ, কোথাও যান না; এই যে কাজ-কর্ম, বিষয়-আশয়, এত বড় কল্‌কাতার আড়ত,—সব বড় বাবু দেখেন শোনেন। কর্তা একেবারে কাশীবাসী হতে যাচ্ছেন। এরই মধ্যে আজ সকালে হুকুম হোলো তাঁরা এখানে আপনার বাড়িতে আস্‌বেন। বড় মানুষের মরজি—কখন কি হয় তা ত বলা যায় না। পত্রখানি পড়ে দেখুন, তাতে বোধ হয় সব কথা খোলসা লেখা আছে।"

গোপীনাথ তখন পত্রখানি খুলিয়া পড়িলেন, তাহাতে লেখা আছে—

শ্রীশ্রীহরি

সহায়।

সবিনয় নিবেদন,—

আমার পিতৃদেব শ্রীযুক্ত সর্বেশ্বর রায় মহাশয় কোন বিশেষ কারণে অদ্য অপরাহ্ণের গাড়িতে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবেন। তিনি বৃদ্ধ হইয়াছেন, শরীরও তেমন ভাল নহে; এই জন্য আমিও তাঁহার সঙ্গে যাইব। স্টেশন হইতে আপনার বাড়িতে গমনের, এবং আগামী কল্য প্রত্যাগমনের ব্যবস্থা করিবার জন্য রজনী দাসকে এই পত্রসহ পাঠাইলাম।

সবিশেষ সাক্ষাতে নিবেদন করিব। অত্র কুশল, মহাশয়ের পারিবারিক কুশল কামনা করি। নিবেদন ইতি—

ভবদীয়
শ্রীসিদ্ধেশ্বর রায়

পত্রে বিশেষ কিছু লেখা নাই; অথচ যে বৃদ্ধ কাশী গমন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তিনি হঠাৎ পুত্রকে সঙ্গে করিয়া বৈকুণ্ঠপুরে আসিতেছেন, ইহার কোন কারণ গোপীনাথ কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না।

তিনি রজনী দাসকে বলিলেন, "তা হ'লে দাসের পো, বেলা অনেক হয়েছে; স্নান-আহার করে বিশ্রাম কর। তাঁদের স্টেশন থেকে আন্‌বার সমস্ত ব্যবস্থা আমি ঠিক করে রাখব, তার জন্য তোমাকে কষ্ট করতে হবে না।"

এই বলিয়া তিনি রজনীকে চাকরের জিম্মা করিয়া দিয়া নিজে স্নান-আহারে গমন করিলেন।

আজ আর তাঁহার বিশ্রাম করিবার সময় নাই। পূর্বের মত অবস্থা থাকিলে দুদশজন বড়মানুষের অভ্যর্থনার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইতে হইত না। কিন্তু এখন ত আর সে অবস্থা নাই! সুতরাং সবই নিজেকে দেখিয়া শুনিয়া ব্যবস্থা করিতে হইবে। আর্থিক অবস্থা যাহাই হউক, পিতৃ-পিতামহেব নাম ত এখনও লোপ পায় নাই। বিশেষত, রজনীর নিকট যাহা শুনিলেন, তাহাতে বুঝিতে পারিলেন, যাঁহারা আসিতেছেন, তাঁহারা অবস্থাপন্ন লোক, কলিকাতার অধিবাসী; তাঁহাদের পদমর্যাদার অনুরূপ ব্যবস্থা করিতেই হইবে। তাই আহারান্তেই তিনি লোকজন ডাকাইয়া বৈঠকখানার আবর্জনা দূর করিলেন; ফরাস পাতাইলেন; বিক্রয়াবশিষ্ট যে কয়েকটি আলো ছিল, তাহা যথাস্থানে স্থাপিত করিলেন। অবস্থা মলিন হইলেও ডাকিলে দশজন লোক মণ্ডল-বাড়িতে আসে এবং কাজটা-কর্মটা করিয়া দেয়।

এই প্রকারের দুই-চারিজন অনুগত লোককে ডাকাইয়া বাড়ি-ঘর একটু পরিষ্কার করাইয়া লইলেন। পুকুর হইতে মাছ ধরাইবার ব্যবস্থা করিলেন; আহার্য-দ্রব্যও যথাসাধ্য সংগ্রহ করিলেন।

তাহার পর ভাবিলেন, ভদ্রলোকেরা যখন পূর্বাহ্ণে সংবাদ দিয়াছেন, তখন স্টেশনে কেবল পাল্‌কি ও লোক পাঠাইয়া দেওয়া ভাল দেখায় না।—অপরিচিত বড়লোক, কলিকাতার বাবু লোক,—হয় ত তাহা অভ্যর্থনার ত্রুটি বলিয়া মনে করিতে পারেন; তাই তিনি তিনখানি পাল্‌কির ব্যবস্থা করিলেন। নিজেদের যে কয়খানি পাল্‌কি ও যে দুইটা ঘোড়া ছিল, তাহা ইতঃপূর্বেই বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছিলেন,—বিলাসিতার যাহা কিছু আস্‌বাব, সে সমস্তই বিদায় করিয়াছিলেন।

এই সকল ব্যবস্থা করিতে করিতেই বেলা চারিটা বাজিয়া গেল; তখন তিনি আর বিলম্ব না করিয়া পাল্‌কিতে চড়িয়া স্টেশনে গেলেন—অপর দুইখানি পাল্‌কি পূর্বেই রজনী দাসকে সঙ্গে দিয়া স্টেশনে পাঠাইয়াছিলেন।

যথাসময়ে গাড়ি স্টেশনে আসিলে দ্বিতীয় শ্রেণির একটি কক্ষ হইতে একটি বৃদ্ধ ও একটি যুবক অবতরণ করিলেন।

গোপীনাথ সেই দিকে অগ্রসর হইলে রজনী কর্তাকে নমস্কার করিয়া বলিল, "কর্তা মহাশয়, বাবু আপনাদের নিতে নিজেই এসেছেন।"

তখন গোপীনাথ তাঁহার সম্মুখে যাইয়া নমস্কার করিয়া বলিলেন, "আমার নাম শ্রীগোপীনাথ মণ্ডল; আমি স্বর্গীয় হরেকৃষ্ণ মণ্ডল মহাশয়ের পুত্র।" বৃদ্ধ সর্বেশ্বর বাবু বলিলেন, "এস বাবা, বেঁচে থাক। তোমার বাবা বেঁচে নেই। আমি সে খবর জানিনে, তিনি আর আমি একবয়সী ছিলাম; আমিই হয় ত একটু বড় ছিলাম। হরেকৃষ্ণ আমাকে 'সর্ব-দা' ব'লে ডাক্‌ত। সে কি আজকের কথা বাবা! এখন চল, তোমার বাড়ি যাই। আজ বড় আশা করে এসেছিলাম, হরেকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা হবে; সে দেখ্‌ছি আগেই চলে গিয়েছে। তোমাদের বাড়ি এখান থেকে কত দূর বাবা?"

"এই ক্রোশ দেড়েক; আমি পাল্‌কির ব্যবস্থা করেছি।"

সর্বেশ্বর বাবু সিদ্ধেশ্বর বাবুকে দেখাইয়া বলিলেন, "এইটি আমার বড় ছেলে, সিদ্ধেশ্বর।" গোপীনাথ সিদ্ধেশ্বর বাবুকে নমস্কার করিলেন। তাহার পর সকলে স্টেশনের বাহিরে আসিয়া পাল্‌কিতে চড়িলেন। সর্বেশ্বর বাবুর সঙ্গে যে দুইজন চাকর ও একজন দ্বারবান আসিয়াছিল, তাহারা রজনী দাসের সঙ্গে পদব্রজে চলিল।

বাড়িতে পৌঁছিয়া বিশ্রামান্তে হাত-মুখ ধুইয়া সর্বেশ্বর বাবু যখন ফরাসে বসিতে যাইবেন, তখন গোপীনাথ বলিলেন, "একটু জলযোগ করতে হবে। আমাদের এ পাড়াগাঁ, এখানে ত আপনার অভ্যর্থনার উপযুক্ত কিছুই মেলে না; তবে যখন দয়া করে পায়ের ধুলো—"

গোপীনাথের কথায় বাধা দিয়া, তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিয়া সর্বেশ্বর বাবু বলিলেন, "বাবা, তুমি জান না, তোমাদের সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ। তা জান্‌লে এমন কথা বল্‌তে না। যাক্ এখন চল, একটু জল খেয়েই আসি।"

এই বলিয়া সিদ্ধেশ্বর বাবু ও গোপীনাথকে সঙ্গে লইয়া তিনি অন্দরের একটা ঘরে গেলেন।

সেখানে দেখেন, তাঁহাদের পিতা-পুত্রের জন্য প্রচুর জলযোগের আয়োজন হইয়াছে।

সর্বেশ্বর বাবু তখন গোপীনাথকে বলিলেন, "বাবা গোপীনাথ, এ তুমি কি করেছ? আমাকে তোমরা কি মনে করেছ? তুমি তা' হলে কিছুই জান না। আমি যে এ বাড়ির চাকর।।"

এই বলিয়া তিনি মৃত্তিকা-আসনে বসিয়া পড়িলেন। গোপীনাথ ও সিদ্ধেশ্বর বাবু অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সর্বেশ্বর বাবু বলিলেন, "তোমরা আমার কথা বুঝ্‌তে পার্‌ছ না; আমি সত্য-সত্যই এ বাড়ির চাকর—সামান্য চাকর—এক টাকা বেতনের চাকর। আমার জন্য এ অভ্যর্থনার আয়োজন ক'রে গোপী, তোমার পিতামহের অপমান কোরো না। তোমরা বোসো, আমার কথা শোন।"

গোপীনাথ বলিলেন, "আপনি ঐ আসনের উপর ব'সে যা বল্‌বার বলুন না।"

সর্বেশ্বর বাবু বলিলেন, "না, না,—আগে আমার কথা শোন। এ কথা তুমি নিশ্চয়ই শুনেছ যে, তোমার পিতামহ স্বর্গীয় বৈকুণ্ঠ মণ্ডল মহাশয় মুর্শিদাবাদ জেলার হাজিপুরের নীলকুঠির দেওয়ান ছিলেন। তিনি যে বছর কাজ ছেড়ে দিয়ে বাড়ি চলে আসেন, তার দুই বছর আগে আমি তাঁর কাছে গিয়েছিলাম। তখন আমার কেউ ছিল না—আমি নিরাশ্রয় ছিলাম;—ভিক্ষা করে খেতে-খেতে হাজিপুরে যাই। তখন আমার বয়স বারো কি তেরো বছর; তোমার বাবারও বয়স তখন দশ-এগারো। মণ্ডল মহাশয় আমার দুরবস্থা দেখে দয়া করে আমাকে আশ্রয় দেন; আমি তাঁর চাকর হয়ে থাকি। তিনি আমাকে মাসে এক টাকা বেতন দিতেন, আর খেতে-পরতে দিতেন। আমি তখন অতি সামান্য লেখাপড়া জান্‌তাম। দুই বছর তাঁর কাছে থাকি। তিনি আমাকে বড়ই ভালবাসতেন। আমি তিলির ছেলে; তাই তিনি আমাকে দিয়ে সামান্য চাকরের কাজ করাতেন না; আমি হাটবাজার কর্‌তাম, তোমার বাবার সঙ্গে-সঙ্গে থাক্‌তাম। তার পর তিনি যখন কর্ম ত্যাগ করে দেশে আসেন, তখন আমি তাঁর সঙ্গে এখানে আস্‌তে চেয়েছিলাম। তিনি তাতে সম্মত হন নাই। তিনি আমাকে বলেছিলেন, 'দেখ সর্ব, তোমার ভাল হবে, তোমার উন্নতি হবে, তোমার এ অবস্থা থাক্‌বে না!' তিনি আমাকে বলেছিলেন, আমি তিলির ছেলে, চাকরের কাজ আমার নয়। এই বলে তিনি আমাকে পঞ্চাশটি টাকা দিয়ে বলেছিলেন, "সর্ব, এই টাকা কয়টি দিয়ে একখানা দোকান কোরো, আর কারো চাক্‌রি কোরো না। আমি তোমাকে এই মূলধন দিয়ে গেলাম। সৎপথে থেকে কাজ কোরো, তোমার উন্নতি হবে।" আমি সেই মহাপুরুষের উপদেশ গুরুবাক্য ব'লে গ্রহণ করেছিলাম। তারই থেকে আজ আমার এই অবস্থা। তাঁরই আশীর্বাদে আজ আমার জমিদারি; তাঁরই আশীর্বাদে আজ আমি সর্বেশ্বর রায়;—তাঁরই মূলধনে আজ আমি ধনী। তিনি আজ স্বর্গে, তাঁর ছেলে হরেকৃষ্ণ আজ স্বর্গে; আমি কি তাঁর বাড়িতে এসে আসনে বসে জলযোগ কর্‌তে পারি! অমন কথা বোলো না গোপীনাথ! আমি কত আশা করে এসেছিলাম—হরেকৃষ্ণ তার ছেলেবেলার সঙ্গী 'সর্ব-দা'কে দেখে কত আনন্দ কর্‌বে। আর—যাক্‌; সে কথায় আর এখন কাজ নেই। বাবা গোপীনাথ, তুমি তোমার মাকে ডাক; তিনি এসে হাতে তুলে আমাকে কিছু দেন; আজ চল্লিশ বছর পরে আমার মনিব-বাড়ির প্রসাদ পেয়ে আমরা বাপ-বেটায় কৃতার্থ হয়ে যাই। শোন গোপীনাথ, তুমিও শোন সিদ্ধেশ্বর, সেই ছেলেবেলায়,—সেই যখন আমরা হাজিপুরে ছিলাম, তখন হরেকৃষ্ণ আমাকে 'সর্ব-দা' ব'লে ডাক্‌ত। তার পর আমি সে ডাক ভুলে গিয়েছিলাম। এই চল্লিশ বৎসর কেউ আমাকে 'সর্ব-দা' বলে ডাকে নাই। আমি মহা অপরাধী; চল্লিশ বছর তোমাদের কথা ভুলে ছিলাম—একেবারে ভুলে ছিলাম। কাল রাত্রিতে একটা মেয়ে—স্বপনে নয় বাবা—আমি তখন বেশ জেগেছিলাম—আমি সজ্ঞানে ছিলাম—তখন রাত্রি সাড়ে সাতটা কি আটটা—একটা ছোট মেয়ে, এই চল্লিশ বছর পরে আমার সম্মুখে গিয়ে দাঁড়িয়ে আমাকে বল্‌লে, 'সর্ব-দা, কাশী যাচ্ছ; বৈকুণ্ঠ মণ্ডলের ধার কি শোধ কর্‌বে না,—তাদের যে বহু কষ্ট, তাদের বাড়ি এবার পুজো যে হয় না!' দেখ, আজ চল্লিশ বছর 'সর্ব-দা' ব'লে কেউ ত আমায় ডাকে নাই। কাল কে সে মেয়ে, আমাকে সেই

নাম ধ'রে ডাক্‌লে! স্বপ্ন নয় বাবা,—কিছুতেই স্বপ্ন নয়! আমার মত মহা অপরাধীকে অপরাধের কথা জানিয়ে দেবার জন্য কে আমাকে দয়া করেছিলেন? সেই জন্যই আজ চল্লিশ বছর পরে তোমাদের কাছে ছুটে এসেছি। আমার সবই ত তোমাদের গোপীনাথ! তাই আমি তোমাদের কাছে এসে দাঁড়িয়েছি;—বৈকুণ্ঠ মণ্ডলের চাকর আজ তোমাদের সম্মুখে উপস্থিত। তোমার মাকে হুকুম কর্‌তে বল বাবা! আমার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হোক।"

গোপীনাথ অশ্রুপূর্ণনয়নে বৃদ্ধ সর্বেশ্বর বাবুর হাত জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "আপনি না হয় ঠাকুরদাদার চাকর ছিলেন, কিন্তু আমার বাবার ত 'সর্ব-দা'! আমার ত জ্যাঠামশাই! আমি যে আজ বাপ হারিয়ে জ্যাঠামশাইকে পেয়েছি! আপনি সেকালের চাকর হতে পারেন; আজ যে আপনি আমার জ্যাঠামশাই! এই সম্পর্কই আজ ধরুন। আমি বিপন্ন, আমার বিষয়-আশয় সব বেচে আমি বাবার ঋণ শোধ করেছি; তাই আজ আমি দরিদ্র, তাই আজ আমি আমার জ্যাঠামশাইকে—"

গোপীনাথের কথায় বাধা দিয়া সর্বেশ্বর বাবু বলিলেন, "তাই আজ জ্যাঠামশাই তাঁর ঋণের সামান্য অংশ শোধ দিতে এসেছে।"

গোপীনাথ বলিলেন, "জ্যাঠামশাই, আমার কথা ত আপনি শুন্‌বেন না; তা হ'লে যে আপনাকে 'সর্ব-দা' ব'লে ডেকে জোর ক'রে হাত ধ'রে নিয়ে বসাতে পারে, তাকেই ডাকি।"

"সে কে বাবা গোপীনাথ!"

"সে আমার মেয়ে ইন্দিরা।"

এই কথা বলিয়া গোপীনাথ ডাকিলেন, "মা ইন্দিরা, এদিকে এস মা! দেখে যাও তোমার আর এক দাদামশাই এসেছেন!"

ইন্দিরা, তাহার মা, তাহার ঠাকুরমা এবং বাড়ির অন্যান্য মেয়েরা সকলেই পাশের ঘর হইতে সমস্ত শুনিতেছিলেন।

পিতার আহ্বান শুনিয়া ইন্দিরা ধীরে ধীরে আসিয়া গোপীনাথের পাশে দাঁড়াইল।

সর্বেশ্বর বাবু মুখ তুলিয়া চাহিয়াই চিৎকার করিয়া উঠিলেন, "কি বল্‌ছ! এই তোমার মেয়ে ইন্দিরা!"

তাহার পরই বৃদ্ধ দৌড়িয়া গিয়া ইন্দিরাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "দিদি! 'সর্ব-দা'র অপরাধ স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য তুই-ই না কা'ল আমার কাছে গিয়েছিলি! গোপীনাথ! সিদ্ধেশ্বর! এই ইন্দিরাই কা'ল আমার কাছে গিয়েছিল! আমাকে 'সর্ব-দা' বলে ডেকে আমার ঋণের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে এসেছিল! মা মহামায়া! তুমি কা'ল আমার এই দিদির রূপ ধরে মণ্ডলবাড়ির পূজা আদায় কর্‌তে গিয়েছিলে মা! বুড়া সর্বেশ্বরের উপর তোমার এত করুণা—মা করুণাময়ী! আয় দিদি! আয় আমার মহামায়া! আয়—"

বৃদ্ধ সর্বেশ্বর রায় সংজ্ঞাশূন্য হইয়া ভূপতিত হইলেন।

-ভারতবর্ষ ৫ম বর্ষ ১৩২৪, ১ম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা কার্তিক।

আনন্দময়ী

গ্রামের লোকে ঠিক নাম করিত না—বলিত ঠাণ্ডা মল্লিক; নাম করিলে সেদিন না কি অদৃষ্টে অন্ন মিলিত না। যুবকেরা তাস খেলিতে বসিয়া চারিখানি কাগজের পরের খেলায় এক পক্ষে ছক্কার হাত থাকিলে প্রতিপক্ষ যদি ঠাণ্ডা মল্লিকের আসল নাম উচ্চারণ করিয়া কাগজ কয়খানি স্পর্শ করিত, তাহা হইলে জয়-নিশ্চিত পক্ষের ছক্কা ত হইতই না, কাগজ চারিখানিও উঠিয়া যাইত;—এমনই নামের গুণ ছিল।

নামটা বলিয়াই ফেলি; ঠাণ্ডা মল্লিকের প্রকৃত নাম শীতল মল্লিক। সেকালের মেয়েরা যেমন ভাসুরের নাম হরিদাস থাকিলে 'ফরিদাস' বলে, তেমনই শীতল মল্লিকও 'ঠাণ্ডা মল্লিক' নামেই সে অঞ্চলে পরিচিত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

মল্লিক মহাশয় জাতিতে কায়স্থ ছিলেন, কিন্তু ব্যবহার ছিল একেবারে চামারের মত। দয়া, ধর্ম, চক্ষুলজ্জা বলিয়া জিনিসটা তাঁহার মধ্যে মোটেই ছিল না বলিয়া সকলেই জানিত। তাঁহার কিছু অর্থ ছিল। এই অর্থই তাঁহাকে একেবারে পাইয়া বসিয়াছিল। টাকা ধার দেওয়াই তাঁহার ব্যবসায় ছিল।

মল্লিকের সংসারে এক বিধবা ভগিনী ব্যতীত আর কেহই ছিল না। ভগিনীটির যদি ছেলে-মেয়ে থাকিত, তাহা হইলে মল্লিক নিশ্চয়ই তাহাকে আশ্রয় দিতেন না; নিজেই ঘর-গৃহস্থালির কাজ করিতেন। তাঁহার স্ত্রী যখন নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান, তখন মল্লিকের বয়স ৪২ বৎসর। অবশ্য দ্বিতীয়বার বিবাহের সময় তখনও অতীত হয় নাই; অনেকেই তাঁহাকে কন্যাদানের চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু মল্লিক হিসাব করিয়া দেখিলেন যে, মা-গঙ্গা যখন অপব্যয় হইতে তাঁহাকে নিষ্কৃতিদানেব জন্যই তাঁহার গৃহিণীকে কোলে টানিয়া লইয়াছেন, তখন দেবীর অভিপ্রায় কি ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করা উচিত? মল্লিক কাহারও কথায় কর্ণপাত করিলেন না; তাঁহার নিঃসন্তান বিধবা ভগিনীকে বাড়িতে আনিলেন।

ভগিনীটিও দরিদ্র শ্বশুরালয়ে দাসীবৃত্তি করিয়া, অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া, দেবর-পত্নীর বাক্য-যন্ত্রণা পরিপাক করিয়া কোন প্রকারে দিন কাটাইতেছিল; এখন দাদার সাদর-আহ্বানে সে চলিয়া আসিল। দাদার পরিচয় সে জানিত। কিন্তু সে বিধবা,—তাহার একবেলা এক পোয়া চাউল, একটু লবণ, আর একটা কাঁচা লংকার দরকার;—হাজার কৃপণ হইলেও তাহার দাদা এই সামান্য বিষয়ে কৃপণতা করিবেন না, এ বিশ্বাস তাহার ছিল। আর হাজারও হউক, এক মায়ের পেটের ভাই ত। সেই ভাই একেলা কষ্ট পাইবে, এ কি কখন ভগিনী সহ্য করিতে পারে?

মল্লিক মহাশয় বিশেষ বিবেচনা করিয়াই ভগিনীকে বাড়ি আনিয়াছিলেন। এতদিন অর্থাৎ স্ত্রীর মৃত্যুর পরও তিনি দুবেলাই আহার করিতেন। এখন ভগিনীকে বাড়িতে আনিয়া মল্লিক বলিলেন, "দেখ্ নেত্য, তুই আমার ছোট বোন, তোকে কোলে ক'রে মানুষ করেছি। তুই

একবেলা হবিষ্যি করবি, আর আমি তোর বড় ভাই, আমি দুবেলা মাছ-ভাত, এটা-ওটা সেটা খাব, এ আমি কিছুতেই পারব না। আজ থেকে আমিও একবেলা তোর সঙ্গে হবিষ্যিই করব। ভাই-বোন কি পৃথক রে।"

মল্লিক অনেক হিসাব করিয়াই এ কথা বলিয়াছিলেন। একটি মানুষের খোরাক—হোক্ না সে বিধবা—তারও ত চা'ল ডা'ল লাগে, তেল লাগে, কিঞ্চিৎ তরিতরকারি লাগে। তা যেমন করিয়াই হোক, একটা বিধবার একবেলা খোরাক যোগাইতে হইলে এই আক্রা-গণ্ডার দিনে আড়াই টাকার কমে আর হয় না। মাসে আড়াই টাকা,—তা হ'লে বৎসরে হইল—বারো-দুগুণে চব্বিশ, আর ধর বারো আধে ছয়—হোল কি না ত্রিশ টাকা। একটা মানুষের জন্য বছরে তি—রি—শ টাকা? নাঃ—এত টাকা কোথায় পাব? গিন্নির মৃত্যুর পর মাসে যা খরচ হচ্চিল, তার এক আধেলা বেশি ব্যয় করা যেতে পারে না।—তবে আর গিন্নি গেল কেন? শেষে অনেক হিসাব করিয়া—অনেক জমা-খরচ থতাইয়া মল্লিক ভগিনী নেত্যর সঙ্গে এক-বেলা হবিষ্যি স্থির করিলেন। মাসান্তে হিসাব করিয়া দেখিলেন—এই বন্দোবস্তে তাঁহার এক টাকা সাড়ে তেরো আনা ব্যয়-সংক্ষেপ হইয়াছে। তখন একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া মল্লিক বলিলেন, "হবে না! হাজারও হোক কায়েতের ছেলে! হিসাবে কেউ ঠকাতে পারবে না!"

নেত্য অনেক প্রতিবাদ করিয়া, অনেক কাঁদাকাটি করিয়াও দাদাকে এই মহৎ সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারিল না।

দাদা রাত্রিতে কিছুই আহার করেন না দেখিয়া নেত্য একদিন আধপোয়াটাক চাল ভাজিয়া, লবণ-তৈল মাখিয়া দাদাকে খাইতে দিতে গিয়াছিল।

দাদা চাউল-ভাজা দেখিয়া একেবারে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন; উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "নেত্য, তুই কি শেষে আমাকে ফতুর করবি! আধ পোয়া চালের দাম কত জানিস্?

দাদা এখনই কড়াক্রান্তি হিসাব আরম্ভ করিবে, বুঝিতে পারিয়া নেত্য বলিল, "দাদা, মহাপ্রাণীকে এত কষ্ট দিতে নেই; ওতে লক্ষ্মী নারাজ হ'ন।"

দাদা রাগ করিয়া বলিলেন, "লক্ষ্মী, লক্ষ্মী,—লক্ষ্মী রাজিই বা কবে হলেন। যা, যা, তোর সঙ্গে আর কথা কাটাকাটি করতে পারিনে। সাবধান, আর কখনও জিনিসপত্র এমন নষ্ট করিস্‌নে। জানিস্, আধপো চালের দাম একটি পয়সা; তা'হলে হলো গিয়ে—"

"না, না, তোমাকে আর হিসাব করতে হবে না; আমি এই নাকে-কানে খত দিচ্ছি, আর যদি কখন এমন কাজ করি।" এই বলিয়া নেত্য বাড়ির মধ্যে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল।

দাদা তখন কোমল স্বরে নেত্যকে ডাকিয়া বলিলেন "দেখ্ নেত্য, তোরই ভালোর জন্য বলি। আমি আর ক'দিন আছি। এখন যদি সব উড়িয়ে দিস্, তা'হলে আমি মরে গেলে কি করবি।

"তখন তোমার ঐ যকের ধন, ঐ লোহার সিন্দুক আগ্‌লে বসে থাক্‌ব। কথার শ্রী দেখ্!" নেত্য আর সেখানে দাঁড়াইল না, চাল-ভাজার বাটিটা সেখানে ফেলে চ'লে গেল! "এমন না হ'লে কি আর কপালে ওর এত দুঃখ হয়।" এই বলিয়া তিনি যেন কি ভাবিতে লাগিলেন। একটু পরেই বলিলেন, "যাক্, কাল একাদশী। মনে করেছিলাম, এবার থেকে নির্জলা

একাদশীই করব; দেখ্‌ছি হতভাগি তা করতে দিল না; কা'ল এই চালভাজা কয়টি দিয়েই একাদশী করা যাবে।"

আধ পোয়া চাউলের একটা গতি হওয়ায় ঠাণ্ডা মল্লিক আশ্বস্ত হইয়া বাটিটা অতি সন্তর্পণে বাক্সের মধ্যে এক পার্শ্বে তুলিয়া রাখিলেন।

নিজেদের সম্বন্ধে যাই করুন, পরের দেনা-পাওনা সম্বন্ধে ঠাণ্ডা মল্লিক খুব ঠিক; কখনও কাহারও এক পয়সা ঠকান না। যাহার নিকট যাহা পাওনা, তার একটি আধেলাও তিনি ছাড়িয়া দেন না; আবার তাঁহার কাছে অন্যে যাহা পাইবে, তাহা কড়াক্রান্তি হিসাব করিয়া তিনি পরিশোধ করেন; কোনদিন কাহারও নিকট সিকি পয়সা মাপের জন্য প্রার্থনা করেন না। সকলেই ঠাণ্ডা মল্লিককে ঘৃণা করে, নিন্দা করে; কিন্তু টাকার দরকার পড়িলে ঐ ঠাণ্ডা মল্লিকের অনেক টাকা;—কেহ অনুমান করে পঞ্চাশ হাজার, কেহ কেহ বলে ত্রিশ হাজার; গল্প-লেখক সর্বজ্ঞ হইলেও পরের ধনের কথা প্রকাশ করিবেন কেন?

এইভাবে তেরো-চোদ্দ বৎসর কাটিয়া গেল; ঠাণ্ডা মল্লিকের ধনার্জন-স্পৃহা বাড়িলও না, কমিলও না; লোকের নিন্দা, ঘৃণা, উপেক্ষা সমস্ত অম্লানবদনে হজম করিয়া ঠাণ্ডা মল্লিক তাঁহার লোহার সিন্দুক পূর্ণ করিতে লাগিলেন। বিগত বৎসর পূজার সময় একটা বিষম গোলযোগে তাঁহাকে একেবারে উলট্‌-পালট্‌ করিয়া গেল।

গ্রামের নিষ্কর্মা যুবকেরা অনেক দিন হইতেই মল্লিককে বিপন্ন করিবার জন্য নানা ফন্দি আঁটিয়া আসিতেছিল; কিন্তু মুরুব্বিদিগের ভয়ে তাহারা এতদিন কিছুই কার্যে পরিণত করিতে পারে নাই। পূজার সময় কর্তাদের অগোচরে, অতি গোপনে তাহারা এক কাজ করিয়া বসিল।

২

ষষ্ঠীর দিন অতি প্রত্যুষে অন্যান্য দিনের মত নেত্য যখন বাহিরের বৈঠকখানা-ঘর ঝাঁট দিতে আসিল, তখন সে সবিস্ময়ে দেখিল, বৈঠকখানার বারান্দায় একখানি অনতিবৃহৎ দুর্গাপ্রতিমা রহিয়াছে।

এই অভূতপূর্ব ব্যাপার দেখিয়া সে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল; কি করিবে, কি বলিবে, কিছুই স্থির করিতে পারিল না। একটু প্রকৃতিস্থ হইয়াই সে সেখান হইতে চিৎকার করিয়া বলিল, "ও দাদা, শিগ্‌গির এস, দেখে যাও, কে আমাদের সর্বনাশ করেছে গো!"

ঠাণ্ডা মল্লিকের তখন সবে নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে; উঠি-উঠি করিয়াও এ-পাশ ও-পাশ কারিতেছিলেন, এমন সময় ভগিনীর চিৎকার শুনিয়া তিনি তাড়াতাড়ি শয্যা ত্যাগ করিয়া বাহিরের দিকে দৌড়াইয়া আসিলেন। দাদাকে দেখিয়াই নেত্য বলিয়া উঠিল, "এই দেখ, পোড়াকপালির বেটারা আমাদের বারান্দায় মা-দুর্গাব প্রতিমা রেখে গিয়েছে।"

"বলিস্‌ কি নেত্য!" বলিয়া তিনি বারান্দায় নিকটে আসিয়া দেখিলেন সত্যসত্যই একখানি দুর্গাপ্রতিমা বৈঠকখানার বারান্দায় রহিয়াছে।

তখন তাঁহার ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হইল; যাহা মুখে আসিল তাহাই বলিয়া গ্রামের পাজি,

বজ্জাত, বদমায়েস লোকদিগের উপর অজস্রধারে ব্যাকরণ-বহির্ভূত ভাষায় গালাগালি করিতে লাগিলেন।

তাঁহার চিৎকার শুনিয়া প্রতিবেশী স্ত্রীপুরুষ বালক-বালিকায় বাহিরের অঙ্গন পরিপূর্ণ হইয়া গেল; বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা বলিতে লাগিলেন, "তাই ত, এ ত ভারি অন্যায় ব্যাপার। এমন কাজ কে করলে। ভদ্রলোককে এমন বিপদে ফেলা কিছুতেই উচিত হয় নাই।"

যুবকেরা বড় কেহ আসে নাই; যে দুই-একজন আসিয়াছিল, তাহারও অতি গম্ভীরভাবে বলিল, "এ কি অন্যায়! এমন ব্যাপার ত এ গ্রামে কখন দেখি নাই।"

মল্লিক তখন আরো ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "এ কাজ হতভাগা ছোঁড়াদের, একথা আমি তামা-তুলসী-গঙ্গাজল হাতে করে বলতে পারি। ঐ পুরুত-ঠাকুরের বাড়ি গাঁয়ের যে সব শালারা নাটকের আড্ডা ক'রেছে, এ সেই শালাদেরই কাজ। পাজিরা মনে করেছে বাড়ির ওপর ঠাকুব ফেলে গেলেই আমি অম্‌নি পুজো ক'রব। শীতল মল্লিক গলায় ছুরি দিয়ে মরবে, তবু পুজো করবে না। বেটারা এসে দেখে যাক্‌, এখনি তাদের ঠাকুরের কি দশা করি। নিয়ে আয় ত নেত্য, আমার লাঠিখানা।"

প্রতিবেশী বৃদ্ধ গদাধর লাহিড়ী এই সময় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই মল্লিক তাঁহার দিকে অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "এই দেখ ত গদা কাকা, কি অত্যাচার! তুমিই এর বিচার কর!"

লাহিড়ী মহাশয় অতি ধীরস্বরে বলিলেন, "তাই ত কাজটা অত্যন্তই গর্হিত হ'য়েছে; এ রকম অত্যাচার এ গ্রামে ত পূর্বে কখন দেখিনি।"

মল্লিক বলিয়া উঠিলেন, "আপনারাই ত ছোঁড়াদের আস্পর্ধা দিয়ে মাথায় তুলে দিয়েছেন; এ তাদেরই কাজ। হয় আপনারা এখনি প্রতিমা সরিয়ে নিয়ে যান, তা না হয় ত আমি রাস্তায়—"

"শীতল, রাগে জ্ঞানহারা হয়ো না। যারা এ কাজ ক'রেছে—গ্রামের দশজনকে ডেকে তার অনুসন্ধান ক'রে তাদের শাস্তি দিতে হবে; তার জন্যে তুমি ভেবো না। কিন্তু আজ ষষ্ঠী। যে কোরেই হোক, আজ তোমার বাড়িতে যখন মায়ের আগমন হয়েছে, তখন হিঁদু হয়ে আর কায়স্থের ছেলে হ'য়ে তুমি বাপু মাকে টেনে রাস্তায় ফেল্‌তে পারছ না। তাতে তোমার অধর্ম, গ্রামেরও অপযশ। আমরা দশজন থাকৃতে এমন অধর্মের কাজটা কেমন করে হ'তে দিই, তুমিই বল দেখি?"

"তা'হলে আপনি কি ক'রতে বলেন?"

"আমি বলি, যে করেই হোক কোন রকমে মায়ের পূজাটা তোমাকে ক'রতেই হবে।

"আপনি ত করতেই হবে বলে খালাস। পুজো করা কি ছেলেখেলা! বল্‌তে গেলে বৃষোৎসর্গের ব্যাপার। আমার সাধ্যি কি এ তাল আমি সামলাই;—সে আমি কিছুতেই পারব না। আমি গরিব মানুষ, কোনরকমে কায়ক্লেশে বেঁচে আছি। আমি কি করে পুজো করব? আপনার ইচ্ছে হয়, আপনার বাড়িতে প্রতিমাখানি নিয়ে যান, পুজো করুনগে।"

বৃদ্ধ লাহিড়ী মহাশয় হাসিয়া বলিলেন, "শীতল, মায়ের কাছে সেই প্রার্থনাই কর, আমার

যেন মায়ের পুজো করবার মত অবস্থা হয়, তখন তোমরা না বল্লেও আমি মাকে বাড়িতে আনবো। কিন্তু তুমি ত জান, আমার কি অবস্থা। আমি বলি কি, মহেশকে ডেকে আনি। সে তোমার পুরোহিত। যাতে কোন রকম ব্যয়বাহুল্য না করে মায়ের পুজোটা হ'য়ে যায়, তারই মত ব্যবস্থা করে দিই। এই ধর—একশ টাকা হলেই তিন দিনের পুজো অমনি নমো-নমো করে সেরে দেওয়া যেতে পারে।"

"এক—শ' টাকা! আপনি বলেন কি গদা কাকা? আমার কি একশ' টাকা খরচ করবার অবস্থা? আমি সোজা কথা বল্‌ছি, আমি এক পয়সাও খরচ করতে পারব না।"

"তা হলে যা ভাল বোঝ কর বাপু। আমরা তোমার হিতৈষী, এ ক্ষেত্রে যা সৎপরামর্শ, তাই তোমাকে দিলাম।" এই বলিয়া লাহিড়ী মহাশয় ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন।

মল্লিক এতক্ষণ উঠানে দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছিলেন; এখন বারান্দায় উঠিয়া প্রতিমার সম্মুখে চাপিয়া বসিলেন।

তখন নেত্য বলিল, "বসে-বসে ভাবলে কি হবে দাদা, যা হয় একটা ঠিক করে ফেল। ষষ্ঠীর দিন—মা যখন বাড়িব ওপর এসেছেন, তখন বিদায় কর কি বলে?"

"বিদায় করব না ত কি ঢাক-ঢোল বাজিযে পুজো ক'রতে হবে? সে আমার দ্বারা হচ্ছে না; থাক্ যেমন আছে ঠাকুর, তেমনি থাক্। আমি পুজোও কচ্ছিনে, ফেলেও দিচ্ছিনে। একশ' টাকা গাছের ফল আর কি! কুড়িয়ে আনলেই হল? সব বেটারাই ভাবে, আমার না জানি কত টাকাই আছে। যাক গে, আর বক্‌তে পারিনে"—এই বলিয়া মল্লিক বাড়ির মধ্যে চলিয়া গেলেন।

একটু পরেই পুরোহিত মহেশ ভট্টাচার্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বাড়ির মধ্যে যাইয়া দেখেন, মল্লিক মাথায় হাত দিয়া বসিয়া আছেন।

ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁহাব নিকটস্থ হইয়া বলিলেন, "ও মল্লিক-দা, বসে ভাব্‌লে কি হবে? একটা ব্যবস্থা ত কর্‌তে হবে।"

"যাও হে যাও, তোমার আর মুরুব্বিগিবি কর্‌তে হবে না। পুজো করতে হয় আমিই ক'রবো। তোমার কিছু কর্‌তে হবে না। তুমি নিজের পথ দেখ।"

"তুমি পুজো কর্‌বে? পুজো করবার তোমাব অধিকার কি?"

"অধিকার-টধিকার বুঝিনে ঠাকুর! যা করতে হয় আমি করব এখন? আমি বামুনও ডাক্‌ব না, পুরুতও ডাক্‌বও না।"

"তুমি পাগল হ'লে নাকি? এমন অনাছিষ্টি কথাও ত কখন শুনিনি। তুমি কায়েতের ছেলে, তুমি পুজো করবে কি? এখনো ত কলির শেষ হয় নি! পাগলের মত কথা বলো না; এখন যাতে যা হয়, এস তাই স্থির করি।"

"তোমার কিছু স্থির কবতে হবে না মহেশ।"

ভট্টাচার্য মহাশয় দেখিলেন, এখানে কথা বলা নিতান্তই নিরর্থক,—হয় ত বা অপমানই হইতে হইবে। এই ভাবিয়া তিনি নেত্যকে ডাকিয়া বলিলেন, "পুজো যদি না করাই স্থির হয়, তা'হলে প্রতিমাখানি রাস্তায় ফেলে দিয়ে আস্‌তে বোলো।"

"ফেলে দিই আর ঘরে তুলে রাখি, সে আমি বুঝব; সে পরামর্শ কারুর কাছে নিতে যাব না।"

৩

বেলা আট্‌টা পর্যন্ত মল্লিক চুপ করিয়া বসিয়া কি চিন্তা করিলেন। তাহার পর উঠিয়া ঘরের মধ্যে গেলেন। নেত্য তখন উঠানের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিল। সে বেশ শুনিতে পাইল, তাহার দাদা লোহার সিন্দুক খুলিলেন এবং একটু পরেই বন্ধ করিলেন।

তাহার পর চাদরখানি কোমরে জড়াইয়া, পুরাতন জীর্ণ ছাতাটি হাতে করিয়া বাহিরের উঠানে আসিয়া নেত্যকে বলিলেন "আমি ফুলতলার হাটে চল্লাম। আমার আস্‌তে দেরি হবে। তুই আমার জন্য বসে থাকিসনে; তোর মত দুটো রেঁধে খাস্‌; আমি জল-টল খেয়েই আস্‌ব। আর দেখ্‌, বিপিন আর পাঁচুকে পাঠিয়ে দিয়ে যাচ্ছি। যা যা করতে হবে, তাদের বলে যাচ্ছি। তারা যতক্ষণ না আসে, ততক্ষণ দেখিস্‌ যেন লক্ষ্মীছাড়া ছোঁড়ারা ঠাকুরখানি ভেঙে না ফেলে।"

"কি ঠিক করলে দাদা?"

"ঠিক আবার কি করবো—পুজোটুজো আমার দিয়ে হচ্ছে না।"

"তবে আর সাত-তাড়াতাড়ি ফুলতলায় যাওয়া কেন? খেয়ে-দেয়ে হাটে গেলেই হোতো!"

মল্লিক সে কথার কোন উত্তর না দিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেলেন।

একটু পরেই চারি-পাঁচজন মজুর আসিয়া নেত্যকে বলিল "দিদিঠাকরুন, কর্তা ব'লে গেলেন, বাইরের আর ভিতরের উঠোনের পাশে দক্ষিণ-মুখো করে একটা চালা বাঁধতে হবে। সেইখানেই না কি প্রতিমা রাখা হবে। ঘরে যে কখানা টিন আছে, তাই দিয়ে চালা বাঁধতে হবে।"

নেত্য তখন বুঝতে পারল, তাহার দাদা পুজোর জিনিসপত্র কিনবার জন্যই এত তাড়াতাড়ি ফুলতলায় গেলেন।

এ অঞ্চলের মধ্যে ফুলতলার বাজার ও হাট প্রসিদ্ধ—এত বড় বাজার, আর শনি মঙ্গলবারে এত বড় হাট সে অঞ্চলে আর কোথাও হয় না।

সে দিন মঙ্গলবার ষষ্ঠী—সেদিনের হাটে অনেক দ্রব্য আসিবে। অনেক দূর হইতে অনেক ক্রেতা এই মঙ্গলবারের হাটে পূজার জিনিসপত্র কিনিবে। নেত্যর মনে বড়ই আনন্দ হইল,—তাহার দাদার নিশ্চয়ই সুমতি হইয়াছে!

সে তখন মহা উৎসাহে কাজে লাগিয়া গেল;—কোথায় কি করিতে হইবে, তাহা মজুরদিগকে বলিয়া দিতে লাগিল,—মজুরেরা কিন্তু কর্তা যাহা বলিয়া গিয়াছিলেন, তাহাই করিতে আরম্ভ করিল।

এদিকে ঠাণ্ডা মল্লিক ফুলতলার হাটে যাইয়া দেখিলেন, তখন জিনিসপত্র আমদানি হইতে আরম্ভ হইয়াছে। তিনি প্রথমেই ময়রাদের দোকানে গেলেন। বাজারে সাত-আট-খানি ময়রার দোকান। যে দোকানে যত চিড়ে-মুড়কি ছিল, তাহা সমস্তই তিনি কিনিয়া ফেলিলেন এবং

দোকানদারদিগকে বলিলেন যে, পূজার তিনদিন যে যত নারিকেলের সন্দেশ দিতে পারিবে, তিনি তাহাই লইবেন।

দোকানদারেরা সকলেই মল্লিকের এই কার্যে অবাক হইয়া গেল। মল্লিক তাহাদিগকে বলিলেন "কি করি, শালারা আজ ষষ্ঠীর দিন প্রতিমা বাড়ির উপর ফেলে গেছে। মাকে পুজো করি আর না করি, না খাইয়ে ত রাখ্‌তে পারিনে; তাই চাট্‌টে চিড়ে-মুড়কি নিয়ে যাচ্ছি। তোমরা সবাই প্রসাদ পেতে যেও।"

কথাটা হাটময় রাষ্ট্র হইয়া গেল; সকলেই এই কথা শুনিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল।

মল্লিক তখন হাটে যত চিড়ে মুড়কি বাতাসা আমদানি হইল, সমস্ত কিনিয়া ফেলিলেন। পঁচিশ ত্রিশখানি গ্রামের পূজা-বাড়ির লোকেরা এই হাটে চিড়ে মুড়কি প্রভৃতি কিনিবে বলিযা আসিয়াছিল; তাহারা কেহই এক সের দ্রব্যও পাইল না। মল্লিক হাটে সমাগত গোয়ালাদিগকে দধির কথা বলিলেন; কিন্তু কেহই এত অল্প সময়ের মধ্যে দধি সববরাহ কবিতে সাহসী হইল না। মল্লিক বলিলেন "যাক্, বেটিকে এবার শুক্‌নো চিড়েই চিবুতে হবে—আমি কি করবো!"

চিড়া, মুড়কি, বাতাসা, পাতা, হাঁড়ি, কলসি প্রভৃতি কিনিয়া ঠাণ্ডা মল্লিক স্তূপাকার কবিযা ফেলিলেন। তাহার পর কযেকখানি গোরুর গাড়িতে সেই সকল দ্রব্য বোঝাই হইতে লাগিল। বোঝাই শেয হইলে গাড়িগুলি বাড়িতে পাঠাইয়া দিয়া, তিনি ময়রাদিগকে নারিকেলের সন্দেশের জন্য যাহার যাহা প্রয়োজন, সেই পরিমাণ টাকা বায়না করিলেন।

তাহার পর হাটের মধ্যে নিমে ঢুলির সহিত তাঁহার দেখা হইল। তিনি তাহাকে বলিলেন, "দেখ্ নিমচাঁদ, তোকে একটা কাজ করতে হবে। আজ এই হাটে এখনই ঢোল-সহরত দে, যে, কাল থেকে তিনদিন আমাব বাড়িতে মাযের পূজা হবে; সব দুঃখী-কাঙালির নিমন্ত্রণ। শুধু হাটেই সহরত দিলে হবে না; গাঁয়ে গাঁয়ে বলে দিতে হবে। আজ এই টাকাটা নে, তার পর তোর যা পাওনা হবে, পুজোর পর মিটিয়ে দেব। সব দুঃখী-কাঙালি—বুঝলি ত!"

বেলা প্রায আড়াইটার সময় মল্লিক হাঁপাইতে-হাঁপাইতে বাড়ি ফিরিয়া আসিলেন; দেখিলেন মজুবেরা চণ্ডীমণ্ডপ প্রস্তুত করিযা ফেলিয়াছে এবং বাহিরের প্রাঙ্গণ পবিষ্কার করিতেছে।

একটু পরেই জিনিসপত্র বোঝাই পাঁচখানা গাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইল। মল্লিক মজুরদিগকে বলিলেন, "ওরে, ও সব এখন থাক; আগে জিনিসগুলো নামিয়ে ঘরে তোল্।"

নেত্য তখন তাড়াতাড়ি আসিয়া জিনিসগুলি ঘরে তুলিতে-তুলিতে বলিল, "পুজোর জিনিষ কৈ দাদা!"

দাদা রুক্ষস্বরে বলিলেন, এই ত সব পুজোর জিনিস। আবার কি লাগ্‌বে?"

নেত্য বলিল "এ সব ত চিড়ে-মুড়কি? পুজোর জন্য যে সব জিনিস লাগবে, তা ত দেখ্‌ছি নে, সে সব বুঝি আস্‌ছে।"

"না, না, আর কিছু আস্‌বে না। দই ত পাওয়া গেল না; কেউ দিতে স্বীকার হোলোই না। আর নারিকেলের সন্দেশ,—তা কাল থেকে আস্‌তে আরম্ভ হবে। আমি সব ঠিক করে এসেছি। বেটির যেমন অদেষ্ট, শুকনো চিড়ে খাক্—আমি কি করব।"

"তা ত বুঝলাম দাদা, কিন্তু মায়ের পুজো ত করতে হবে? তার জিনিস কৈ?"

"যা—যা, আর বকাবকি করতে পারিনে। পুজো,—পুজো আবার কি? ও-সব ঘণ্টা-নাড়া আর ফুল বেলপাতা দেওয়া—সে হচ্চে না।"

নেত্য অবাক্ হইয়া দাদার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; এমন অনাসৃষ্টি ত সে কখনও দেখেও নাই, শোনেও নাই।

"বেলা যে তিন পহর হয়ে গেল, একটু তেল্ দে, স্নানটা সেরে নিই। আজ আর খাওয়া-দাওয়ার সময় নেই— এখনও আমার অনেক কাজ বাকি।"

৪

তাড়াতাড়ি স্নান শেষ করিয়া ঠাণ্ডা মল্লিক গ্রামের মধ্যে বাহির হইলেন। সকলে শুনিল যে, মল্লিক দুঃখী কাঙালি ভোজনের বিপুল আয়োজন করিতেছে।

মল্লিক প্রথমেই লাহিড়ী মহাশয়ের বাড়িতে গেলেন, এবং তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "কাকামশাই, এক্ রকম ত কোরে ফেল্‌লাম। তোমার ও পুজো-টুজো আমি করব না; সে তোমাকে যা বলেছি, তাই হবে। বেটি যখন বাড়িতে এসেছে, তখন না খাইয়ে ত আর রাখতে পারিনে, তাই দুটো চিড়ে-মুড়কির আয়োজন করেছি। সব কাঙাল-দুঃখীকে নিমন্ত্রণ করতে পাঠিয়েছি। মায়ের নাম করে তারা তিনদিন খাবে—সেই আমার পুজো। তোমরা সবাই গিয়ে দেখ্‌বে; যাতে মায়ের একটি কাঙাল ছেলেও না খেয়ে চলে যেতে না পারে, তাই তোমাকে দেখ্‌তে হবে কাকা!"

লাহিড়ী মহাশয় বলিলেন, "সে বেশ করেছ শীতল; কিন্তু শাস্ত্রানুসারে পূজা-অর্চনাও ত করা চাই; নইলে যে মহা অপরাধ হবে।"

"মায়ের কাঙাল ছেলে-মেয়েরা পেট ভরে খাবে, এতে যদি মায়ের পুজো না হয়, এতে যদি মা খুশি না হন,—তা হলে অমন মায়ের পুজো আমি করি নে!"

লাহিড়ী মহাশয় আর কথা বলিলেন না।

মল্লিক গ্রামের প্রত্যেকের বাড়িতে যাইয়া সকলের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। যথারীতি পূজা হইবে না শুনিয়া যদিও সকলেই আপত্তি করিলেন, কিন্তু মল্লিককে দৃঢ়সঙ্কল্প দেখিয়া সকলেই কাঙালি-ভোজনের সাহায্য করিতে সম্মত হইলেন।

সেদিন সন্ধ্যার সময় গ্রামের মুরুব্বিরা মল্লিকের বাড়ি আসিয়া মিলিত হইলেন। তাঁহারা পূজার ব্যবস্থা করিবার জন্য মল্লিককে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার সেই কথা—"আমি যা ব্যবস্থা করেছি, তাতে যদি মায়ের পূজা না হয়, না হবে।"

ইতঃপূর্বেই কয়েকজন লোকের সাহায্যে প্রতিমাকে নবনির্মিত মণ্ডপে আনিয়া রাখা হইয়াছিল। পূজার আসন দেওয়া হয় নাই, ডাকের সাজ দিয়া প্রতিমাকে সাজান হয় নাই, এমন

কি নবনির্মিত মণ্ডপে গোবর-ছড়া পর্যন্ত দেওয়া হয় নাই। মণ্ডপের মধ্যে প্রতিমার সম্মুখে একটি মৃৎপ্রদীপ মিট্‌মিট্‌ করিয়া জ্বলিতেছিল। তাহাতে অন্ধকার দূর না হইয়া আরও বেশি অন্ধকার বোধ হইতেছিল।

সকলেই মল্লিকের এই অদ্ভুত ব্যবস্থার কথা লইয়া আলোচনা-আন্দোলন করিতেছিল। এমন সময়ে একজন অপরিচিত ভিখারি আসিয়া মায়ের মণ্ডপের সম্মুখে দাঁড়াইয়া, একতারা বাজাইয়া গান ধরিল—

"শক্তিপূজা কথার কথা না!
যদি কথার কথা হোত, চিরদিন ভারত
শক্তি পূজে শক্তিহীন হোত না।
কেবল ডাকের গয়নায়, ঢাকের বাজনায়
শক্তিপূজা হয় না;
এক মনোবিল্বদলে, ভক্তি-গঙ্গাজলে,
শতদল দিলে হয় সাধনা। (হৃদয়)
দিলে আতপান্ন, কি মিষ্টান্ন, মা যে তাতে ভোলেন না;
কেবল জ্ঞান-দীপ জ্বেলে, একান্ত ধূপ দিলে
ব্রহ্মময়ী পূর্ণ করেন কামনা।
বনের মহিষ অজা, মায়ের বাছা, মা সে বলি লন না;
যদি বলি দিতে আশ, স্বার্থ কর নাশ,
বলিদান কর বিলাস-বাসনা।
কাঙাল কয় কাতরে, জাত-বিচারে শক্তিপূজা হয় না;
সকল 'বর্ণ' এক হ'য়ে, ডাক মা বলিয়ে,
নইলে মায়ের দয়া কভু হবে না।"*

সকলে নিস্তব্ধ হইয়া ভিখারির গান শুনিল।

গান শেষ হইলে মল্লিক বলিলেন, "শুন্‌লে তোমরা, মা নিজে গান শুনিয়ে গেলেন। আরে শীতল মল্লিক কি আর শাস্ত্র জানে না।"

তাহার পরই প্রতিমার সম্মুখে যাইয়া গললগ্নীকৃতবাসে করযোড়ে বলিলেন, "মা, তোর কাঙাল ছেলেবা তোর পুজো করবে, সেই পুজোই তোকে নিতে হবে। বল্‌ মা, পুরুতের পুজো নিবি—না কাঙাল ছেলেদেরই পুজো নিবি?" এই বলিয়া মল্লিক মায়ের মুখেব দিকে চাহিলেন।

কি দেখিলেন, তাহা তিনিই বলিতে পারেন। একটু পরেই বলিয়া উঠিলেন, "ওরে, আমি কি আর তা বুঝি নেই। ঐ দেখ্‌, মা হাস্‌ছেন। ঐ দেখ্‌, মা বল্‌চেন—শীতল, আমি তোর পুজোই নেব।" শীতল মায়ের সম্মুখে নতজানু হইয়া প্রণাম করিলেন।

পদটি কাঙাল হরিনাথেব রচনা।

৫

গ্রামের লোকেরা মনে করিয়াছিল, মল্লিক যাহাই বলুক না কেন, পূজা তাহাকে করিতেই হইবে। কিন্তু অপরাহ্নে মল্লিক যখন ফুলতলার হাট হইতে ফিরিয়া আসিলেন, তখন দ্রব্যাদি দেখিয়া সকলেই বুঝিতে পারিল, ঠাণ্ডা মল্লিকের যে কথা সেই কাজ।

তখন মহেশ ভট্টাচার্যের বাড়িতে থিয়েটারের যুবকদল মিলিত হইয়া ভট্টাচার্য মহাশয়ের পরামর্শ-মত অতি গোপনে সেই বাড়িতেই পূজার দ্রব্যাদি আহরণ করিতে লাগিল। থিয়েটারের ফণ্ড হইতে টাকা লইয়া যুবকদল হাটে, বাজারে, নানাদিকে ছুটিল; রাত্রি আটটা-নটার মধ্যেই পূজার দ্রব্যাদি যথাসম্ভব সংগৃহীত হইল। ঠাণ্ডা মল্লিক এ ব্যাপারে ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারিলেন না।

সপ্তমীর দিন প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিয়াই মল্লিক তাঁহার ভগিনীকে বলিলেন, "আমাকে এখনি একবার ফুলতলার বাজারে যেতে হচ্ছে। ময়রাদের বিশ্বাস নেই, তারা যদি সময়মত সন্দেশ না নিয়ে আসে, তা'হলে বড়ই মুশকিল হবে। আমি একবার গিয়ে দেখে আসি; এই ঘণ্টা-দুইয়ের মধ্যেই ফিরে আস্‌বো।"

এই বলিয়া মল্লিক ফুলতলায় চলিয়া গেলেন। তখন তাঁহার অনুপস্থিতির সুযোগ পাইয়া যুবকদল সপ্তমী-পূজার দ্রব্যাদি আনিয়া উপস্থিত করিল।

সাতটা বাজিতে না বাজিতেই পুরোহিত মহেশ ভট্টাচার্য সমস্ত দ্রব্য গোছাইয়া লইয়া পূজায় বসিলেন; ব্রাহ্মণ যুবকগণ আয়োজন কবিয়া দিতে লাগিল।

একটু পবেই ঠাণ্ডা মল্লিক বাড়িতে আসিয়া দেখেন, তাঁহার পুরোহিত মহেশ ভট্টাচার্য যথারীতি পূজা আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন; পূজার দ্রব্য-সম্ভারে চণ্ডীমণ্ডপ পূর্ণ রহিয়াছে। সামান্য একটুও ত্রুটি নাই।

এই দৃশ্য দেখিয়া মল্লিক স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন; তিনি যে কি বলিবেন, কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

সহসা তাঁহার দৃষ্টি দুর্গা-ঠাকুরানির দিকে আকৃষ্ট হইল; তিনি স্পষ্ট দেখিলেন, মা তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া হাস্য করিতেছেন। এমন মনোহর মূর্তি, এমন সহাস্য বদন তিনি ত জীবনে কখন দেখেন নাই! তাঁহার তখন মনে হইল, পূজার যে আয়োজন তিনি করিয়াছেন, তাহা হয় ত মায়ের মনের মত হয় নাই; তাঁহার মনে হইল পূর্বদিন তিনি মায়ের যে হাসিমুখ দেখিয়াছিলেন, সে-হাসিমুখ নহে—ভ্রূকুটি—তাঁহারই দৃষ্টিবিভ্রম হইয়াছিল।

আবার তিনি মায়ের মুখের দিকে চাহিলেন,—দেখিলেন সত্যসত্যই মায়ের বদন প্রফুল্ল।

গভীর মর্মবেদনায় তিনি চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "তবে কি মা, আমার পূজা তুই নিবি না? আমি যে তোর নাম করে, তোর গরিব-দুঃখী ছেলেদের পুজো ক'রতে চেয়েছিলাম, তাতে কি তোর পুজো হ'ত না মা? তবে কি তোর গরিব-দুঃখী ছেলেমেয়েদের আজ ফিরিয়ে দেব? তাদের কি ব'লব, তোরা সব চলে যা; তোদের পুজো করলে মায়ের পুজো হবে না?"

তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল; তিনি আর একটি কথাও বলিতে পারিলেন না; তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে সমস্ত জগৎ অন্ধকার হইয়া গেল;—ক্ষণকালের জন্য তাঁহার চেতনা লুপ্ত হইল।

পরক্ষণেই তাঁহার লুপ্ত-সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "মহেশ, ভাল ক'রে পুজো কর ভাই! মা বল্ছেন, তোমার পুজোও নেবেন, আমার পুজোও নেবেন। এই যে মা ব'লে গেলেন, 'ওরে, সবাই আমার ছেলে। যে যেভাবে আমাব পুজো করে, প্রাণ দিয়ে করলে আমি তাই গ্রহণ করি। মা দুর্গে, আমার কি শক্তি যে তোর পুজো করি মা! আমি ত তোকে একদিনও ডাকিনি; আমি ত তোকে একদিনও চাইনি। আমি চেয়েছি টাকা,—তা তুই আমাকে ঢের দিয়েছিস। এখন তোর জিনিস তুই বুঝে নে,—তোর টাকা, তোর পুজোয় তুই লাগা, আমায় ছুটি দে।" এই বলিযা শীতল মল্লিক বালকের মত কাঁদিয়া উঠিলেন, ভক্তের অশ্রুবিন্দুতে মহামায়ার মহাপূজা সুসম্পন্ন হইয়া গেল।

তাহার পর তিনদিন ধরিযা মল্লিকের অঙ্গনে শত-শত দীন-দরিদ্র, অনাথ-অনাথা মায়ের প্রসাদ পাইয়া কৃতার্থ হইয়া গেল। শীতল মল্লিক চারিদিকে দৌড়িয়া বেড়ান, আর এক-একবার চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে দাঁড়াইযা করজোড়ে বলেন,—

"জয় মা আনন্দময়ী"

–ভাবতবর্ষ ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১৩২৫-২৬, ১ম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা আশ্বিন।

মায়ের নাম*

বেশ ছিলাম—ত্রিশ টাকা বেতনে মহেশপুর ইংরেজি স্কুলে তৃতীয় শিক্ষক।

আমার বাড়ি নিশিগঞ্জ, মহেশপুর হইতে ৭ মাইল। শনিবার দুইটার সময় স্কুল বন্ধ হইলে বাড়ি যাইতাম, আবার সোমবার বাড়ি হইতেই আহারাদি করিয়া একবারে স্কুলে হাজির হইতাম; বাকি কয়টা দিন স্কুলের বোর্ডিংয়ে কাটাইয়া দিতাম। দরকার পড়িলে সপ্তাহের মধ্যে যে কোন দিনও বাড়ি যাইতাম।

বেতন ত্রিশ টাকা ছিল—'উপরি' প্রাপ্তিও কিছু ছিল। একজন অবস্থাপন্ন ভদ্রলোকের ছেলে আমাদের স্কুলে পড়িত এবং বোর্ডিংয়েই থাকিত। আমি তাহার পড়া বলিয়া দিতাম, তাহার তত্ত্বাবধান করিতাম,—ছেলেটির পিতা আমাকে মাসে দশটি টাকা দিতেন।

একরকম বাড়িতে থাকিয়াই মাসে চল্লিশ টাকা উপার্জন—এল্-এ ফেল ভদ্রলোকের পক্ষে যথেষ্ট; তাহার অধিক আশা করিতে গেলে মুরুব্বির জোর চাই। আমার তাহা ছিল না,—নিজের কুলে ত নয়ই, শ্বশুরকুলে বা মাতামহ-কুলেও তেমন কেহ ছিলেন না।,—সকলেই আমারই মত গরিব ;—আমারই মত কেহ বা স্কুলের মাস্টার, কেহ বা পণ্ডিত, কেহ বা সামান্য কেরানি।

আমার সংসারও বড় ছিল না ;—আমার মা, আমার স্ত্রী, আর আমি, এই তিনজন মাত্র। তারপর স্বর্গীয় পিতাঠাকুর যে সামান্য কয়েক বিঘা জমি রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহাতে নিতান্ত অজন্মা হইলেও সংবৎসরের চা'ল ডা'লের ভাবনা ভাবিতে হইত না। সুজন্মার বৎসরে যে ধান পাইতাম, সংসার-খরচ বাদে তাহা হইতে যাহা বাঁচিত, তাহা গোলায় তুলিয়া রাখিতাম,—বাবার নিষেধ ছিল, কখন যেন ধান বিক্রয় না করি।

এখন, আপনারা দশজনে বলুন ত, এই অবস্থায় আমার সন্তুষ্ট থাকা উচিত ছিল কি না? এক, বলিতে পারেন, ভবিষ্যতে ত সংসারে লোক বাড়িতে পারে—পুত্র-কন্যা হইতে পারে। আমার সে আশা নাই ;—আমার বয়স বত্রিশ, আমার স্ত্রীর বয়স ছাব্বিশ! এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে যখন আমরা সন্তানের মুখ দেখিতে পাইলাম না, তখন এ বংশ রক্ষার আর সম্ভাবনা নাই,—আমি শ্রীঅশ্বিনীকুমার বসুই এ বংশের শেষ প্রদীপ ;—এই প্রদীপ নিবিয়া গেলেই নিশিগঞ্জের স্বর্গীয় পিতৃদেব রামধন বসুর বংশ লোপ। ভবিষ্যতে স্কুল মাস্টারি করিবার জন্য এ-বংশে আর কেহই থাকিবে না। কি দুর্ভাগ্য!

কথাটা আবার জিজ্ঞাসা করি, মোটামুটি কিছুরই অভাব ছিল না, ভবিষ্যতে পরিবার

* গল্পটি মানসী ও মর্ম্মবাণী পত্রিকার ১৩২৫ এর জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় 'গৃহশিক্ষক' নামে প্রকাশিত হয়েছিল।

বৃদ্ধিরও সম্ভাবনা ছিল না, হঠাৎ কোন বিপদ আপদ কি ব্যাধি পীড়া হইলে যাহা ব্যয় হইতে পারে, সে জন্য মাস্টারির এই বেতন হইতেও, যখনকার কথা বলিতেছি, তখন ছয় শত টাকা ডাকঘরে সেবিংস্ ব্যাঙ্কে জমা ছিল এবং মাসে মাসে পাঁচ সাত টাকা জমা হইতেছে;—এ অবস্থাতেও কেন আমার অধিক উপার্জনের লোভ হইল? মনস্তত্ত্বের এই কথাটা কেহ আমাকে বুঝাইয়া দিতে পারেন?

এই যে আকাঙ্ক্ষা, এই যে অতৃপ্তি, এই যে কি জানি কি—অর্থাৎ এই যে শয়তান, এ-ই মানুষকে সুখে থাকিতে দেয় না, শান্তিতে বাস করিতে দেয় না। তাহার ফলে মানুষের কি দুর্গতি হয়, কি বিপদ হয়, কি সর্বনাশ হয়, অথবা যাহার অদৃষ্টের জোর আছে, তাহার সর্বনাশের সূচনা মাত্র হইয়াই কিরূপে তাহার চৈতন্যোদয় হয়,—সেই কঠোর অভিজ্ঞতার কথাই আজ লিপিবদ্ধ করিব। এই হতভাগ্যের জীবনে সেই অতৃপ্ত শয়তানের খেলা দেখিতে পাইবেন।

২

মহেশপুর স্কুলের যিনি সেক্রেটারি, তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত হরিহর চট্টোপাধ্যায়। বড় জমিদার, আয় লাখ টাকার উপর। পাড়াগাঁয়ে লাখ টাকা আয়ের জমিদার রাজার হালে থাকে, হরিহর বাবুর খুব নামডাক ; প্রতাপও কম নয়;—তবে এখন এই সুশাসিত ইংরেজের মুল্লুকে তাঁহার তাঁহার প্রতাপে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খায় না,—জমিদারদের আর সে দিন নাই—পিনাল কোড সব সমান করিয়া দিয়াছে। তবে টাকার কল্যাণে জমিদার মহাশয়েরা এখনও পল্লিগ্রামে একটু-আধটুকু বাদশাগিরি করিয়া থাকেন; আমাদের স্কুলের সেক্রেটারি মহাশয়ও করেন,—তাঁহার কর্মচারীরাও কিঞ্চিৎ মেজাজ দেখাইয়া থাকেন, তাহাতেই গরিব প্রজাদের হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়।

আমাদের হেডমাস্টার ও হেডপণ্ডিত মহাশয়েরা হরিহরবাবুর যথেষ্ট মন যোগাইয়া চলেন,—প্রতিদিন জমিদার মহাশয়ের খাস দরবারে হাজিরা দেন; একজন বিশ্ববিদ্যালযের এম-এ পরীক্ষোত্তীর্ণ, আর এক জন কাব্য, দর্শন ও বেদান্ত এই ত্রি-তীর্থ; তাঁহারা যে জমিদার বাবুর মোসাহেবি করেন, এমন কথা থার্ড মাস্টার হইয়া কেমন করিয়া বলিব? আমি কিন্তু ঐটি পারিতাম না—কোন প্রয়োজনও বোধ করিতাম না—মহেশপুর স্কুলের তৃতীয় শিক্ষকের বেতন ত্রিশ টাকার একপয়সাও বেশি হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। তবে আর কেন হাজিরা দিয়া মরি?

হরিহর বাবুর বয়স প্রায় পঞ্চাশ—অনুগত ব্যক্তিরা বলেন চল্লিশ কি বিয়াল্লিশ। এত কম যাঁহার বয়স, এবং লাখ টাকা যাঁহার জমিদারির আয়, তাঁহার প্রথমা পত্নীর ৺গঙ্গালাভ হইলে এই বছর দুই পূর্বে যে তিনি একটি ষোড়শীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে নিন্দার কথা মোটেই নাই,—তা থাকুক না প্রথম পক্ষের একটি পুত্র, হউক না তাহার বয়স এগার বৎসর। তবে গত কয়েক বৎসর হইতে তাঁহার শরীর একেবারে 'ব্যাধিমন্দিরম্', হইয়াছিল—এই যা

কথা; আর তাঁহার চেহারাটাও তেমন ভাল ছিল না। কিন্তু তাহাতে কি বড়মানুষের বিবাহ বন্ধ থাকে? এই বিষম কন্যাদায়ের দিনে, হরিহর বাবুর মত রোগে জীর্ণ, পঞ্চাশ বৎসর বয়সের বড়মানুষের হাতে সুন্দরী, যোড়শী কন্যাকে বলি দিবার লোক বাংলা দেশে যথেষ্ট—বহুত আছে। তুমি নবীন যুবক 'হরিবোল' (horrible) বলিলে চলিবে কেন?

সে কথা থাকুক। একদিন স্কুল হইতে আসিয়া বোর্ডিংয়ে বসিয়া আছি, এমন সময়ে শুনিলাম হরিহর বাবুর পুত্র অনিলকুমারের যিনি গৃহশিক্ষক ছিলেন, তাঁহার সেই দিনই চাকুরি গিয়াছে এবং সেই দিনই তাঁহাকে মহেশপুর ত্যাগ করিয়া যাওয়ার আদেশ প্রচারিত হওয়ায় ভদ্রলোক কাহারও সহিত দেখা করিয়াও যাইতে পারেন নাই; এবং এমন অকস্মাৎ, কি অপরাধে তাঁহার পাঁচ বৎসরের চাকুরিটি গেল, তাহাও বলিয়া যাইতে পারেন নাই।

এ অবস্থায় যাহা হয়, তাহাই হইল,—নানা জনে নানা কথা বলিতে লাগিল; সে সকল জনরব আর বলিয়া কাজ নাই। বড়মানুষের ঘরের কথা, আমরা সামান্য লোক কেমন করিয়া জানিব; এবং যে সমস্ত জনরব প্রচারিত হইল, তাহার সত্য-মিথ্যাই বা কেমন করিয়া নির্ণয় করিব।

তাহার পরই বোর্ডিংযের কোন কোন ছাত্র আসিয়া বলিল যে, এইবার হেডমাস্টাব মহাশয়ের অদৃষ্ট খুলিল, তিনিই না কি ১২৫্ টাকা বেতনে অনিলকুমারের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হইবেন।

আর একজন সে কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিল যে, অন্য ব্যবস্থা হইবে; হেডমাস্টার সকালে ও রাত্রে পড়াইয়া আসিবেন; তাহার জন্য ৫০্ টাকা পাইবেন, আর পণ্ডিত মহাশয় বিকালে পড়াইবেন, ৩০্ টাকা পাইবেন; বাড়িতে আর মাস্টার রাখা হইবে না। এই রকম কত কথাই যে শুনিতে লাগিলাম, তাহা আর কি বলিব।

৩

সন্ধ্যার পর জমিদার-বাড়ি হইতে একজন ভৃত্য আসিয়া আমাকে সংবাদ দিল যে, হুজুর আমাকে তলব করিযাছেন; এখনই যাইতে হইবে।

এই অসময়ে আমার তলব কেন? হয় ত ভৃত্য ভুল করিয়াছে, এই মনে করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে সে বলিল, "না, আপনাকেই এখনই ডাকিয়া লইয়া যাইবার হুকুম হইয়াছে।"

আমি ত অবাক্ । আমার তলব ! এত দিনের মাস্টারিটা খসিবে না কি? কি জানি, অদৃষ্টে কি আছে !

দরবারে আর কে কে আছেন, জিজ্ঞাসা করায ভৃত্য বলিল, "হুজুর দরবার-ঘরে বসেন নাই, তিনি শয়ন-ঘরে আছেন। শরীর ভাল নাই, তাই যাঁহারা আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে বিদায় করিয়া দিয়াছেন। একেলাই আছেন।"

আমি আরও বিস্মিত হইলাম! একেবারে শয়ন-গৃহে আমার তলব! অসুস্থ শরীরে

আর কাহারও সহিত দেখা করেন নাই, বাছিয়া বাছিয়া লোক পাইলেন এই অশ্বিনীকুমার বসু!

দুর্গানাম স্মরণ করিয়া যাত্রা করিলাম। জমিদার-বাড়িতে উপস্থিত হইলে, ভৃত্যটি আমাকে একটা ঘরে বসাইয়া হরিহর বাবুকে সংবাদ দিতে গেল; এবং একটু পরেই আসিয়া আমাকে তাহার অনুবর্তী হইতে বলিল। হরিহর বাবুর বৈঠকখানায় মাঝে মাঝে আসিতে হইয়াছে; কিন্তু আজ আমাকে যে দিকে যাইতে হইল, সে দিকে কোন দিন যাই নাই; সেটি অন্দর মহল কি .বাহিরমহল, তাহাও জানি না।

দুই তিনটি ঘর পার হইয়া আমরা একটি ঘরের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। সে ঘরের দ্বার বন্ধ ছিল না, সম্মুখে একটা পর্দা ছিল। পর্দার বাহির হইতেই ভৃত্য বলিল, "হুজুর, মাস্টার বাবু এসেছেন।

গম্ভীর স্বরে উত্তর হইল, "ভিতরে আস্‌তে বল।" সেটি শয়নঘর কি বসিবার ঘর, বুঝিতে না পারিয়া আমি আমার ছিন্ন-পাদুকা বাহিরে রাখিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

দেখিলাম, একখানি পালঙ্কের উপর হরিহর বাবু শয়ন করিয়া আছেন। আমাকে দেখিয়াই তিনি বলিলেন, "এস অশ্বিনী, ভাল আছ ত?"

আমি পালঙ্কের নিকট যাইয়া তাঁহার পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিয়া বলিলাম, "আজ্ঞে ভাল আছি। আপনার শরীর কি অসুস্থ হইয়াছে?"

হরিহর বাবু বলিলেন, "হ্যাঁ, আজ শরীরটা তেমন ভাল নেই। তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন? ঐ চেয়ারখানা টেনে নিয়ে এই দিকে এসে বোসো।"

আমি বিনীতভাবে বলিলাম, "আমি নীচেই বসি।"

তিনি বলিলেন, "না, না, আমার শিয়রের কাছে চেয়ার টেনে বোসো। তোমার সঙ্গে বিশেষ কথা আছে।" আমার সঙ্গে বিশেষ কথা ! ব্যাপার কি?

আমি তখন একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া হরিহর বাবুর শিয়রের নিকট বসিলাম।

তিনি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "দেখ অশ্বিনী, আমি খোকার মাস্টারকে বিদায় করে দিয়েছি। লোকটা লেখাপড়ায় বেশ ছিল; কিন্তু এদানিক তার যেন স্বভাবটা কেমন বোধ হচ্ছিল। বল্‌তে গেলে এক রকম অন্দরেই থাক্‌তে হয়, আব ছেলের মাস্টার; তার উপর কোন বকম সন্দেহ হ'লে তাকে কি আর রাখা যায়। কি বল?"

আমি ধীরভাবে বলিলাম, "সে ত ঠিক কথাই।"

হরিহর বাবু বলিলেন, "তেমন কিছু নয়। এই আমার শ্বশুরবাড়ির গাঁ থেকে যে ঝিটাকে এনেছি, মাস্টারটা তার সঙ্গে তামাশা করত। আমার স্ত্রী তাই দেখে কা'ল আমাকে বল্‌লেন এবং মাস্টারকে বিদায় করে দিতে বললেন। ঠিক কথাই ত! কি বল অশ্বিনী!"

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। তাহার পর হরিহর বাবু বলিলেন, "দেখ, তুমি যদিও সর্বদা আমার এখানে এস না, তবুও তোমার উপর আমার দৃষ্টি বরাবরই আছে। তোমার ঐ হেডমাস্টারই বল, আর সেকেন মাস্টারই বল, আর পণ্ডিত মশাই-ই বল, সব খোসামুদের দল। তাই যদি না বুঝব, তা হ'লে এত বড় জমিদারিটা চালাই কি করে? কি বল অশ্বিনী!

তা দেখ, বি-এ, এম-এ-ই হোক, আব বিদ্যাভূষণ তর্কালঙ্কারই হোক—একই স্বভাব। আর—আর লেখা-পড়া—বিদ্যার কথা যদি বল, তা হলে তোমাকে বল্‌ছি, ও সব পাস-ফাস কর্‌লেই যে বেশী বিদ্যা হয় তা আমি মানিনে। এই ধর না তুমি; তুমি এল-এ ফেল বটে, কিন্তু অনেক বি-একে পড়িয়ে দিতে পার। কি বল?"

আমি আব কি বলব; আমি শুধু ভাবিতে লাগিলাম, এ সূচনার উদ্দেশ্য কি? এত লোক থাকিতে তবে কি আমাকেই ছেলেব মাস্টার করা হইবে? সত্য কথা বলিতে কি, এ কথাটা ভাবিয়াও মনে আনন্দ হইল।

হরিহর বাবু একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "তা দেখ অশ্বিনী, আমি ভেবে দেখলাম, কোথা থেকে কোন্ অজানা অচেনা লোককে শুধু মার্কা দেখে আনব, তার চাইতে জানা চেনা লোককেই মাস্টারিটা দিই। তাই তোমাকে ডেকেছি। ছেলের মায়েরও তাই ইচ্ছা। তোমায় বলব কি অশ্বিনী, আমাব স্ত্রীব একেবাবে ঐ ছেলে তাঁর প্রাণ; কারো বলবার যো নেই যে নেই যে ওঁর গর্ভজাত ছেলে নয। যাক্ সে কথা। দেখ, তোমাকেই এ ভার নিতে হচ্চে; স্কুলে আর একজন মাস্টাব দেখে নেওযা যাবে। তুমি ত স্কুলে ৩০্ টাকা মাইনে পাচ্ছ; আমবা তোমাকে একেবারে তার ডবল ৬০্ টাকা দেব। তা ছাড়া খাওয়া-দাওয়া, ধোবা নাপিত, সময সময কাপড়-চোপড়—সব আমাদেব জিম্মা। কি বল অশ্বিনী?

আমি বলিলাম, "আমি স্কুলে ৩০্ টাকা পাই, আর একটা ছেলে পড়িয়ে দশটাকা পাই। তার পর—"

আমার কথাব বাধা দিযা হবিহব বাবু বলিলেন, "মোটে কুড়ি টাকা বাড়ছে বলে' তোমার আপত্তি ত। যাক্, সে মাস্টারকে যে ৭৫্ টাকা দিতাম, তোমাকেও তাই দেব। তারপর ছেলেটাকে যদি মানুষ করতে পার, চিরদিন এ সংসারেই কেটে যাবে। কি বল?"

আমি বলিলাম, "আমাব বাড়িতে কেউ নেই; আমাকে প্রতি শনিবারে বাড়ি যেতে হয়, আর সোমবারে আস্‌তে হয।"

হরিহর বাবু বলিলেন, "সে একটা কথা বটে। তা তুমি একটু বোসো অশ্বিনী, আমি অন্দর থেকে আসছি, এখনই আস্‌ব।" এই বলিয়া হরিহর বাবু পালঙ্ক হইতে নামিয়া অন্দরে চলিয়া গেলেন।

৭৫্ টাকা বেতন। কোন খবচপত্রই নাই—৭৫্ টী টাকাই ঘরে যাইবে ! এ কি কম প্রলোভন! হিসাব করিলে যে, অন্যস্থানের একশত টাকা বেতনের সমান ! এ কি সামান্য কথা। আমি এল-এ ফেল—মহেশপুব স্কুলের থার্ড মাস্টার—ত্রিশ টাকা পাই, আর যে দশ টাকা পাই, সে আজ আছে কাল নাই। কোথায় ত্রিশ টাকা আর কোথায় নিখরচা ৭৫্ টাকা। ইহার আর বিবেচনার কিছুই নাই—কিচ্ছু না। কত বি-এ এম-এ এই চাকরির খোঁজ পাইলে একবাশি সার্টিফিকেট আনিযা ধবনা দিত; আর আমাকে ডাকিয়া আনিয়া চাকুরি—ইহারই নাম অদৃষ্ট!

আমি নিজেকে মহা ভাগ্যবান মনে করিলাম। হায় প্রলোভন, হায় শয়তান, এমনই করিয়াই মানুষ বিপন্ন হয় ! ভগবান, আমাদের মত অমানুষকে যদি একটু ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি

দিতে প্রভু, তাহা হইলে, আর কিছু না হউক, অনেক লাঞ্ছনার হাত হইতে আমরা মুক্তি পাইতাম!

প্রায় দশ মিনিট পরে হরিহর বাবু ফিরিয়া আসিলেন; তিনি বলিলেন, "দেখ অশ্বিনী, তোমাকে যখন এক রকম ঘরের ছেলের মতই থাক্‌তে হবে, তখন এ সব বিষয়ে গৃহিণীর পরামর্শ নেওয়াই দরকার। বিশেষ তাঁর বয়স কম হ'লেও খুব বুদ্ধিমতী। তুমি শুন্‌লে আশ্চর্য হবে অশ্বিনী, তিনি যে পরামর্শ দেন, তেমন পরামর্শ খুব পাকা লোকও দিতে পারে না। তা দেখ, উনি বল্‌লেন যে, তোমার যখন বাড়িতে কেউ নেই, আর জমাজমিটাও আছে, তখন তুমি শনিবারে শেষ বেলায় বাড়ি যেও; কিন্তু সোমবারে খুব ভোবে চ'লে এস, যেন সোমবারের সকালের পড়াটা কামাই না হয়; কোনও বাব বা রবিবারের বিকালেই এলে। কেমন, এতে সম্মত ত? হেড্‌মাস্টাবেব কথাও ভেবেছিলাম; কিন্তু উনি বল্‌লেন, ওসব লোক দিয়ে ছেলে পড়ান হয় না, ওরা স্কুলেই পড়াতে পারে। তুমি জানাশুনো লোক, বাড়িতে একেবারে ছেলের মত থাক্‌বে; যখন যা অসুবিধা বোধ হবে, অন্দরে বলে পাঠালেই তখনই তা ঠিক হয়ে যাবে। কি বল?"

আমি বলিলাম, "আপনি পিতার তুল্য; আপনি যখন আদেশ করছেন তখন আমার আর আপত্তি কি! তবে বাড়িতে মাকে কথাটা জিজ্ঞাসা করা দরকার।"

হরিহর বাবু বলিলেন, ' তা বেশ ত; কা'ল সকাল সকাল স্কুল থেকে বেরিয়ে বাড়ি যেও, আবার পরশু দিন এসেই একেবারে এখানে কাজে হাজির হবে।"

আমি বলিলাম, "মায়ের এতে আপত্তি হবে না; তবুও কোন কাজ করতে গেলে তাঁকে জানাতে হয়, তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে আস্‌তে হয়।"

হরিহর বাবু বলিলেন, "তা বটেই ত! আজ-কালকার দিনে এমন কথা কোন ছেলে বড় একটা বলে না। তোমার কথায় আমি বড় সন্তুষ্ট হ'লাম অশ্বিনী! আর পাশেব ঘব থেকে আমার স্ত্রীও সব কথা শুনছেন; তিনিও নিশ্চয়ই খুব খুশি হয়েছেন। তা তুমি এখন এস, অনেক রাত হয়ে গেল। ওরে তিনু, একটা লণ্ঠন নিয়ে মাস্টার বাবুকে বোর্ডিংয়ে রেখে আয়গে ত! আমি অ হ'লে ভিতরে যাই।"

এই বলিয়া হরিহর বাবু পাশের ঘরে গেলেন এবং তখনই বাহির হইয়া আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "যেও না অশ্বিনী, একটু বোসো। এই দেখ ত, তুমি ভদ্রলোকের ছেলে এতক্ষণ বসে থাক্‌লে, এখন গিয়ে হয় ত ঠাণ্ডা ভাত খাবে। তাই উনি বল্‌লেন যে, তোমাকে একটু জল খাইয়ে দিতে। দেখেছ অশ্বিনী, ওঁর কেমন বুদ্ধি-বিবেচনা! কথাটা আমার মোটেই মনে হয় নি।"—তিনি যেন খুব আত্মপ্রসাদ অনুভব করিলেন।

আমি বলিলাম, "জল খাওয়ার দরকার হবে না। আপনাদেরই ত খাচ্ছি; এর পরে ত দিনরাত্রিই আছি। রাতও বেশী হয় নি, বোধ হয় ন'টা; আমাদের ন'টার পরই খাওয়া হয়।"

হরিহর বাবু বলিলেন, "আরে তা কি হয়। দেরী হবে না। উনি পূর্বেই সব ঠিক করে রেখেছিলেন; আমারই মাথায় আসে নি; হাঃ হাঃ হাঃ।"

কি করি, জল খাইতে হইল। পাশের ঘর হইতে গৃহিণী যে দেখিতেছেন, তাহা অলঙ্কারের ধ্বনিতেই বুঝিতে পারিলাম।

বোর্ডিংয়ে চলিয়া আসিলাম। অতি-ভক্তি যে চোরের লক্ষণ, ৭৫ টাকার প্রলোভনে তখন সে কথা ভুলিয়া গেলাম।

পথে আসিতে-আসিতে নিজের সৌভাগ্যে গর্ব অনুভব করিতে লাগিলাম; আর মনে হইতে লাগিল, হরিহর বাবুর কথা;—বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা যে কি, তাহাই ভাবিয়া বেশ আনন্দ অনুভব করিলাম। কিন্তু আমার দিক হইতেও যে কথাটা ভাবা দরকার, তাহা ঐ ৭৫ টাকা আমাকে ভুলাইয়া দিল।

৪

যথাসময়ে নূতন চাকরিতে উপস্থিত হইলাম। অনিল ছেলে ভাল, তাহা পূর্ব হইতেই জানিতাম, কারণ সে স্কুলে পড়ে। এবার তাহার পঞ্চম শ্রেণী; পড়াশুনায় খুব মনোযোগ; বড়-মানুষের ছেলেদের যে সব দোষ থাকে; অনিলের তাহা কিছুই নাই। সুতরাং তাহার পড়াশুনার জন্য আমাকে কোন বেগই পাইতে হইল না। আমাকে শিক্ষক রূপে পাইয়া সে খুবই আনন্দিত হইল। আমিও নিশ্চিন্ত হইলাম।

পাঁচ সাত দিন বেশ কাটিয়া গেল। তাহার পর একদিন যখন অনিল স্কুলে গিয়াছে, আমি কি একখানি বই পড়িতেছি, সেই সময় একটি দাসী একখানি কাগজে জড়ান কি হাতে করিয়া আমার ঘরে প্রবেশ করিল। এ কয়দিন কিন্তু কোন ঝি-দাসী আমাদের দিকে আসে নাই। অনিলের পড়ার ও আমার থাকিবার জন্য যে কয়েকটি ঘর নির্দিষ্ট ছিল, তাহা অন্দরের সংলগ্ন হইলেও, অন্দরের দাসীরা কেহ আমাদের দিকে আসিত না, আসিবার প্রয়োজনও ছিল না।

দাসীকে দেখিয়া আমি বলিলাম, "এখানে কি চাই?"

দাসী একটু মুচকি হাসিয়া বলিল, "মা আপনার জন্য এই কাপড় পাঠিয়ে দিলেন।"

আমি বলিলাম "আমার ত কাপড় আছে; যখন অভাব হবে, তখন আমিই কিনে নেব। তুমি কাপড় ফিরিয়ে নিয়ে যাও, আমার দরকার নেই।"

দাসী বলিল, "মা বলেছেন, আপনি যে কাপড় জামা ব্যবহার করেন, তাতে খোকা বাবুর মাস্টারের মানায় না; কাপড়-চোপড় একটু ভাল চাই। তাই তিনি পাঠিয়ে দিয়েছেন। আপনি না নিলে তিনি বড়ই দুঃখিত হবেন।"

গৃহিণী যে আমার প্রকৃত মনিব, তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম; সুতরাং তাঁহার অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিলাম না; বলিলাম, "তা হলে ঐ টেবিলের উপর রেখে যাও। কর্ত্রী ঠাকুরানিকে বোলো, আমার এ সব কিছুরই দরকার নেই।"

দাসী হাসিয়া বলিল, "আপনার দরকার কি, তা তিনি আপনার চাইতে বেশি বোঝেন। আপানার যাতে কোন রকম অসুবিধা না হয়, তার জন্য সকলকে সাবধান করে দিয়েছেন"—বলিয়া দাসী চলিয়া গেল।

দাসীর কথা কয়টি আমার ভাল লাগিল না; কাপড় দেওয়াও আমি ঠিক মনে করিলাম না। আমি ছেলের মাস্টার, মাস্টারি করিব; সরকারের যে বকম ব্যবস্থা আছে, তাহাই আমার উপর প্রযুক্ত হইবে। আমার অসুবিধার জন্য এত বড় জমিদারের গৃহিণীর এ প্রকার আগ্রহের ত কোনই প্রয়োজন অনুভব করিলাম না। তবে পূর্বের মাস্টারের হঠাৎ বিদায় দান সম্বন্ধে বাহিরের কু-লোকে যে কটাক্ষ করিয়াছিল, তাহার কি কিছু ভিত্তি আছে? ছিঃ, অমন কথা মনেও করিতে নাই। কর্ত্রী ঠাকুরানি গরিবের ঘরের মেয়ে, গরিবের দুঃখ খুব বোঝেন; আমাকে দরিদ্র মনে করিয়া দয়া-পরবশ হইয়াই তিনি আমার সুবিধা-অসুবিধার খোঁজ লইয়াছে এবং কাপড় পাঠাইয়াছেন। সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহিলা সম্বন্ধে এমন অন্যায় কথা, এমন পাপের কথা মনে করিলেও অধর্ম হয়। মনকে তাহাই বুঝাইতে লাগিলাম; কিন্তু—!

৫

পরদিন দ্বিপ্রহরে আবার সেই দাসী আসিয়া উপস্থিত। সে বলিল "মাস্টার মশাই, মা জান্‌তে পাঠালেন, আপনার ত কোন অসুবিধা হচ্চে না?"

আমি বলিলাম, "কিচ্ছু না। তাঁকে বোলো, আমি গরিব মানুষ, এখানে রাজার হালে আছি; আমার কোন অসুবিধাই নেই।"

ঝি হাসিয়া বলিল, "আমিও তা সেই কথাই বলি। তিনি কি তা শোনেন ! তিনি সারা দুপুর শুধুই বলেন 'যা দেখে আয় মাস্টার কি করছেন' 'যা শুনে আর তাঁর ত অসুবিধা হচ্চে না'। আমি কি আর সব বার আসি? এদিক-ওদিক ঘুরে গিয়ে যা হয় একটা বলি। তা যা বলুন মাস্টার মশাই, আপনার অদেষ্ট ভাল, মায়ের নজরে যখন পড়েছেন, তখন বুঝে চল্‌তে পারলে আপনাকে পায় কে? কর্তা ত মায়ের হাতের মধ্যে। আর বুড়া-মানুষের কি চোখ আছে? মা তাঁকে যে দিক ফেরাবেন, তিনি সেই দিকেই ফিরবেন। যাই, তিনি হয় ত ঐ জানালার ধারেই বসে আছেন।"

ঝি চলিয়া গেল। আমার মাথায় যেন বজ্রপাত হইল! তাহা হইলে যাহা কা'ল ভাবিয়াছি, তাহা ত মিথ্যা নহে। এখন উপায়! হায় আমার দুর্ভাগ্য! ৭৫৲ টাকার লোভে এ কি করিলাম! যে দিন হরিহর বাবু আমাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, সেই দিনের সব কথা আমার মনে হইল। সেই দিনই ত এ সকল কথা আমার বোঝা উচিত ছিল! কিন্তু তখন উন্নতির আশায় আমি অন্ধ হইযাছিলাম; সম্ভ্রান্ত গৃহের মহিলা সম্বন্ধে কোন অন্যায় কথা ত তখন আমার মনেই আসে নাই। এই বত্রিশ বৎসর বয়সের মধ্যে এমন কথা ত কখন শুনি নাই। বইয়ে পড়িয়াছি বটে, কিন্তু তাহা কল্পনা বলিয়াই মনে করিয়াছি। সত্য-সত্যই যে ভদ্র-মহিলা এমন হইতে পাবে, তাহা আমি কোন দিনই ভাবি নাই। ছিঃ, এ সব কথা মনে করিলেও যে মন কলুষিত হয়! কিন্তু এখন উপায় কি?

আমি আর স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিলাম না, আমার মনের ভিতর তখন আগুন জ্বলিতেছিল। আমি উঠিয়া ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম।

হঠাৎ আমার দৃষ্টি অন্দরের দিকে পড়িল। দেখিলাম অন্দরের দিকে একটা জানালার সম্মুখে এক অপূর্ব সুন্দরী দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার দৃষ্টি তখন অন্য দিকে নিবদ্ধ ছিল। কি অনুপম রূপ, কি মোহিনী প্রতিমা ! মানুষের যে এমন রূপ থাকে, সে রূপে যে এত মাধুর্য থাকে, তাহা ত আমি কোন দিন দেখি নাই। হাঁ, রূপ বটে ! দেখিবার বস্তু বটে !

আমি তখন আত্মবিস্মৃত হইলাম; যেখানে দাঁড়াইয়া ছিলাম, সেখান হইতে নড়িতে পারিলাম না। সেই স্থানে দাঁড়াইয়া সেই অতুলনীয় রূপরাশি দেখিতে লাগিলাম।

হঠাৎ তিনি মুখ ফিরাইলেন,—চারিচক্ষু সম্মিলিত হইল। তাহার পরই একটু হাসিয়া, তিনি জানালার অন্তরালে গেলেন। আমার তখন সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল।

আমি আর সেখানে দাঁড়াইলাম না। সরিয়া আসিয়া একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িলাম। আমার চক্ষুর সম্মুখে সেই রূপই ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল—হৃদয়ের মধ্যে সেই হাসিই দীপ্তি পাইতে লাগিল।

আমি যেন কেমন হইয়া গেলাম ! তাহার পর কত কথা ভাবিতে লাগিলাম, কত সুখের কথা—কত ভোগের কথা—কত মাথামুণ্ড ! সে কথা আর প্রকাশ করিয়া কাজ নাই ! এখন সে কথা বলিতেও যে আমার প্রাণ কেমন করে!

৬

সে রাত্রিতে আর খোকাকে পড়াইতে পারিলাম না—শরীর অসুস্থ হইয়াছে বলিয়া অনাহারেই শয়ন করিলাম। খোকা বাড়ির মধ্যে চলিয়া গেল।

আমার আর নিদ্রা নাই। কত কি ভাবিতে লাগিলাম, তাহা এত দিন পরে বলিতে পারিতেছি না।

রাত্রি যখন প্রায় দশটা, তখন সেই দাসী চোরের মত ধীরে ধীরে আমার শয়ন-ঘরে প্রবেশ করিল এবন আমার বিছানার পার্শ্বে আসিয়া অনুচ্চ স্বরে বলিল, "মাস্টার বাবু কি ঘুমুচ্ছেন?"

আমি মাথা তুলিয়া বলিলাম, "না, ঘুম হচ্ছে না। তুমি এত রাত্রে কেন?"

দাসী বলিল, "আর এত রাত্রে! এখন বলুন, কি করবেন? কা'ল সকালেই আমাকে খবর দিতে হবে।"

আমি বলিলাম, "কি খবর?"

দাসী হাসিয়া বলিল, "কি আর করবেন! নিমন্ত্রণ নিলেন ত?"

আমি বলিলাম, "কৈ, কেউ ত আমাকে নিমন্ত্রণ করে নি!"

দাসী রহস্য করিয়া বলিল, "চোখ দুটো তখন কোথায় ছিল?"

আমি বলিলাম, "পত্রের দ্বারা নিমন্ত্রণ না করলে, আমি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করব না—এই কথা বোলো।"

দাসী বলিল, "বেশ, তাই হবে। কাল নিমন্ত্রণ-পত্র পাবেন।"

তখন কিন্তু নরকের পথে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই নিমন্ত্রণ-পত্র চাহিয়াছিলাম—রূপের মোহে তখন আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম।

কিন্তু ঐ নিমন্ত্রণ পত্রই আমাকে বাঁচাইয়াছিল—আমার রক্ষাকবচ-স্বরূপ হইয়াছিল।

ভালমন্দের দ্বন্দ্বেই সমস্ত রাত্রি কাটিয়া গেল; কেহই পরাজয় স্বীকার করিল না; তবে সত্য বলিতে কি মন্দের প্রলোভনের জয়ই অনিবার্য বলিয়া বোধ হইল।

পরদিন খোকা যখন স্নান-আহারের জন্য অন্তঃপুরে গিয়াছে, সেই অবকাশে দাসী আসিয়া 'নিমন্ত্রণ-পত্র' দিয়া গেল।

রঙীন সুদৃশ্য খামখানি হাতে পড়িতেই একটা সুবাস অনুভব করিলাম। পত্রখানি নাসিকার নিকট লইয়া আসিলাম, গন্ধে ভুরভুর করিতেছে;—এসেন্স মিশান কালিতে লেখা।

পত্র খুলিলাম। অক্ষরগুলি সুছাঁদ—বানান-ভুলও বেশী নাই। পাঠ করিতে লাগিলাম,—কথাগুলি যেন অদেহিনী সুরা। আমার মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়া আমায় পাগল কবিয়া, মাতাল করিয়া তুলিল—সুখের আবেশে আমি বিভোর হইয়া পড়িলাম।

পত্রখানি শেষাংশে পৌঁছিয়া, স্বাক্ষর নামটিতে দৃষ্টি পড়িবামাত্র আমার সে সুখের নেশা তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া গিয়া, আমার সমস্ত দেহ-মন অসীম লজ্জা ও প্রচণ্ড ধিক্কারে ভবিযা উঠিল।

পূর্বে এই শয়তানির নাম আমি জানিতাম না। দেখিলাম, সে নাম-যে নাম ইহজগতে আমার নিকট সর্বাপেক্ষা মূল্যবান, আমার চিরজীবনের সর্বাপেক্ষা ভক্তি শ্রদ্ধা ও পূজার জিনিষ,—আমার মায়ের নাম।

পত্রের প্রতি শব্দ যেন তখন আমাকে প্রবলভাবে বেত্রাঘাত করিতে লাগিল।

কর্তব্য স্থির করিতে এক মুহূর্তও বিলম্ব হইল না। কে যেন আমার হৃদয়ে অমিত বল সঞ্চার কবিল—কে যেন আমার গন্তব্য পথ স্থির করিয়া দিল।

আমি তৎক্ষণাৎ জামা চাদর লইয়া একেবারে হরিহর বাবুর নিকট উপস্থিত হইলাম। তিনি তখন কার্যান্তরে ব্যস্ত ছিলেন। আমার আর অপেক্ষা সহিল না। আমি তাঁহাকে বলিলাম, "আপনাকে একটু উঠে আস্‌তে হচ্চে; একটা বিশেষ কথা আছে।"

আমার মুখেব দিকে চাহিয়া এবং আমাব কথা শুনিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ আমাকে লইযা পাশের ঘবে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি অশ্বিনী, ব্যাপার কি?"

আমি অতি নম্রস্বরে বলিলাম,"আমি বাড়ি চল্লাম; চাকরি করব না, আর—মহেশপুবে আসব না।"

হরিহর বাবু বলিলেন, "কেন, কেন, হয়েছে কি?"

আমি বলিলাম, "মাতৃ-আজ্ঞা।"

হরিহর বাবু বলিলেন, "এমন হঠাৎ! কারণ কি হল শুনতে পাইনে?"

"আজ্ঞে না"—বলিয়া আমি সেই পাপপুবী পরিত্যাগ করিলাম। নির্জন পথে, পত্রখানা টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া, পার্শ্বস্থিত একটা পচা ডোবায় ফেলিয়া দিলাম।

তাহার পর,—তাহার পর সেই জমিদার-বাড়িতে কি হইয়াছিল, সে কথা হিন্দুর ছেলের, সতী মায়ের পুত্রের বলিতে নাই।

ন্যায়বাগীশের মন্ত্রদান

বাসুদেবপুরের বামতনু ন্যায়বাগীশের নাম একসময় বাংলাদেশের পণ্ডিত-সমাজের সকলেই জানিতেন। তিনি ন্যায়শাস্ত্রে মহাপণ্ডিত ছিলেন; কত দূরদেশ হইতে কত ছাত্র তাঁহার চতুষ্পাঠীতে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আসিত; তিনিও অকাতরে ছাত্রগণকে অন্নদান করিতেন এবং ন্যায়শাস্ত্রে পণ্ডিত করিয়া দিতেন।

বাড়ীতে তাঁহার ব্রাহ্মণী ব্যতীত আর কেহই ছিল না। ব্রাহ্মণ-কন্যা একাকিনী সমস্ত গৃহকার্য করিতেন এবং অন্নপূর্ণার মত প্রতিদিন অনেকগুলি ছাত্রের দুইবেলা অন্ন-পানের ব্যবস্থা করিতেন। বাহিরে ন্যায়বাগীশ মহাশয় যেমন মহাদেবের ন্যায় ছিলেন, বাড়ীর ভিতরে তেমনই তাঁহার গৃহিণী জগদ্ধাত্রীর মত বিরাজ করিতেন।

ন্যায়বাগীশ মহাশয়ের বিষয়-আশয় ছিল না বলিলেই হয়, সামান্য দশ-বার বিঘা ব্রহ্মোত্তর মাত্র তাহার সম্বল ছিল; কিন্তু দেশের সম্পন্ন ব্যক্তিগণ তাঁহার চতুষ্পাঠীর সমস্ত ব্যয় চালাইতেন; কেহ মাসে যত চাউল লাগে, তাহার ভার লইয়াছিলেন; কেহ বা দৈনিক বাজার খরচের ব্যয় নির্বাহ করিয়া দিতেন। ন্যায়বাগীশ মহাশয় এ সকল ক্ষুদ্র বিষয়ের চিন্তা মোটেই মনে স্থান দিতেন না;—গৃহস্থালি আছে আর গৃহিণী আছেন; তিনি ছাত্রদিগকে লইয়া শাস্ত্রালোচনাতেই সময় অতিবাহিত করিতেন।

সংসারের কোন অভাবের কথাই তাঁহার মনে উঠিত না, শুধু মধ্যে মধ্যে একটি অতৃপ্ত বাসনা তাঁহাকে পীড়া দিত। তিনি যখন ভাবিতেন যে তাঁহার সহিত স্বর্গীয় রামলোচন ভট্টাচার্যের নাম লোপ হইবে, তখন তিনি বড়ই বিমর্ষ হইতেন। গৃহিণীর বয়স ৪০ পার হইয়া গেল, তিনিও বৃদ্ধ হইলেন—আর তাঁহাদের সন্তান হইবার সম্ভাবনা নাই। প্রতিবেশী অনেকে নানাপ্রকার শান্তি-স্বস্ত্যয়নের কথা বলিতেন, কিন্তু ন্যায়বাগীশ মহাশয় সে সকল কথায় কর্ণপাত করিতেন না; তিনি বলিতেন, ওসবে কিছু হয় না।

ন্যায়বাগীশের ব্রাহ্মণীকে কিন্তু কখন কেহ এজন্য দুঃখ প্রকাশ করিতে শোনে নাই। কেহ তাঁহার বন্ধ্যাত্বের কথা বলিলে, তিনি বলিতেন, "তোমরা বল কি? আমার কত ছেলে আছে। এক সঙ্গে ২৫/৩০টা ছেলে আমাকে মা বলে ডাকে, আমি বুঝি বন্ধ্যা! নয বছর বয়সে এই বাড়ীতে এসেই আমি মা হয়ে বসেছি। আমার মত ভাগ্যবতী কে? না, না, আমার আর ছেলেতে কাজ নেই; যারা আছে, তারাই বেঁচে থাক, আমায় মা বলবার লোকের অভাব কি?"

কথাটা বড়ই ঠিক। এই যে ছাত্রের দল—ইহারা ন্যায়বাগীশের গৃহে পুত্র-স্নেহেই প্রতিপালিত হইত;—এই দূরদেশে আসিয়াও কেহ কোন দিন জননীর অভাব অনুভব করে নাই। এতগুলি সুসন্তানের ভক্তির অর্ঘ্যে তাঁহার মাতৃহৃদয় তৃপ্ত হইয়া যাইত।

বিধির বিধান কে খণ্ডন করিতে পারে? এই বৃদ্ধ বয়সে ন্যায়বাগীশ মহাশয়ের ভাগ্য প্রসন্ন হইল, একটি সুকুমার শিশু ন্যায়বাগীশের গৃহিণীর কোল জুড়িয়া বসিল। সকলেই ইহাতে আনন্দিত হইলেন;—ভট্টাচার্য বাড়ীর বংশ-লোপ হইবার যে আশঙ্কা ছিল, তাহা দূর হইল।

বৃদ্ধ বয়সের সন্তান;— ন্যায়বাগীশ মহাশয় এই সন্তানের মায়ায় বদ্ধ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার শাস্ত্রালোচনার আগ্রহ ক্রমে কমিতে লাগিল; পূর্বে যে প্রকার উৎসাহ ও একাগ্রতার সহিত ছাত্রগণকে পাঠ দিতেন, গভীর তত্ত্বের আলোচনা করিতেন, তাহা ক্রমে কমিয়া যাইতে লাগিল। এখন টোলগৃহে তিনি ছেলেকে কোলে লইয়া উপবিষ্ট হইতেন; ছেলে হয় ত ন্যায়দর্শন পুঁথির পাতার উপর কোমল পদদ্বয় স্থাপন করিত, কখনওবা ছাত্রদিগের পাঠের নানা বিঘ্ন জমাইত; ন্যায়বাগীশ সহাস্যবদনে বালকের খেলা দেখিতেন। রামপ্রসাদের সামান্য একটু অযত্ন হইবার যো ছিলনা; রামপ্রসাদ একটু কাঁদিলেই ন্যায়বাগীশ ব্যস্ত হইয়া বাড়ীর মধ্যে ধাবিত হইতেন এবং ছেলের কান্না নিবারণের জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিতেন।

এত আদরে যাহা হইয়া থাকে, তাহাই হইল। রামপ্রসাদ যখন দশম বর্ষে পদার্পণ করিল তখনও তাহার লেখাপড়া মোটেই অগ্রসর হইল না। সেই যে যথারীতি বিদ্যারম্ভ হইয়াছিল, সেই পর্যন্তই। পণ্ডিত গৃহিণী মধ্যে মধ্যে স্বামীকে একথা বলিতেন; ছেলে যে তাঁহার আদরে নষ্ট হইয়া যাইতেছে, একথাও তিনি স্বামীকে জানাইতেন; কিন্তু ন্যায়বাগীশ এ সকল কথায় মোটেই কান দিতেন না; বলিতেন "আহা ছেলেমানুষ, একটু আবদাব করবেনা! আর দেখ গিন্নি, ঐ যে চাঞ্চল্য দেখছ, ওটা তেজীয়ান পুরুষের পূর্বাভাস। রামপ্রসাদ কালে যে খুব তেজস্বী হবে, এ তারই লক্ষণ। এর জন্য তুমি ব্যস্ত হোয়োনা। আমি ওর কোষ্ঠী গণনা করে দেখেছি, ও কালে একটা মানুষের মত মানুষ হবে। জ্যোতিষশাস্ত্র কখন মিথ্যা বলেনা। পড়াশুনার কথা বলছ—তার জন্য ভেবনা। হোক না বয়স দশ বৎসর। কার ঔরসে ওর জন্ম, সেটা প্রণিধান করছ না গিন্নি। আর সকল ছাত্র দশ বৎসরে যা শিখতে পারবে না, আমার রামপ্রসাদ ছ'মাসে—বুঝেছ গিন্নি, এই ছটি মাসে তা শিখে নেবে। সেই জন্যই ত আমি ওকে পড়ার জন্য তাড়না করিনা। তুমি দেখে নিও, তোমার এ ছেলে কি হয়?"

গৃহিণী ন্যায়বাগীশ মহাশয়ের বাক্য বেদবাক্য বলিয়াই বিশ্বাস করিতেন সুতরাং তিনি নীরব হইতেন: কিন্তু মধ্যে মধ্যে রামপ্রসাদের দুষ্টামি, তার কাণ্ডকারখানা দেখিয়া তার অবাধ্যতায় বিরক্ত হইয়া তিনি বেদবাক্যের উপর ও সন্দেহ করিতে লাগিলেন।

রামপ্রসাদের বয়স যখন সতর বৎসর হইল, তখন ন্যায়বাগীশ মহাশয় বুঝিতে পারিলেন যে, ছেলেকে এতদিন আদর দিয়া তাহার মস্তক চর্বণ করিয়াছেন; এত বড় ধীমান পণ্ডিতের পুত্র কিনা এত বয়সেও কিছুতেই মুগ্ধবোধের সন্ধির গণ্ডী অতিক্রম করিতে পারিলনা; এদিকে কিন্তু অন্যান্য বিদ্যায় সে গ্রামের অতি বড় বয়াটে ছেলেকেও অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। ষণ্ডামি গুণ্ডামিতে রামপ্রসাদ অদ্বিতীয়; তামাকের শ্রেণী হইতে প্রমোশন পাইয়া এখন সে গঞ্জিকার ক্লাসে প্রবিষ্ট হইয়াছে, এ সংবাদও ন্যায়বাগীশ মহাশয়ের কর্ণে পৌছিল। কিন্তু কি মায়াতেই তাঁহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল যে, এত দেখিয়া, এত শুনিয়াও তিনি রামপ্রসাদকে শাসন করিবার জন্য অগ্রসর হইতে পারিলেন না।

রামপ্রসাদের মাতা পুত্রের গুণের কথা শুনিয়া মধ্যে মধ্যে তাহাকে তিরস্কার করেন; কিন্তু ন্যায়বাগীশ মহাশয় সে কথা শুনিয়া দুঃখিত হন। এখন তাঁহার সুর নামিয়া গিয়াছে; তিনি গৃহিণীকে বলেন, "শোন গিন্নি, যার অদৃষ্টে যা আছে, তা কেউ খণ্ডাতে পারে না,—স্বয়ং

বিধাতারও সে ক্ষমতা নেই। দুঃখ কোরে কিছু লাভ নেই, উপদেশেও কিছু হয় না। ওর অদৃষ্টে যদি ভাল কিছু লেখা থাকে, তা হলে দেখতে পাবে গিন্নি, তোমার ঐ ছেলেই দিগ্বিজয়ী হবে। আমার ত মনে হয়, ওর স্বভাব এমন থাকবে না। জ্যোতিষ শাস্ত্র কি মিথ্যা হতে পারে। আর গণনায় কিছু ভুল হয়নি গিন্নি, কিছু ভুল হয়নি। এখন যাই হোক, পরে আমার রামপ্রসাদ মানুষের মতো মানুষ হবে। তবে যা দুঃখ এই যে, আমরা আর তখন বেঁচে থাকবনা।"

ন্যায়বাগীশ গৃহিণী বিষণ্ণ বদনে বলিতেন। "তোমার কথা যে মিথ্যা হবে না, এ বিশ্বাস ত এতদিন করে এসেছি। কিন্তু তুমি আমার অপরাধ নিও না, এখন সময়-সময় মনে হয়, তুমি হয় ত গণনায় ভুল করেছ; নইলে তোমার ছেলে কি এমন হতে পারে।"

ন্যায়বাগীশ বলিলেন, "না গিন্নি, রামতনু ন্যায়বাগীশ এত কালের মধ্যে কোন দিন ভুল করে নাই। তুমি দেখে নিও, আমার কথা ঠিক হবে। তুমি রামপ্রসাদকে তাড়না কোরোনা। জান ত প্রাপ্তেতু ষোড়শে বর্ষে পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ।"

গৃহিণী বলিলেন, "তা দেখ, একটা কাজ কর। যে রকম দেখছি, তাতে ওর যে আর বেশি বিদ্যা হবে, তা মনে হয়না। তুমি ওকে ধরে বেঁধে এই দশকর্মটা শিখিয়ে দেও; আর ঘর কয়েক যজমান করে দেও, তা হলেই ওর একটা পথ হবে, নইলে দু-দিন পরে ও কি করে খাবে। ঐটে কর, আর ওর একটা বিয়ে দিয়ে দাও।"

ন্যায়বাগীশ বলিলেন, "গিন্নি, ও দুইয়ের একটাও আমার দ্বারা হবে না। স্বর্গীয় রামলোচন ভট্টাচার্যের পৌত্র, আমার পুত্র যে যজনকার্য করবে, তার ব্যবস্থা আমি করতে পারবনা। আর বিবাহের কথা যা বলছ, তাতেও আমি সম্মত নই। পুত্র উপার্জনক্ষম হয়ে নিজের কর্তব্য বুঝে বিবাহ করবে, এই আমার মত, এই আমার উপদেশ। আমি এর অন্যথাচরণ করতে পারব না। এ অনুরোধ তুমি আমাকে কোরোনা। ওর অদৃষ্টে বিবাহ থাকে, হবে। আর যদি যজনকার্য করে পিতৃপুরুষের নাম ডুবাতে চায়, ডুবাবে, আমি তার সহায়তা করতে পারব না—সে কিছুতেই হবে না।"

এই কথোপকথনেব দুই মাস পরে একদিন ন্যায়বাগীশ মহাশয় জ্বরে পড়িলেন। দুইদিন লঙ্ঘন দিলেন; জ্বর ছাড়িলনা। তৃতীয় দিন কবিরাজ ডাকা হইল,—ডাক্তারি ঔষধ ত তিনি সেবন করিবেন না। কবিরাজ মহাশয় রোগীর নাড়ী পরীক্ষা করিয়া এবং নানা প্রশ্ন করিয়া অনেক চিন্তার পর দুইটি ঔষধ বাহির করিলেন।

ন্যায়বাগীশ মহাশয় একটু হাস্য করিয়া বলিলেন, "রাধাবল্লভ, বড়ি দুটি কেন নষ্ঠ করবে? গৃহিণী তোমাকে ডাকতে পাঠিয়েছিলেন, আমি জানলে নিবেধ কবতাম। আমার পক্ষে এখন নারায়ণের নামই একমাত্র ঔষধ।"

রাধাবল্লভ কবিরাজ বলিলেন, "খুড়ো ঠাকুর, আপনি বল্‌ছেন কি? এ অতি সামান্য জ্বর, নাড়ীর অবস্থাও খারাপ নয়। আপনি অমন নিরাশ হচ্ছেন কেন?"

ন্যায়বাগীশ উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন, "নিরাশ কি রাধাবল্লভ! আমি ত যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছি। তুমি নাড়ীতে কিছু পাচ্ছ না, কিন্তু আমি বুঝতে পারছি, আজ দিবা দ্বিপ্রহর

অন্তে আমার দেহান্ত হইবে। তুমি ঔষধপত্রের আয়োজন না করে সকলকে সংবাদ দাও। যাওয়ার সময় একবার সকলের মুখ দেখে যাই;—কি মায়ার বন্ধন রাধাবল্লভ!"

তাহার পর পুত্র রামপ্রসাদের দিকে একবার সতৃষ্ণনয়নে চাহিলেন; কিন্তু তাহাকে কিছু না বলিয়া গৃহিণীকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "গিন্নি তোমায় কোন সাধই পূর্ণ হোল না বলে দুঃখিত হয়ো না। ব্রহ্মবাক্য অন্যথা হয়না—জ্যোতিষ কখন মিথ্যা বলে না,—আমার গণনা ভুল হয় নাই গিন্নি! তোমায় ত কতবার বলেছি, রামপ্রসাদ মানুষ হবে—মানুষের মত মানুষ হবে; তবে আমি তা দেখে যেতে পারব না। আমি যে ঘোর মায়াজালে বদ্ধ হয়ে পড়েছিলাম গিন্নি! তাই তোমার মনে কতদিন কষ্ট দিয়েছি। আমি যে বহুপূর্বেই কার্য সুসম্পন্ন করতে পারতাম; কিন্তু তোমার দিকে চাহিয়াই গিন্নি, আমি আজ পাঁচ বৎসর কিছুই করি নাই। তাই রামপ্রসাদের ব্যবহারে তুমি এত কাতর হয়ে পড়েছ। আজ আমার যাবার দিন;—আর ত বিলম্ব করলে চলবে না।" রাধাবল্লভের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "রাধাবল্লভ, আজ অষ্টমী তিথিটা কতক্ষণ আছে, পাঁজিখানা দেখত। আমার যেন বোধ হচ্ছে ছাব্বিশ দণ্ড তিতাল্লিশ পল। যাক্, তুমি একবার ভাল করে দেখ। প্রসাদ পঞ্জিকাখানা এনে দাও ত তোমার দাদাকে।"

রামপ্রসাদ পঞ্জিকা আনিযা দিলে রাধাবল্লভ দেখিয়া বলিলেন, "খুড়াঠাকুর, আপনার কথা কি ভুল হয়, অষ্টমী ছাব্বিশ দণ্ড তিতাল্লিশ পলই আছে।"

ন্যায়বাগীশ মহাশয় ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "এতকাল ত ভুল হয় নাই; তবে আজ মৃত্যুশয্যায় কিনা, তাই তোমাকে দেখতে বললাম। সে কথা থাকুক।" এই বলিয়া তিনি নীরবে কি চিন্তা করিতে লাগিলেন।

তিন চারি মিনিট পরে বলিলেন, "প্রসাদ, একটু বিলম্ব হয়ে গিয়েছে বাবা! তা হোক, সব কাজেরই সময় আছে ত ! পূর্বেও একবার সময় এসেছিল; কিন্তু আমি মায়ায় বশীভূত হয়ে সে সময়টা যেতে দিয়েছিলাম। দেখ বাবা প্রসাদ, তোমাকে কোন দিনই কিছু বলি নাই। তুমি বিদ্যার্জন করলেনা, কুসঙ্গে পড়ে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে গেলে, তোমার যে পানদোষ পর্যন্ত হল, এসব দেখেশুনেও আমি কিছু বলি নাই,—কোন উপদেশ দিই নাই। এ সব যে তোমার চাই, তা আমি জানতাম। পাঁচ বৎসর পূর্বেও যদি তোমাকে সেই শুভদিনে দীক্ষা প্রদান করতাম, তা হ'লেও তার পরে তোমাকে এই দুর্ভোগ ভুগতে হোতো। তা সেটা সেরে নেওয়াই গেল। আজ প্রসাদ, তোমাকে আমি দীক্ষিত করব। আজ অষ্টমী; আগামী অষ্টমীই মহাষ্টমী—মা মহামায়ার মহাপূজা। আমি আজ তোমাকে মন্ত্রদান করবো; আগামী মহাষ্টমীতে মহা-সন্ধিক্ষণে তুমি সিদ্ধিলাভ করবে, যাও বাবা, শীঘ্র স্নান করে এস। অধিক বিলম্ব কোরোনা,—আমার আর বেশি সময় নাই। যাও বাবা, বিষণ্ণ হোয়োনা—কাতর হোয়োনা, যাও।"

রামপ্রসাদ চলিয়া গেলে ন্যায়বাগীশ মহাশয় গৃহিণীকে বলিলেন, "গিন্নি আমি তোমার পুত্রকে মহামন্ত্র দান করব। সম্মুখে মহাপূজা ! মহাষ্টমীর সন্ধিক্ষণে তোমার পুত্র সিদ্ধিলাভ করবে। সেদিন গিন্নি ! তোমার ছেলেকে সারাদিন উপবাসী থাকতে বোলো। সন্ধ্যার পর সে যেন আমার বিল্ববৃক্ষমূলে বসিয়া আমার প্রদত্ত মন্ত্র জপ করে। তারপর যা হয় দেখতেই পাবে

গিন্নি! আমার জন্য বেশিদিন ভাবতে হবে না—অতি কম সময় গিন্নি! অতি কম সময়! তোমার কিঞ্চিৎ বৈধব্যযোগ আছে যে।"

এইকথা বলিয়া ন্যায়বাগীশ মহাশয় চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। কবিরাজ উঠিয়া গেলেন।

কথাটা গ্রামময় প্রচারিত হইল। ছাত্রগণ, আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধবগণ যে যেখানে ছিলেন, সংবাদ শুনিবামাত্র ন্যায়বাগীশের গৃহে উপস্থিত হইলেন। ন্যায়বাগীশ মহাশয় সকলের সহিত কথা বলিতে লাগিলেন; মৃত্যুর কোন লক্ষণই কেহ দেখিতে পাইলেন না।

একটু পরেই রামপ্রসাদ স্নান করিয়া বাড়ীতে আসিল। ন্যায়বাগীশ বলিলেন, "বেলা বোধ হয় দ্বাদশ দণ্ড পাব হয়েছে।" তিনি তখন গৃহিণীকে বলিলেন. "সাধ্বি, আর ত বিলম্ব নাই। আমাকে একখানি কুশাসন পাতিয়া দাও। না, না, আমাকে ধরিতে হইবেনা; আমার দেহ ত দুর্বল বা অবসন্ন হয় নাই।"

গৃহিণী তাড়াতাড়ি কুশাসন পাতিয়া দিলেন। ন্যায়বাগীশ মহাশয় কাহারও সাহায্য গ্রহণ না করিয়া শয্যা হইতে নামিয়া, বস্ত্র পরিবর্তন করিলেন; উত্তরীয় গ্রহণ করিয়া যোগাসনে বসিলেন। গৃহিণী বলিলেন, "আহ্নিকের আয়োজন করিয়া দিব কি?" ন্যায়বাগীশ সহাস্য বদনে বলিলেন, "দেবি, সন্ধ্যা-আহ্নিকের প্রয়োজন শেষ হইয়াছে; আর নয়। রামপ্রসাদ আমার কাছে এস।"

রামপ্রসাদ পিতার সম্মুখে বসিলে তিনি বলিলেন, "রামপ্রসাদ, এখন আর আমি তোমার পিতা নহি, তুমি আমার পুত্র নহ,—এখন আমি গুরু, তুমি শিষ্য। আমি আজ তোমাকে মন্ত্রদান করিব। ইহার পর কি করিতে হইবে, তাহা মন্ত্রই তোমাকে বলিয়া দিবে; আর যদি কিছু জানিবার প্রযোজন বোধ কর, তোমার জননীকে জিজ্ঞাসা করিও! তিনি সব জানেন" এই বলিয়া গৃহিণীর দিকে উৎফুল্ল নয়নে চাহিলেন।

তাহার পর শরীর ঈষৎ সঞ্চালিত করিয়া তিনি আসন সুদৃঢ় করিয়া ধ্যানমগ্ন হইলেন। সমাগত জনমণ্ডলী এক দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল।

প্রায় পাঁচ মিনিট পরে তিনি নয়ন উন্মীলন করিয়া অতি গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "শিষ্য অগ্রসর হও।"

ন্যায়বাগীশ মহাশয়কে এমনভাবে, এমন স্বরে কথা বলিতে কেহ শোনে নাই; সকলে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল।

রামপ্রসাদ আর একটু অগ্রসর হইলে ন্যায়বাগীশ মহাশয় তাহার মস্তিষ্ক নিজের বক্ষে ধারণ করিয়া তাহার কর্ণে মন্ত্র প্রদান করিলেন।

রামপ্রসাদ কাঁপিয়া উঠিল; শরীরের মধ্যে হঠাৎ বিদ্যুৎ-প্রবাহ সঞ্চারিত হইলে, দেহ যেমন কাঁপিয়া উঠে রামপ্রসাদের ঠিক সেই ভাব হইল; পরক্ষণেই সে মূর্ছিত হইল। ন্যায়বাগীশ মহাশয় তাহাকে ভূমিতলে শয়ন করাইয়া দিলেন।

তাহার পর পুনরায় ধ্যানস্থ হইলেন। দুই তিন মিনিট পরে একবার মাত্র গম্ভীর স্বরে উচ্চারিত হইল—ওঁ।

তাহার পর সব শেষ। ন্যায়বাগীশ মহাশয়ের পার্থিব লীলার অবসান হইল।

বত্রিশ বৎসর পূর্বে গঙ্গোত্রীর পথে এক সন্ন্যাসীর আশ্রমে এক রাত্রি অতিবাহিত করিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। সন্ন্যাসী আমাকে বাঙ্গালি দেখিয়া সেই রাত্রিতে তাঁহার জীবনকথা যতটুকু বলিয়াছিলেন তাহাই এতকাল পরে লিপিবদ্ধ করিলাম। তিনি পরবর্তী ঘটনার বিবরণ অসমাপ্ত রাখিয়াছিলেন; আমাকেও অসমাপ্ত রাখিতে হইল।

ছয় সাত বৎসর পূর্বে একদিন সেই সন্ন্যাসীর সহিত আমার এই কলিকাতাতেই সাক্ষাৎ হইয়াছিল। আমি তাঁহাকে চিনিতে পারি নাই;—আমার মত বিষয়াসক্ত সংসারীর পক্ষে তাহা অসম্ভব। কিন্তু তিনি বিপুল জনসঙ্ঘের মধ্য হইতে ও আমাকে চিনিয়া বাহির করিয়াছিলেন।

ন্যায়বাগীশ মহাশয়ের কথা ফলিয়াছে। তাঁহার পুত্র রামপ্রসাদ সত্য-সত্যই এখন দেশবিখ্যাত ব্যক্তি,--একজন প্রধান সন্ন্যাসী। তাঁহার অসংখ্য শিষ্য। তাঁহার নাম, তাঁহার কীর্তি-কাহিনী, অনেকের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়। এই বাংলাদেশেও তাঁহার অনেক শিষ্য আছেন—পশ্চিমাঞ্চলে ত শিষ্যের অভাবই নাই। দেশ ও জনহিতকর কার্যের অগ্রণীবৃন্দের মধ্যে তিনি একজন। তাঁহার নাম আমি বলিব না,—সাধু সন্ন্যাসীর গৃহস্থাশ্রমের কথা বলিতে নাই,—সে পরিচয় গোপন করিতে হয়।

—মানসী ও মর্ম্মবাণী ১০ম বর্ষ, ১৩২৫, ২য় খণ্ড ২য় সংখ্যা আশ্বিন।

এবং

কিশোর ঘোষ জাতিতে গোয়ালা; কিন্তু সে রাগ করিয়া জাতি ব্যবসায় ছাড়িয়া দিয়াছিল। তাহার পিতা ও তস্য পিতা গোয়ালার ব্যবসায়েই জীবনযাপন করিয়াছিল;—ঘৃত, দধি, ক্ষীর বিক্রয় করিত—গ্রামের বাজারে দুগ্ধ বিক্রয় করিত—ভদ্রলোকের বাড়ীতে দুগ্ধ যোগান দিত এবং সেরকে অন্তত একপোয়া জল ও দুগ্ধের সহিত মিশাইয়া খাঁটি দুগ্ধ বলিয়া মা-ঠাকুরানিদিগের নিকট চালাইত। কিশোর প্রথমে এই পৈতৃক ব্যবসায়েই নিযুক্ত হইয়াছিল এবং কোন গোল না হইলে, ঐ কার্যেই গোপ-জীবন কাটাইয়া দিত।

গোল এমন কিছু নহে। একদিন তাহার পিতা নবীন ঘোষ নিকটের এক গ্রামে এক ধনী-গৃহস্থের বাড়ির কোন ব্যাপার উপলক্ষে একেবারে আড়াই মন দুগ্ধের বায়না লইয়া আসিল। কিশোরের বয়স তখন উনিশ বৎসর। কিশোর যখন আড়াই মন দুগ্ধের বায়নার কথা শুনিল তখন সে একেবারে অবাক হইয়া গেল—আড়াই মন দুধ! "বাবা, এত দুধ কেমন করিয়া জোগাড় হইবে?"

নবীন বলিল, "যে ক'রেই হোক, বায়নার বুঝ দিতেই হইবে।"

দুগ্ধে যে একটু-আধটুকু জল দেওয়া হয়, তাহা কিশোর জানিত এবং তাহা তাহাদের কৌলিক প্রথা বলিয়া মনে মনে একটু ক্ষুণ্ণ হইলেও কোন কথা বলিত না; কিন্তু কি জানি কেন, কোনদিনই দুগ্ধে জল মিশাইতে তাহাব হাত সরিত না, তাহার পিতা ও মাতাই সে পবিত্র কার্য শেষ করিত।

বাবুদের বাড়িতে যেদিন আড়াইমন দুগ্ধ দিবার কথা, সেদিন প্রাতঃকালে সাতটার মধ্যে নবীন ঘোষের বাড়িতে যে দুগ্ধের আমদানি হইল, তাহা মাপিয়া দেখা গেল-দেড়মন, দুইমন। নবীন ঘোষ তখন নিকটস্থ পুষ্করিণী হইতে এক কলসী জল আনিয়া, মাপিয়া মাপিয়া দুগ্ধের সঙ্গে মিশাইতে লাগিল। কিশোরের এই প্রতারণা আর সহ্য হইল না; সে বলিল, "বাবা", এ কি করছ?"

নবীন পুত্রের দিকে চাহিয়া বলিল, "আড়াই মন ত হওযা চাই!"

"হওয়া চাই বলে কি এমন কাজই করতে হবে?"

নবীন রাগিয়া বলিল, "তাই হয়রে বেটা! তুই দেখছি ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির। যা. যা, সরে যা।"

কিশোরের রাগ হইল; সে বলিল, "এ দুধের বাঁক আমি কাঁধে করছিনে।"

"তুই করবিনে, তবে কি লোক ভাড়া করে আনতে হবে?"

কিশোর বলিল, "এমন অধর্ম আমি করতে পারব না।"

নবীন ভারি চটিয়া গেল; বলিল, " পারবিনে ত খাবি কি? তোর বৌ খাবে কি?"

কিশোর বলিল, "সারা-জন্ম মোট খেটে যাব, সেও ভাল, তবুও এমন দিনে-ডাকাতি করব না।"

"তবে রে হারামজাদা, আমি ডাকাত ! এত বড় কথা। বেরো, আমার বাড়ি থেকে, নিযে যা তোর বৌকে। মোট খেটেই খাস্‌,—আমার বড় দিব্বি, তুই যদি আর বাঁক ঘাড়ে করিস।"

নবীনের স্ত্রী গোলমাল শুনিয়াই বাহিরে আসিয়াছিল; নবীন যখন এতবড় একটা দিব্বি গালিতে গেল, তখন সে বলিল, "আরে, কর কি? অমন দিব্বি কি করতে আছে; তোমার কি বুদ্ধিশুদ্ধি উড়ে গেল!"

কিশোর দৃপ্ত সিংহের ন্যায় গর্জন করিয়া বলিয়া উঠিল, "বেশ তাই হবে, আমি যদি নবীন ঘোষের ব্যাটা হই, তাহ'লে মোট বযেই খাবো, গয়লার ব্যবসা আর করবনা। গয়লার ভাত আর খাবো না।" এই বলিয়া কিশোর বাড়ি হইতে বাহির হইয়া গেল।

২

কত জন কত সাধিল, গ্রামের গোপবৃন্দ মজলিশ করিয়া কিশোরকে কত অনুরোধ করিল, মাতা কত কাঁদিল; অবশেযে পিতা নবীন ঘোষও বলিল, "ওরে ব্যাটা, রাগের মাথায় একটা কথা বলে ফেলেছি, আর তুই একমাত্র ছেলে, তুই সেই কথাটাই ধরে বসলি। বাবা আমার, রাগ করিসনে, আমার কথা আমি ফিরিয়ে নিচ্ছি। তুই ঘরে ফিরে আয়। এমন করে পথে, পথে বেড়ান কি ভাল।"

কিশোর কিন্তু কোন কথাতেই গলিল না, তাহার সেই একই কথা—বাপেব আজ্ঞা সে কিছুতেই লঙ্ঘন করিতে পারিবে না,—বাপের দিব্বি কি আর ফেরে।

তাহার মা একদিন পথের মধ্যে তাহাকে ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল, হাত চাপিয়া ধরিল; কিন্তু কিশোরের মন কিছুতেই নরম হইলনা; সে বলিল, "নবীন ঘোষের ব্যাটার যে কথা, সেই কাজ। এ জন্মে আমি মোট বয়েই খাব। বাপের কথা রক্ষা করে রামচন্দ্র বনে গিয়েছিলেন, আর আমি মোট বয়ে দুটো পেটের ভাত জোটাতে পারব না?"

মা বলিল, "তুই যেন জোটালি, কিন্তু আর একজন যে আছে; আবার দু'দিন পরে যখন কাচ্চা বাচ্চা হবে, তখন কি করবি?"

কিশোর বলিল, "সে কথা তুমি ভেব না মা! জীব দিয়াছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি। আমি সে কথা একটুও ভাবিনে—একেবারেই না। বউয়ের কথা বলছ? তার ভাইকে খবর দিয়েছি; দুই একদিনের মধ্যেই তারা এসে নিয়ে যাবে। তারপর—যা করেন হরি!"

মা বলিল, "সে কি হয় বাবা! আমরা ঘর করব কাকে নিয়ে! তোদের বনবাস দিয়ে কি করে ঘরে মাথা দেব?"

কিশোর বলিল, "সে আর হয় না মা। আমাদের পেটের ভাতের জন্য মোট বইতেই

হবে। তুমি আর কিছু বোলনা। মনে করনা কেন, তোমার ছেলে নেই, তোমার ছেলে মরে গেছে।"

"ষাট্, ষাট্, বাবা, অমন কথা বলতে নেই। দেখ্ কিশোর, এবই জন্য কি তোকে মানুষ করেছিলাম। তুমি কি আমাদের মুখের দিকে চাইবি নি।"

কিশোর কাতর বচনে বলিল, "সব করব মা। তোমাকে কি ফেলতে পাবি, বাবাকেই কি ফেলব? কিন্তু সেই এক কথা—মাথায় মোট বয়ে এনে তোমাদের খাওয়াব। ও-বাড়িতে আর মাথা দেব না—বাপের আজ্ঞা।"

মাতা আর কিছু বলিল না, কাঁদিতে কাঁদিতে ঘরে গেল। কিশোর বাড়ি ছাড়িয়া, গ্রাম ত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গেল। তাহার স্ত্রী পিত্রালয়ে আশ্রয় লইল। নবীন ঘোষ মাথায় হাত দিয়া বসিল, তাহার স্ত্রী পুত্রশোকে শয্যাশায়িনী হইল; কিন্তু একদিনও সে স্বামীকে একটা কটু কথা বলিল না,—বলিতে পারিল না;—নবীনের মুখের দিকে চাহিয়াই সাধ্বী বুঝিতে পারিত, কি প্রলয়ের অগ্নি তাহার বুকের মধ্যে অহরহ জ্বলিতেছে!

নবীন বসিয়া বসিয়া ভাবিত, বাপে কি ছেলেকে বকে না, গালাগালি দেয়না, দূর-ছাই করে না। কিন্তু তাহার একি হইল! হায় ঠাকুর! একি করিলে! কি পাপে আমার এমন শাস্তি দিলে দয়াল! নবীনের বুক ফাটিযা যাইত।—ঐ বুঝি তাহার কিশোব ফিরিয়া আসিল—ঐ বুঝি তাহার পায়ের শব্দ। কিন্তু কোথায় কিশোর ! সে যে কোথায় গেল, কেহই তাহার সন্ধান দিতে পারিল না।

৩

কিশোরের মাতা শয্যাগতা হইল; তাহার আর উঠিবার শক্তি রহিলনা। নবীন ঘোষ মহাবিপদে পড়িল। কাজ-কর্ম ত যায়-যায় হইল; পীড়িতা স্ত্রীর শুশ্রূষা কে করে? সে তখন কিশোরের শ্বশুর বাড়িতে সংবাদ পাঠাইল। কিশোরের শ্বশুর-শাশুড়ী মেয়েকে পাঠাইতে প্রথমে অস্বীকার করিল;—তাহারা সকল কথাই শুনিয়াছিল। নবীন ঘোষের কথাতেই কিশোর বিবাগী হইযাছে; সেই নবীন ঘোষের বিপদের সময় তাহার সাহায্য করা তাহারা কর্তব্য বলিয়া মনে করিল না! কিন্তু কিশোরের স্ত্রী কাঁদিয়া আকুল হইল। তাহার স্বামীই না হয় রাগ করিয়া দেশান্তরে গিয়াছে; কিন্তু তাই বলিয়া এই অসময়ে সে শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবা করিবে না কেন? কিশোরই কি দেশে থাকিলে এ সময় রাগ করিয়া থাকিতে পারিত? না—তাহা হইতে পারে না। কিশোরের স্ত্রী জেদ করিয়া, তাহার ছোট ভাইকে সঙ্গে লইয়া শ্বশুরালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। পুত্রবধূকে পাইয়া কিশোরের মা কিঞ্চিৎ শান্তি লাভ করিল; কিন্তু তাহার শরীর আর ভাল হইল না;—ক্রমেই সে অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল। গ্রামের কবিরাজ মহাশয় অনেক ঔষধ দিলেন; কিছুতেই কিছু হইল না। শেষে একদিন তিনি বলিলেন, "কি করিব, এ রোগ তো ঔষধে সারিবে না, এ যে মনের রোগ—ইহার চিকিৎসা নাই।"

তাহাই হইল;—দেড় মাস রোগে কষ্ট পাইয়া কিশোরের মা সকল দুঃখের হস্ত হইতে

পরিত্রাণ লাভ করিল। নবীন ঘোষ কাঁদিয়া বলিল, "ওরে কিশোর, একবার এসে দেখে যা; তোর মা তোরই শোকে চলে গেল। গিন্নি আমারও আর দেরি নেই; তুমি যাও, আমিও যাচ্ছি। কিশোর, বাবা তোর মনে কি এই ছিল?"

নবীন ঘোষের কথাই ফলিল। সাত দিনও গেল না;—নবীন বিছানায় পড়িল। চিকিৎসা পত্রের ত্রুটি হইল না, কিশোরের শ্বশুর এই বিপদের সময় অভিমান করিয়া থাকিতে পারিল না। সে বেহাই বাড়ি আসিল। তাহার পরই একদিন তুলসীতলায় কিশোরের নাম করিতে করিতেই নবীন ঘোষের দেহাবসান হইল। মরিবার পূর্ব মুহূর্তেও নবীন ঘোষ প্রাণপণে চিৎকার করিয়া বলিল, "ওরে কিশোর, আমি আমার দিব্বি ফিরিয়ে নিলাম বাবা!" তাহার পর সব শেষ!

৪

ইহার পর পাঁচ বৎসর চলিয়া গিযাছে। নবীন ঘোষের বাড়িতে যে কয়খানি ঘর ছিল, তাহা ভূমিসাৎ হইয়াছে; আসবাবপত্র যাহা ছিল, তাহা গ্রামের দশজনে যে দিক দিয়া পাইয়াছে, লইযা গিয়াছে, নবীন ঘোষেব ভিটা এখন জঙ্গলে পরিপূর্ণ। কিশোরের স্ত্রীও বছর খানেক পূর্বে মাবা গিয়াছে। গ্রামের লোক কিশোরের কথা এক প্রকার ভুলিয়া গিয়াছে বলিলেই হয়।

পাঁচ বৎসর পরে একদিন কিশোর গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে প্রথমেই তাহাদের বাড়ির দিকে গেল। বাড়ির সম্মুখে রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া দেখিল—ঘরদ্বার কিছুই নাই; গুটি তিনেক ভিটা পড়িয়া আছে; আর সমস্ত স্থানটা জঙ্গলে ভরিয়া গিয়াছে। রাস্তার পার্শ্বেই একটা বটগাছ ছিল; কিশোর মাথায় হাত দিয়া সেই বটগাছের ছায়ায় বসিল, তাহার পুঁটুলিটি তাহার পার্শ্বে পড়িয়া রহিল।

কিশোর মনে করে নাই যে, তাহার বাড়ির এই অবস্থা হইয়াছে। পাঁচ বৎসরের মধ্যেই এত পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। তাহার বাবা কোথায় গেল? তাহার মা কোথায়; সে যে পিতামাতার চরণ দর্শন করিবার জন্য দেশে আসিয়াছে। তবে কি তাহারা বাঁচিয়া নাই? নিশ্চয়ই নাই, নতুবা বাড়ির এ অবস্থা হইবে কেন? কিশোর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। তাহার মনে হইল, তাহারই জন্য গৃহের আজ এ অবস্থা! তাহারই শোকে তাহার পিতামাতা অকালে দেহত্যাগ করিয়াছে। তাহার ইচ্ছা হইতে লাগিল, একবার উচ্চৈঃস্বরে বাবা, মা বলিয়া প্রাণ ভরিয়া কাঁদে। কিন্তু তখন তাহার কথা বলিবার শক্তি ছিলনা; তাহার চক্ষের জল শুকাইয়া গেল। সে সেই জঙ্গলাকীর্ণ বাড়ির দিকে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে একজন লোক সেই বৃক্ষতলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইনি আর কেহই নহেন, কিশোরদিগেরই পুরোহিত বৃদ্ধ বামতনু ভট্টাচার্য। পুরোহিত মহাশয় কিশোরের দিকে চাহিয়াই তাহাকে চিনিতে পারিলেন; সবিস্ময়ে বলিলেন, "কে ও, কিশোর না?"

এই সম্বোধন শুনিয়া কিশোর পুরোহিত মহাশয়ের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চাহিল, কোন উত্তরই দিতে পারিল না।

পুরোহিত মহাশয় বলিলেন, "কিশোর, কখন এলে? এমন করে এখানে বসে কেন?"

এইবার কিশোর উঠিয়া দাঁড়াইল; তাহার পর পুরোহিত মহাশয়কে প্রণাম করিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিল। তাহার পর বলিল, "ঠাকুর-মশাই, বাবা কেমন আছে, মা কোথায়? বাড়ির এ হাল কেন?"

পুরোহিত বলিলেন, "তুমি বুঝি কোন সংবাদই রাখনা। তোমার পিতা এবং তোমার মাতা এবং—"

তাঁহার কথায় বাধা দিয়া নিতান্ত উন্মত্তের ন্যায় চিৎকার করিয়া কিশোর বলিয়া উঠিল, "ঠাকুরমশাই এবং-এরও সেই পথে যাওয়াই ঠিক ছিল; হাঁ, হাঁ, এবং এরও সেই পথে যাওয়াই ঠিক ছিল।"

পুরোহিত মহাশয় বলিলেন, "কিশোর অধীর হোয়োনা, পিতামাতা কাহারও চিরকাল বাঁচিয়া থাকে না; তবে তোমার সঙ্গে তাদের শেষ সময় সাক্ষাৎ হইল না এটা বিশেষ পরিতাপের কথা বটে। তা কি করবে বল। শাস্ত্রেই আছে—নিয়তি কেন বাধ্যতে। তাদের নিয়তি ছিল এবং—"

কিশোর পুনরায় বাধা দিয়া বলিল, "ঠাকুর মশাই, আপনার নিয়তি এবং-কে রেখে গেল কেন?"

পুরোহিত মহাশয় বলিলেন, "সে কথা পরে হবে, এখন চল, আমার বাড়িতেই চল। তোমার নিশ্চয়ই স্নান-আহার হয় নাই; চল বাড়িতে চল। আগে স্নানাহার কোরে স্থির হও; তারপর সব কথা হবে, ওঠ।"

কিশোর আর কোন কথা না বলিয়া তাহার পুঁটুলিটা তুলিয়া লইয়া পুরোহিত-মহাশয়ের অনুসরণ করিল।

পুরোহিত মহাশয় বাড়িতে পৌছিয়া কিশোরকে বলিলেন, "কিশোর, বেলা প্রায় তৃতীয় প্রহর পার, বিলম্ব করোনা, স্নান করে এস।"

কিশোর বলিল, "ঠাকুর মশাই এবং এর আজ স্নান-আহার নেই। বাপ-মায়ের কোন কাজই ত এবং করে নাই, সে খবরও ত এবং—"

পুরোহিত মহাশয় বলিলেন, "ও কি তুমি এবং-এবং করছ। পাগল হলে না কি?"

কিশোর বলিল, "যে পিতামাতাকে হত্যা করেছে, সে পাগল বইকি! তবে এবং-এর কথা এই যে, তার বাপ-মায়ের কোন কাজ তা হলে হয় নাই।"

পুরোহিত মহাশয় বলিলেন, "তা আর হয়েছে কৈ! কে করে? তোমার স্ত্রী যথাশাস্ত্র যা-হয় তা না কি তার পিত্রালয়ে করেছিল। সে ও ত বাঁচিয়া নাই; গত বৎসর সংবাদ পাইয়াছিলাম, তাহার মৃত্যু হইয়াছে।"

কিশোর বলিল, "তাহা হইলে ঠাকুর-মশাই এবং একেবারে নিশ্চিন্ত—একেবারে কোথাও কেউ নেই। যাক্, বাঁচা গেল, এবং তা হলে আজ উপবাসই করবে; কাল একটা শ্রাদ্ধশান্তি করাই চাই।"

পুরোহিত মহাশয় বলিলেন, "সে অতি উত্তম প্রস্তাব, পুত্রের উপযুক্ত কথাই বটে। তা হলে তুমি এখন বিশ্রাম কর; আমি স্নান-আহ্নিক শেষ করিয়া লই, তারপর একটা ফর্দ করা যাবে।" এই বলিয়া পুরোহিত-মহাশয় বাড়ির মধ্যে চলিয়া গেলেন; কিশোর সেখানেই বসিয়া রহিল।

৫

কিশোর নানাস্থানে কাজ করিয়া কিছু অর্থসংগ্রহ করিয়াছিল; পাঁচ বৎসর পরে একবার জন্মভূমি, বাপ-মা, দুঃখিনী পত্নীকে দেখিবার ইচ্ছা হয়। তাই সে বাড়ি আসিয়াছিল। বাড়িতে আসিয়া যাহা শুনিল, তাহাতে তাহার সকল বন্ধনই ছিঁড়িয়া গেল।

কিশোর পুরোহিত-মহাশয়ের হস্তে তাহার সমস্ত সঞ্চিত অর্থ দিয়া বলিল, "ঠাকুর-মশাই এবং-এর কাছে আর কিছু নেই। এই দিয়েই বাপ-মায়ের কাজটা শেষ করে দিন; আর যদি পারেন, তাহলে সে পরের মেয়েটারও একটা পিণ্ডি দেবার যোগাড় করুন।"

পুরোহিত মহাশয় বলিলেন, "কিশোর সব টাকা যদি শ্রাদ্ধেই ব্যয় কর, তাহলে পরে কি হবে, সে কথা ত ভাবতে হয়! আমি বলি কি, কিছু খরচ করে শ্রাদ্ধটা শেষ কর, আর বাকি টাকা দিয়ে বাড়িতে দুই-একখানি ঘর তোল, আবার একটা বিবাহ কর, সুখে-স্বচ্ছন্দে ঘর-করনা কর। বাপের নাম বজায় থাক!"

কিশোর বলিল, "ঠাকুর-মশাই তা আর হয়না, এবং সে পথে আর যাবে না। যে কয়দিন দেবতা বাঁচিয়ে রাখবেন, কোন মতে দিন কেটে গেলেই হয়। ওসব আদেশ আর করবেন না। এবং ও-পথে আর যাচ্ছে না।"

পুরোহিত মহাশয় বলিলেন, "তুমি ও কি এবং আরম্ভ করলে। মাথা খারাপ হয়ে গেল না কি?"

কিশোর বলিল, "না ঠাকুর, বাপ-মায়ের দেওয়া নাম ও নেওয়া হবে না, বাপ-মায়ের দেওয়া নাম ও আর না; এ দাস এখন এবং।"

পুরোহিত 'মহাশয় বুঝিলেন, কিশোরের মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে, তিনি আর কিছু বলিলেন না। পরদিন যথারীতি কিশোর তাহার বাপ-মায়ের এবং তাহার স্ত্রীর শ্রাদ্ধ করিল।

৬

গ্রামের লোক আর কিশোরের নাম ধরিয়া ডাকে না, সকলেই বলে 'এবং'। কিশোর পুরোহিত মহাশয়ের বাহিরের ঘরে এক পার্শ্বে থাকে; সে মুটের কাজ করে। কিন্তু সে তাহার প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটি পয়সাও উপার্জন করে না।

প্রতিদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া সে নিকটবর্তী হাটে যায়। হাটের অনতিদূরে একটা খাল।

হাটে যাহারা জিনিসপত্র বিক্রয় করিতে আসে, তাহাদের অনেকেই দূরস্থান হইতে নৌকায় বোঝাই দিয়া জিনিষপত্র· লইয়া আসে। কিশোর নৌকা হইতে তাহাদের বোঝাগুলি হাটে পৌছাইয়া দেয়; কিন্তু সে অধিকক্ষণ বোঝা বহে না; আটটি কি দশটি পয়সার মত কাজ হইলেই সে আর বোঝা মাথায় করে না, বলে, "এবং আর বোঝা বইছেনা; এই পেটের বোঝা নামেনা, তাই বোঝা বইতে হয়।"

কেহ যদি বলে "বিপদ আপদ; রোগ ভোগ ত আছে, তখন কি হবে?"

কিশোর হাসিয়া উত্তর দেয়, "তখন এবং-এর বোঝা বইবার লোক আছে গো—লোক আছে। এবং আর বোঝা ভার করছে না।"

আট দশটি পয়সা পাইলেই সে হাট হইতে যাহা ইচ্ছা হয় কিনিয়া লইয়া পুরোহিত মহাশয়ের বাড়িতে যায়। কোন দিন বা রান্না করিয়া খায়, কোন দিন বা চিড়া-মুড়কি কিনিয়া আনিয়া তাহাই আহার করিয়া দিন কাটায়। পুরোহিত মহাশয় কতদিন কিশোরকে প্রসাদ পাইতে বলিয়াছেন; কিন্তু সে কিছুতেই প্রসাদ গ্রহণ করিত না; বলিত, "এবং বোঝা বইতে এসেছে, বোঝা বইবে আর খাবে, বসে-বসে খাবে না।"

সারাদিন কিশোর পুরোহিত মহাশয়ের বাহিরের ঘরেব এক প্রান্তে শয়ন করিয়া থাকে; কিন্তু প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় সে একবার তাহার সেই পরিত্যক্ত, জঙ্গলাকীর্ণ বাড়ির সম্মুখে দাঁড়াইবেই; কিছুতেই কেউ তাহার সে কার্যে বাধা দিতে পারিত না; ঝড় হউক, বৃষ্টি হউক, কিশোর একবার সেই তাহার পৈতৃক বাড়ীর সম্মুখে যাইয়া দাঁড়াইত এবং করজোড়ে কি ভাবিত; তাহার পর আভূমি প্রণত হইয়া সে গান ধরিত—

"ওরে দিন ত গেল, সন্ধ্যা হোলো,
পার কর আমারে।
তুমি পারের কর্তা, শুনে বার্তা
ডাক্‌ছি হে তোমারে।"*

সন্ধ্যার অন্ধকার যখন ঘনাইয়া উঠিত, তখন প্রতিদিন প্রতিবেশীরা কিশোরের কণ্ঠনিঃসৃত এই সুন্দর গান শুনিয়া তৃপ্তি লাভ করিত। কিন্তু তাহার পর, অন্য সময়ে যদি কেহ তাহাকে গান গায়িতে বলিত, তাহা হইলে সে বলিত, "এবং কি গান জানে? ঐ একটাই সে জানে— তা তোমরা শুনে কি করবে?"

কিশোরকে গ্রামের সকলেই ভালবাসিত। পুরোহিত মহাশয়ও তাঁহার বাড়ির সকলে বলিত, কিশোর রাত্রিতে মোটেই নিদ্রা যায় না, সমস্ত রাত্রি জাগিয়া জপ করে; কখন হাসে, কখন কাঁদে; কেহ যদি সেই সময় ডাকে, অমনই সে আত্মসংবরণ করে—কিছুতেই সে তাহার সাধন-ভজনের কথা কাহাকেও বলেনা। পুরোহিত মহাশয় সকলের নিকটই গল্প করিতেন যে, কিশোরের সঙ্গে দেবতাদের কথা হয়, তাই কিশোর অমন হয়ে গিয়েছে। কিশোরকে জিজ্ঞাসা করিলে যে হাসিয়া বলে, "এবং মোট খাটতে এসেছে, মোট খাটে; দেবতার সঙ্গে তার কি? তবে বোঝা বইবার কথা বলচ। তা এবং-য়ের বোঝা বইতে হবে না? খুব হবে—আল্‌বৎ হবে!"

*কাঙাল হরিনাথের পদের ঈষৎ পরিবর্তিত রূপ।

এমনই ভাবে অনেক দিন চলিয়া গেল; গ্রামের সকলে কিশোরকে শুধু ভালবাসে না, শ্রদ্ধা কবে। গ্রামে কাহাবও কোন বিপদ হইলে কিশোর বুক দিয়া পড়ে, প্রাণপণে যত্নচেষ্টা করে, সকলেই সেইজন্য তাহার অনুগত। কিন্তু কিশোর কোন দিন কাহারও নিকট কোন প্রকার সাহায্য গ্রহণ করে না।

৭

একদিন প্রাতঃকালে কিশোর যথানিয়মে হাটে গেল, কিন্তু সেদিন আর সে মোট মাথায় করিল না। দোকানদারেরা যখন কিশোরকে মোট লইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিল, তখন সে হাসিয়া বলিল, "এবং আর মোট বইবে না; সে আজ বোঝা নামিয়েছে।"

একজন বলিল, সে কি কিশোর!"

কিশোর বলিল, "আজ এবং-য়ের বোঝা বওয়া শেষ হয়েছে। অনেক দিনের বোঝা আজ নেমে গেছে গো! তোমারা আজ বেলা বারটাব সময় ঘাটে এস, তোমাদের নিমন্ত্রণ রইল।"

আব একজন দোকানদাব হাসিয়া বলিল, "হ্যাঁ কিশোর, আজ বাবটার সময কিসেব নিমন্ত্রণ?"

কিশোব বলিল, "ওগো বুঝতে পাবছ্না, আজ এবং বোঝা নামিযেছে; বেলা বাবটাব সময এবং বোঝা বিসর্জন দেবে, তোমরা সবাই এস গো।"

সকলেই মনে কবিল, কিশোর তামাশা কবিতেছে; দুই একজন সে কথা বলিল। কিশোব বলিল, "তামাশা নয ভাই, তামাশা নয়, এবং আজ তার সব বোঝা ঘুচিয়ে দিযে চলে যাবে; আব কি সে বোঝা বয়। তার যে ডাক পড়েছে।" কেহই কিন্তু কথাটা বিশ্বাস করিল না।

এদিকে কিশোর পুবোহিত মহাশয়ের বাড়িতে যাইয়া তাহাকে বলিল, "ঠাকুব, আজ দুপুব বেলা আপনাকে একবার খালের ধারে যেতে হবে।"

পুবোহিত মহাশয বলিলেন, "দুপুরবেলা খালের ধারে কেন কিশোর?"

কিশোর বলিল, "একবাব পায়ের ধূলো দিতে হবে ঠাকুর! এবং আজ বোঝা নামাবে।"

পুবোহিত মহাশয বলিলেন, "তোমার কথা ত কিছুই বুঝতে পারলাম না, কিশোব।"

কিশোব বলিল, "সেখানে গেলেই বুঝতে পারবেন ঠাকুর-মশাই।" এই বলিয়া কিশোব সেই স্থানেই বসিযা পড়িল এবং অনুচ্চস্বরে কি বলিতে লাগিল। পুরোহিত মহাশয় কিশোবের এভাব জানিতেন; সুতবাং তিনি কার্যান্তরে চলিয়া গেলেন।

বারটা বাজবার কিঞ্চিৎ পূর্বেই কিশোব ধ্যান ভঙ্গ হইল। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পুরোহিত মহাশয়ের বাড়ির মধ্যে যাইয়া ডাকিল, "ঠাকুরমশাই, আসুন; বেলা যে হয়ে এল।"

পুরোহিত মহাশয় বলিলেন, 'কিসের বেলা কিশোর?"

কিশোব বলিল, "এবং-য়ের বোঝা নামাবার সময় যে হয়ে এল, আপনি আসুন, একটু পায়ের ধুলো যে দিতে হবে ঠাকুর!"

পুরোহিত ঠাকুর আর কি করেন; ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন, কিশোর তাহার পশ্চাতে চলিল।

তাহারা খালের ধারে উপস্থিত হইল। তখনও হাট ভাঙ্গে নাই। কিশোর তখন বলিল, "ঠাকুরমশাই, তবে এবং বোঝা নামাক?"

পুরোহিত ঠাকুর বলিলেন, "তোমার অভিপ্রায় কি, তা ত বুঝতে পারছি নে কিশোর।"

কিশোর আর কোন কথা বলিলনা; ধীরে ধীরে পুরোহিত ঠাকুরের পদধূলি গ্রহণ করিল। তাহার পর সে জলে নামিল। তামাশা দেখিবার জন্য হাটের লোক তখন খালের ধারে কাতার দিয়া দাঁড়াইল। কিশোর জলে দাঁড়াইয়া এক গণ্ডূষ জল মাথায় দিল। তাহার পর একবার সে চিৎকার করিয়া বলিল, "হরিবোল"—তাহার পরই একেবারে চুপ!

তখন সকলে ধরাধরি করিয়া কিশোরের দেহ তীরে তুলিল;—দেখিল সব শেষ হইয়া গিয়াছে,—কিশোর সাধনোচিত ধামে চলিয়া গিয়াছে।

এখনও লোকে সেই ঘাটের নাম 'এবং ঘাট' বলিয়া থাকে।

গৃহিণীরোগ

আফিস থেকে ফিরতেই প্রত্যহই ছ'টা বাজে। আবার যে দিন কাজ চেপে পড়ে, সেদিন আটটা সাড়ে আটটাও হয়। যাঁরা নিম্ন কর্মচারী, তাঁরা বলেন, আফিসের বড়বাবু, মাস গেলে চারশ'খানি টাকা পান—খাটবেন না? আমাদের যেমন দান, তেমনই দক্ষিণা; দশটা পাঁচটা কাঁসি বাজাই—চল্লিশ পঞ্চাশ যা পাই, বহুৎ আচ্ছা!

এই ত গেল আফিসের কথা। বাড়ির অবস্থা আরও সঙ্গিন। সে কেমন শুনবেন?

একদিন একটু সকাল অর্থাৎ অপরাহ্ন সাড়ে ছ'টার সময় বাড়ি এসে দেখি, উপরে আমার শয়ন ঘরে আমার গৃহিণী শুয়ে আছেন, মাথার উপরে হু হু করে পাখা চলছে, বুড়ো ঝি শ্যামার মা গৃহিণীর পায়ের কাছে বসে আছে।

আমাকে ঘরে প্রবেশ করতে দেখেই শ্যামার মা অতি কর্কশ স্বরে বলে উঠল— " যা হক, বাবুর ঘরে আসবার সময় হয়েছে, সে ও ভাল।"

আমি এমন সুমিষ্ট সম্ভাষণের কোন কারণ বুঝতে না পেরে জিজ্ঞসা করলাম, "কি হয়েছে? উনি শুয়ে রয়েছেন যে? অসুখ—"

আমার কথা শেষ করতে না দিয়েই শ্যামার মা ঝঙ্কার দিয়ে উঠল—"শুয়ে থাকবেনা, কি নেচে বেড়াবে? এই যে এত দিন থেকে বাছার আমার অসুখ, তার কি খোঁজ নেওয়া আছে?"

শ্যামার মা অনেক দিনের ঝি। সে আমার স্ত্রীকে 'মানুষ' করেছিল। তাব পর তিনি যখন আমার গৃহিণী হয়ে এলেন, তখন তাঁর সঙ্গে সঙ্গে এই ঝিটিকেও ফাউ পাওয়া গিয়েছিল; শ্যামার মা বলতে গেলে সেই থেকেই এ বাড়ির অভিভাবিকা,—তার উপরে কথা বলে, এমন সাহস কারু হয় না। আর হবেই বা কার? বাড়িতে আমি, আর আমার স্ত্রী। একটি মেয়ে, তাকেও বছর দুই হল তালতলার ঘোষেদের বাড়িতে বিয়ে দিয়েছি; সে সেখানে বেশ সুখে আছে। সুতরাং শ্যামার মার ক্ষমতা অব্যাহতই আছে।

শ্যামার মা যে গুরু চার্জ আমার উপর করল, তা অস্বীকার করে আরও গোলমাল না বাধিযে, আমি নিতান্ত ভাল মানুষের মত বল্‌লাম, "এমন অসুখ, তা আমাকে আফিসে খবর পাঠালেই আমি তখনই ছুটে আসতাম, এত দেরি হোতনা।"

শ্যামার মা উত্তর দিল, "অসুখ কি আজই হয়েছে? এই মাসখানেক ধরেই অসুখ। সেই যে বেলা ১১টার সময় দুটো ভাত মুখে দিয়ে—আহা, বাছার আমাব কি সে খাওয়া আছে? ঐ নামমাত্তর ভাতের কাছে বসেই উঠে এসে সেই যে বিছানায় পড়ে, আব ৫টার আগে উঠতে পারে না। সেই যে ৫টার সময় কষ্ট করে উঠে, তাই কি সাধ করে? শুযে থাকতে বল্‌লে বলে, "না, না, বাবুর আমার সময় হ'ল। তাঁকে আমি না দেখলে কে দেখবে? বাবুব ত সে দিকে দিষ্টি কত! বাছার আমার শরীরে কি পদার্থ আছে!"

অসুখ যে কি এবং তাহা যে কেমন গুরু, শ্যামার মার এই সুদীর্ঘ বক্তৃতায় তার ত কোন হদিশই পেলাম না। এত দিনের মধ্যে কোন দিন কোন কথা শুনতেও পাইনি, দেখতেও পাইনি।

কিন্তু আজ যে প্রকার গুরু ব্যাপার, তাতে সে কথা ত বলা যায় না। সুতরাং নিতান্ত বিনীতভাবে অপরাধ স্বীকার করে যতখানি সহানুভূতি সংগ্রহ করা যেতে পারে, তাই করে বল্লাম—"তাইত, ভারি অন্যায় হয়ে গেছে। সেই গাধার খাটুনি খেটে সন্ধ্যার পর এসে আর কোন দিকে চাইবার শক্তি থাকে না। তারই জন্য ওঁর অসুখ এমন বেড়ে উঠেছে। আমারই অমনোযোগে এমন হয়েছে। যাক্ সে কথা বলে দুঃখ করে এখন আর কি হবে। আমি এখনই যাই, ললিত ডাক্তারকে ডেকে আনি।"

গৃহিণী এতক্ষণ নীরবই ছিলেন, ললিত ডাক্তারের নাম করতে যেন তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন, মুখখানি যথাতিরিক্ত বিকৃত করে বললেন, "ললিত ডাক্তার কেন, শ্রীচরণ কম্পাউন্ডার কে ডেকে আনলেই হবে। আমার যেমন পোড়া কপাল।"

এই নেও ! চারশ টাকা মাইনের আফিসের বড়বাবুর একমাত্র সহধর্মিণীর এমন দারুণ অসুখ, আর আমি কি না ডাকতে চাইলাম, পাড়ার ললিত ডাক্তারকে। যার মোটর দূরে থাক গাড়ি ঘোড়াও নেই, সে এক টাকার বেশি ভিজিট নেয়না, হয়ত পায়ওনা, আমি কি না আমার মহামহিমময়ী গৃহিণীর চিকিৎসার জন্য তাকে ডাকবার প্রস্তাব করলাম। কি ধৃষ্টতা আমার!

আমি তখন আমার নির্বুদ্ধিতার কৈফিয়ত স্বরূপ বললাম, "আরে, ললিতকে কি আর চিকিৎসার জন্য ডাকতে চাইছি। তোমার যে রকম ভয়ানক অসুখ, তাতে বাড়িতে একজন ডাক্তার সর্বদার জন্য রাখা দরকার। তাই তাকে পাঠিয়ে দিয়ে আমি একজন বড় ডাক্তার আনতে যাচ্ছি। তোমার চিকিৎসা ললিতকে দিয়ে করাব—আমি কি পাগল হয়েছি?" মনে মনে কিন্তু যা বললাম,—তা আর লিখে কাজ নেই।

কি আর করি? সেই সন্ধ্যাবেলাতেই অফিসের কাপড় না ছেড়েই একজন ভাল ডাক্তারের খোঁজে বার হলাম। কিন্তু যাই কার কাছে? ডাক্তার নীলরতন সরকার কি বিধান রায়ের কাছে নিয়ে আমার গৃহিণীর এবংবিধ দারুণ অসুখের কথা বললে তাঁরা তখনই হয় আমাকে পাগল বলে তাড়িয়ে দেবেন, আর না হয়, দয়া পরবশ হয়ে আমাকে পাগলা গারদে পাঠাবার জন্য পুলিশের জিম্মা করিয়ে দেবেন।

শেষে মনে পড়্ল, ডাক্তার বোসের কথা। শুনেছি তিনি নাকি এই রকম রোগীর চিকিৎসায় সিদ্ধহস্ত। তার সঙ্গে ত আমার তেমন আলাপ পরিচয় নেই। দুই তিনবার বন্ধুদের বাড়িতে দেখা হয়েছিল মাত্র। তিনিও আমার নাম জানেন, আমিও তাঁর নাম জানি। পথে ঘাটে দেখা হলে আজকালকার ভদ্রতা সঙ্গত "নমস্কার মশাই" "ভাল ত' এই রকম মামুলি সম্ভাষণের অধিক কোন কথা কোন দিন হয় নি—ঘনিষ্ঠতা তো দূরের কথা। তবে অনেকের কাছ তার প্রশংসা শুনেছি। ডাক্তারও বেশ নামওয়ালা। সুতরাং তাঁর কাছে যাওয়াই স্থির করলাম।

ডাক্তার বোসের বাড়ি আমার জানা ছিল। তাঁর বাড়িতে গিয়ে শুনলাম, তিনি বাড়িতেই আছেন। মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা করার পরই ডাক্তারবাবু উপর থেকে নেমে এলেন এবং আমাকে দেখে সহাস্যমুখে বললেন, এই যে বিজয়বাবু, আসুন আমার বসবার ঘরে।"

তাঁর রোগী দেখবার ঘরের মধ্যে গিয়ে আমাকে বসিয়ে বললেন, "তারপর এ অসময়ে একেবারে আফিসের ড্রেসে এসে উপস্থিত, ব্যাপার কি?"

আমি বললাম, ব্যাপার কিছু সঙ্গিন না হলে কি এ সময় আপনাকে বিরক্ত করতে আসি? আপনার সময় হবে ত? সব কথা বল্‌তে হয়ত দশমিনিট সময় লাগবে।"

ডাক্তার বললেন, "আমি এখন আর কোথাও বেরুবনা, যথেষ্ট সময় আছে। কেউ 'ডিসটার্ব্ব' না করে, দুয়ারটা বন্ধ করে দিই।" এই বলে তিনি ঘরের প্রবেশ দ্বার বন্ধ করে বিজলি বাতি ও পাখা খুলে দিলেন। তারপর বললেন, "এখন বলুন, আপনার ব্যাপারটা কি?"

আমি বললাম, "আমার স্ত্রীর নাকি ভয়ানক অসুখ!" ডাক্তার হেসে বললেন,—"না, কি কথাটা ত বুঝতে পারলাম না বিজয়বাবু।"

আমি বললাম,—"কি যে অসুখ, তা আমি জানিনে। প্রত্যহ সাড়ে ৯টায় আফিসে যাই, সাড়ে ৬টা ৭টায় বাড়ি ফিরি। আমাব স্ত্রীকে কোন দিন অসুস্থ দেখিনে। আজ আঠারো বছর যেমন দেখে আসছি, তাই-ই দেখি। শরীরেও কোন বৈকল্য দেখিনি। বাড়িতে ছেলেপিলে নেই যে, হাঙ্গামা পোহাতে হয়। একটি মাত্র মেয়ে তারও দুবছর হোল বিয়ে দিয়ে দিয়েছি। সে কখনও এক আধবেলার জন্য আসে, আর চলে যায়। বাড়িতে চাকর, ঝি, বামুন, সইস-কোচোযান সবই আছে। গিন্নীকে শ্রমসাধ্য কোন কাজই করবার দরকার হয়না। এই ত অবস্থা। আজ এই একটু আগে বাড়ি এসে দেখি, তিনি শুয়ে আছেন। আমি ঘরে প্রবেশ করতেই তার বাপের বাড়ি থেকে আমদানি করা বুড়ো ঝি শ্যামার মা একেবারে রেগে অস্থিব। তার বাছার নাকি গুরুতর অসুখ; আর আমি নাকি কোন দিন সে দিকে 'দিষ্টি' দিইনে। আমি ত মশাই, মহাসঙ্কটে পড়লাম। শেষে অনেক বক্তৃতা ও অনেক ভর্ৎসনার পর শ্যামার মা রোগের যে বিবরণ দিলেন, তা থেকে আমি এক বর্ণও বুঝতে পারলাম না। আপনি শুনেছি মনস্তত্ত্ববিদ্ চিকিৎসক, আপনি যদি কিছু বুঝতে পারেন। শ্যামার মা বলল যে, তার বাছা অর্থাৎ আমার স্ত্রী বেলা ১১ টার সময় প্রত্যহই পাতের কাছে বসেন মাত্র, তারপর উঠেই যে শয্যাগ্রহণ করেন, বিকেলে ৫টার পূর্বে আর সে শয্যা ত্যাগ করতে পারেন না, এমনই তিনি কাতর। আমি ৬টার পর বাড়ি আসি, তখন আর কিছু দেখতে পাইনে, জানতেও পাইনে, গৃহিণীও কিছু বলেন না। আজ ৫টায় পরেও তিনি শয্যা ত্যাগ করতে পারেননি। এই পর্যন্তই আপনাকে বলতে পারি, ডাক্তারবাবু! কাজেই আমাকে ডাক্তার ডাকতে ছুটে আসতে হ'ল।"

ডাক্তার বোস আমার কথা শুনে হেসে বললেন, "আপনাকে আর বলতে হবে না, আমি আপনার গৃহিণীর ও আপনার অসুখের কথা বুঝতে পেরেছি।"

আমি সবিস্ময়ে বললাম,—"আমার অসুখ! আপনি কি এতক্ষণ সব কথা শোনেননি? অসুখ আমার স্ত্রীর, আমার নয়, আমি বেশ সুস্থ আছি।"

ডাক্তার বললেন, "সে পরে বিবেচনা করা যাবে। এখন আমাকে কি করতে বলেন? এখনই কি আপনার রোগীকে দেখতে যেতে হবে?"

আমি বললাম,—"সর্বনাশ! আপনি এখনই যাবেন কি? তাহলে কি গৃহিণী আপনাকে

আমল দেবেন, না আপনার ব্যবস্থাগত ঔষধ ব্যবহার করবেন; তিনি অমনই বলে বসবেন, বড় ডাক্তার, না ছাই, ওর মোটেই পসার নেই, বড় ডাক্তারদের কি ডাকবামাত্রই পাওয়া যায়? আপনি পণ্ডিত হয়ে কথাটা বুঝতে পারেননি। আপনি আসছে কাল একটা সময় বলে দিন; সেই সময় যাবেন। আমি বাড়ি গিয়ে আপনার এখন সময় হোল না, আর আপনার ভয়ানক পসারের কথা সত্যমিথ্যা বানিয়ে তাঁকে বলে আপনার উপর শ্রদ্ধা বাড়িয়ে রাখব। তবে ত এ রোগের চিকিৎসা ঠিক হবে। কি বলেন ডাক্তার বাবু, আমার কথা সঙ্গত কি না?"

ডাক্তার বাবু বলিলেন,—"সত্যই আমি অতটা ভেবে দেখিনি বিজয়বাবু। আপনি দেখছি মনস্তত্ত্ব বিষয়ে আমার অপেক্ষাও সূক্ষ্মদর্শী। যাক্ তাহলে আমি কাল সাড়ে ৯টায় আপনার বাড়িতে যাব? ঠিকানাটা লিখে রাখছি।"

আমি বললাম, "আর একটু আগে কি সময় হতে পারে না, ডাক্তারবাবু? সকাল সাড়ে ৯টায় গেলে, হয় কাল আমাকে আফিস কামাই করতে হয়, আর না হয় 'লেট' হয়। তাতে ত কাজের ভারি অসুবিধা হবে।"

ডাক্তারবাবু একটু চিন্তা করে তার ডায়েরি বইখানি নেড়ে চড়ে বললেন,—"বেশ একঘণ্টা আগে, সাড়ে আটটায় যাব! কেমন, তা হলে তা আপনার অসুবিধা হবে না?"

আমি বল্‌লাম, "না, কোন অসুবিধা হবে না; ঠিক সাড়ে ৮টাতেই যাবেন। ১০ মিনিট আগে গিয়ে যেন না ওঠেন। বরঞ্চ ২ মিনিট দেরি হলেও কোন ক্ষতি হবে না। আগে গেলে কি হবে বুঝেছেন তো? গৃহিণী অমনিই মনে করবেন, এ ডাক্তারের হাতে তেমন রোগী নেই।"

ডাক্তার বললেন, "আর আপনাকে কিছু বলতে হবে না, আমি বেশ বিবেচনা করে কাজ করব; আমি সব বুঝতে পেরেছি।"

আমি বললাম,—ডাক্তার বোস, যদি কিছু মনে না করেন, তাহলে আর একটা কথা বলতে চাই।"

তিনি বললেন,—"সে কি কথা; আপনি বলুন না।"

আমি বললাম—"দেখুন, আমি অনেক দিন দেখেছি, আপনি সকালে বা বিকালে যখন রোগী দেখতে আপনার মোটরে চড়ে যান আর আপনার পরনে খদ্দরের টুপি, গায়ে গরদের পাঞ্জাবী, আর কাঁধের উপর খদ্দরের চাদর দেখতে পাই। পায়ে কি দেন, দেখতে পাইনে, হয়ত চটিই হবে। ওযে শ্বশুরবাড়ী নেমন্তন্নে যাবার পোষাক। ও পরে আমার বাড়ির রোগিনীকে দেখতে গেলে তিনি আপনাকে আমলই দেবেন না। আপনাকে একেবারে ফিটফাট 'সাহেব' সেজে যেতে হবে। তিনটে বাংলা কথার সঙ্গে দশটা ইংরেজি কথা বলতে হবে। তবে ত রোগীর মনে হবে, হ্যাঁ, ডাক্তার বটে। এই সব ভদ্রতা বিরুদ্ধ কথা থেকেই আপনি বুঝতে পারছেন। আমি ফিরে গিয়ে আপনার সম্বন্ধে যে সব কথা তাঁকে বলব তাঁর শ্রদ্ধা বাড়িয়ে রাখব, কাল তার কিছু গলতি হলে কি আব আমার বাঁচোয়া থাকবে। তাই এত কথা বলতে হোল; আমার অবস্থা বিবেচনা করে ক্ষমা করবেন।

ডাক্তারবাবু বললেন, "ওসব কিছু মনে করবেন না; আমাকে অনেক রকম রোগী নিয়ে কারবার করতে হয়. বিশেষ মাথা পাগলা রোগী নিয়ে আমাকে অনেক সময় থাকতে হয়।

তাদের কথার কাছে, আপনার কথাগুলো তেমন বেশি অসংলগ্ন নয়। বিশেষত আপনাকে যে রোগী নিয়ে ঘর করতে হচ্ছে, তাতে আপনাকে যে বিশেষ সতর্ক হতে হয়, এত জানা কথা। তা হলে আপনি আসুন, আমি কাল ঠিক কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে আটটায় যাবো, আর যা যা করতে হয় করব। কোন রকম ভুলের জন্য আপনাকে বিব্রত হতে হবে না।"

আমি বিদায় নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছি, তখন আর একটা কথা মনে পড়ে গেল। আমি বিনীত ভাবে বললাম—"আর একটা কথা বলতে ভুল হয়ে গেছে। বড়ই বিরক্ত করছি, ডাক্তার বোস, ক্ষমা করবেন।"

ডাক্তার হেসে বললেন,—"আবার কি ভুল হ'ল বলুন।"

আমি বললাম,—"রোগী দেখে আপনি যখন উঠবেন, আমি তখন আপনাকে যে কটি টাকা ফি দেব; আপনি অমনি বলে বসবেন, আমার ফি যোল নয়, বত্রিশ টাকা। বুঝলেন? এটাও দরকার, ভুলবেন না।

ডাক্তার উচ্চহাস্য করে বললেন, "বিজয়বাবু, আপনি দেখছি, এসব রোগের আমার অপেক্ষা পাকা চিকিৎসক। বেশ, বেশ, তাই হবে; আমি বত্রিশ টাকাই চাইব।"

ডাক্তার বোসের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি বাড়ি ফিরে এলাম। এসে দেখি গৃহিণী শয্যাত্যাগ করে ঘরের মেঝেতে বসেছেন, বামুন ঠাকুর এক বাটি দুধ হাতে করে দাঁড়িয়ে আছেন। আর শ্যামার মা দুধটুকু খাবার জন্য গৃহিণীকে জেদ করছেন।' আমাকে দেখেই শ্যামার মা বলল, "ডাক্তার আসছে না কি?"

আমি বললাম,—"জানত কলকাতা সহরে বলবা মাত্রই বড় ডাক্তার মেলে না।"

আমার গৃহিণী বললেন, "সে ত ঠিক কথা; বড় ডাক্তারদের কত রোগী। তিন দিন ঘুরে তবে একজনকে পাওয়া যায়।"

মিথ্যা কথা বলতে কোন দিনই আমার বাধে না। তা যদি হোত তা হ'লে আর ত্রিশ টাকার কেরানি থেকে চারশ টাকার বড়বাবু হ'তে পারতাম না। সুতরাং গৃহিণীর অনুকূলে মন্তব্য শুনে আমার মিথ্যার ভাণ্ডার একেবারে খুলে গেল। আমি আফিসের কাপড় ছাড়তে ছাড়তে বললাম,—"বুঝলে, এই কলকাতা সহরে বড় ডাক্তার হঠাৎ পাওয়া যে মুশকিল, তা আজ আমি হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি। এই ধরনা, এখান থেকে বেরিয়ে প্রথমে ত ঠিক করতে পারিনে, কার কাছে যাই। শেষে ভাবলাম, টাকা আগে, না প্রাণ আগে। এই কথা মনে হতেই একেবারেই ছুটে গেলাম নীলরতন সরকারের বাড়ি। সেখানে গিয়ে শুনি তিন দিন থেকে তিনি অসুস্থ; নীচেও নামেন না, রোগীও দেখেন না। তখন আর কি করি, দৌড়োলাম বিধান রায়ের বাড়ি। গিয়ে দেখি তিনি ব্যাগ সাজাচ্ছেন। কি ব্যাপার! না এখনই তাঁকে কোন্ নরসিংগড়, না প্রতাপগড়ে যেতে হবে। মোটর প্রস্তুত। এক ঘণ্টা পরে হাওড়ায় ট্রেন। কি করি, সেই গোলমালের মধ্যেই তাঁকে রোগীর অবস্থা বললাম। তিনি বললেন,—এক কাজ করুন। যে রোগের কথা বললেন, তাঁর চিকিৎসা সম্বন্ধে ডাক্তার বোস খুব উপযুক্ত; তাঁকে নিয়ে যান। আমি যদি থাকতাম, তা হলেও তাঁকে নিয়ে যেতেই আপনাকে পরামর্শ দিতাম। সেখান থেকে ছুটলাম, ডাক্তার বোসের বাড়ি—বিলম্ব ত করা যায় না। তাঁর বাড়ি ঠিক সময়ে পৌছেছিলাম।

তিনি রোগী দেখতে বেরুচ্ছেন; মোটরে এক পা দিয়েছেন; সেই সময় গিয়ে আমি উপস্থিত। তিনি আর ঘরে ফিরলেন না; তাঁর খুব তাড়াতাড়ি কোথায় যেতে হবে। আমি আমার বিপদের কথা বল্‌তে তিনি বললেন—"তাই ত বিজয়বাবু, এখন তো যেতেই পারব না। এত রোগী আমার হাতে যে, বাড়ি ফিরতে সেই রাত ১১টা। তখন ত আর যাওয়া যায় না। আচ্ছা দেখছি। এই বলে তাঁর নোটবুক খুলে দেখে বললেন, কাল বেলা ১টার পূর্বে আর আমার যাওয়ার সুবিধে হবে না।' তখন কি করি, অনেক সাধ্য-সাধনা করলাম যা চাইবেন, তাই দিতে স্বীকার করলাম। তবুও আজ রাত্তিরে তিনি সময় করতে পারবেন না, বললেন। অনেক অনুরোধের পর তিনি কাল ঠিক সাড়ে আটটার সময় আসতে স্বীকার করে সেই কথা নোট বুকে নিয়ে নিলেন। একবার মনে হয়েছিল, জিজ্ঞাসা করি, কত ফি দিতে হবে। তখনই ভাবলাম, টাকা আগে, না প্রাণ আগে। যা চাইবে, তাই দেব। কি বল?"

এইবার গৃহিণীর মুখে হাসি ফুটল। তিনি বললেন, "আহা, বড় কষ্ট ত হয়েছে। ও রাধি, ও ঠাকুর, বাবুর হাত মুখ ধোয়ার ঠিক করে দে ত। যাও ঠাকুর, এত রাত্তিরে আর জল খাবার দিয়ে কাজ নেই। শিগগির একেবারে খাবার ঠিক করে দেও।"

যাক্ মিষ্ট কথায় পেট না জুড়োক শরীর ত জুড়িয়ে গেল। আমি তখন সাহস পেয়ে বললাম,—"হাঁ ডাক্তার বটে বোস। দেখ দেখি কি পসার, রাত ১১টা পর্যন্ত রোগী দেখতে হয়। কাল ১টার আগে আসতে পারবে না বলে বসল। শেষে অনেক করে বলে তবে সাড়ে ৮টা করলাম। এ ত আমাদের ললিত ডাক্তার নয়, এ একেবারে সাহেব; বাংলা কথা বড় একটা বলেই না। আর কি প্রকাণ্ড মোটর।"

গৃহিণী বললেন, "তা আর হবে না! অত বড় ডাক্তার যে পাওয়া গিয়েছে, এই আমার সৌভাগ্য।"

যাক, এতগুলো মিথ্যা কথা একেবারে বৃথায় যায়নি। কাজ হয়েছে। আমি নিশ্চিন্ত হলাম।

পরদিন ৮টা বাজতেই গৃহিণী মহাব্যস্ত হয়ে উঠলেন,—"ওগো, তুমি নীচের বৈঠক খানায় গিয়ে থাক। কি জানি, বলা ত যায় না। ডাক্তার সাহেব যদি সাড়ে ৮টার আগেই এসে পড়েন।"

আমি বললাম,—"তুমি বল কি? একি যে-সে ডাক্তার যে আধঘণ্টা আগে এসে বসে বসে গল্প করবে? ডাক্তার ঠিক সাড়ে আটটায় আসবে, দু মিনিট আগে আসবারও তার সময় হবে না।"

গৃহিণী উল্লসিত হয়ে বললেন,—"তা কি আর আমি জানিনে, তবুও তুমি নীচে গিয়ে অপেক্ষাই করনা।"

আমি, সব ঠিক করে এসেছি; তবুও গৃহিণীর আদেশ নীচে যেতে হ'ল।

পূর্বের ব্যবস্থা মত ডাক্তার সাড়ে ৮টার সময় এলেন—একেবারে আঠারো আনা "সাহেব"। এসেই তাড়াতাড়ি রোগী দেখতে চললেন। মুখে একটাও বাংলা কথা নেই—খাঁটি বিলাতি বুঝি। গৃহিণী প্রস্তুতই ছিলেন। ডাক্তার তখন বুক-পিঠ পরীক্ষা করলেন; কতক বা আমাকে ইংরোজিতে বললেন। আমি আবার সেই সব তর্জমা করে উত্তর শুনিয়ে দিলাম। ডাক্তারের সে সব জেরার কথা আনুপূর্বিক বলে আর কথা নেই। অবশেষে তিনি বললেন,

"রোগ কঠিনই বটে। তবে আমি ঠিক এইরকম একটা রোগীকে ৩ দিনে আরাম করেছি,—ছয় ডোজ ওষুধ দিয়ে। এঁকেও বোধ হয়, ৩ দিনেই সারাতে পারব। সেই রোগীর জন্য ব্যবস্থা লিখে দিলাম; তারা কোন দোকানে সে ওষুধ পেলে না। শেষে কি করি, আমাকে বেরুতে হোল। একটা 'সাহেবের' দোকানে এক শিশিমাত্র ওষুধ ছিল। দশ টাকা দিয়ে তাই গিয়ে এখন। ছয় ডোজে ছয় ড্রপমাত্র খরচ হ'ল; বাকিটা আমার কাছেই আছে। আপনাকে বেলা সাড়ে দশটায় একবার আমার বাড়িতে যেতে হচ্ছে। আমি এখন বাড়ি ফিরতে পারছিনে। আপনার ওষুধ দেওয়ার জন্যই সাড়ে ১০টায় আমি পাঁচ মিনিটের তরে বাড়ি ফিরব। ছয় দাগ ওষুধ দেব। রোজ সকালে বিকালে এক দাগ খাওয়াতে হবে। আজ এ-বেলা ওষুধ এনেই এক দাগ খাইয়ে দেবেন। তারপর পথ্যের কথা। এ রোগে পথ্যই হচ্ছে প্রধান। তার একটু গোল হলেই সব মাটি হবে। রোগীকে বাঁচান দায় হবে। সুতরাং পথ্য দেওয়ার ভার আপনাকে নিতে হবে; চাকর-দাসী বা আর কারও উপর সে ভার দিলে আমি চিকিৎসার দায়িত্ব নিতে পারব না। এ ৩ দিন আপনাকে অফিস কামাই করতে হবে শুধু রোগীর পথ্যের ব্যবস্থার জন্য। পথ্য হচ্ছে, বেলা ১২টার সময় ছয় আউন্স ডাবের জল; বেলা ৩টার সময় চার আউন্স ঘোল, আর রাত সাড়ে ৭টার সময় ছয় আউন্স ছানার জল। মেজার গ্লাসে মেপে খাওয়াতে হবে। একটু কম বেশি হলেই বিপদ; কাজেই এ ভার আপনাকেই নিতে হবে, আর কারও উপর নির্ভর করবেন না। এই ঔষধ আর ঐ পথ্য আজ, আর কাল দুদিন চলবে। পরশু আমি এসে পুনরায় পরীক্ষা করে যদি অন্য কোন ব্যবস্থার দরকার হয়, তা করব। আপনি পরশু সকালে খবর দিতে পারেন ভাল, না হয় আমিই আসব। আমি আর বসতে পারছিনে, অনেক জায়গায় যেতে হবে।" এই বলে ডাক্তার যেই উঠবেন, আমি অমনই তাঁকে ১৬টি টাকা দিলাম। তিনি টাকার দিকে চেয়েই বললেন,—"আমার এ সব কেসে ফি ৩২ টাকা।"

আমি তখনই আর ১৬টাকা দিয়ে বললাম—"আপনি ৩২ কেন, তার ডাবল চাইলেও দিতাম।"

ডাক্তাব বললেন,—"কোন ভয় নেই, ৩ দিনেই রোগ সেরে যাবে।" এই বলে তিনি চলে গেলেন।

কি করি, অফিস কামাই করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। ১০ টার সময় পাশের বাড়ি থেকে আফিসে 'বড় সাহেবের কাছে টেলিফোন করে আমার বিপদের কথা জানালাম এবং সহকারী বিধুবাবুকে একবার আমার বাড়ীতে পাঠাবার জন্য অনুরোধ করলাম। সাহেব কথা শুনে দুঃখপ্রকাশ করলেন এবং ৩ দিনের ছুটি মঞ্জুর করলেন।

সাড়ে দশটার সময় গিয়ে ডাক্তারের কাছ থেকে ছয় দাগ ওষুধ নিয়ে এলাম। দাম দিতে চাইলাম, তিনি নিলেন না। যেমন যেমন ব্যবস্থা করেছিলেন, সেইভাবে ঔষধ ও পথ্য দেওয়া হোল। কোনরকমে দিনমান কেটে গেল, কিন্তু রাত আর কাটে না। ছয় আউন্স ডাবের জল, চার আউন্স ঘোল, আর ছয় আউন্স ছানার জল খেয়ে কি মানুষ দিন-রাত কাটাতে পারে? গৃহিণী সন্ধ্যার পর থেকেই ক্ষুধার জ্বালায় ছটপট করতে লাগলেন; কিন্তু উপায় নেই, ডাক্তারের নিষেধ।

কোনরকমে রাত কেটে গেল। ভোরে উঠেই আমাকে পাঠালেন ডাক্তারের কাছে। বলে দিলেন যে, কাল দু'দাগ ওষুধ খেয়েই তাঁর অসুখ সেরে গেছে, ভয়ানক ক্ষুধা হয়েছে; পথ্যের অন্য ব্যবস্থা করতেই হবে।

ডাক্তারের বাড়ি গিয়ে সব কথা বলতে তিনি গম্ভীর হয়ে বললেন, "ওষুধে যে ফল হয়েছে, তা বেশ বুঝা যাচ্ছে। যিনি আহারের সময় পাতের কাছে বসেই অমনই করে পড়তেন, তাঁর যে যথেষ্ট ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছে, এখুব ভাল লক্ষণ। কিন্তু তাই বলে, আজই ঔষধ বা পথ্যের কোন পরিবর্তন করতে পারছিনে। আজ ঐ ব্যবস্থাই চলবে; কাল গিয়ে পরীক্ষা করে দেখে, যা ভাল হয়, করা যাবে,।"

আমি বললাম, "আপনি তো ব্যবস্থা করে দিলেন, এ দিকে বাড়িতে যে আমার তিষ্ঠান ভার হবে, তার উপায় কি?"

ডাক্তার হেসে বললেন,—"এ পাপের শাস্তি আপনাকে ভুগতেই হবে।" কি করব, বাড়ি ফিরে এসে গৃহিণীকে সমস্ত কথা বললাম। তিনি তো রেগেই অস্থির। শুধু ডাবের জল, আর ছানার জল খেয়ে মানুষ থাকতে পারে?

উপায় কি? চিকিৎসক যা বলছেন, তা প্রতিপালন করতেই হবে! সে দিন যে কি কষ্টে গেল; তা আর কহতব্য নয়।

পরদিন ঠিক সাড়ে আটটার সময় ডাক্তার এলেন; পূর্বের মত পরীক্ষা করলেন; তাহার পর আমাকে বললেন,—"বৈঠকখানায় চলুন; বিশেষ বিবেচনা করে ব্যবস্থা করতে হবে।"

বৈঠকখানায় এসে ডাক্তারবাবু বললেন, "বিজয়বাবু, আপানার গৃহিণীর আর অসুখ হবে না। এই দু' দিনেই তাঁর যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। তাঁকে আর ওষুধ খেতে হবে না; অর্থাৎ অকারণ জল খেতে হবে না; তিনি আর পাতের কাছে বসেই উঠবেন না। কিন্তু, একটা গোল রইল। আপনার রোগ যে সারল না? আপনার গৃহিণী যদি মাসের মধ্যে দুবার করে এইভাবে অসুস্থ হতেন, আর আপনার অফিস কামাই করতে হতো, খরচের কথা না হয় নাই বা ধরলাম, তা হলে এই ভাবে মাস ছয়ের মধ্যে অফিস কামাই করলে মনিবরা বিরক্ত হয়ে আপনাকে চাকরি থেকে তাড়িয়ে দিতেন, তা হলে হয় ত আপনার রোগ সারত। কিন্তু এই দুইদিনে আপনার গৃহিণী যে শিক্ষা পেয়েছেন, তাতে তাঁর আর কোন দিন এরকম অসুখ হবে না, আপনাকেও অফিস কামাই করে চাকরি হারাতে হবে না; সুতরাং আপনার গুরু রোগ থেকেই গেল।"

আমি বললাম, "আপনি কি বলছেন? আমার ত কোন রোগই নেই।"

ডাক্তারবাবু হেসে বললেন,—"আপনি রোগের কথা জানবেন কি করে? আমরা ডাক্তার, আমরা মানুষ দেখলেই তার কি রোগ হয়েছে, তা বলতে পারি, আপনার রোগের ইংরেজি নাম তেমন নেই; তবে আমাদের আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে একটি রোগের কথা আছে, তার সমস্ত লক্ষণই আপনাতে বিদ্যমান। সে রোগের নাম গৃহিণী রোগ! আপনার সেই রোগ হয়েছে; কিন্তু তার চিকিৎসা পদ্ধতি আমি জানিনে, বুঝেছেন? ও কি আজ বত্রিশও নয় ষোলও নয়— আজ আমি ফি নেব না। নমস্কার!"

—বার্ষিক বসুমতী, ২য় বর্ষ ১৩৩০।

স্মৃতি

সারাদিন টিপ টিপ করে বৃষ্টি হচ্ছিল।

অসময়ে প্রকৃতির উৎপাতে সকলেই বিরক্ত হয়েছিল; বর্ষার আধিক্য কোন কালেই তেমন সুসহ নহে, তাহার উপর আবার এই অকালে! অল্প অল্প শীতের হাওয়া বইতে শুরু করেছে, আর তার সঙ্গে প্রকৃতির এই বিষণ্ণতা সবারই দেহে মনে এমন জড়তা এনে দিয়েছিল যে, কারও এক পা নড়ে বসবার ইচ্ছা ছিল না। তাই সবাই মিলে ঘরের মধ্যে মহোল্লাসে তাসের আসরে জমিয়ে তুলেছিল।

অন্ধকার হয়ে গেছে। বাইরে যত দূর দৃষ্টি চলে, কেবলই কালো আর কালো, সেই কাজল রাতের নিরবচ্ছিন্ন একঘেয়েমি দূর করতে একটু বিজলির বেখাও ছিল না।

ঘরের ভিতরে আসর থেকে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে প্রভাত একা দাঁড়িয়েছিল বাহিরের বারান্দায়। এই মসিমাখা অকালসন্ধ্যায় তাব মন যেন কোথায় চলে গেছে। তাই তার ঘরে ভাল লাগছিলনা।

হঠাৎ পিছনে পদশব্দ শুনে চমকে উঠে পিছনে চাইবামাত্র প্রতিভা বলে উঠলো,— "প্রভাতবাবু, আপনি এখানে যে?"

মৃদু হেসে প্রভাত জিজ্ঞাসা করলে, "তুমিই বা এখানে কেন?"

প্রতিভা জবাব দিল, "আপনাকে ঘরের মধ্যে না দেখে ভাবলুম, কোথায় গেছেন আপনি, সন্ধান করা যাক। উঃ, কি অন্ধকার! আপনার এই ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়ে থাকতে ভাল লাগছে?"— বলে প্রতিভা যেন তার উৎসুক দৃষ্টি প্রভাতের দিকে মেলে দিলে।

প্রভাত বল্লে,—হ্যাঁ, আমার নীরবতা আর এই অন্ধকার খুব ভাল লাগছে।"

রেলিঙে ভর দিয়ে প্রতিভা জিজ্ঞাসা করলে—"কেন বলুন তো? শুধু আজকে নয়, আমি আরও অনেক দিন দেখেছি, আপনি মাঝে মাঝে হঠাৎ যেন কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যান। সেদিন ত কিছু বলেন নি, আজ কিন্তু ছাড়ছিনে।"

কথাটা ঠিক। প্রভাত মাঝে মাঝে বিষণ্ন হয়ে পড়ত, তখন কারও সঙ্গ তার ভালো লাগতো না' আপন মনে বাইরের গেটের কাছে তেঁতুল গাছের তলায় গিয়ে বসে থাকত। অনেক দিন সকালবেলা, দুপুর বেলা, সে প্রভাতকে এমনই ভাবে বসে থাকতে দেখেছে, একদিন সে প্রভাতকে জিজ্ঞাসাও করেছিল এ সম্বন্ধে; কিন্তু তার উত্তরে প্রভাত বলেছিল, কি জানি। সময়ে সময়ে আমার মনে হয়, কিছু ভাল লাগছে না।

সেদিন প্রতিভাকে এইখানেই ক্ষান্ত হতে হয়েছিল বটে, কিন্তু কৌতূহল বরাবরই মনে তার জেগেছিল। তাই আজকের এই সান্ধ্য আসরে প্রভাতকে না দেখতে পেয়ে এই রকমই একটা কিছু সন্দেহ করে সে বারান্দায় এসেছিল।

প্রভাত কিন্তু কোন জবাবই দিল না। বাস্তবিক এ সম্বন্ধে তার নিজের ধারণা খুব স্পষ্ট ছিল না; থাকলে হয়ত বলতে পারতো। কিন্তু এমন অনেক জিনিষ আছে যাদের অস্তিত্ব

অনুভব করা যায়, অথচ ঠিক স্বরূপটি ধরা যায়না, তাই তারা যেমন কৌতূহল জাগায়, বেদনাও দেয় তেমনই। আবার একরকম বেদনা আছে, যাকে ঠিক সখেরই মতো উপভোগ করা যায়, তাই সে বেদনার হেতু সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার আগ্রহও থাকে না। কাজেই শেষ পর্যন্ত কৌতূহলকে হার মানতে হয়; কেন না, সে কৌতূহল মিটলেই এ পরম উপভোগ্য বেদনার উৎস বন্ধ হয়ে যাবে।

এই বেদনার আনন্দ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করতে চাইত না বলে প্রভাত এ বিষয়ে বিশেষ কোন চিন্তাই করত না। কেবল সময়ে সময়ে যখনই তার মনে হোত তার কাছে কেউ কোথাও নেই, চারিদিকে কেবল শূন্যতা,—তখনই সে সকলের কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিত; কিন্তু এর 'কেন'র কথা সে কোনদিন জিজ্ঞাসা করেনি আপনাকে।

প্রভাতের বাঁ হাত ধরে একটা নাড়া দিয়ে প্রতিভা বল্লে, কি চুপ করে রইলেন যে, বলতেই হবে, নইলে আপনার সঙ্গে আড়ি করে দেব, তা বলে রাখছি।"

তার সকল কথার মধ্যে এমন একটা সরলতা ছিল যে, তা প্রভাতের ভারী ভাল লাগত। সাধারণত তার বয়সে বাঙালি মেয়েরা যে রকম "গৃহিণী" হয়ে ওঠে, প্রতিভা সে রকম মোটেই ছিলনা। এজন্য অবশ্য তাকে মাঝে মাঝে তিরস্কার সইতে হোত; কিন্তু তার অন্তরের অফুরন্ত আনন্দের স্রোতে সে ভর্ৎসনা তার মনে কোন দাগ রেখে যেতে পারতোনা। তার মুখের সহজ হাসিটুকু কখনও তাকে ছেড়ে যেত না।

এসবই প্রভাতের ভালো লাগলেও প্রতিভাকে কিছুই জানানো সে সমীচীন মনে করলে না। তাছাড়া সে জানাবেই বা কি? নিজেই কি সে ঠিক জানে এর কারণ? আর প্রতিভা হয়ত বুঝবেও না—

প্রতিভা ফের বললে, "শুধু শুধু কেন আপনাব মন এমন খারাপ হয়? আমার ত হয় না।"

কখনও কখনও প্রভাতের মনে হোত, যদি সে তার এই অব্যক্ত, অনির্দেশ্য, বেদনার কথা কাউকে বলে ফেলে, তা হলে হয়ত এ ভার অর্ধেক কমে যায়, নইলে সময়ে সময়ে এটা তাকে অত্যন্ত পীড়া দেয়। কিন্তু এ পর্যন্ত কাউকেই তার বলা হয়নি। এখন তার একবার মনে হোল, বলে ফেলে, কিন্তু কি মনে করে একটু হেসে বললে,—"আমার এক বন্ধুব জন্যে মন কেমন করছে!"

প্রতিভা জিজ্ঞাসা করল—"তাকে চিঠি দেন না কেন?"

"চিঠি দিয়ে কি হবে?"

"বা! আপনি ত আচ্ছা লোক,—বলে একটু হেসে প্রতিভা আবার প্রশ্ন করলে—"কে আপনার বন্ধু।"

"একটি মেয়ে।"

প্রতিভার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। সে যেন কারণটা আগেই অনুমান করেছিলো, এমনই ভাবে বললে,—তাতে আর দুঃখ কি ? তাকে বিয়ে করে কাছে এনে রাখুন না কেন? আর তা হলে আপনার কখনও খারাপ লাগবে না।"

প্রভাত একটু হাসলে মাত্র। কথাটা আগাগোড়া মিথ্যা। বাস্তবিক তার কোন মেয়ে বন্ধুই ছিলনা। কেবল প্রতিভাকে শান্ত করার জন্য একটা কাহিনি বানিয়ে বলেছিল মাত্র। প্রতিভা সেটা সত্যি বলে ধরে নিয়েছে দেখে তার ভারী আমোদ পেয়ে গেল । সে বললে,—"সে হয় না।"

কেন হয় না? আমাকে বলুন, আমি ঠিক করে দিচ্ছি। দেখুন প্রভাতবাবু, বিয়ে আপনাকে কবতেই হবে শিগগির।"

বিস্মিত হয়ে প্রভাত প্রশ্ন করল, "কেন বলত?"

ডান হাতের তর্জনী প্রসারিত করে মাথা নেড়ে প্রতিভা বললে,—"আমি বলছি বলে।" সে অকস্মাৎ যেন উষ্মা প্রকাশ করে চলে গেল।

স্তম্ভিত হয়ে প্রভাত দাঁড়িয়ে রইল। প্রতিভার শেষের কথাগুলোর সঙ্গে তাব এ পর্যন্তকার ব্যবহারের এতটা অসাদৃশ্য যে, কোন দিক থেকেই এর কোন অর্থ প্রভাত খুঁজে পেল না। তাছাড়া প্রতিভার কণ্ঠস্বরেও এমন একটা অস্বাভাবিকতা ছিল, যা তাকে আঘাত করেছিল। প্রভাতের মনে হল, 'এই কথাগুলোর সঙ্গে প্রতিভাব অন্তরেব যোগ নেই, তাই সে যতটা তাকে না হোক, আপনার কথা আপনি বিশ্বাস করতে এত জোর করে কথা বলে গেল, যাব ফলে, এই অস্বাভাবিকতাব সৃষ্টি।

কিন্তু কেন এই প্রয়াস? কোন সদুত্তর তার মনে এলনা, বরং সে দুঃখিত হ'ল এই মনে করে যে, প্রতিভার সঙ্গে বহস্য করতে গিয়ে তার মনে সে বেদনা দিলে।

বাইরে তখনও তেমনই অন্ধকার। তাসখেলা সবেমাত্র শেষ হয়েছে; প্রতিভার দাদা অমিয আগাগোড়া র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে বাইরে এসে বললে,—"ওঃ, প্রভাত, বুঝি এখানে? তাই আমি বলি, সে গেল কোথায়! খুব বাহাদুরি হয়েছে, আর হিমে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না। চল, খাবার জায়গা হয়েছে।"

হাসিমুখে প্রভাত বল্‌লে, "চল"।

২

পরদিন সকালেই আকাশকে বর্ষণক্ষান্ত হতে দেখে সবাই বল্‌লে,—"আঃ, বাঁচা গেল, একে শীতে বাঁচিনে, তাব ওপর আবার বিষ্টি!"

চা-পান চলছিল, অমিয় বললে, "ওবেলা নাগাদ আকাশ পরিষ্কার হয়ে যাবে আশা করছি।"

প্রভাত বললে, "তোমায় তা হলে আশীর্বাদ করব। বর্ষার দিন হলেই আমার ভারী মন খারাপ হয়ে যায়।"

পরিহাসের সুরে অমিয় বললে, "তোমার যেমন মন। দেখ দিকি, আমরা কাল সন্ধ্যার সময়ে কেমন তাসের আড্ডাটি জমিয়ে তুলেছিলুম; আর তুমি গেলে কি না ঠাণ্ডায় বারান্দায় কাব্যি করতে'—বলে সে চায়ের পেয়ালায় মুখ দিল।

প্রতিভা ভিতর থেকে এল। সবেমাত্র স্নান করে চুল তার এলিয়ে দেওয়া এবং একখানি শাল তার গায়ে জড়ান।

—"ওসব তোমরা বুঝবে না হে", বলে হাসি হেসে প্রভাত প্রতিভার মুখের দিকে চাইলে।

প্রতিভা বললে, "প্রভাতবাবুর কথাই ঐ রকম, কেউ কিছু বুঝবেনা, আর উনি সব বুঝে বসে আছেন। কাল রাত্তিরে যখন জিজ্ঞাসা করলুম, বাইরে কেন, বললেন, বুঝবেনা।"

তার মৃদু হাসিতে দুষ্টামি মাখানো!

প্রভাত তখন মনে মনে প্রমাদ গনছিল। যদি প্রতিভা কালকের কথা বলে দেয়, এরা নিশ্চয়ই বিশ্বাস করবেন। তখনকার লজ্জা থেকে সে মুক্তি পাবে কিসে? আর কেমন করেই বা সে প্রমাণ করবে, এটা নিছক মিথ্যা কথা! কিন্তু প্রতিভা আর কোনও কথা বললে না দেখে সে আশ্বস্ত হল।

এবার তার মনে হল, না হয়, সে একটু লজ্জাই পাবে, সেটুকু কাটিয়ে দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু এতে প্রতিভার উষ্মার কারণটা হয় ত ধরা পড়ে যেতে পারে। এই মনে করে সে প্রতিভার মুখের দিকে চেয়ে দেখলে, গত সন্ধ্যার অনুভূতির কোনও চিহ্ন তার মুখে আছে কিনা, কিন্তু কিছুই দেখতে না পেয়ে সে নিজে থেকে খুঁচিয়ে কোনও কথা তোলা প্রয়োজন মনে করলে না।

প্রতিভা বললে,—"কিন্তু প্রভাতবাবু, আজ বিকালে আকাশ পরিষ্কার হলেই আমাকে সঙ্গে করে বেড়াতে যেতে হবে, আমি কোন আপত্তি শুনবো না।"

প্রভাত বললে,—"বেশ আমার কোন আপত্তি নাই; দিন দুই ধরে বসে থেকে ত হাঁপিয়ে উঠেছি।"

মনে মনে সে স্থির করলে, যদি বিকালে বেড়াতে যাওয়া সম্ভব হয়, তা হলে সেই সুযোগে প্রতিভার কাছ থেকে কালকের রহস্যময় আচরণের কারণ জেনে নেবে; কেন না, সে বেশ জানে যে, প্রতিভার যে স্বভাব, তাতে তার কাছে থেকে কথা আদায় করে নেওয়া বিশেষ কঠিন হবে না। তবে একটা মুশকিল হচ্ছে এই যে, প্রতিভা হয়ত তার হালকা মনের হাসির হাওয়ায় তার প্রশ্নকে একেবারে উড়িয়ে দেবে, অথবা যদি সে কালকের ব্যবহারের জন্য লজ্জিত হয়ে থাকে, তা হলে কথাটাকে সে একেবারে চাপা দিয়ে ফেলতে চাইবে। তবে, আপাতত তার আচরণ থেকে সে যে কোন লজ্জা অনুভব করছে, প্রভাতের এমন মনে হোল না।

সে নিজের প্রতি একটু বিরক্তও হল এই মনে করে যে, প্রতিভা হয়ত কালকের কথাগুলো একেবারে ভুলেই গেছে, আর সে কেবল মনে মনে সেই কথা আলোচনা করে আপনার অস্বস্তি বাড়িয়ে তুলেছে। কি আর এমন অস্বাভাবিক যে কথাগুলো!

তা নয় বটে, তবু প্রতিভার কাছ থেকে তাই যে অপ্রত্যাশিত—

প্রতিভার দিদির ছেলে তিনু সেইখানে একটা চেয়ারে বসে পরমানন্দে বিস্কুট ভোজন করছিল; সে এই সময়ে বলে উঠলো—"মাসি, আমিও যাব তোমার সঙ্গে বেড়াতে!"

ততক্ষণে প্রভাতের চা পান শেষ হয়ে গেছে। সে পেয়ালা নামিয়ে রেখে একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে প্রতিভার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

তার উৎসুক দৃষ্টির সম্মুখ থেকে আপনার আঁখি সরিয়ে নিয়ে প্রতিভা শালের আঁচলটা নিয়ে নাড়াচাড়া শুরু করলে।

তিনু ফের বল্‌লে—"অ—মাসি।"

তার কথায় বাধা দিয়ে সহজ কণ্ঠে মুখ না তুলেই প্রতিভা উত্তর দিলে—"বেশ প্রভাতবাবু যদি নিয়ে যান, তবে যাস।"

তিনুর আর কোন কথা বলবার আগেই প্রভাত বলে উঠলো, "বেশ ত, তার আর কি! যেয়ো তুমি আমাদের সঙ্গে!"

কাল সন্ধ্যার কথাগুলো প্রতিভার মনে ছিল এবং সে জন্যে সে মনে মনে আপনার ব্যবহারে প্রভাতবাবুর মনে কষ্ট দিয়েছে মনে করে লজ্জিত হয়েছিল। প্রথমে সে যখন প্রভাতের সঙ্গে বেড়াতে যাওয়ার প্রস্তাব করে, তখন তার এ কথা মনে হয়নি, হয়ত প্রভাত তাকে সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করতে পারে; কিন্তু কথা স্থির হয়ে যাওয়ার পর যখন তা মনে পড়লো, তখন সে একটু বিব্রত হয়ে উঠল। তাই একলা প্রভাতবাবুর সঙ্গে যাওয়া সম্বন্ধে তার মনে যেমন একটুখানি দ্বিধা জাগছিল, এমন সময়ে তিনুর যাওয়া ঠিক হয়ে যাওয়াতে তার সমস্ত অস্বাচ্ছন্দ্য কেটে গেল। তাছাড়া তার মনে এ সব বিষয় বেশিক্ষণ ঠাঁই ও পেতনা।

তবু এ প্রকার দ্বিধা যে আগে কখনও জাগেনি, তা ঠিক—

তিনু বিস্কুট শেষ করে হাত ধোবার জন্য লাফাতে লাফাতে ভিতরে চলে গেল। সেদিকে চেয়ে প্রভাত বল্‌লে—"ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে আমার বড় ভালো লাগে।"

তিনুর পরিত্যক্ত চেয়ারখানা দখল করে প্রতিভা বললে,—"কেন?"

কৌতুক করার উদ্দেশ্যে প্রভাত বল্‌লে, "সে তুমি বুঝবে না।"

মহা চটে প্রতিভা বললে,—"ফের? আপনার সঙ্গে কিন্তু তা'হলে আড়ি!" অমিয়কে এই সময়ে দৃষ্টিক্ষেপ করতে দেখে তাকে উদ্দেশ করে প্রভাত বললে, "আচ্ছা অমিয়, তোমার কি মনে হয়?"

"এই আমি বলছিলুম, ছোট ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে। আমার ত মনে হয় ওরা আগাগোড়া রহস্যভরা; ঐটুকু ছোট ছোট মনে ওরা যে কখন কি ভেবে হাসে, কাঁদে, এটা আমার ভারী আশ্চর্য বলে মনে হয়।"

অমিয় কিছু বলবার আগেই প্রতিভা বলে উঠলো—"প্রভাতবাবুর মত আজগুবি ভাবনা উনি নিজে কেবল ভাবেন কিনা, তাই মনে করেন, সবাই বুঝি কেবল বসে বসে ভাবে। লোকের ত আর কাজ নেই।"

ভর্ৎসনার স্বরে অমিয় বলিল,—"না বুঝে কথা কইতে হবে না। চুপ কর তুই ।" তারপর প্রভাতের দিকে ফিরে বললে, "হ্যাঁ, আমারও ছোটদের ভাল লাগে, খুব আদর করতে ইচ্ছা করে, কিন্তু তোমার মত এ সম্বন্ধে আমি কিছু ভাবিনি এ পর্যন্ত !"

দাদার বকুনিতে কিছুমাত্র না দমে, তেমনই হাসিমুখে প্রতিভা বললে,—"আচ্ছা আমি কিছু বুঝি কি না দেখবে? প্রভাতবাবু বলে দিই?"

যেন মস্ত বড় একটা রহস্য তার কাছে গোপন আছে এবং সে ইচ্ছা করলে এখনই সব ফাঁস করে দিয়ে প্রভাতবাবুকে অপ্রস্তুতে ফেলতে পারে, এমনই একটা ভাব দেখিয়ে প্রতিভা গম্ভীর ভাবে পা নাচাতে শুরু করে দিলে।

অমিয় জিজ্ঞাসা করিল—"ব্যাপার কি হে?"

হেসে প্রভাত বললে—'কিছু না, ওর পাগলামি। আমাকে জ্বালাতন করার মতলব আর কি!"

অমিয় সহাস্যে প্রতিভার দিকে চাইলে। প্রভাতের কথায় প্রতিভার চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল বটে, তবে সে মুখে আর কিছু বললে না।

একটু পরে সে উঠে চলে যাবার সময় তার প্রতি দৃষ্টিপাত করে প্রভাত বললে, "তোমার বোনটি একটি আস্ত পাগল।"

অমিয় জিজ্ঞাসা করলে—"কেন?"

"কেন, ওর ব্যবহারেই কি তার পরিচয় পাওয়া যায়না?"

মৃদুহাস্যে অমিয় বললে,—হ্যাঁ, বোধ হয়, ওর মাথার কোন স্ক্রু আলগা আছে।"

প্রভাত বললে, "কিন্তু যাই বল, ঐ জন্যই ওকে আমার এত ভাল লাগে। ওর মধ্যে এমন একটা সহজ ভাব আছে, অবশ্য এ বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা খুব কম,—তবে এ বয়সে আমাদের দেশের বেশির ভাগ মেয়ের এরকম সহজ ভাব থাকে কিনা, এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।"

অমিয় একটু হাসলে।

আর সকলে এর অনেক আগেই চায়ের টেবিল থেকে উঠে গিয়েছিল।

৩

সকালের কথামত প্রতিভা এবং তিনুকে সঙ্গে নিয়ে প্রভাত বেড়াতে বার হয়ে পড়লো। অমিয়কেও সে সঙ্গে যাবার জন্য ডাকছিল; কিন্তু সে বললে, ঠাণ্ডা লেগে তার শরীরটা এবেলা ভাল নেই, বের হবে না।

বেড়াতে বেড়াতে অনেক কথাই হল তাদের, কিন্তু সকাল বেলা প্রভাত যে কথাটি বলবে বলে মনে করেছিল। তা আর বলা হোল না; তার কেমন প্রবৃত্তি হোল না, হয়ত সেই কথাগুলো তুলে প্রতিভার লজ্জা দেওয়া হবে মনে করে।

কোন বিশেষ মুহূর্তে একটি সামান্য কথাও এমন বিশেষত্ব নিয়ে মনে আসন পেতে বসে যে, তাকে মন থেকে কিছুতেই দূর করা যায় না। অথচ অন্য কোন সময়ে বললে হয়ত সেই কথারই তেমন সার্থকতা থাকতনা। প্রভাতের সেই অবস্থা হয়েছিল; প্রতিভা কাল সন্ধ্যাবেলা যে কটি কথা বলে চলে গিয়েছিল, সেগুলি প্রভাতের তখনকার মনের এমনই একটি অবস্থার দরুন এমন করে বারে বারে মনের উপর তলায় ভেসে উঠছিল; অথচ ভেবে দেখলে সে আর এমন বিশেষ কথাই বা কি!

প্রতিভা নিজেও সেদিকে তেমন গেলনা। একবার মাত্র ঠাট্টার ছলে কথাটা তুলে প্রভাতের কোন সায় না পেয়ে চুপ করে গেল। দুজনের মধ্যে কিছুক্ষণ আর কোনো কথা হোল না।

তিনু ততক্ষণ তার অর্থহীন হাজার প্রশ্নে প্রতিভাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলছিল। তাকে বিরক্ত হতে দেখে তিনুকে ডেকে প্রভাত বললে,—"এস, তিনু আমার কাছে এস। তোমার মাসি ভারী দুষ্টু।"

প্রতিভা ঠোঁট বেঁকিয়ে বললে, 'ইস্, নিজে ভারী লক্ষ্মী কিনা!" তারপর আবার তাদের মধ্যে আরম্ভ হল কত কি কথা। প্রতিভার আচরণে কিছুমাত্র সঙ্কোচ ছিল না। প্রভাতও আপাতত আপনার সঙ্গে বোঝাপড়া শেষ করে নিঃশেষে নিজেকে খুসির স্রোতে ছেড়ে দিলে।

সে দিন রাত্রিতে শুয়ে শুয়ে প্রভাতের হঠাৎ ভারী হাসি পেয়ে গেল—প্রতিভাকে কেমন করে তার মেয়ে বন্ধু সম্বন্ধে একটা মিথ্যা গল্প রচনা করে বলেছে মনে করে। ঘুম আসার আগে অনেকক্ষণ আকাশ-পাতাল চিন্তার মাঝে হঠাৎ এই কথাটা মনে পড়ে যাওয়ায় সে ভারী আমোদ বোধ করলে।

প্রতিভা কি ছেলে মানুষ! যেমন সে একটা গল্প বানিয়ে বললে, অমনই তা বিশ্বাস করে বসল! কিন্তু এই জন্যেই যে তার প্রতিভাকে ভালো লাগে। সে যদি অন্য রকমের হ'ত, তা হলে হয়ত তার এত ভালো লাগত না; কিংবা হয়ত অন্য রকম ভাবে ভালো লাগত। কিছুই বলা যায়না। তবে বর্তমানে তাকে এই রকমেই খুব ভাল লাগে। একথা প্রভাত আপনার কাছে বারে বারে স্বীকার করলো।

যা থেকে তার মিথ্যা কাহিনীর উদ্ভব, সেই কথা মনে করতে গিয়ে প্রভাতের মনে হল, বাস্তবিক এর কারণ কি? সে তার এক বন্ধুকে একবার এই কথাটা জানিয়েছিল, তাতে সে উত্তর দেয়,—একটা বিয়ে করে ফেল হে! তা হলেই ওসব বায়ুরোগ সেরে যাবে।

এই অনির্দেশ্য বেদনাব আনন্দ ছিল তার গোপন সম্পদ। তাই এতদিন জোর করে নিজেকে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করে এই আনন্দ থেকে সে বঞ্চিত করতে চায়নি; কিন্তু আজ সকল রকম ভাবপ্রবণতা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে তলিয়ে ব্যাপারটা বুঝতে গিয়েও প্রভাত কিছুই কিনারা করে উঠতে পারলে না। তার মনে হোল, যদি সত্যই তার কোন বন্ধুর জন্য মন খারাপ হয়ে থাকত, তা হলে ভাল হত; সে অনিশ্চয়তার চাপ থেকে মুক্তি পেয়ে যেত। তারপরে তার মনে পড়ে গেল, তার বন্ধুর পরিহাসের ছলে বলা বিয়ের কথা; সত্যিই কি তার জীবনে একজন সঙ্গিনীর এত প্রয়োজন হয়েছে যে, তার নিজের অজ্ঞাতসারে অন্তরে বিরাট ক্ষুধা জেগে উঠে এমন করে তাকে পীড়া দিচ্ছে?

এ কথাটা সে এতদিন মোটেই ভেবে দেখেনি, তাই তার প্রশ্নের এমন একটা রমণীয় দিক খোলা পেয়ে তার তরুণ মন খুশি হয়ে উঠলো। সে বারে বারে এ কথাটি মনে তোলাপাড়া করতে লাগলো। মানুষের স্বভাবই এই যে, মনে কোন প্রশ্ন জাগলে তার এক রকম উত্তর না স্থির করে কেউ থাকতে পারে না। এই উপস্থিত প্রশ্নের উত্তর ঠিক করতে গিয়ে প্রভাতের মনে তার কল্পিত মেয়ে বন্ধুর কথা এই দুইয়ে মিশে গেল; তার মনে হোল, সত্যি যদি তার কোন বন্ধু থাকতো—যাকে সে ভালবাসে তা হলে তাকে তার জীবনের সঙ্গিনী করে আনলে

এই বর্তমান মনের অবস্থা থেকে সে মুক্তিলাভ পেত হয়ত।

মনকে ক্রমাগত একটা জিনিষ বোঝাতে থাকলে শেষে আর কষ্ট করে বোঝাবার দরকার হয়না। মন আপনি তাকে জেনে নেয়। তাই যখন এই ব্যাপারকেই প্রভাত তার বর্তমান শূন্যতার অনুভূতির কারণ বলে স্থির করে নিলে, তখন মন খানিকটা ছাড়া পেয়ে হালকা হয়ে গেল। কিন্তু ফিরতি পথে চিন্তাধারা আবার তার প্রতিভার কথা স্মরণ করিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রভাত আপনার মধ্যে এমন একটা তথ্যের আবিষ্কার করে ফেললে, যাতে আপনি স্তম্ভিত হয়ে গেল। প্রতিভাই যদি সেই বন্ধু হয়, আর যদি সে তাকে ভালবাসে—

যদি ভালবাসে, তা হলে কি?

কি যে, তার স্বরূপ ঠিক ধরতে তার সাহস হলনা। কেবল হঠাৎ পাওয়ার এই খবরটি, তার মনকে যেন কানায় কানায় পূর্ণ করে দিয়ে গেল।

আর প্রতিভা? তার খুশির আলোভরা জীবনে কি তার কোন ছায়া পড়েছে? কে জানে? নারী রহস্যের সে কোন দিনই খোঁজ রাখে না, কাজেই সে বুঝবে কি করে? তার এ পর্যন্ত কার সমস্ত ব্যবহার যতদূর মনে পড়ল, সব প্রভাত মনে মনে আলোচনা করে দেখলে; কিন্তু কোন হদিস পেলেনা। এই কালই ত সে তাকে তার কল্পিত মেয়ে বন্ধুর কাহিনি বিশ্বাস করে কত পরিহাস করে গেল। কেবল প্রতিভার সেই কথাগুলো সম্বন্ধে তার সে খট্‌কা লেগেছিল, সেটা থেকেই গেল; সেখানটা সে বেশ গুছিয়ে উঠতে পারলেনা। একবার তার মনে হোল, হয়ত সে তার মেয়েবন্ধুর জন্য মন খারাপ থাকার কথা বলায় প্রতিভা ঈর্যাবশে অত ঝাঁজের কথাগুলো বলে ফেলেছিল। তা যদি হয়, তা হলে প্রতিভা ত ভালবাসে।

এই সিদ্ধান্তটি অত মনোরম হলেও সে মানতে রাজি হোলনা; প্রতিভা সম্বন্ধে তার ধারণা তা হলে অনেকটা খারাপ হয়ে যায়। প্রতিভা যে সামান্য কথায় বিচলিত হয়ে পড়ে, একথা তাকে বিশ্বাস করতে হয়। তাই তলে তলে এই সিদ্ধান্তটি তার অন্তরের খুশির পরিমাণ বাড়িয়ে তুললেও ওপর থেকে সে এটাকে চাপা দিয়ে রাখলে; এবং সে যে নিজে প্রতিভাকে ভালবাসে, এই সত্যটি উপলব্ধি করে পরম খুশিতে পাশ ফিরে শুলে।

তার ব্যথার আনন্দ সে হারিয়ে ফেলল বটে, কিন্তু তার আনন্দ বদলে এতখানি আনন্দ সে আজ পেলে যে, আগেকার আনন্দ এর কাছে তুচ্ছ বলে তার মনে হল।

৪

পাঁচ বছর পরে।

বছর চারেক হ'ল প্রতিভার বিয়ে হয়ে গেছে। তাব স্বামী রাজ-সরকারে বেশ পদস্থ কর্মচারী; দিল্লী, সিমলা তাঁর অফিস; তাই প্রতিভা এখানকার সমস্ত সম্বন্ধ থেকে প্রায় বিচ্যুত হয়ে পড়েছিল। প্রভাতবাবুরও আর কোন খোঁজ সে পেত না; কেননা একবার সে শুনেছিল, তিনি কলকাতাতেই কি যেন কাজ করেন এখন।

শৈশবের সজীবতা-ভরা-দিনগুলি সরে সুদূর প্রবাসে বসে প্রথম প্রথম প্রতিভার অত্যন্ত কষ্ট বোধ হত। কত কি যেন পরিবর্তন হয়ে গেছে অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে, এবং হাজার

ইচ্ছা করলেও আর সেই পরিবর্তনের স্রোত ফেরানো যায় না;—এমনই একটা চিন্তা তাকে কেবল পীড়িত করে তুলতো। তার ওপর প্রভাতের স্মৃতিও অতি অকারণেই যেন তার বেদনাকে বাড়িয়ে দিত।

তারপর ক্রমে সব গা-সহা হয়ে এলো। বিশেষত যে দিন খুকি তার কোলে এলো, সে দিন থেকে সে যেন খুকির মধ্যে তার সমস্ত শৈশব কালটাকে ফিরে পেয়ে বিহ্বল হয়ে গেল এবং ক্রমে সেই বিহ্বলতার মাদকতা ধীরে ধীরে গভীর আনন্দে পরিণত হয়ে তার সমস্ত ক্ষতির বেদনা দূর করে দিল।

অতীত কালটা তখন তার কাছে উপভোগের বস্তু হয়ে দাঁড়ালো।

....

অনেকদিন পবে সে বাপেব বাড়ি এসেছে। সেদিন সে বিকেল বেলা শোবার ঘরে বিছানা পেতে রাখছে, এমন সময তিনু ছুটতে ছুটতে এসে তাকে খবব দিলে—"মাসি, প্রভাতবাবু এসেছেন।"

মুহূর্তকাল প্রতিভাব মুখ থেকে কোন কথা বাব হোলনা; তারপর সে সহজ কণ্ঠে বললো;—দাদা নীচে নেই?"

"না; মামা কোথায বেরিযেছে; আমি তাকে ডেকে আনি?"—তাব আব দেরি সইছিল না।

বিছানার চাদরের একটা দিক গুটিয়ে ছিল; সে দিকটা সমান করে দিতে দিতে প্রতিভা বললে,—আচ্ছা, ডেকে নিয়ে আয়।"

প্রভাত ঘরে ঢুকে নমস্কার করে বললে—"ভাল আছ ত প্রতিভা? অনেক দিন তোমার সহিত দেখা হযনি, তাই সে দিন অমিয়র কাছে তুমি এসেছ শুনে একবার দেখা করতে এলুম।"

মাথাব কাপড একটু টেনে দিযে প্রতিভা জিজ্ঞাসা করলে,—"কিন্তু আপনাকে অমন শুকনো দেখাচ্ছে কেন? অসুখবিসুখ করেছিল নাকি?"

হেসে প্রভাত বললে, "বালাই অসুখ করবে কেন? তবে কি জান, পবের চাকুবি কবে জীবন কাটাতে হ'লে শবীবেব দিকে দৃষ্টি দেওয়া হযে উঠেনা। তাছাড়া নিজের যত্ন আমি কোনদিনই করতে পারিনে।"

কি একটা কথা প্রতিভাব মুখের গোড়ায় এসে অনুচ্চারিত বযে গেল। সে পরিহাস তবল কণ্ঠে বললে,—"বিয়ে করেন নি?"

প্রভাত বললে,—"এইবাবে ঠিক বলেছ! নিজেই খেতে পাইনে, তার উপর আবার—"

এই সমযে দাসী খুকিকে কোলে নিয়ে এসে বললে, "মা, খুকি বড় কাঁদছে, আপনি একে নাও।"

উৎসুক হয়ে প্রভাত প্রশ্ন করলে।—"এটি তোমার মেয়ে নাকি? দেখি, দেখি!"

সে হাত বাড়িয়ে দিলে। মৃদু হেসে প্রতিভা "হ্যাঁ" বলে খুকিকে ঝির কোল থেকে নিয়ে প্রভাতের কোলে দিতে গেল, কিন্তু সে মাকে জড়িয়ে ধবে রইলো।

প্রভাত বললে,—"বোকা মেয়ে, মামাকে চেনো না।"

একটু পরে সে কৌতুক ভরে বললে,—"একদিন তুমি বড় জোর করে বলেছিল যে, আমি বিয়ে করবই। সেই জন্যেই বোধ করি ওটা হয়ে ওঠেনি!"

প্রতিভা কোন উত্তর দিল না।

এর কিছুক্ষণ পরেই অমিয় এসে বললে,—"এই যে প্রভাত, কতক্ষণ এলে?"

"এই খানিকক্ষণ।"

এদের দুজনকে কথা কইবার অবসর দিয়ে প্রতিভা খুকিকে কোলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল এবং একটু পরেই একথালা জলখাবার এনে হাজির করলে; বললে, "প্রভাতবাবু, অনেকদিন বাদে দেখা হ'ল, একটু মিষ্টিমুখ করুন ; নইলে আবার ঝগড়া হবে।"

হেসে প্রভাত অমিয়-র দিকে চেয়ে বললে, "প্রতিভার কাণ্ডটা দেখছো একবার! এত কখন একজন লোক খেতে পারে?"

খাবারের থালাটা প্রভাতের সামনে রেখে দিয়ে ডান হাতের তর্জনী প্রসারিত করে প্রতিভা বললে, "খুব খেতে পারে। এ ত খেতেই হবে,—তা ছাড়া পরশু সকালে আপনার নেমন্তন্ন রইলো এখানে"—বলে সে যেন সম্মতির অপেক্ষায় দাদার দিকে চাইলে।

অমিয় বললে,—"সে ত ভালই।"

গম্ভীর মুখে প্রভাত বললে, "আপাতত এগুলো না হয় উদরস্থ করার চেষ্টা করা যাচ্ছে, কিন্তু পরশু সকালে আসতে পারবো কি না, ঠিক বলতে পারছিনে।"

ঝঙ্কার দিয়ে প্রতিভা বলে উঠল—"কেন কি এত কাজ আপনার! ওসব শুনচিনে, আসতেই হবে।"

প্রভাতের কানে যেন বহুদিনের বিস্মৃত কোন সুর আবার আজ বেজে উঠলো। সে চুপ করে রইলো।

প্রতিভা ফের বললে, শুনচেন! ও সব শোনা হবে না। দাদা, তুমিও বলনা একবার।"

অমিয় কোন কথা বলবার আগেই প্রভাত হেসে বললে,—"আচ্ছা, আচ্ছা হার মানছি! আসবো।"

প্রভাত চলে যাওয়ার পর খুকিকে ঘুম পাড়াতে পাড়াতে সে যে আজও বিয়ে করেনি, এই কথাটা প্রতিভার মনে পড়ে মনকে এক অকারণ, অনির্বচনীয় খুশিতে ভরে দিলে। সে আনন্দের রসে ঘুমন্ত খুকির মুখে চুমা দিয়ে গভীর স্নেহে তাকে বিছানায় শুইয়ে দিলে।

—বার্ষিক বসুমতী, ১ম বর্ষ ১৩৩২।

কবিব্যাধি

ইস্কুল-কলেজে পড়বার সময় অনেক ছেলেরই কবিত্ব রোগে ধরে; তারপর বয়স হলে, সংসার ঘাড়ে পড়লে সে 'রোগ' অনেকের সেরে যায়। তবে যারা জন্ম কবি, তাদের কবিত্বটা চিতাশয্যা পর্যন্ত স্থায়ী হয়। সে রকম ভাগ্যবান লোক 'কোটিকে গুটিক'। কিন্তু আমাদের এই মহেন্দ্র, ওটা ত জন্ম কবি নয়ই, কবিত্ব শক্তিও ওর নেই; অথচ এতকালের মধ্যে ওর কবিতা লেখার সখও মিটল না। কবি হবার দুর্দম বাসনাটাকেও বেচারি কিছুতেই জয় করতে পারল না। কবিতা যা লেখে, তা একেবারেই অখাদ্য; তবুও এই কুড়ি বছর দেখে আসছি, সে কবিতা লেখাও ছাড়বেনা; ছাপাবার জন্য দোরে দোরে ঘোরার ও তার কামাই নেই। আর খরচের কথা যদি বল, তা হলে চুপে চুপে বলি, তার বাবা যে হাজার ত্রিশেক টাকা রেখে মারা গিয়েছিলেন, তার বিশিষ্ট অংশই সে তার কবি-গৃহ কবির মত করে সাজাতে, আর কবি ও সাহিত্যিক বন্ধুদিগের নিত্য মজলিসের চা, জলখাবার ও সপ্তাহান্তে শনিবাবের বিপুল ভোজে ব্যয় করে ফেলেছে। আফিসে চাকরি করে; শ খানেক টাকা মাইনে পায়; বাড়িতে তাবই প্রায় সমবয়সী স্ত্রী ছাড়া পিতার আত্মীয় বা আত্মীয়া নেই। সে হিসাবে, বুঝে চললে, খরচও নিতান্তই কম হোত; কিন্তু ঐ যে কবিব্যাধি তাতেই বেচারিকে একেবারে উন্মাদ করে ফেলেছে। যারা মহেন্দ্রের শুভানুধ্যায়ী, তারা ওকে কত বলেছে, কত বুঝিয়েছে যে "Poet is born not made"—কবি হাতে গড়ে তোলা যায় না, কবিকে ভগবান ক্ষমতা দিয়ে পাঠিয়ে দেন। সে মনে করে তাকে ভগবান ক্ষমতা দিয়েছেন; সে কবি যশঃ লাভের অধিকারী; সে যে স্বয়ং কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথের কাছে সুখ্যাতি লাভ করেছিল। এই সুখ্যাতিই তার কাল হয়েছিল।

ব্যাপারটা কি হয়েছিল জানেন? এই যারা রোজ রোজ মহেন্দ্রের বাড়িতে চা ও জলখাবারের সদ্ব্যবহার করেন, সপ্তাহান্তে বিরাট ভোজেও যোগদান করেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন সত্যিকার কবি বিমানচন্দ্র। তিনি নিমকের সম্মান রাখার জন্য একদিন একটা ভাল কবিতা লিখে মহেন্দ্রকে দেন এবং তাকে উপদেশ দেন যে, সেই কবিতাটা সে যেন তার নিজের লেখা বলে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে দেখায়। তিনি যদি কবিতাটি পড়ে একবার প্রশংসা করেন। তা হ'লে আর যাবে কোথায়। তার কবি-নামের পথ একেবারে খুলে যাবে। কথাটা একেবারে গোপনেই ছিল কিছুদিন; তারপর কি কারণে কবি বিমানচন্দ্রের সঙ্গে একটু মনান্তর হয়; তখন তিনি গোপন কথাটা বন্ধুমহলে প্রকাশ করে দেন; তাইতে আমরা শুনতে পেয়েছিলাম।

মহেন্দ্র সেই কবিতাটি নিয়ে কবীন্দ্রের কাছে যায়। তিনি কবিতাটি শুনে বড় মুগ্ধ হ'ন—বড় কবির লেখা যে। মহেন্দ্র তখন কবীন্দ্রকে চেপে ধরে যে তাঁর অভিমত একটু লিখে দিতে হবে। রবীন্দ্রনাথ আর কি করেন, কবিতাটার প্রশংসা করে দুই লাইন লিখে দেন। এই সার্টিফিকেট হোল মহেন্দ্রের কাল। তখন আর তাকে পায় কে? সে যে সত্যসত্যই কবি তার এমন ছাড়পত্র পেয়ে সে সত্যসত্যই মাথা ঠিক রাখতে পারল না। তাব পবেই তার গৃহ কবি-

কুঞ্জ হোল; কবি ও সাহিত্যিকদের পদধূলিতে তার কবিকুঞ্জ মহাতীর্থে পরিণত হোল—আর বেচারির পিতৃদেবের সঞ্চিত অর্থ এবং তার একশ টাকা মাইনে উড়ে যেতে লাগলো। বড় বড় কাগজেও দুই-চারটা কবিতা ছাপা হোলো বই কি! তা অমন হয়ে থাকে; এর জন্য সম্পাদকের উপর আপনারা কটাক্ষ করবেন না।

এইভাবে কিছুদিন যায়; কবির কিন্তু গৃহ ও গৃহিণীতে মন বসেনা। তারও কারণ আছে। পূর্বেই বলেছি, মহেন্দ্রের পিতা তাকে যে মেয়েটার সঙ্গে বিবাহ দেন, তিনি বিবাহের সময় প্রায় মহেন্দ্রের সমবয়সী ছিলেন, বোধ হয় এক আধ বছরের কমবেশি। তারপর দুর্ভাগ্যক্রমে, তিনি সুলক্ষণা ও অঙ্গসৌষ্ঠব সম্পন্না হলেও গৌরবর্ণা নহেন। রংটা একটু ময়লা। তারপর লেখাপড়াও তিনি চলনসই রকম জানেন। এমন মেয়ে কি কবির সহধর্মিনী, মনোরঞ্জিনী হইতে পারেন? তখন ১৭ বছর বয়সে ত আর কথা বলবার সাহস ছিলনা। এখন তাই মহেন্দ্রের ঘরে মন বসেনা। বলিতে গেলে বিগত যৌবনা শ্যামাঙ্গিনী স্ত্রীর কি কবির সহধর্মিণী হইতে পারে? তাই বলিয়া মহেন্দ্র যে কুপথে গিয়াছে, এমন কথা যারা কোন দিন তার চায়ের মজলিসে যায় না, এমন শত্রুও বলতে পারে না। কিন্তু ঐ যে বলেছি, কবি মহেন্দ্রের মনে সুখ ছিল না। বন্ধুরাও প্রায় সকলেই এ কথা জানতেন; মহেন্দ্রের কবিতার মধ্যেও এভাব অনেক সময় স্পষ্ট হয়ে উঠত।

ওদের দলের মধ্যে রসিক ছিল ভারি দুষ্ট-সত্যসত্যই সে রসিক ছিল। সে গোপনে এক কাজ করে বসল।

একদিন সকালের ডাকে মহেন্দ্রের নামে একখানি পত্র এল। মহেন্দ্র পত্রখানি হাতে করেই দেখল, খামের উপর মেয়ে-হাতের লেখা। সে তার কবি-জীবনে মেয়ে-হাতের লেখা পত্র ত কোনদিন পায়নি, তখন সে তাড়াতাড়ি পত্রখানা খুলে পড়ল। তাতে লেখা আছে—

কবিবর!

সেদিন মলিনা লাইব্রেরির বার্ষিক অধিবেশনে আপনি যে কবিতা পাঠ করেছিলেন, আমি তা সেই সভায় উপস্থিত থেকে শুনেছি। অনেক সভায় আমি যাই, অনেক কবিতা পাঠ তো শুনেছি; এমনকি রবীন্দ্রনাথের কবিতা-আবৃত্তি শুনেছি, কিন্তু সে দিন আপনার কবিতা এবং তার আবৃত্তি শুনে আমি একেবারে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। সেইজন্য অতি সঙ্কোচের সহিত নিবেদন করছি, আমাকে একবার দর্শন দান করতে কি আপনার আপত্তি আছে? আপনার ন্যায় কবিকে সম্মুখে পেয়ে অর্ঘ্য দান করে জীবন সার্থক করতে চাই।

আমাদের বাড়িতে সুবিধা হবে না। আপনি যদি দয়া করে আগামী শনিবার সন্ধ্যা সাতটার সময় গঙ্গার ধারে আউটরাম ঘাটের জেটিতে আগমন করেন, তা হ'লে আপনার দর্শন লাভ করে কৃতার্থ হই। শনিবারই স্থির রইল; কি জানি যদি কোন কারণে শনিবার যেতে না পারি; রবিবার ঠিক ঐ সময়ে যাবই। আমাকে নিরাশ করবেন না। ইতি—

আপনার গুণমুগ্ধা লতিকা।

পত্রখানি মহেন্দ্র তিনচার বার পড়ল। তার কবিতা যে একজন মহিলার এমন ভাবে হৃদয় স্পর্শ করেছে, তা ভেবে সে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। তার মনে হল এতদিনে তার

কবিজীবন সার্থক। স্বয়ং বাণী তাকে জয়মাল্য দেবার জন্য পবিত্র গঙ্গাতীরে জ্যোৎস্নাময়ী যামিনীতে আহ্বান করেছেন। কি আনন্দ! কি সাফল্য তার কবি প্রতিভার!

বুধবারে পত্র পেল; তারপর তিনদিন। এ তিনদিন তার আর কাটিতে চায়না। ক্রমে শনিবার এল। মহেন্দ্র এ ক'দিন অফিসের কাজে কত ভুল করেছিল, তার সংবাদ আমরা পাইনি।

শনিবার দুটার সময় অফিস বন্ধ হলে সে তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে এল। তারপর বেশবিন্যাস। তার স্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন, কোথাও যেতে হবে না কি? ফিরতে কত রাত হবে? সে বলল এক বন্ধুর বাড়ি সান্ধ্য সমিতিতে নিমন্ত্রণ, ফিরতে বেশি রাত হবে না; নটার মধ্যেই সে বাড়িতে ফিরবে।

হায় কবির অদৃষ্ট! সারাদিন আকাশে একবিন্দুও মেঘ ছিল না; পাঁচটা বাজতে না বাজতেই আকাশ অন্ধকার করে এল; তারপর কি বৃষ্টি! মহেন্দ্রের স্ত্রী বললেন, এমন দুর্যোগে আব বাব হয়ে কাজ নেই। কিন্তু মহেন্দ্র কি সে কথা শোনে? তার দৃঢ় বিশ্বাস হোল যে, ঝড় হোক, বৃষ্টি হক, পত্রলেখিকা নিশ্চয়ই যথাসময়ে যথাস্থানে উপস্থিত হবেন—এ যে প্রেম নিমন্ত্রণ! প্রাণেব আহ্বান!

সন্ধ্যা ছ'টার সময় বৃষ্টি কম পড়তেই মহেন্দ্র বাড়ি থেকে বাব হল। ট্রামের রাস্তায় গিয়ে দেখে ট্রাম সব হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে। সে তখন ট্যাক্সি ভাড়া করে আউটরাম ঘাটে গেল। ট্যাক্সি বিদায় করে দিয়ে জেটিতে গিয়ে দেখে সেখানে জনমানবের সম্পর্ক নেই, পাহারাওযালারা পর্যন্ত সেই দুর্যোগে গা-ঢাকা দিয়েছে।

মহেন্দ্র কি করে, তাকে অপেক্ষা করতেই হবে। কবি মানুষ, ছাতা নিয়ে বের হয়নি? এমন বেশের সঙ্গে কি ছাতা মানায়? ছড়িতে ত আর বৃষ্টি মানে না। একে বৃষ্টি, তাতে দক্ষিণে বাতাস, মহেন্দ্রেব পোষাক পরিচ্ছদ একেবারে ভিজে গেল, কোন পারিপাট্যই আর বইল না।

সাতটা বাজল, ক্রমে আটটাও বেজে গেল, নটা বাজে বাজে, মহেন্দ্র ভাবল, এমন দুর্যোগে কি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহিলা বাব হতে পারেন? সে নিরাশ হল বটে, কিন্তু আশা ত্যাগ কবতে পারল না; পত্রে ও লেখাই ছিল, শনিবার না হলে রবিবার নিশ্চিত।

আবাব সে রবিবার জেটিতে গেল। সেদিন বৃষ্টি ছিল না বটে। কিন্তু আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। সে দিনও তার লতিকা এলনা; রাত্রি দশটা পর্যন্ত সে জেটিতে বসে থেকে ভগ্ন হৃদযে বাড়িতে ফিরে এল।

সোমবারেও আশা ত্যাগ করতে পারলনা; সে দিন অফিসেব কাপড়-চোপড়েই বেচাবি সেই ঘাটে গিয়ে উপস্থিত। রসিক কিন্তু এই দুই দিনই তার গতিবিধি লক্ষ্য করছিল। সোমবাবে তার বড়ই অনুশোচনা হ'ল, আহা লতিকা বেচারিকে কি কষ্টই না পেতে হচ্ছে! তাই সে সোমবার সাতটাব সময় আউটবাম ঘাটে জেটিতে গেল। দেখে, কবি মহেন্দ্র পথের দিকে চেযে বসে আছে।

"কি হে, মহেন্দ্র, এখানে যে?"

"এই ভাই মনটা ভাল নেই, তাই এখানে বসে প্রকৃতির শোভা দেখছি।"

রসিক হেসে বললে, "এখানে শোভা দেখা তোমার কর্ম নয়, তোমার স্থান কাশীমিত্রের ঘাটে। এখন ওঠ, এখানে লতিকার দেখা মিলবেনা। আমরা তাকে পথ থেকে 'কিডন্যাপ' করেছি, বুঝলে কবি?"

"তা হলে এসব তোমাদের কাজ।"

আজ্ঞে হাঁ, তোমার মত গর্দভ কবিকে সজ্ঞান করবার জন্য কোন প্রকৃষ্ট পন্থা যে মাথায় আসেনি। এখন চল, বাড়ি যাওয়া যাক।"

....

এততেও মহেন্দ্রের কবি-ব্যাধির উপশম হয়নি, সে যেমন, তেমনই আছে। এ ব্যাধির ঔষধ নেই!

ভাতারমারীর মাঠ

অনেকদিন আগের একটা কাহিনি আজ নিবেদন করব। 'অনেকদিন আগে' কথাটা শুনে কেহ যদি মনে করে বসেন যে, আমি প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা বলছি অথবা পৌরাণিক কাহিনি বলছি, অথবা ঐতিহাসিকেরা যদি ভেবে থাকেন যে, মোগল-পাঠান বা কোম্পানি বাহাদুরের ভারতের রাজতক্ত অধিকারের সমসাময়িক কোন ঘটনার উল্লেখ করছি, তা'হলে তাদের নিরাশ হতে হবে। আমার 'অনেকদিন আগের' সীমানা এই ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসর ; এবং একথাও আগে থাকতে বলে রাখছি যে, আমি যে ঘটনার কথা বলব, তার যাথার্থ্য প্রমাণ করবার জন্য আমি তাম্রশাসনও দেখাতে পারব না, ভিনসেন্ট স্মিথকেও তলব করতে পারবনা, বা আমার সোদরোপম স্নেহভাজন ঐতিহাসিক শ্রীমান ব্রজেন্দ্রনাথের অনুগ্রহে রেকর্ড আফিসের পুরাতন কাগজপত্রও নজির স্বরূপ হাজির করতে পারব না,—আমার বর্ণিত কাহিনি একেবারে শোনা কথা, আর সে কথা শুনেছিলাম, আমার পাল্‌কিবাহক নিরক্ষর পোদ-পুঙ্গবদের কাছে। আব একথাও আমি বলে রাখছি যে, আমি সেই পল্লিবাসী অশিক্ষিত পোদদের কথা বিশ্বাস না করে থাকতে পারিনি এবং এতকাল পবে, যখন জীবনের অনেক কথা একেবারে ভুলে গিয়েছি,—কত বন্ধু-বান্ধবের কত স্নেহ, কত অনুগ্রহের কথা, কত বিপদ-আপদের কথা ভুলে গিয়েছি, তখনও সেই 'ভাতারমারীর মাঠের' কাহিনি আমার মনে আছে—শুধু মনে আছে নয়,—হৃদয়ে মুদ্রিত হয়ে আছে। সেই কাহিনিই এতদিন পরে বলতে বসেছি। অতএব আর ভূমিকা না বাড়িয়ে কথাটাই বলি।

তখন আমি একটা সামান্য পাড়াগাঁয়ে মাস্টারি করতাম। তাতে সুখ যথেষ্টই ছিল—যা কষ্ট ছিল অন্নবস্ত্রের। মাইনে পেতাম একত্রিশ টাকা পনেরো আনা—পুরা বত্রিশ টাকার এক আনা রসিদ-স্ট্যাম্পের জন্য সেলামি দিতে হত। সৌভাগ্যের কথা এই ছিল যে, আঠাশ টাকা পেয়ে বত্রিশ টাকার রসিদ লিখে দিতে হত না। আর একটা কথাও বলে ফেলি, মাইনে কিন্তু মাসে মাসে পেতাম না—কিস্তিবন্দি করেও না। জমিদারের স্কুল, তিনচার মাস ধরে কর্তাদের তহবিলের অবস্থা যখন একটু সচ্ছল হত, তখনই তাদের অনুগ্রহ দৃষ্টি পড়ত এই গরিব অসহায় স্কুল মাস্টারদের উপর। এ অবস্থায় আর আর মাস্টারেরা এই হতভাগ্য বাংলাদেশে যা করে থাকেন।' আমাকেও সেই উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বন করতে হয়েছিল—অর্থাৎ প্রাইভেট টুইশনি করতে হোত। তাইতে যা পাওয়া যেত তাই দিয়ে আর গ্রামের সদাশয় মুন্সিপ্রবর হরেকৃষ্ণ মাইতির দোকানের প্রসাদে কোনরকমে দিনান্নের ব্যবস্থা করা যেত। কথাটা অতিরঞ্জন বলে কেউ মনে করবেন না—বাংলাদেশের গ্রাম ও পল্লির সাড়ে পনেরো আনা শিক্ষকদেরই এই অবস্থা—ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগেও এই অবস্থা ছিল, এখনও তাই আছে, আর যদি কখন স্বরাজ লাভ হয় তখনও ঐ অবস্থাই থাকবে।

থাক্ সে দুঃখের কষ্টের কথা এখন। বলেছি তো, আমাকেও বাধ্য হয়ে প্রাইভেট টিউশনি করতে হ'ত। আমি দুইটি ছেলেকে পড়াতাম। তারা রবিবার বাদে প্রতিদিন প্রাতঃকালে আমার

বাসায় এসে প'ড়ে যেত। দুইটি ছেলে একই শ্রেণিতে পড়ত, সুতরাং একসঙ্গে দুইজনের পড়া বলে দিলেই চলত। একটি ছেলে তার এক আত্মীয়ের বাড়িতেই থাকত, অপরটি স্কুলের বোর্ডিং-এ বাস করত। পূর্বোক্ত ছেলেটি মাস্টার মশাইয়ের দক্ষিণা দিত দেড় মন চাউল— ধান নয় ভাই, চাউল। তার বাপ তিন ক্রোশ দূরের এক গ্রামের সম্পন্ন কৃষি-গৃহস্থ; নগদ টাকার বদলে চাউল দিতে তার গায়ে বাধতনা। দ্বিতীয় ছেলেটির বাড়ি প্রায় সাত ক্রোশ দূরে, তার বাপ বড় জমিদার, সুতরাং টাকার মানুষ। তিনি মাসে মাসে যথাসময়ে দশটি করে টাকা পাঠিয়ে দিতেন; এটাকা কখনও বাকি পড়ত না। মাসের প্রথমে যখন ছেলের খরচ পাঠাতেন, তখন আমার টাকাও পাঠাতেন এবং যে লোক টাকা দিতে আসত, তার সঙ্গে ছেলের বাপ তারকবাবু ছেলের জন্য এবং সেই সঙ্গে মাস্টারের জন্য, কখনও এক কলসি গুড়, কখনও বা একটা বড় মাছ, কখনও বা দু-সের ঘি পাঠিয়ে দিতেন এবং কোন কার্য উপলক্ষে যখন জেলায় আসতেন, তখন এই পথ দিয়ে যাবার সময় এক আধ বেলা আমার মত গরিবের প্রবাস-গৃহে আতিথ্যও স্বীকার করতেন। তাই, তারকবাবুও তাঁর ছেলে আমার ঘরে-বাইরের ছাত্র লক্ষ্মীকান্তের সঙ্গে আমাব বেশ একটা আত্মীয়তা হয়েছিল।

এই আত্মীয়তার ফলস্বরূপ একদিন তারকবাবু তাঁর ছোট ভাইকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন—উদ্দেশ্য, তাঁর বাড়িতে একবার আমাকে পদধূলি দিতে হবে; উপলক্ষ তারকবাবুর নবজাত পুত্রের অন্নপ্রাশন। দিনও স্থির করেছিলেন ভাল—এক রবিবার। তারকবাবু অনুরোধ করে পাঠিয়েছিলেন যে, শনিবার মধ্যাহ্নে একটু সকাল সকাল স্কুল থেকে বেরিয়ে তাঁর বাড়ি অভিমুখে যাত্রা করতে হবে—ছয়-সাত ক্রোশ পথ, তিন চার ঘণ্টাতেই অতিক্রম করা যাবে। রবিবার সেখানে থাকতে হবে; সোমবার খুব ভোরে বেরিয়ে এসে যথাসময়ে স্কুলে হাজিরা দেওয়া যাবে। লক্ষ্মীকান্ত দিন দুই আগেই বাড়ি যাবে। শনিবার প্রাতঃকালে পাল্‌কি বেহারা আমার বাসায় এসে হাজির হবে। বলাবাহুল্য, এমন মক্কেলের সাগ্রহ নিমন্ত্রণ আমি অস্বীকার করতে পারিনি, সম্মতি দিয়েছিলাম।

শনিবার এসে পড়ল। সেটা বৈশাখ মাস, রোদ একেবারে ঝাঁ ঝাঁ করে, দুপুরবেলা ঘরের বার হওয়া যায় না। আমাদের স্কুল তখন প্রাতঃকালে বসে—৭টার মধ্যেই ছুটি হয়ে যায়, নইলে যে সব ছেলে দূর গ্রাম থেকে পড়তে আসে, তাদের কষ্ট হয়।

আমি জানতাম নটা-দশটার মধ্যেই পাল্‌কি ও বেহারা এসে পড়বে; কি জানি আমার বাসায় আসতে যদি একটু বিলম্ব হয়, তা হলে লোকগুলো এসে তাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা কববার কথা বাসায় বলে গিয়েছিলাম।

আমি স্কুল থেকে যখন বাসায় এলাম, তখন দেখি বেহারারা পৌছে গেছে। আমি আসতেই তারা নমস্কার করে বলল যে, তাদের বাবু বলে দিয়েছেন, সকাল সকালই যাত্রা করতে। 'কালবোশেখির' দিন, বেলা পড়তেই জল-ঝড় হবার সম্ভাবনা।'

আমি বললাম, "যে রোদ উঠবে তার মধ্যে তোমরা পাল্‌কি কাঁধে করে যাবে কেমন করে? তার বদলে এক কাজ করা যাক, সন্ধ্যার পর ঠাণ্ডা পড়লে যাওয়া যাবে।"

বেহারাদের মধ্যে যে প্রধান, সে বলল, "না, বাবু তা হবে না; বাবুর হুকুম কি অমান্যি

করতে পারি। রোদ দেখে আমরা ডরাইনে। রাস্তার মধ্যে ঝড় তুফানেরই ভয়। আপনি স্নান-আহার করে নিন। এই এগারোটা-বারোটার মধ্যে বেরুলে আপনার আশীর্বাদে এ সাতকোশ পথ তিনটের মধ্যেই পাড়ি জমিয়ে দেব।"

আমি বললাম,—"সে না হয় হবে। তোমরা যে চুপ করে বসে আছ; খাওয়া দাওয়ার কি ব্যবস্থা হয়েছে।"

তারা বল্‌ল—"মা ঠাকরুন তো রান্না করবার কথাই বলেছিলেন; আমরা ও হাঙ্গামায় নারাজ। বাবু একটা টাকা দিয়েছিলেন, তাই দিয়ে চিড়ে ফলার করব ঠিক করেছিলাম। মাঠাকরুন সে টাকা কেড়ে নিয়ে তাঁর চাকরকে কি বলে বাজারে পাঠিয়েছেন, আর আমাদের চুপ করে বসে থাকবার হুকুম দিয়েছেন—আমরা বসে আছি।"

এখানে 'মাঠাকরুন' কথাটার ব্যাখ্যা করতে হচ্ছে। যাঁকে বেহারারা 'মাঠাকরুন' বলে অভিহিত করেছিল, তিনি আমার স্বর্গগতা পূজনীয়া দিদি—আমার জ্যেষ্ঠা ভগিনী; বেহারাদের 'মা ঠাকরুনের' আমার গৃহে আগমনের সুদূর সম্ভাবনাও আমার মনে তখন উদিত হয় নাই। হায় রে, সে সময়!

যাক, সে কথা; বুঝলাম যে দিদি বেহারাদের আহারের জন্য চিড়ামুড়কি সংগ্রহের জন্য বাজারে লোক পাঠিয়েছেন।

বেহারারা এগারটার মধ্যেই খেয়ে-দেয়ে প্রস্তুত হল, আর আমাকে ঘনঘন তাগিদ দিতে লাগল; তাদের ঐ এক কথা রোদে কি করবে, ভয় কালবোশেখির! কালবৈশাখির ভয় আমার ছিলনা—তার পূর্বে অনেক কালবৈশাখি আমার মাথার উপর দিয়ে চলে গিয়েছিল; ভীষণ পদ্মাবক্ষে কালবৈশাখির ঝড়ে নৌকো ডুবে আমাকে মারতে পারেনি, হিমালয়ের মধ্যে কত কালবৈশাখির ঝঞ্ঝাবাত আমাকে চূর্ণ করে ফেলতে পারেনি—কত কালবৈশাখির আক্রমণ সহ্য করে এই সত্তর বছর পর্যন্ত বেঁচে আছি! সে কথা থাকুক।

বেহারাদের তাড়নায় বারোটার সময়ই যাত্রা করতে হ'ল। আমার বিপুল দেহের কথা ভেবে বন্ধুবর তারকবাবু আটটি বেহারা পাঠিয়েছিলেন—বার বার কাঁধ বদল করতে হবে যে!

প্রায় ক্রোশ দেড়েকের মধ্যে পথের পাশে গ্রামও ছিল, মাঠও ছিল, গাছপালাও ছিল, ছায়াও ছিল। কাঁচা রাস্তা, বর্ষাকালে অনেক স্থান ডুবে যায়, যেটুকু মধ্যে মধ্যে জেগে থাকে সেখানেও এক হাঁটু-ভর কাদা। আমি যেদিন যাত্রা করেছিলাম, সেদিন পথের মাঝে মাঝে কাদা ছিল, কিন্তু জলে ডুবে যায়নি।

দেড় ক্রোশ, কি তার একটু বেশি অতিক্রম করবার পর এমন একটা মাঠে গিয়ে পড়লাম যাকে মাঠ বললে 'মাঠের' মর্যাদা বহুগুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয় সে মাঠ নয়—একটা প্রান্তর। এমন বিশাল প্রান্তর, আমি তো অনেক স্থান ঘুরেছি, আর কোথাও দেখেছি বলে মনে হয়না। পিছনের দিক্ ছাড়া সম্মুখে, বাঁয়ে, ডাইনে যে দিকে চাই, সেই দিকেই যেন ধূ ধূ করছে; দূরে—অতি দূরে দৃষ্টি রেখার সীমান্তে কালো মত কি যেন লি-লি করছে; সে গ্রাম কি মরীচিকা, তাও ঠাহর করা যায় না। আমার মনে হ'ল এই প্রান্তরের পরিমাণ-ফল অন্তত দশ বর্গ মাইল। আর এই প্রান্তর একেবারে শূন্য। এ-দেশের জমিতে একটা মাত্র দ্রব্যের চাষ হয়-সে ধান। ধান

কাটা হয়ে গেলেই শূন্য মাঠ হা, হা করতে থাকে; পর বৎসর জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে আবার ধানের চাষ আরম্ভ হয়। তাই তখন মাঠের শোভা অতি ভয়ানক।

আমি পাল্কির মধ্য থেকে সভয়ে চেয়ে দেখলাম, এত বড় প্রান্তরের মধ্যে একটা কি বড় গাছ নেই, যার তলায় একটু আশ্রয় পাওয়া যেতে পারে। একে এই জনমানবহীন প্রান্তর, তাতে বৈশাখের মধ্যাহ্নের অনলবর্ষী সূর্যকিরণ—আমি পাল্কির মধ্যে বসে মধ্যাহ্নের এই ভীষণ মূর্তি দেখে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম—প্রকৃতির এই দৃশ্য আমার কাছে একেবারে নূতন—একেবারে অদৃষ্ট পূর্ব। কিন্তু কি আশ্চর্য এই প্রখর রৌদ্রের তাপে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে বেহারারা তাদের সেই শব্দ মাত্রে পর্যবসিত হুঙ্কার করতে করতে একইভাবে চল্ছে—মাঝে মাঝে কেবল কাঁধ বদলাবার জন্য এক একবার থামছে। আমি এদের এই কষ্ট-সহিষ্ণুতা দেখে অবাক হয়ে গেলাম।

এইভাবে বোধ হয় মাইল দুই তিন গিয়ে তারা পথের পাশে একজায়গায় গিয়ে পাল্কি নামালে। আমি রোদের জ্বালায় কিছুক্ষণ আগে থেকে চোখ বুজে ছিলাম। হঠাৎ পাল্কি ভূমি স্পর্শ করায় আমি দেখলাম একটা বট্গাছের ছায়ায় পাল্কি নেমেছে। তার পরেই দেখি বেহারারা সেই বট গাছের গোড়ায় গিয়ে নতমস্তকে প্রণাম করল। আমি আর তখন পাল্কির মধ্যে বসে থাকতে পারলাম না, পাল্কি থেকে নেমে একটু এগিয়ে গিয়ে দেখি বটগাছের গোড়ায় ছোট একখানি কুটির—আর তার মধ্যে কয়েকটা জলের জালা ও কলসি। একজন লোকও সেখানে বসে আছে। বুঝতে পারলাম যে, কোন সদাশয় মহাত্মা এই প্রান্তরের মধ্যে, এই একটি মাত্র বটগাছের ছায়ায় পথিকদের তৃষ্ণা দূর করবার জন্য জলছত্র খুলেছেন। বিশেষ বিবরণ জানবার জন্য সেই কুটিরের সম্মুখে যেতেই আমার বেহারাদের একজন বলল, "বাবু, জল খাবেন কি?"

আমি বললাম—জল পরে খাব; আগে শুনতে চাই, কে এই জলছত্র দিয়েছেন। বেহারা বলল,—সে অনেক কথা বাবু। আপনি এই ছায়ায় বসুন, আমি বলছি।

তার কথামত সেই বটগাছের ছায়ায় বসে সত্য সত্যই আমার শরীর যেন জুড়িয়ে গেল। যে বাতাস বইছিল তা আগুন-মাখা হলেও আমার কাছে স্নিগ্ধ বোধ হ্ল। তখন সেই বেহারা যা বলেছিল, এতদিন পরে তাহার ভাষায় ঠিক ঠিক সে কাহিনি বলতে পারব না, কিন্তু সে যে ইতিহাস বলেছিল, তার একটি বিবরণও আমি ভুলিনি। সে বলেছিল,

বাবু, এই যে মাঠ দেখছেন এর নাম আগে ছিল বিশ হাজারী মাঠ। এর মধ্যে বিশ হাজার বিঘে জমি আছে নাকি। এখন এই মাঠের নাম হয়েছে ভাতারমারীর মাঠ। এ নামও শুনেছি এই পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে দেওয়া; আমরা তখন জন্মাইনি। এই যে বটগাছটি দেখ্ছেন, এরও বয়স প্রায় পঞ্চাশ-ষাট বছর।

তারপর সে যে কাহিনি বলল, আমি আমার ভাষাতেই বলছি। এই স্থান থেকে মাইল তিনেক দূরে একটা গ্রাম আছে; তার নাম এলাইপুর। পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে এই এলাইপুরে মহেশ দাস নামে একজন মাহিষ্য চাষি বাস করত। এখন যেখানে বটগাছ জন্মেছে, সেই জমি এই মহেশ দাসেরই ছিল। সে নিজেই ঐ জমি চাষ করত। জমির পরিমাণও বেশি নয়—এক

দুই বিঘে কি আড়াই বিঘে। এই জমিটুকু চাষ করবার জন্য মহেশ অন্য জন-মজুরের সাহায্য নিতনা, কারণ তাদের পারিশ্রমিক দেওয়ার সামর্থ্য মহেশের ছিল না। দূরবর্তী গ্রামগুলির কাছে যে সব জমি ছিল, কৃষকরা সেই সকল জমি যখন তখনই চাষ করত, কিন্তু এই প্রকাণ্ড প্রান্তরের মাঝখানে যে সমস্ত জমি, সেগুলি চাষ করবার জন্য চাষিরা খুব ভোরে জমির উপর আসত। বেলা আটটা-নয়টা পর্যন্ত চাষ করত; তার পরেই বাড়ি চলে যেত, কারণ মাঠের মাঝে না আছে ছায়া, না পাওয়া যায় জল; দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে কি এ হেন স্থানে চাষ করা যায়?

একদিন মহেশের কি দুর্বুদ্ধি হ'ল। সে তার স্ত্রীকে প্রাতঃকালে বলল যে, সে তার লাঙল ও দুইটা গরু দিয়ে মাঠের মাঝের জমি চাষ করতে যাবে। দুপুর বেলা সে আর ঘরে আসবেনা। সারাদিনই মাঠে থেকে সবটা জমি চাষ করে সন্ধ্যার সময় সে ঘরে ফিরবে। রোজ রোজ এই দুক্রোশ পথ যাওয়া আসা সে করতে পারবে না। তার স্ত্রী সে কথার প্রতিবাদ করে বলেছিল, এই রোদের মধ্যে সারাদিন সেই মাঠের মাঝে থাকা ঠিক হবে না। সেখানে না আছে ছায়া, না পাওয়া যায় জল। তারও কষ্ট হবে, বলদ দুটাও মারা যাবে। মহেশ সে কথা কানেও তুলল না, সে বলল, "দেখ, তুমি এক কাজ কর। দুপুরবেলাব আগেই আমাব জন্য কিছু চিড়ে আব মুড়ি আর এক কলসি জল নিয়ে মাঠে যেও। আমি তাই খাব, আর বলদ দুটোকেও জল খাওযাব।" তার স্ত্রী বলেছিল, এতটা পথ এখন যাবে, ঘটিখানেক জল সঙ্গে নিযে যাও। যদি সকাল সকাল আসতে পাব তা হলেই ভাল হয়। এক প্রহর বেলার পরও যদি তোমাকে ফিবে আসতে না দেখি তা হ'লে তোমার খাবার, আব এক কলসি জল নিয়ে মাঠে যাব।"

মহেশ এই ব্যবস্থা ঠিক করে লাঙল গরু নিয়ে মাঠে চলে গেল। তার স্ত্রী হরিমতি গৃহকার্যে মন দিল।

হরিমতি ভেবেছিল, তার স্বামী এই নটা-দশটার মধ্যে ঠিক ফিরে আসবে—দুপুব রৌদ্রে কাব সাধ্য যে, ঐ তেপান্তরের মাঠের মাঝখানে থাকে। কিন্তু সে-ভুল বুঝেছিল। বেলা যখন বেড়ে গেল, হবিমতি তখন একবার ঘরে যাচ্ছে, একবার বাইবে এসে পথের দিকে চাইছে। এমনি করতে করতে বেলা যখন দুপুরের কাছে গেল, তখন হরিমতি আব অপেক্ষা কবতে পারলনা; সে কিছু মুড়কি আর বাতাসা আঁচলে বেঁধে আর একটা মেটে কলসি ভবে জল নিয়ে সেই মাঠের দিকে যেতে লাগল। কম পথ তো যেতে হবে না? আর এই প্রচণ্ড বোদেব মধ্যে। হরিমতি জলের কলসিটা একবার কক্ষে নেয়, আঁচল দিয়ে বিড়ে পাকিয়ে মাথায় দিয়ে তার উপর কলসিটা বসিয়ে জমির আল ধরে যেতে লাগল।

এদিকে মহেশ বেলা দশটা পর্যন্ত চাষের কাজেই নিযুক্ত ছিল। দশটার পবে যখন রোদ বেড়ে উঠল, তখন সে একবার মনে করল বাড়ি ফিরে যায়, আবার ঠিক করল, আর একটু কাজ করলেই সবটা জমি চাষ করা হয়ে যায়—এই তো আর একটু পরেই হরিমতি খাবার ও জল নিয়ে আসবে, তখন না হয় দুজনে একসঙ্গেই বাড়ি ফেরা যাবে।

ঘণ্টাখানেক যেতেই জলতৃষ্ণায় মহেশের গলা কাঠ হয়ে গেল। সেই বেলা সাতটা থেকে এই বৈশাখ মাসের প্রখর রৌদ্রের মধ্যে সে কাজ করেছে—তৃষ্ণার আর অপরাধ কি? সে তখন আর লাঙল চালাতে পারলনা—নিকটে গাছপালাও নেই যে, তার ছায়ায় বসে। মহেশ

অধীরভাবে পথের দিকে চাইতে লাগল—তার শরীর অবসন্ন হয়ে পড়ল, চোখ বুজে আসতে লাগল, সেই জনহীন প্রান্তরের মধ্যে নিতান্ত অসহায় অবস্থায় সে পথের দিকে চেয়ে রইল, এমন শক্তি তার নেই যে, তিন মাইল পথ হেঁটে তখন বাড়ি যায়।

মহেশ একবার চোখ বুজে শুয়ে পড়ে, আবার উঠে পথের দিকে চায়। জল—জল—ওগো একটু জল! কিন্তু কোথায় জল, কোথায় হরিমতি।

"তারপর বাবুজি, কি আর বলব। মহেশ তেষ্টার জ্বালায় পাগল হয়ে গিয়েছিল, পরান বার হবার আর দেরি ছিল না। এমনি সময়ে সে দেখলে তার ইস্তিরি মাথায় জলের কলসি নিয়ে আসছে। মহেশ আর তখন বসে থাকতে পারলে না, একেবারে পাগলের মত উঠে দৌড়ল তার ইস্তিরির দিকে—আর সবুর চলে না—ঐ তো জলের কলসি।

"তেনারে ছুটে আসতে দেখে তেনার ইস্তিরি ভাবল তার দেরি হয়ে গেছে, তাই বুঝি তার সোয়ামি তাকে মারবার তরে ছুটে আসছে। সে তখন ভয় পেয়ে যেই বেসামাল হয়েছে, অমনি তার মাথার উপর থেকে কলসিটা পড়ে গিয়ে ভেঙে গেল। এইনা দেখে বাবুজি, মহেশ ঠিক এইখানডায়, যেখানে আপনি বসে আছেন, সেইখানে আপ্রাণ চেষ্টায় কি যেন বলে মাটিতে পড়ে গেল—আর তো জল পাবার উপায় নেই ভেবে তার দম আটকে গেল—এই ঠিক এইখানডায়—আর মহেশ উঠলনা। তার ইস্তিরি কি হল ঠাহর করতে না পেরে দৌড়ে এসে ঠেলা দিয়ে দেখে মহেশের সাড়া নেই। হরিমতি তখন চেঁচিয়ে উঠে তার সোয়ামির মাথাটা কোলে নিয়ে এইখানডায় বসল।

বোশেখ মাসের বেলা গড়িয়ে গেল হরিমতি যেমন বসেছিল, তেমনি বসে রইল। বিকেল বেলায় তার পাড়াপড়শিরা তাকে ঘরে না দেখে খুঁজতে খুঁজতে এই জায়গায় এল। হরিমতি তখনও সেই ভাবেই বসে আছে। মেয়েরা এসে তার গায়ে ঠেলা দিতে তার হুঁস হল। সে ডুকরে কেঁদে উঠে অতি কষ্টে সব কথা বলতে বলতে হঠাৎ চুপ করে গেল, তার মাথাটা তার সোয়ামির বুকের উপর ঝুঁকে পড়ল। যারা এসেছিল, তারা, কি হল, কি হল বলে তার গায়ে ঠেলা দিয়ে দেখে সতীলক্ষ্মী সোয়ামির সঙ্গে চলে গিয়েছে। বাবুজি, আপনি যেখানে বসে আছেন, আমার বাবার মুখে শুনেছি, ঠিক ঐখেনেই তারা পরান দিয়েছিল। তাই তারপর হতে এই মাঠের নাম হয়েছে 'ভাতারমারীর মাঠ'। আর বাবুজি, এই যে বটগাছ দেখছেন, আমাদের মনিব তারকবাবুর বাবা গঙ্গাধরবাবু এই বটগাছ পিতিষ্ঠে করে দিয়ে গেছেন। তিনি এখানে একটা পুকুর দিতে চেয়েছিলেন; কিন্তু বটগাছ দেবতা কি না; তিনি রেতের বেলায় গঙ্গাধরবাবুকে স্বপন দিয়ে বলেন, তুই এখানে পুকুর কাটাসনি, জলছত্তর দে। যদ্দিন এখেনে জলছত্তর রাখবি, তদ্দিন লক্ষ্মী তোর ঘরে অচলা হবে। তারই জন্যই তো বাবুজি গঙ্গাধরবাবু সগ্গে গেলেন। তার পুত্তুর আমার মনিব এই জলছত্তর চালাচ্ছেন। এলাইপুরে মহেশের বাড়ির উপর পুকুর কাটিয়ে দিয়ে সেই জল আনিয়ে এই জলছত্তরে রোজ রোজ বারোমাস পথচলতি লোকের জল খাওয়ানোর ব্যবস্থা করেছেন। মহেশ যে জল জল করে এখানে পরান দিয়েছিল,—তার ইস্তিরি যে এখান থেকে আর ঘরে ফিরে যায়নি বাবুজি।

এই কাহিনি সেই দুপুর রৌদ্রের গাছতলায় বসে শুনতে শুনতে আমি দেশ-কাল ভুলে

গিয়েছিলাম। আমি তখন আমার ঝাপ্‌সা চোখে দেখতে পেয়েছিলাম, মহেশ আর হরিমতির দেবমূর্তি; শুনতে পেয়েছিলাম, তৃষ্ণাকাতর মহেশের মর্মভেদী আর্তনাদ, দেখতে পেয়েছিলাম সতীলক্ষ্মী হরিমতির অসহায় মুখ। আর এতদিন পরেও আজ আপনাদের কাছে সেই ভাতারমারীর মাঠের করুণ কাহিনি বল্‌বার সময়ই সেই দৃশ্যই আমার চোখের সুমুখে ভেসে উঠেছে—সেই মহেশের প্রাণপণ আর্তনাদ—জল! জল! একটু জল! অনেক কাল আগে কারবালার প্রান্তরে একদিন এমনই জল, জল, একবিন্দু জল বলে হৃদয়ভেদী আর্তনাদ উঠেছিল—আর এই নির্জন প্রান্তরের মধ্যে—এই ভাতারমারীর মাঠেও একদিন সেই কাতরধ্বনি 'জল', 'জল একবিন্দু জল', মহেশের মুখ থেকে শেষ উচ্চারিত হয়েছিল। কারবালা জগতের ইতিহাসে অমর হয়ে আছে—আর এই ভাতারমারীর মাঠ মহেশের প্রাণদানের কথা—সতী-সাধ্বী হরিমতির স্বামীর বুকের উপর প্রাণত্যাগের কাহিনি সেই ভাতারমারীর মাঠের মধ্যেই হায় হায় করে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

আমি তখন সেই জলছত্রের রক্ষকের সম্মুখে গিয়ে যুক্তপানি হয়ে জল খেলাম—শরীর মন পবিত্র হয়ে গেল—এ যে সতীকুণ্ডের জল। তাবপর মহেশ-হরিমতির উদ্দেশে সেই বটগাছকে প্রণাম করে আমি পাল্‌কিতে উঠে বস্‌লাম—সেই নিস্তব্ধ জনহীন ভাতারমারীর মাঠের মধ্য দিয়ে আমার পাল্‌কি গন্তব্য স্থানের অভিমুখে চলতে থাকল।*

—পঞ্চপুষ্প—আষাঢ় ১৩৩৭

* ববিবাসরের ষোড়শ অধিবেশনে পঠিত।

আমার মাষ্টার জীবন

যখন আমি জন্মগ্রহণ করি তখন আমাদের গ্রাম ছিল পাবনা জেলাভুক্ত, এখন হইয়াছে নদিয়া জেলার অন্তর্গত; তাহার পর প্রথম জীবনে শিক্ষালাভ করি ফরিদপুর জেলায়, যতদিন চাকুরি করিয়াছি তাহা অধিকাংশ কালই কাটিয়াছে ময়মনসিংহ জেলায়। এখন আপনারা দশজনে বিচার করিয়া বলুন, আমি পূর্ববঙ্গের অধিবাসী, না উত্তরবঙ্গের লোক, না দক্ষিণবঙ্গের মানুষ। এ প্রশ্নের নিষ্পত্তি প্রথমে না হইলে, অন্য কথা যে মোটেই বলা যায়না। তাহাতে কি আসে যায় বলিতেছেন? খুব যায় আসে, পরিচয়টা ভাল মত হইলে অনেক কাজের সুবিধা হয়।

তা হয় হউক, তুমি তোমার গল্প বল।

বেশ কথা, তোমরা যদি কথাটার মীমাংসা না করিয়াই আমার কথা শুনিবার আগ্রহ প্রকাশ কর, আমি নাচার। কিন্তু শেষে নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া হে পশ্চিমবঙ্গ! তুমি বলিয়া বসিওনা, বেটা বাঙাল, লোকটা পদ্মা পেরে হে।

ভূমিকা থাকুক, গল্পই বলি। তোমরা ত গভীর-তত্ত্ব মনোযোগ সহকারে শুনিতে চাওনা, তোমরা গল্পই চাও। বেশ গল্পই শোন। এক যে ছিল রাজা—!

ওকি? গল্প আরম্ভ করিবার সনাতন রীতি সেই ঠাকুরমায়ের আমল হইতেই চলিয়া আসিতেছে 'এক যে ছিল রাজা—' তা'হলে বল, তোমরা রাজার গল্প শুনিবে না। তোমরা কলিযুগের গল্প শুনিতে চাও। তোমরা মাধবী-কুঞ্জের মধ্যে উপবিষ্টা যুবক-যুবতীর প্রেমালাপ শুনিতে চাও না। তোমরা ত্রিতল গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মণিমালিনীর বিরহ ব্যথা শুনিতে চাওনা, তবে কি তোমরা পল্লিবাসী দীন কৃষকের চাঁছা গলায় মোটা সুরে 'তাইরে নাইরে নাইরে না, ঐ শামের নাগাল পালাম না' শুনিতে চাও? মুখ ফিরাও যে! ঘৃণার হাসি চাপিয়া রাখ যে! তবে তোমরাই ফরমাইস কর। বল, কি গল্প বলিব? ঐ জন্য ত বলিয়াছিলাম, যে অগ্রে আমি কোন্ অঞ্চলের লোক সাব্যস্ত করিয়া দাও, তাহা হইলে কথা বলিবার সুবিধা পাই; অর্থাৎ গিয়াছিলাম, গ্যাছলাম, গেছিনু, গিছলাম, গিইলাম—ইহার মধ্যে কোন্ ক্রিয়াপদের ব্যবহার করিয়া কথা বলিতে হইবে, তাহার একটা হদিস পাইতাম।

কি বলিলে, বাজে কথা না বলিয়া আসল গল্পই বলিতে হইবে। ভাষার বিচারটা বুঝি বাজে কথা? যাক, যাহার যেমন অভিরুচি। আমি খিচুড়ি ভাষা ব্যবহার করিয়াই আমার ক্ষুদ্র কাহিনির বর্ণনা করিব। Silence—বড় গোল হচ্ছে! ক্ষমা করবেন মহাশয়গণ, আমার জীবনটা স্কুল মাস্টারিতে কাটিয়াছে কিনা, তাই এখনও Silence—'চুপ' 'চুপ' এখনও ভুলিতে পারি নাই। কেমন ভোলা মন, আমার ঠিক মনে হইতেছিল আমার সেই পাড়াগাঁয়ের স্কুলের সপ্তম শ্রেণির ছাত্রদিগকে বুঝি গ্রামার পড়াইতেছি। বারদিগর আর এমন বেয়াদপি হইবে না।

আমরা তিন ভাই, বড় দাদা, মেজদাদা ও আমি। আর আমাদের আছেন এক বিধবা

ভগিনী—তিনি দাদারও বড়। পিতামাতা অনেক দিন হইল পরলোকে চলিয়া গিয়াছেন। আমার বয়স তখন চোদ্দ বৎসর। দিদিই আমাকে বড় করিয়াছেন—মানুষ করিয়াছেন বলিতে যাইতেছিলাম, আর একটু হইলেই বলিয়া ফেলিতাম। সৌভাগ্যক্রমে কথাটা ওষ্ঠপ্রান্ত অতিক্রম করে নাই। তাহা হইলেই প্রকাণ্ড একটা জবাবদিহির মধ্যে পড়িতাম। চারিদিক হইতে পনেরোগণ্ডা সমালোচক, তথা পাঠক-পাঠিকা এবং তস্য নাবালক নাবালিকা পুত্র-কন্যাগণ বলিয়া বসিতেন, পাড়াগাঁয়ের ইংরেজি স্কুলের ফোর্থ মাস্টার আবার মানুষ! বিশেষ দ্বাদশ বৎসর শিক্ষকতা করিলে নাকি দ্বিপদ মনুষ্য চতুষ্পদ গর্দভে পরিণত হইয়া থাকে, এ প্রকার সিদ্ধান্তও স্বীকৃত হইয়া গিয়াছে।

যাক্, আব বাগাড়ম্বর করিবনা। ঐটাই আমার দোষ। ঐ দোষের জন্য স্কুলের হেডমাস্টার, সেক্রেটারি, দপ্তবি মালি প্রভৃতি অনেকের নিকট কৈফিয়ত দিতে হইয়াছে, তবুও ও অভ্যাসটা ছাড়িতে পারি নাই. যাক্, এখন ঠিক ঠিক গল্প বলিব, আব বৃথা বাগাড়ম্বর করিব না, আপনাদের অমূল্য সময় নষ্ঠ করিব না; কাবণ বাল্যকালে পাঠ করিয়াছি এবং পরে অধ্যাপনাও করিযাছি যে, সময় অমূল্য ধন। "বাশি বাশি ধন দাও অমূল্য সময। একবার গেলে আর আসিবার নয়।"

বড় দাদা বহবমপুবে ওকালতি করেন—বি.এল. নহেন কমিটি পাশ করা। পসারও আছে, নতুবা বড় বৌদিদির গায়ে প্রায আড়াই হাজাব টাকার অলংকার আসিল কেমন করিয়া; নতুবা তাহার একমাত্র শ্যালিকার বিবাহে তিনশত টাকার অধিক ব্যয় করিয়া একছড়া চন্দ্রহার দিয়া তত্ত্ব করিলেন কেমন কবিযা; নতুবা গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপখানি বহুদিন অন্তর্হিত হইয়া খালি ভিটা অতীত গৌরবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে কেমন করিয়া; নতুবা দিদির নিষেধ ও বহু অশ্রুপাত সত্ত্বেও পিতামহেব প্রতিষ্ঠিত নারায়ণ শিলা স্থানীয় বৈরাগীর আখড়ায় সম-অবস্থাপন্ন আর দশটি নারায়ণেব সঙ্গে জুটিলেন কেমন করিয়া; নতুবা আমি দীর্ঘকাল অবিবাহিত থাকিয়া পল্লিগ্রামের স্কুলে বাইশ টাকা বেতনে মাস্টারিতে কাটাইলাম কেমন করিয়া; নতুবা—

—কি বলিলে, সব বুঝিয়া ফেলিয়াছ? বেশ, বেশ তা হ'লে আর 'নতুবা' বাড়াইবনা। বড়দাদাকে তহলে তোমরা চিনিয়া ফেলিয়াছ। এত সহজে; এত কম কথাতেই চিনিলে কেমন করিয়া? বুঝিয়াছি, তোমাদের অনেকেরই বোধ হয় সু-অদৃষ্টক্রমে এমন বড়দাদা আছেন!

পূর্বেই বলিয়াছি, বাবা ও মা তিনদিন আগে-পাছে যখন পরলোক গমন করেন, তখন আমার বয়স ১৪ বৎসর, মেজদাদার বয়স ১৬ বৎসর, বড়দাদার বয়স ১৯ বৎসর। সেই বৎসরে বড় দাদা এল. এ. পাশ করেন, মেজদাদা ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণি হইতেই পড়া ছাড়িয়া দেন; আমি ফরিদপুর জেলাব একটা সাবডিবিসনে বাবার এক মোক্তার বন্ধুর বাসায় থাকিয়া ইংরেজি স্কুলের তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ি। বাবা ছিলেন ময়মনসিংহ জেলার কোন জমিদারের ফরিদপুর জেলার এলাকাভুক্ত এক কাছারির নায়েব। সেকালের নায়েব—বুঝিয়াছ ত, প্রাপ্তি বিলক্ষণ ছিল। বাবার প্রাপ্তি বিলক্ষণের উপরও বিলক্ষণ ছিল। তিনি বৎসবে দুই চারিবার বাড়ি আসিতেন। যখনই বাড়ি আসিতেন, তখনই তাঁহার সঙ্গে তিনচারি

খানি বড় নৌকা বোঝাই জিনিসপত্র আসিত। সে সকল জিনিসপত্র আর নগদ টাকা কি ঘরে থাকিত, না জমা হইত। সমস্ত জিনিস দশ পনেরো দিনের মধ্যে গ্রামের ও পার্শ্ববর্তী গ্রামের আত্মীয় স্বজন, আশ্রিত, অনুগত প্রভৃতির মধ্যে ভাগ হইয়া যাইত। বাড়িতে নিত্য মহোৎসব হইত। আয়ের অধিক ব্যয় হইয়া যাইত। বাবা বলিতেন, সঞ্চয় করিতে নাই; দশজনের জন্যই উপার্জন। বাবা বাড়িতে কোঠাঘর করিতে পারিতেন; কিন্তু আমাদের নাকি কোঠাবাড়ি সয় না। কবে কে নাকি বাড়িতে কোঠা দিবার জন্য ইঁট পোড়াইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, ইঁটের ভাটায় আগুন দিবার সময় কেমন করিয়া সেই আগুন তাঁহার কাপড়ে ধরিয়া যায় এবং তিনি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। সেই হইতে নিষেধ হইয়া গিয়াছে যে, আমাদের কোঠা দিতে নাই, কোঠা আমাদের সথ না। বাড়িতে বড় বড় ঘর ছিল, এখনও কয়েকটা বড় বড় ভিটা অনাবৃত বক্ষে তাহার প্রমাণ স্বরূপ পড়িয়া আছে।

বাবা সুতরাং যখন অকস্মাৎ তিন দিনের জ্বরে মারা গেলেন এবং মাতা ঠাকুরানিও তাহার তিন দিন পরেই ওলাওঠা রোগে বাবার অনুগমন করিলেন, তখন দিদি চারিদিকে খোঁজ করিয়া দেখিলেন যে, কতকগুলি তৈজসপত্র ও একশত টাকা মুনাফার একটি জোত ব্যতীত আমাদের জন্য বাবা আর কিছুই রাখিয়া যান নাই। এই সংবাদ চারিদিকে রাষ্ট্র হইলে আত্মীয়স্বজন আশ্রিত প্রতিপালিতগণ ভাঁড়ের কর্পূরের মত দেখিতে দেখিতে উবিয়া গেলেন; আমরা তিনটি ভাই ও দিদি সেই শূন্য ভাঁড়টি লইয়া বসিয়া থাকিলাম।

বড়দাদা তখন পড়াশুনা ত্যাগ করিয়া কাজ-কর্ম করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন; কিন্তু দিদি তাহাতে সম্মত হইলেন না। দিদি বলিলেন, "পরেশ, আর দুই বছর পড়লে তুই বিয়ে পাশ করে হাকিম হ'তে পারবি; তোর কি পড়া ছাড়া হয়? যেমন করে হোক তোর পড়ার খরচ চালাব।" বড়দাদা তাই ঢাকা কলেজে পড়িতে গেলেন। মেজদাদাও ঢাকায় পড়িতেন। তখনত আর পয়সার অভাব ছিল না; বড়দাদা, মেজদাদা যখন যা চাইয়া পাঠাইতেন, তাহাই পাইতেন। বড়দাদা টাকার সদ্ব্যবহার করিতেন, তাই তিনি লেখাপড়া শিখিতে লাগ্‌লেন। আর মেজদাদা টাকা হাতে পাইয়া ছাত্রদের যা করিতে নাই, তাই আরম্ভ করিলেন—কুসঙ্গে মিশে গেলেন, বড় মানুষের ছেলেদের সঙ্গে টক্কর দিয়ে চলিতে লাগিলেন। কাজেই বাবা যখন পরলোকগত হইলেন, তখন ত আর বাবুগিরি চলেনা; তিনি দ্বিতীয় শ্রেণি হইতেই মা সরস্বতীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া ইয়ারের দলে ভর্তি হইলেন। তাঁহার সমবয়স্ক এবং তাঁহারই মত সুবোধ ও সুশীল ছাত্রের অভাব ঢাকায় ছিল না। তাহারই মধ্যে পিতৃহীন ও সঙ্গতিপন্ন একটি যুবকের সঙ্গ-লাভ করিয়া তিনি কৃতার্থ হইলেন এবং বাবুর মোসায়েবের পদপ্রাপ্ত হইয়া সুখ-সাগরে ভাসিলেন; যত কিছু শিক্ষণীয় ছিল তাহার সমস্তই অধিগত করিলেন,—আবগারি বিভাগের একজন প্রধান পরিপোষক হইলেন। সেই হইতে তিনি আর দেশে আসেন নাই। কিছুদিন ঢাকায় ছিলেন, তাহার পর কলিকাতায় যান, তাহার পর তাঁহার আর উদ্দেশ পাওয়া যায় নাই। এখনও তিনি নিরুদ্দেশ। কেহ বলেন, তিনি সন্ন্যাসী হইয়াছেন, কেহ বলেন, তিনি কাশীতে দেহত্যাগ করিয়াছেন, আবার কেহ বলেন, তিনি ছদ্মনাম গ্রহণ করিয়া রেঙ্গুনে কাঠের কারবার করিয়া বড় মানুষ হইয়াছেন; সেই দেশেরই একটি স্ত্রীলোককে বিবাহ, কি ঐ রকম কিছু করিয়া পুত্র-কন্যাসহ সুখে বাস করিতেছেন।

দুই দাদার ত খবর পাইলেন, এখন আমাব কথা। দিদি ভাবী সাহস করিয়া দাদাকে বি এ. পাশ করাইয়া হাকিম করিতে চাহিয়াছিলেন এবং তাহার জন্য ঘরে যাহা কিছু ছিল, একে একে কিছু বা বন্ধক, কিছু বা বিক্রয় করিয়া দাদার পডাব খরচ চালাইয়াছিলেন। আমাদের সম্বল ছিল, সেই একশ্বত টাকার মুনাফার জোত। দাদা কিন্তু বি. এ. পাশ করিয়া হাকিম হইতে পারিলেন না। দাদা যেবার বি. এ. ফেল করিলেন, আমি সেবার এন্‌ট্রান্‌স পাশ করিলাম। দাদা মাস্টারি লইয়া দিনাজপুর জেলায় চলিয়া গেলেন এবং মাস্টারি কবিতে করিতেই পর বৎসব আইন পরীক্ষা দিলেন। এই এক বৎসর আমাব এল. এ. পড়িবাব খরচ দাদাই দিযাছিলেন। আমি বার্ষিক দ্বিতীয় শ্রেণিতে উঠিলাম। দাদা সেই সময় দিদিকে জিজ্ঞাসা না করিয়া আমাকে কোন সংবাদ না দিয়া এক মুনসেফ হাকিমেব পঞ্চদশ বর্ষীয়া, কেহ বলেন সপ্তদশ বর্ষীয়া, কন্যাকে বিবাহ করিলেন এবং মুনসেফ-শ্বশুরের পবামর্শ মত মাস্টারি ত্যাগ করিয়া বহরমপুরে ওকালতি কবিতে গেলেন। আর এক বৎসব মাস্টাবিতে থাকিবার জন্য তাঁহাকে অনেক অনুরোধ করিয়াছিলাম, কারণ এক বৎসর খরচ চালাইলেই আমি এল.এ. পরীক্ষা দিতে পারিতাম। কিন্তু আমার লেখাপড়াব জন্য তিনি কি তাঁহাব জীবনের উন্নতির আশা ত্যাগ করিতে পারেন? আমি কি করিব, দুইবেলা দুইটা ছেলে পডাইয়া কোন প্রকারে এল. এ. পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইলাম। কিন্তু অদৃষ্টে আছে মাস্টারি, আমার পরীক্ষা দেওয়া হইবে কেন? পরীক্ষার পূর্ব দিনই আমার জ্বর হইল। সেই জ্বব লইযাই দুইদিন পরীক্ষা দিলাম; তৃতীয় দিনে আর উঠিতে পারিলাম না; পরীক্ষা দেওয়া হইল না। জীবনের সকল আশা ভরসা ফুরাইযা গেল। ছয় মাস সেই জ্বরে ভুগিলাম; দশদিন ভাল থাকি, আবাব জ্বর হয়। বৎসরে এক শত টাকা আয়। তাহারই দ্বারা দুই ভাইবোনে কোন রকমে দিন কাটাই। দুরবস্থার কথা দিদি দাদাকে কতবার জানাইয়াছিলেন। কিন্তু দাদা কখনও একটি পয়সাও সাহায্য করেন নাই। একবার বাড়ি আসিয়া দিদির ও আমার অমতে আমাদের বাড়ির নারায়ণ শিলাকে বৈরাগীর আখড়ায় রাখিয়া দিয়া এবং জোতের তাহার অংশ আমাব নামে দানপত্র লিখিয়া দিয়া তিনি আমাদের সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। আমি তখনও অসুস্থ, তখনও আমি দুপয়সা আনিতে পারিনা।

কিছুদিন পরে যখন সুস্থ হইলাম, তখন আর বসিযা থাকিতে পারিলাম না। বাড়ি ঘর-দুয়ারগুলা পড়িয়া যাইতে লাগিল। জিনিসপত্র ক্রমেই মহার্ঘ হইতে লাগিল। মাসিক আট টাকা হারে কি আর দুইজন মানুষের চলে? চাকুরির সন্ধান করিতে লাগিলাম। সুদিনের আত্মীয় স্বজন সকলকেই পত্র লিখিয়া অনুরোধ করিলাম, শুধু অনুরোধ করি নাই বড়দাদাকে। না খাইয়া মরিব, তবুও আমার সহোদর ভ্রাতার সাহায্য গ্রহণ করিবনা, ইহা মনে মনে স্থির করিয়াছিলাম। তিনি দুঃসময়ে আমাদের দেখিলেন না, আমাদের তত্ত্ব পর্যন্তও লইলেন না। একটি পয়সা দিয়া সাহায্য করিলেন না, তাঁহার অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতে আমাব প্রাণ চাহিল না, তাঁহার দ্বারে উপস্থিত হইতে পারিলাম না। সুদিনের বন্ধুরা দুর্দিনে আমার দিকে চাহিলেন না। মুরুব্বির জোর না থাকিলে আর কোন চাকুরি হয়না কিন্তু পাড়াগাঁয়ের স্কুলের মাস্টারি হয়। আমি প্রতি সপ্তাহে এডুকেশন গেজেট দেখিয়া মাস্টারির জন্য দরখাস্ত পাঠাইতে

লাগিলাম। দুই মাসে কম করিয়া হইলেও বোধহয় ত্রিশখানি দরখাস্ত করিয়াছিলাম। প্রতিদিনই ডাকপিয়নের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া থাকি। পিয়ন আমাদের বাড়ির সম্মুখ দিয়া প্রত্যহই চলিয়া যায়, কিন্তু কোনদিনই আমাদের বাড়িতে পদার্পণ করে না। দুইমাস পরে একদিন তাহার পদধূলি স্পর্শে আমার গৃহ পবিত্র হইল। আমার একখানি আবেদনের উত্তর আসিল। ময়মনসিংহ জেলার মধ্যে একটা ইংরেজি বিদ্যালয়ের পঞ্চম শিক্ষকের পদে মাসিক ১৮৲ টাকা বেতনে আমি নিযুক্ত হইয়াছি। দিদিকে এই শুভসংবাদ জানাইলাম। দিদি বলিলেন, "এই আঠারোটি টাকার জন্য ময়মনসিংহ জেলার কোন এক গ্রামে যেতে হবে? তোর চাকরি করে কাজ নেই।" আমি বলিলাম, "আমাদের ত মুরুব্বি নেই যে বড় চাকুরি হবে। এই রকম পনেরো-কুড়ি টাকার মাস্টারিই আমাদের করতে হবে, তা কে বা জানে ময়মনসিংহ আর কে বা জানে মেদিনীপুর।" অনেক বুঝাইয়া দিদিকে হাত করিলাম। তাহার পর একটা শুভ দিন দেখিয়া চাকুরি করিতে গেলাম। সেখানে এক ভদ্রলোকের গৃহে আশ্রয় পাইলাম; তাহার একমাত্র পুত্রকে পড়াই, তিনি আহার দেন। বেতনের টাকা হইতে প্রতি মাসে ১৫৲ টাকা দিদিকে পাঠাইয়া দিই। দিদি এত টাকা পাঠাইতে নিষেধ করিয়া পত্র লেখেন; তিনি বলেন, তাহার টাকার প্রয়োজনই নাই। আমি যেন ভালভাবে থাকি এবং খরচ পত্র করিয়া যাহা পারি জমাইয়া রাখি। আমি কিন্তু দিদির এ কথা, এ আদেশ পালন করি নাই। প্রতি মাসে ১৫টি টাকা তাঁহাকে পাঠাইয়া দিতাম।

গ্রীষ্মের বন্ধের সময় যখন বাড়ি গেলাম, তখন দিদি ধরিয়া বসিলেন যে, আমাকে বিবাহ করিতেই হইবে। আমি তাঁহাকে স্পষ্ট বলিলাম যে, "আমি জীবনে কখনও বিবাহ করিব না। আঠারো টাকা বেতনের স্কুলমাস্টারের বিবাহ করিতে নাই। বিবাহ করিলে পাপ হয়।" দিদি আমার কথা শুনিয়া বলিলেন, "যোগেশ তোর এক অনাছিষ্টি কথা; এমন কথা ত বাপের জন্মেও শুনি নাই। তুই যদি বিবাহ না করবি, তা হলে আমি কেমন করে এসব রক্ষা করি, আর কেনই বা করি। পরেশ ত কোন খোঁজ খবরই নেয়না; সুরেশ বেঁচে আছে না কি হয়েছে, তা এত দিনেও জানতে পারলাম না। এক তুই আছিস; তুই ও যদি বিবাহ করে ঘরসংসার না করিস, তবে তোদের এত কাল টানলাম কেন?" আমি বলিলাম, "আর দুই জনকে টেনেও যা লাভ হয়েছে, আমাকেও টেনে তাই হবে। দাদার ত ভাই বটে।" দিদি বলিলেন, "তা হবে না যোগেশ' তোকে বিয়ে করতেই হবে।" আমি বলিলাম, "দিদি তুমি যাই বল না কেন, আমি এ জীবনে কিছুতেই বিবাহ করিব না। যে কয়দিন তুমি বেঁচে আছ, সে কয়দিন তোমার সেবা করব। তারপর তোমার অভাব হলে আমি সব ছেড়ে দিয়ে যা হয় একটা করব।" দিদি বলিলেন, "দেখ, আমায় সত্যি করে বলত, তোর এ মতি হল কেন?" আমি বলিলাম, "দিদি তুমি যদি কিছু মনে না কর, তাহলে আমি সত্য কথা বলতে পারি।" দিদি বলিলেন, "আমি কিছু মনে করব না, তুই ঠিক কথা বল্।" আমি বলিলাম, "দেখ দিদি, তুমি আমার সব কথা শুনে হয়ত হাসবে; কিন্তু হাসবার কথা নয়। আমার দৃঢ় ধারণা জন্মেছে যে, এখনকার দিনে ছেলেরা বিয়ে করলেই পর হয়ে যায়। তখন অনেকেরই মা, বোন, ভাই এ সকলের দিকে তেমন টান থাকে না। সে দু-চারজনের থাকে, তারা দেবতা, তাদের আমি মানুষের মধ্যে

ধরিনা। এমন ভাব যে কি করে হোলো, তাও ত বুঝিনা। কিন্তু আমার ত দেখে শুনে ভয় হয়েছে। অবশ্য এ জন্য আমি বৌদেরই দোষ দিচ্ছিনে, বেশি দোষ বাবুদের। তারাই বৌদের স্পর্দ্ধা বাড়িয়ে দেন। এই সব দেখে আমি স্থির করেছি যে, যতদিন তুমি বেঁচে আছ, ততদিন আমি কিছুতেই বিয়ে করবনা। এ সঙ্কল্প আমি ত্যাগ করব না, তা তুমি যাই বলনা কেন।'' আমার কথা শুনিয়া দিদি দুঃখিত হইলেন; বলিলেন, ''এরই জন্য তুই বিয়ে করবিনে। পাগল আর কি! তোর মত যার মন, সে কি আর অমন হয়, সে কি আর সকলকে পর ভাবতে পারে। এই ত আমরাও ত এক বাড়ির বৌ ছিলাম; কিন্তু কৈ, কোন দিন ত আমি আমার দেওর, ভাসুরকে পর মনে করি নেই বা তাঁদের অশ্রদ্ধা করি নেই। তুই কটাই বা দেখেছিস; নিজেদের বাড়ির একটা দেখেই বুঝি তুই সকলকেই তেমনই মনে করে নিয়েছিস্। পাগল আর কি! আমি তোর কোন কথাই শুনব না। আমি একটা ভাল মেয়ে দেখে তোর বিয়ে দিয়ে দেব। কথা জানিস কি, ভাল ঘরের মেয়ে আনতে হয়। যারা দশটা নিয়ে ঘর বসত করেছে; সেই বাড়ির মেয়েরা কখনও অমন হয়না। তারপর পুরুষেরা যদি ঠিক থাকে, তবে মেয়েদের সাধ্য কি যে, তারা কুপরামর্শ দেয়।'' আমি বলিলাম,'' সে যাই বল দিদি! আমি যা বলেছি তাই করব। কেউ আমাকে বিয়ে দিতে পারবে না, তুমি যদি আমার কথা না শুনে কিছু কর, তাহলে তুমিই লজ্জা পাবে। আমি দেশ ছেড়ে পালাব।'' আমার কথা শুনিয়া দিদি যে মনে খুব ব্যথা পেলেন, তা আমি বেশ বুঝতে পারলাম। কিন্তু আমি কি কিছু অন্যায় বা অসঙ্গত বলেছি। তোমরাই কথাটা বিচার কর না। আর পরকে উপদেশ দেবার জন্য কথা বোলোনা, আপনার আপনার দিকে চেয়ে কথা বোলো। কেন, এখন যে কথা বলনা?

যাক, আবার সেই বাগাড়ম্বর আরম্ভ হয়েছিল আর কি। গ্রীষ্মের ছুটি শেষ হয়ে গেল, আমি আমার কর্মস্থানে চলিয়া গেলাম। দিদি যে মনে বড় কষ্ট পেয়েছেন তা মনে করে আমারও কষ্ট হয়েছিল; কিন্তু তা বলে আমি আমার সঙ্কল্প ত্যাগ করি নাই। তারপর যখনই বাড়ি গিয়েছি, তখনই দিদি নিজে কিছু না বলে একে দিয়ে ওকে দিয়ে কথাটা পেড়েছেন; কিন্তু আমার সেই এক উত্তর—আমি কখনও বিয়ে করব না।

গল্পটা তোমাদের ভাল লাগছে না। কেমন? পাড়াগেঁয়ে স্কুলমাস্টার, তারপর ঘর-গৃহস্থালির কথা, জোতজমার কথা, এ সকল ত ভাল না লাগিবারই কথা। গল্পেব মধ্যে যদি চাঁদের জোছনা, ফুলের সুবাস, প্রেমের হা-হুতাশ, মলয় বাতাস, দীর্ঘনিঃশ্বাস না থাকিল; অথবা যদি মারামারি, কাটাকাটি, গুপ্তরহস্য, লুকোচুরি, আহা মরি প্রভৃতি না থাকিল তাহা হইলে সে কি আবার একটা গল্প! ঠিক কথা বলিয়াছ, আমি যাহা বলিতেছি, তাহা আর যাহা হয় হইতে পারে কিন্তু গল্প নহে, গল্পের মালমশলা আমার তহবিলে নাই।

যাক্ কথাটা যখন আরম্ভ করিয়াছি তখন গল্পই হউক, আর অল্পই হউক, মধ্যপথে ত আর শেষ করিতে পারি না. গোল করিলে আমি কথার খেই হারাইয়া বসিব। হ্যাঁ, বলিতেছিলাম এই যে, আমি দিদির প্রস্তাবে কিছুতেই সম্মত হইলাম না; দিদি কিন্তু সুর ছাড়িলেন না। বৎসরের মধ্যে তিনচারি বার বাড়ি আসি, আর দিদি সেই পুরাতন কথা তুলিয়া অদৃষ্টের প্রতি দোষারোপ করেন। কিন্তু আমি অটল, অচল।

একাদিক্রমে একই স্কুলে চোদ্দ বৎসর মাস্টারি করিয়াছি। উন্নতিও যথেষ্ট হইয়াছে। আঠারো টাকা বেতনে পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া গমন করি; তাহার পর চোদ্দ বৎসর অতীত হইলে যখন শিক্ষকতা পরিত্যাগ করিয়া এই সেদিন দেশে আসিয়াছি তখন আমার বেতন হইয়াছিল বাইশ টাকা, ফিফথ মাস্টার হইতে ফোর্থ মাস্টারিতে প্রমোশন পাইয়াছিলাম। চোদ্দ বৎসরে চারি টাকা বেতন বৃদ্ধি বুঝি কম কথা; পল্লিগ্রামের বিদ্যালয় সমূহের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় আমার এই অসম্ভব, অভাবনীয় উন্নতির কথা সোনার হরফে লিখিয়া রাখা উচিত। আমার স্কুলে যিনি তৃতীয় শিক্ষক ছিলেন, তিনি পঁচিশ টাকা বেতনে প্রথম প্রবিষ্ট হন, ছাব্বিশ বৎসর পরে যখন স্বর্গ হইতে তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য দেবদূত আগমন করেন তখনও তিনি সেই থার্ড মাস্টারই ছিলেন, তখন বেতন পাইতেন সাতাশ টাকা। তিনি ছাব্বিশ বৎসরে যদি দুই টাকা পাইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার চোদ্দ বৎসরে সেই নজির অনুসারে কত পাওয়া উচিত, একবার ত্রৈরাশিক করিয়া বলনা? আরও এক কথা জান, অন্য চাকুরিতে লোকে যতই পুরাতন হইতে থাকে, ততই তাহার বেতন বাড়ে, পনেরো টাকা বেতনের কেরানিকে আটশত টাকা বেতনে ডেপুটিগিরি করিতে দেখিয়াছি; কিন্তু স্কুলমাস্টারদের বেলায় ঠিক তার উল্টা; মাস্টার যত পুরাতন হইতে থাকে, ততই তাহার বেতন কমে, তার প্রমোশন নীচের দিকে হইতে থাকে। এ অবস্থায় চোদ্দ বৎসরে আমি যদি পঞ্চম শিক্ষক হইতে চতুর্থ পদে উন্নীত হইয়া থাকি এবং আমার বেতন চারিটাকা বাড়িয়া থাকে, তাহা হইলে আমি আমাকে ভাগ্যবান বলিয়া মনে করিবনা কেন?

যাক্, তোমাদের মত অরসিকের কাছে গল্প বলবার চেষ্টা করাই বিড়ম্বনা হয়েছে; সুতরাং আমার জীবনের এক পর্বের কথা এখানেই শেষ করলাম।

—পুষ্পপাত্র, বৈশাখ ১৩৩৫

ঘরের কথা

আগে আমাদের মোটামুটি পরিচয় দিই, তারপর অন্য কথা। আমরা তিনভাই; আমি সকলের ছোট। বাবা মারা গিয়েছেন। মা বেঁচে আছেন। বাবা প্রথমে কাজ করতেন গিলাণ্ডারের অফিসে; তারপর সে কাজ ছেড়ে তিনি চিনির দালাল হ'ন। এই দালালিতেই তিনি যথেষ্ট উপার্জন করেছিলেন, তার প্রমাণ আমাদের এই বাড়িখানি। অন্য প্রমাণ প্রত্যক্ষ নয়, কারণ বাবার কোন ব্যাঙ্কেও টাকা জমা ছিল না, কোম্পানির কাগজও ছিল না। তবে আমাদের বিশ্বাস, তাঁর ব্যাঙ্ক ছিলেন আমার মাতাঠাকুরানি, কোম্পানির কাগজও ছিলেন তিনি; অর্থাৎ সোজা কথায় মায়ের হাতে বিলক্ষণ যে দু পয়সা আছে, সেটা তাঁর কথায় বার্তায় বুঝতে পারা যায়। তাঁর কাছে সে প্রসঙ্গ উত্থাপন করলে তিনি বলেন,—"আছে ত আছে। আমার মেয়েও নেই যে তাদের দিয়ে যাব, বাপ, ভাইও নেই যে বিলিয়ে দেব; থাকে দু-পয়সা, তোদেরই আছে। নিমতলায় যাবাব সময় তো আব বেঁধে নিযে যাব না।" তাঁর হাতে যে যথেষ্ট টাকা আছে, তার আর একটা প্রমাণ এই যে, বড় বৌদিদি সব দিকে মিলিটারি শ্রেণির মহিলা হলেও এখনও মায়ের উপর কর্তৃত্ব চালাতে সঙ্কুচিত; হুকুম-হাকুম তিনিই দেন, সংসারের রাশ তাঁহারই হাতে, কিন্তু তিনি যা কবেন, সবই মায়ের দোহাই দিয়ে; মায়ের আদেশ বলেই তিনি আদেশ প্রচার করেন, আমরা, তথা তাঁর স্বামী আমার পরম পূজনীয় বড়দাদা শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ, হাইকোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ অ্যাটর্নি প্রবরের ভয়ে "আপনার অতি বিশ্বস্ত ভৃত্য" (your most obedient servant) হয়ে থাকি, অন্তত এতকাল ছিলাম।

আবার দেখি, আমার মাতা ঠাকুরানি ও বড় বৌদিদিকে সমীহ করে চলেন,—আদর করেন বল্লে একটু যেন প্রভুত্বের গন্ধ পাওয়া যায়। এর কারণ এই যে, বড়দাদা আমাদের অন্নদাতা; কাজেই তাঁর গৃহিণীও আমাদের উদরান্নের মালিক। পৈতৃক যা কিছু সবই মায়ের হাতে; তার থেকে একটি পয়সাও মা ব্যয় করেন না; যা কিছু সংসারের জন্য দরকার, তা দাদার প্রতিনিধি ভাবে বড় বৌদিদি সরবরাহ করেন। এক্ষেত্রে মাতাঠাকুরানি বড় বৌদিদিকে সমীহ না করেই পারেন না; আবার বড় বৌদিদিও অচির ভবিষ্যতের মায়ের লোহার সিন্দুকের একমাত্র অধিকারিণী হবার প্রলোভনে মাতা ঠাকুরানিকেও সমীহ না করে পারেন না।

এই ত গেল আমাদের সংসারে নাটকের প্রধান অভিনেতাদের কথা। অপ্রধান যাঁরা তাঁদের মধ্যে আমি একজন—বড়বৌদিদির সর্বকনিষ্ঠ দেবর। আমি এতদিন নাবালক ছিলাম, কলেজের ছাত্র কিনা—এখন এই চার পাঁচ মাস হল এম. এ. পাশ করে সাবালক হয়েছি।

আমাদের সংসার রঙ্গমঞ্চের আর দুটি অভিনেতা ও অভিনেত্রী আমার মেজদাদা ও মেজবৌ-দিদি। আমার মেজদাদা শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষকে তাঁর বিধাতা যখন গড়েন, তখন বোধ হয় সেই বিধাতৃ-পুরুষের তন্দ্রাকর্ষণ হয়েছিল, তাই মেজদাদাকে এক সৃষ্টিছাড়া উপাদানে গড়েছিলেন। মেজদাদা প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করে আই-এ পড়তে গেলেন। মাস ছ'য়েক পড়বার পরই

কলেজ ছেড়ে দিলেন; কৈফিয়ত দিলেন যে, যে ছেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ঢালাও ফার্স্ট ডিভিশনের পাশের মরশুমেও কোনও রকমে তৃতীয় বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে, সে কিছুতেই আই. এ. পাস করতে পারে না; কলেজ এডমিশনই দিতনা, বড়দাদার যোগাড়-যন্ত্রে প্রবেশ পথ পাওয়া গিয়েছিল; সুতরাং পাশের জন্য চেষ্টা করা সময়েরও অর্থের অপব্যবহার। এই অজুহাতে তিনি কলেজ ছেড়ে দিলেন। সে আজ দশ বছর আগের কথা, বাবা তখন বেঁচে ছিলেন, দাদা তখনই অ্যাটর্নি, আর আমি তখন থার্ডক্লাসে পড়ি।

মেজ-দা কলেজ ছেড়ে দিলেন বটে, কিন্তু পড়া ছাড়লেন না;—শুধু ছাড়লেন না নয়, পড়াটা যেন তার নেশা হয়ে পড়ল। দুবেলা স্নান-আহার, আর রাত্রিতে বড় জোর ঘণ্টা তিনচার নিদ্রা ব্যতীত আর সব সময়ে তিনি বই নিয়ে বসে আছেন। নেশা বলব না তো কি বলব? পড়াও সে বিচিত্র রকমের। তিনি প্রতিজ্ঞা করে বসলেন, ইউরোপের বা অন্যান্য দেশের জীবিত, ও মৃত ও অর্ধমৃত যত ভাষা আছে, সব তিনি শিখবেন। বাবা আর কি করবেন, নানা ভাষার বই কেনবার টাকা দিতে লাগলেন। দাদা সেই টাকায় বই কিনতেন আর বড় লাইব্রেরিতে চাঁদা দিয়েই বই নিয়ে আসতেন। 'আসতেন'ই বা বলি কেন, এই দশবছর তাই করে আসছেন। তাঁর এই নেশাকে ঘরের দিকে ফেরাবার জন্য বাবা মা দাদা পরামর্শ করে তাঁর গলায় মেজবৌদিদিকে গেঁথে দিলেন। মেজদা উপরোধে পড়ে শ্রীরত্ন গলায় ধারণ করলেন বটে, কিন্তু ছ'মাস যেতে না যেতেই সে কণ্ঠহার নামিয়ে রেখে আরও বেশি করে পড়ায় মন দিলেন। বাবার মৃত্যুর বছর খানেক আগে মেজদার একটি মেয়ে জন্মগ্রহণ করল। আমরা সবাই মনে করলাম, এইবার দাদা সংসারী হবেন। আমাদের সে আশা পূর্ণ হল না মেজ-দা যা ছিলেন, তাই থাকলেন।

সেই সময় বাবা একদিন মেজদাকে ডেকে বললেন, "দেখ, সত্যেন, এমন করে বই নিয়ে বসে থাকলে ত চল্‌বে না। আমার জমিদারি নেই যে, তোরা বসে খাবি। সবাইকে রোজগার ক'রে সংসার প্রতিপালন করতে হবে। এখন তোর একটা মেয়ে হল, ভগবানের আশীর্বাদে আরও সন্তান হোক। এখন দেখেশুনে একটা কাজকর্মে লেগে যা। বলিস্ তো আমরাও চেষ্টা করতে পারি।"

মেজদা বললেন, "ও সব আমি পারব না বাবা।"

বাবা বললেন, "তা হলে তোর সংসার চলবে কি করে?"

দাদা হেসে বললেন, "বেশ ত কথা; আমার আবার সংসার এল কোথা থেকে? সংসার তোমাদের; তোমরাই দেখবে।"

বাবা বললেন "যে কদিন আমি বেঁচে আছি, ততদিন এ সংসার আমারই তোর একথা খুব ঠিক। কিন্তু আমি ত আর অমর বর নিয়ে আসিনি। আমার বয়সও কম হল না, কোন্ দিন চলে যাব তার ঠিক নেই। আমার অভাবে কি হবে?"

দাদা বললেন "কেন, দাদা আছে, হরেন আছে; তারাই সংসার দেখবে। আমায় দিয়ে ও সব কিছু যে হবে না, তা ত তুমি দেখছো বাবা।"

বাবা বললেন "ওরে হতভাগা, আমার অভাবে তোর ভাইয়েরা যদি তোকে খেতে না দেয়,

তোকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়, বৌমা আর মেয়েটিকে নিয়ে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবি? তোর শ্বশুর বংশে কেউ নেই যে, তোকে আশ্রয় দেবে।"

দাদা তেমনই, সহাস্য মুখ বললেন, "বাবা তোমার সঙ্গে তর্ক করছিনে, কিন্তু তোমার ঐ 'যদি'র কোন অর্থ নেই। যদি বাজারে চাল-ডাল না মেলে, তা হ'লে কি হ'বে? যদি পৃথিবী উল্টে যায় তাহলে কোথায় থাকব? এসব 'যদি'র আর অন্ত নেই বাবা। সে সব কথা তুমি ভেবনা, ও যা হয়—একরকম করে জুটে যাবে। আর এক কথা; তুমি দাদা আর হরেন সম্বন্ধে অমন একটা নিষ্ঠুর 'যদি'র কথা বলে তাদের মনুষ্যত্বকে কি লাঞ্ছনা করলেনা? তাদের কি কর্তব্য জ্ঞানহীন তুমি বল্লেনা? তুমি যে ভুলে যাচ্ছ, তারা আমার ভাই। কবি রবীন্দ্রনাথ কি বলেছেন—পড়নি? তিনি বলেছেন 'ভাই ছেড়ে ভাই কদিন থাকে'; সেকি পারবার যো আছে; তারা যে আমার ভাই—আমার সমসুখদুঃখভাগী।"

বাবা এমন সদাশয় ভালমানুষের এমন উদার সংস্কারের বিরুদ্ধে আব কোন কথা বলা সঙ্গত মনে করলেন না; তিনি চুপ করে রইলেন। আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। আমি মনে মনেই বল্লাম, হায়রে সংসারানভিজ্ঞ বিশ্বপণ্ডিত, তোমার আরও বহু শত বৎসব পূর্বে জন্মগ্রহণ করা উচিত ছিল। সে রাম লক্ষ্মণের দেশ আর নাইরে দাদা!

এর কিছু দিন, প্রায় এক বৎসর পরে বাবা যখন মারা গেলেন, তখন হতেই মেজদাও মেজবৌদিদির অশেষ কষ্ট লাঞ্ছনা, গঞ্জনা আরম্ভ হল। সেই সময়ে আরম্ভ বল্লে ঠিক কথা বলা হয়না,—তুচ্ছ তাচ্ছিল্য গঞ্জনা পূর্ব হতেই অল্পবিস্তর আরম্ভ হয়েছিল, কিন্তু বাবা বেঁচে ছিলেন বলে সেটাব মাত্রা বাড়েনি; আর মেজ বৌদিদিও একেবারে মাটির মানুষ বলে তিনি কিছুই গায়ে মাখতেন না; তাঁর মুখ দিয়ে কোন দিন কেউ একটা কাতর উক্তি ও শুনতে পাইনি; তিনি নীরবে সমস্ত লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করেছেন, আর এখন যে অসহনীয় অত্যাচাব, তাও সেই ভাবেই সহ্য করে আসছেন।

এই বছব খানেক আগে মেজদার আর একটি মেয়ে হয়েছে। বড়দার একটি মাত্র ছেলে; সে মেজদার বড় মেয়ে শুভারই সমবয়সী। বাবা যখন বেঁচে ছিলেন, তখনই বড় বৌদিদি এবং আমাব মাতাঠাকুরানি মেজবৌদিদিকে ভাল দৃষ্টিতে দেখতেন না। আপনারা আমাকে ক্ষমা কববেন আমাকে বাধ্য হয়েই আমার পূজনীয়া মাতৃদেবী ও বড়বৌদিদি সম্বন্ধে বিশেষ অপ্রিয় প্রসঙ্গের অবতারণা করতে হচ্ছে; কিন্তু, যা সত্য, যে সমস্ত ব্যবহার আমাব প্রাণে দারুণ আঘাত করেছে, সে সকল কথা না বলেই পারছিনে।

পূর্বেই বলেছি, বাবা বেঁচে থাকতেই মেজবৌদিদির লাঞ্ছনা আরম্ভ হয়েছিল, কিন্তু পাছে বাবা জানতে পান, সেজন্যে একটু চাপা ছিল। কিন্তু, আমি তো সব দেখতে পেতাম। বড়দাদার ছেলে আর মেজদাদার মেয়ে এই সময় জন্মগ্রহণ করেছিল। বড়দাদা তাঁর সেই শিশুপুত্রের জন্য কত কি এনে দিতেন, আবশ্যক ও অনাবশ্যক জিনিসে তাঁর ঘর বোঝাই হয়ে যেত; কিন্তু মেজদার মেয়ের জন্য বড় দাদা, কি বড়বৌদিদি, কি আমার মা কখনও সাধ-আহ্লাদ করেও একটা জিনিসও এনে দেননি, একথা আমি শপথ করে বলতে পারি। সে হতভাগিনির সন্তানটা সামান্য যা কিছু পেয়েছে, তা বাবাই এনে দিয়েছিলেন;—তাঁর কাছে ত আর অ্যাটর্নির ছেলে

আর সংসারের গলগ্রহের মেয়ের মধ্যে পার্থক্য ছিল না! কিন্তু, তা হলেও মেজদা, মেজবৌদিদি আর তাঁর মেয়ে যে সংসারের গলগ্রহ, শুধু ব'সে ব'সে অন্নধ্বংস করছেন, একথা দিনের মধ্যে দশবার মেজবৌদিদিকে শুনতে হোত, অথচ আমি জানি, মেজবৌদিদি কোনদিন তাঁর মেয়ের জন্য সামান্য একটা দ্রব্যও কারও কাছে চাননি—এমনকি আমার মায়ের কাছেও না। বলতে লজ্জা হয়, ঘৃণা বোধ হয়, শুভা যথেষ্ট পরিমাণে দুধ খেতে পেত কিনা সন্দেহ। সকলের অযত্নেই হোক বা অল্পাহারেই হোক, মেয়েটা দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছিল। আর আমার মেজদাদা তাঁর জ্ঞান ভাণ্ডারের মধ্যে অবিচলিত ভাবে ব'সে থাকতেন। মেজবৌদিদি কোনদিন মেজদার কাছে যে কোন অভিযোগ করেননি, বা তাঁর কষ্টের কথা বলেননি, একথা আমি দিব্য করে বলতে পারি—তিনি যে সে ধাতুতেই গড়া নয়—সহ্য করবার জন্যই ভগবান তাঁকে আমার মেজদার স্ত্রী করে পাঠিয়েছিলেন।

বাবা মারা যাবার পর বড়বৌদিদি একেবারে নিজমূর্তি ধারণ করলেন। মাতা ঠাকুরানির বোধ হয় সাহসে কুলালোনা তাঁর বড় পুত্রবধূর অত্যাচারের প্রতিবিধান করতে, বিশেষত মেজবৌদিদির ওপর প্রসন্ন ছিলেন না, কারণ মেজদা যে একপয়সাও উপার্জন করেন না। আমি ত কেতাবে পড়েছি যে, ছেলেদের মধ্যে যেটি নির্বোধ বা অকর্মণ্য, মায়ের স্নেহ নাকি তার উপরেই বেশি হয়। হয়তো এ কথার পনেরো আনা সত্য; এক আনা মিথ্যে—কিন্তু আমি বলতে পারি, আমার মা সেই অবশিষ্ট এক-আনার মধ্যে। অবশ্য আমিও তখন উপার্জন করতাম না, কলেজে পড়তাম, ভালভাবে পাশও করতাম; সুতরাং ভবিষ্যতের আশায় আমি তাঁদের স্নেহলাভে বঞ্চিত হইনি। তাহলেও আমি কোনদিন মেজদাদা কি মেজবৌদিদির স্বপক্ষে কোন কথা বাড়ির কাউকে বলিনি। আমি নিজে যা পেরেছি, গোপনে তা করেছি।

মেজ-দার বই কেনবার টাকা চাই, তাঁর লাইব্রেরির চাঁদা চাই। আগে এ সব বাবা যোগাতেন। বাবা মারা যাবার পর বড়দাদার কাছে তিনি টাকা চাইতে গিয়েছিলেন, বড়দাদা অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিয়ে তাঁকে তাড়িয়ে দেন। তখন মেজ-দাদা অন্য উপায় নেই দেখে আমাকে এসে ধরেন! আমি তখন তাঁকে একটা চাকুরি দেখে নিতে বলি। তিনি বলেন, "সে আমি পারব না, ভাই! ধরা-বাঁধার মধ্যে যেতে আমার ভয় করে। আমার দিয়ে ওসব হবেনা। তুই যে করে হোক আমার দরকার পুরণ কর্। তোদের উপর যে আমায় দাবি আছে—তুই যে আমার ছোট ভাই।" এমনভাবে মেজদাদা কথা কয়টি বল্লেন; তাঁর ঐ শেষের কথাটি—'তুই যে আমার ভাই'—সে কথাটা এমনই মর্মস্পর্শী ভাবে, এমনই নির্ভরের ভাবে যে, আমি তখনই বলে ফেল্লাম, "মেজদা তোমার ভার আমার উপর! আর যদি আমি ভাল করে সব ক'টা পাশ করতে পারি, তাহলে তোমার স্ত্রী-কন্যাদের সম্পূর্ণ ভার আমি নেব।" তখন আর কি করি একটি ছেলেকে দু-ঘণ্টা পড়াবার ভার অতি গোপনে নিলাম; মাসিক বেতন কুড়ি টাকা। তাতে কি মেজদার বই কেনা চলে? এক একখানি বইয়ের দামই পনেরো কুড়ি টাকা। অন্য উপায় না দেখে আমার এক সহাধ্যায়ী বড়মানুষের ছেলে বন্ধুর সাহায্য প্রার্থনা করলাম। সব কথা শুনে যে আমাকে সাহায্য করতে সম্মত হোল। যখন পারব, তখন তার ধার শোধ দেব। আজ পর্যন্ত হিসাব করলে তার প্রায় নয়শত টাকা পাওনা হয়েছে। এ টাকার অধিকাংশই

মেজ-দাদার খেয়াল পরিতৃপ্তির জন্য ব্যয় করিনি; অবশিষ্ট কিছু দিয়ে অতি গোপনে মেজ-দাদাব দুই মেয়ে শুভা ও বেলার কি যুগিয়েছি—ভগবান সে কথা আমাব মুখ দিয়ে বলিয়োনা।

বড়বৌদিদি এখন আর রাঁধুনি রাখেন না; "কেন ওটা কি বসে বসে খাবে?" মেজবৌ-দিদি এত বড় সংসারের রান্না করেন, দুটো ঝিয়ের কাজ করেন, ভোর থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত তাঁর অবসর নেই; মেয়ে দুটোর দিকে চেয়ে দেখবার ও সময় পান না। এত করেও বড় বৌদিদি আর আমার মা'র মন পাননা। বড় বৌদিদি যে সব বাক্য উচ্চারণ করেন, তা শুনলে কানে আঙুল দিতে হয়। ভদ্রলোকের গৃহিণী, বড়মানুষের মেয়ের মন যে এত ছোট, আর কথা যে এমন কদর্য হতে পারে, তা আমি জানতাম না।

এ পর্বের এখানেই শেষ—যা বলেছি তার থেকেই সবাই প্রকৃত অবস্থা বুঝে নিতে পাববেন। এখন শেষের কথা বলি। আমি এই মাস কয়েক আগে এম. এ. পাশ করেছি, শুধু পাশ নয়—ইংরেজি সাহিত্যে একেবারে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। গোপনে গোপনে চাকরির সন্ধান করলাম। কাল রাত্রিতে সংবাদ পেয়েছি, আমি লাহোর কলেজে ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপকেব কাজে নিযুক্ত হয়েছি, বেতন আপাতত আড়াই শত টাকা। কাল আর একথা কারও কাছে ভাঙিনি। আজ প্রাতঃকালে মায়ের কাছে যেতেই বড় বৌদিদি বল্লেন, "ভাই, এইবাব একটা বিয়ে কব? তারপর দেখেশুনে একটা চাকুরিতে বসে যাও।"

কি জানি কেন, এতকালের রুদ্ধ অন্তর্দাহ আজ আর আমি গোপন রাখতে পারলাম না। বল্লাম "কেন, আরও একটা রাঁধুনি আর বিনা মাইনের ঝিয়ের দরকার হয়েছে বুঝি?"

বড়বৌদিদি বললেন, "কি? কি বল্লে?"

আমি বল্লাম, যা সত্যি কথা, তাই বল্লাম; মেজবৌদিদি আর তার দুটো মেয়ের উপর অত্যাচার ক'রে তাদের ত যমের বাড়ি পাঠাবার মত করেছ; তাই আগে থাকতেই আর একটিকে জুগিয়ে রাখতে চাচ্ছ বুঝি?"

বড়বৌদিদি এই কথা শুনে একেবারে উগ্রচণ্ডা হয়ে বল্লেন, "কি বল্লে? আমরা তাদের মারতে বসেছি? এই কথা সেই হতভাগি তোমার কাছে লাগিয়েছে? আজ দেখছি কেমন তার শক্তি। ঝাঁটা মেরে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছি।"

আমি বল্লাম, "আর তাড়াতে হবে না। তাদের নিয়ে আমি আজই চলে যাব। তোমাদের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখব না।"

মা চেঁচিয়ে বললেন, "তোর ত ভারি আস্পর্ধা হয়েছে রে হরেন! মুখোমুখি কথা বলতে যে সাহস হয়েছে! ওদের নিয়ে কোথায় যাবি? কোন চুলোয়?"

আমি বললাম, "তোমাদের এ নরক থেকে সে চুলো ভাল। আমি ওদের নিয়ে একবার পশ্চিমে যাচ্ছি—লাহোর—আজই যাব! সেখানে আমার বড় চাকরি হয়েছে—অ্যাটর্নীগিরির মতো—"

এইখানেই আমার কথা শেষ। গুরুনিন্দা করলাম, অদৃষ্টে কি আছে কে জানে?"

—মানসী ও মর্ম্মবাণী, ২০শ বর্ষ ২য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা, কার্তিক ১৩৩৫

পোষ্টমাষ্টার

ভাই বিনয়,

তুমি পূজার ছুটিতে যখন বাড়ি আসিয়াছিলে, তখন আমার দুঃখের কথা সমস্তই তোমাকে বলিয়াছিলাম। তুমি নানাকাজে সর্বদা ব্যস্ত থাক, বোধ হয় সে সকল কথা তোমার মনে নাই। আমার দুঃখ অপার; সে দুঃখকাহিনি কাহারো কাছে প্রকাশ করিয়াও কোন ফল নাই। তুমি আমার শুভাকাঙ্ক্ষী, আমার দুঃখ কষ্ট তুমি হৃদয় দিয়া অনুভব কর, তাই মনে হইতেছে, তোমার কাছে আমার কষ্টের কথা কতক কতক প্রকাশ করিয়া একটু শান্তি লাভ করিব। তোমার মত বন্ধু আমার আর কে আছে? তুমি ত ভাই জান, তোমাদের গ্রামে পোস্টমাস্টারি করিয়া আমি মাসে কুড়ি টাকার বেশি বেতন পাই না; টিকিট বিক্রয়ের কমিশন আর কত হইবে?—দুটাকার বেশি হয়না। আয় এই বাইশ টাকা। পরিবারের তিনটি মেয়ে একটি ছেলে আর আমরা স্ত্রী-পুরুষ; বাইশ টাকা আয়ে আজ কাল এতগুলি পরিবার প্রতিপালন করা যে কি কঠিন, তা আমিই জানি। না হয়, ছেলেমেয়ে কটিকে দুবেলা দুমুঠো খাইতে দিয়া আমরা স্ত্রীপুরুষে একবেলা খাইয়াই থাকিলাম; ঘরের মধ্যে কি করি না করি তাঁর খোঁজ কে লইবে? আর আমরা অর্ধাশনে দিনপাত করিতেছি, তাহা অন্যে জানিলেই বা কি ক্ষতি? দুবেলা আহার যাহার জোটেনা, তাহার সে চক্ষুলজ্জা নিষ্প্রয়োজন। সে যাহাই হউক, এখন ঘোর বিপদে পড়িয়াছি, তাহা হইতে কিরূপে উদ্ধার হই! বড় মেয়েটি তেরো বৎসর পার হইয়া চোদ্দয় পড়িয়াছে; মেজ মেয়েটিও বারো বৎসরে পা দিয়াছে; মেয়ে যে আর ঘরে রাখিতে পারিনা। তুমি ত ভাই জান, আমার হাতে একটা পয়সাও নাই, এমন আত্মীয় নাই, যাহার কাছে এ দুঃসময়ে সাহায্য চাহিয়া কিছু পাইবার আশা করিতে পারি; স্ত্রীর গায়ে এমন একখানিও গহনা নাই, যাহা বিক্রয় করিয়া দু পয়সা সংগ্রহ করি। এখন উপায় কি? আমার যে জাতি যায়! কলিকাতায় অনেকের সঙ্গে তোমার আলাপ পরিচয় আছে, বিনা পয়সায় কি আমার মেয়ে দুটিকে কেহ গ্রহণ করিবে না? তুমি একটু বিশেষ চেষ্টা দেখিও; আমি বড় কষ্টে পড়িয়াছি। এমন কেহ আপনার লোক নাই যাহার উপর পাত্র খুঁজিবার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি; কাজ ছাড়িয়া নিজেরও নড়িবার যো নাই। তুমিই আমার একমাত্র ভরসা, তোমার উপর ঊষা ও নিশার বিবাহভার দিতেছি, তাহারা তোমাকে নিজের কাকা বলিয়াই মনে করে, কাকার যাহা কর্তব্য, করিও ভাই। আমরা শারীরিক ভাল আছি, তুমি কেমন আছ লিখিও।

হতভাগ্য রজনী

২

মাস্টার মহাশয়,

আপনার পত্র পাইলাম। কলিকাতায় নানারকম বিষয়কার্যে সর্বদা ব্যস্ত থাকি সত্য, কিন্তু সেজন্য আপনার কথা ভুলি নাই; আপনার ঊষা ও নিশার কথা যখন তখনই মনে হয়, আমি

অনেক মেয়ে দেখিয়াছি, কিন্তু উষার মত মেয়ে আমার চক্ষে কম পড়িয়াছে। তাহার অঙ্গ সৌষ্ঠব এবং স্বভাব দুই অতি সুন্দর; আপনাকে কষ্ট দিবার জন্যই বুঝি ভগবান এমন কন্যারত্ন আপনার ঘরে পাঠাইয়াছেন। এমন লক্ষ্মীর মত সুন্দরী ধীর শান্ত মেয়ে কি যার তার হাতে সঁপিয়া দেওয়া যায়?

আমি যদিও আজ তিনবৎসর হইল কালেজ ছাড়িয়াছি, তথাপি আমার সহপাঠী অনেকে আজও কালেজে পড়িতেছেন। দেশের দুঃখ দূর করিবার জন্য, বালিকা-বিবাহ রহিত করিবার নিমিত্ত, সামাজিক কুরীতি এবং কুসংস্কার নিবারণের জন্য যাহাদের সঙ্গে একত্রে সভাসমিতি করিতাম, গ্রামে গ্রামে বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতাম, প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিতাম, তাঁহাদের অনেকেই এখনও কালেজে পড়িতেছেন। সেদিন খুঁজিয়া খুঁজিয়া আমাদের দেশোদ্ধার দলের চাঁই একটি বন্ধুর সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম; তিনি এম. এ. পাশ করিয়া এখন আইন পড়িতেছেন; এখন পর্যন্ত তিনি বিবাহ করেন নাই; আমাদেরই জাতি, উপাধি ঘোষ, বয়স তেইশ-চব্বিশ বৎসর, উষার সঙ্গে বেশ মানায়। তার সঙ্গে অনেক দিন পরে দেখা হইল, কথায় কথায় দেশোদ্ধার, জাতীয় মহাসমিতি, ব্যবস্থাপক সভা প্রভৃতি লইয়া অনেক আন্দোলন চলিল। তারপর আসল কথা পাড়িলাম। বিবাহের কথা উঠিলে, তিনি যেরকম মেয়ে চান, উষা ঠিক সেই রকম মেয়ে, তাহা বলিলাম, এবং রূপ, গুণ, লেখা-পড়া প্রভৃতিতে উষা তাহাকে বেশ সন্তুষ্ট করিতে পারিবে, তাহাও তাহাকে জ্ঞাত করিলাম। পরে মনে হইল, এই সঙ্গে আপনার পরিচয়টাও দেওয়া ভাল। কাজেই তাঁহাকে বলিলাম, আপনি কুড়ি টাকা মাহিয়ানায় পাড়াগাঁয়ে পোস্টমাস্টারি করেন। শুনিয়া তিনি অনায়াসে বলিয়া বসিলেন, "তাইত, তেমন Respectable লোক নন। আমার বিশেষ আপত্তি না থাকলেও বাবা যে একাজে স্বীকার হবেন তা বোধ হয় না।"—ইচ্ছা হইল আমাদের ছাত্রসমিতিতে গঠিত প্রবন্ধের তাড়া হইতে তাহারই লিখিত 'পাশ করা বরের অত্যাচার' শীর্ষক প্রবন্ধটি বাহির করিয়া এখন একবার তাঁহাকে পড়তে দিই। আপনি সামান্য পোস্টমাস্টার, তাই আপনাকে শ্বশুর বলিতে তাহার আপত্তি। তাহার পিতার কাছে এ প্রস্তাব উপস্থিত করিলে, তিনি যে ফর্দ বাহির করিতেন তাহাতে অনেক রাজা মহারাজকে পৃষ্ঠভঙ্গ দিতে হইত, অথবা পাগলের প্রলাপ বলিয়া কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন।

যাহা হউক এম এ. পাশ প্রাপ্ত ভদ্রলোকটির কাছ হইতে বিদায় লইয়া, আমি অপেক্ষাকৃত অল্প পাশওয়ালা একটি ছেলের সঙ্গে দেখা করিলাম। এ ছেলেটি আমার বড়ই বাধ্য ছিল, গত বৎসরে এল. এ. পাশ করিয়া এখন মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারি পড়িতেছে; অবস্থা মন্দ নয়। শুনিয়াছিলাম, এ ছেলেটির বিবাহ করিবার ইচ্ছা আছে, একটি ভালো মেয়ে পাইলেই হয়, টাকাকড়ির দিকে দৃষ্টি নাই, তাই তাহার কাছে গিয়াছিলাম; তাহাকেও সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলাম। সে সম্মত হইল; কিন্তু টাকাকড়ি কিছু পাইবার আশা নাই শুনিয়া বলিল, "আমার কোন আপত্তি নাই বটে, কিন্তু মা-বাপের অমতে তো কিছু করিতে পারিনা; আমাদের ধর্মশাস্ত্রেই তো আছে, "পিতাস্বর্গ পিতা ধর্ম পিতাহি পরমন্তপঃ", পিতার অসম্মতিতে আমার কোন কাজ করিবার ক্ষমতা নাই।" বুঝিলাম, ইনিও সেই দলের। মাস্টার মহাশয়, কলিকাতায়

ছাত্রদলের মধ্যে আপনার কন্যার বিবাহের আশা ত ছাড়িয়া দিয়াছি; নগদ পাঁচ হাজার, অভাব পক্ষে তিনচারি হাজার টাকার কমে কলেজের ছেলের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া অসম্ভব। আমি কি করিব, কিছুই ভাবিয়া পাইতেছি না অথচ শীঘ্র বিবাহ দেওয়া চাই। আপনি বড়দাদাকে এ সম্বন্ধে একটু বিশেষ করিয়া বলিবেন। মধ্যবিত্ত গৃহস্থের মধ্যে তাঁহার অনুগত অনেক লোক আছে। তিনি যদি চেষ্টা করেন ত কৃতকার্য হইবার যথেষ্ট আশা আছে। আমি ভাল আছি। আপনারা কেমন আছেন? উষা ও নিশাকে আমার ভালবাসা জানাইবেন। ইতি—

আপনাদের বিনয়

৩

ভাই বিনয়,

আমি তোমাকে পূর্বেই বলিয়াছিলাম, পাশ করা ছেলেদের দিকে যাইওনা। তুমি আমাকে কতবার বলিয়াছ, পাশ করা ছেলেরা কি এতই নিষ্ঠুর? তুমি নিজের মত সকলকেই দেখ; তুমি বিবাহ করিয়া এক পয়সাও নাও নাই, তাই মনে করিয়াছিলে, তোমার সঙ্গে মিশিয়া যাহারা স্বার্থপরতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে হৈ চৈ করিত, সকলেই সেই রকম করিবে; তাই উষা ও নিশার জন্য পাত্র খুঁজিতে গিয়া তোমাকে ভগ্নপ্রয়াস হইতে হইয়াছে। সংসারে বাহিরে যেমন দেখা যায়, ভিতরটাও যদি সেরকম হইত, তবে আর দুঃখ ছিল কি? লোকে মুখে যাহা বলে, কাজেও যদি তাহা করিত, তাহা হইলে কি আর ভাবিতে হইত? কলিকাতা শহর খুঁজিয়া দেখিও কলেজের পাশের খাতা লইয়া বাড়ি বাড়ি অনুসন্ধান করিও; দেখিবে ধন-মানের দিকে না চাহিয়া বিবাহ করিতে প্রস্তুত, এমন ছেলে শতকরা একটি মেলা কঠিন। আমার মত কুড়ি টাকা বেতনের পোস্টমাস্টারকে শ্বশুর বলিয়া পরিচয় দিতে একজন এম. এ. পাশ করা বাবুর লজ্জা হওয়াই উচিত; বরং তাহা না হওয়াই আজকালের দিনে আশ্চর্য। উদরান্ন জুটাইতে পারিনা, চার পাঁচ হাজার টাকা কোথায় পাইব ভাই? তোমার দাদা অনুগ্রহ করিয়া এই বিপদে আমাকে তিনশত টাকা সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, তাহাই আমার সম্বল। তিনশত টাকায় যে রকম বর পাওয়া যায়, তাহারই সন্ধান করিও। তোমার দাদা ও চারিদিকে অনুসন্ধান করিতেছেন। কি বলিয়া তোমাদের আশীর্বাদ করিব? ভগবান তোমাদের চিরসুখী করুন,—তোমরা বিপন্নের বান্ধব।

হতভাগ্য রজনী।

৪

প্রিয়তম বিনয়,

তুমি শুনিয়া সুখী হইবে, রজনীবাবুর দুই মেয়ের বিবাহের জন্য আমি পাত্র ঠিক করিয়াছি; মেয়ে যেমন, ছেলে দুটি তেমন হইলনা; কি করিব বল, চেষ্টার ত্রুটি করি নাই। রজনীবাবুর মেয়ে দুটি সত্যসত্যই রাজার পুত্রবধূ হইবার যোগ্য; যদি আমার আর ছোট ভাই থাকিত, তবে উষাকে আমাদের ঘরে আনিয়া ঘর আলো করিতাম। আমাদের

হরিপুরের তহবিলদার রাজকৃষ্ণ মিত্রকে তুমি চিনিতে। গত বৎসর তাহার মৃত্যু হওয়ায় তাহার বড় ছেলে হরেকৃষ্ণকে আমি সেই কাজে দিয়াছি; ছেলেটা বেশ শান্ত শিষ্ট, বেশ বুদ্ধিমান ও বটে, তবে লেখাপড়া ভাল জানেনা। এ একবৎসর কাজ কর্ম ও বেশ করিতেছে। খুব বিশ্বাসী। আমার বিশ্বাস, তাহার সঙ্গে বিবাহ দিলে ঊষা কখনও খাওয়া পরার কষ্ট পাইবে না। হরেকৃষ্ণর ছোট ভাই মাইনর স্কুলের প্রথম শ্রেণিতে পড়িতেছে, বয়স সতেরো বৎসর। মাইনরটা পাশ করিলে, আমি মনে করিতেছি, তাহাকে কলিকাতায় রাখিয়া ক্যাম্বেল স্কুলে ডাক্তারি পড়াইব, নিশার সঙ্গে তাহার একরকম মানাইবে। ইহারা আমার বিশেষ বাধ্য বলিয়াই আমার কথায় সম্মত হইয়াছে। সেদিন পোস্টমাস্টারকে ডাকাইয়া সকল কথা বলিয়াছি। তিনি ছেলে দুটিতেও দেখিয়াছেন, এ বিবাহে তাঁহার অমত নাই। খরচ পত্রের একটা ফর্দ ধরিয়া দেখা গেল, মোটামুটি হিসাব করিয়া দেখিলাম, সাড়ে ন'শ টাকার কমে কিছুতেই দুই মেয়ে পার করা যায় না। আমি তিনশ টাকা দিতে চাহিয়াছিলাম, মা বলেন, স্বজাতির ছেলে কন্যাদায়ে পড়িয়াছে, বিশেষ আমাদের বড় অনুগত লোক, আরো বেশি কিছু সাহায্য করা উচিৎ, ইহা অপেক্ষা পুণ্যের কাজ আর কিছুই নাই। মার এত দয়া। আমি মনে করিতেছি, চারশ টাকা দেব। তুমি কি বল? তুমি বিবাহের সময় বাড়ি আসিও, তাহা হইলে রজনীবাবু বড়ই সুখী হইবে।

এই মাত্র তোমাদের বড়বৌ আসিয়া বলিলেন, যে ছোট বৌমার ইচ্ছা দানের জিনিষগুলিও আমরা দিই; তোমাকে সে কথা লিখিতে বলিলেন। দয়াময়ী ছোট বৌমার কথা আমি অমান্য করিতে পারিব না, তাহার ইচ্ছা অপূর্ণ রাখিতে আমার ইচ্ছা নাই। আমি বলিয়া দিয়াছি দানসামগ্রী যাহা যাহা দেওয়া প্রয়োজন তিনি তোমাকে লিখিবেন, তিনি যেমন যেমন জিনিসের ফরমাইস দিবেন, তাহাই আনিবে, আমার মতামতের অপেক্ষা করিওনা। এলাকার সব মঙ্গল; বিনোদ, বিপিন, খোকা, ভাল আছে। তোমার শরীর কেমন? ইতি—

আশীর্বাদক
শ্রীবিনয়কুমার মিত্র

৫

ভাই বিনয়,

তোমাদের দয়ায় এবার আমি কন্যাদায় হইতে উদ্ধার হইতে চলিলাম। শনিবার ঊষা-নিশার বিবাহ সে কথা পূর্বেই লিখিয়াছি। তুমি অন্তত শুক্রবারে অবশ্য অবশ্য এখানে আসিয়া পৌঁছিবে। নানা কারণে তোমার সঙ্গে দেখা করা নিতান্ত দরকাব। তোমরা যাহা সাহায্য করিয়াছ, তাহা ছাড়া আর যে তিনচারশত টাকা লাগিবে, তাহা আমি অন্যস্থান হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। তোমার সঙ্গে দেখা হইলে সমস্ত বলিব। অবশ্য অবশ্য আসিও।

হতভাগ্য রজনী।

৬

শ্রীচরণকমলেষু,

দাদা, আজ বুধবার, শনিবার রজনীবাবুর মেয়েদের বিবাহ। আপনি যাইতে লিখিয়াছিলেন। রজনীবাবুও যাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন, বাড়ি হইতেও পত্র পাইয়াছি। কিন্তু আমার যাওয়ার বিশেষ বিলম্ব উপস্থিত। শনিবারে oriental tea company-র মিটিং; কোম্পানির কাজকর্মের বিশৃঙ্খলতার কথা পূর্বেই লিখিয়াছি। এই মিটিংএ হিসাবপত্র পরীক্ষা ও ভবিষ্যতের কাজকর্মের বন্দোবস্ত স্থির হইবে। আমার যে সভায় উপস্থিত থাকা নিতান্ত দরকার। যদি আপনি এখানে থাকিতেন, তাহা হইলে আমি যাইতে পারিতাম। এই পত্রপাঠ আপনি চলিয়া আসিয়া শনিবারের মিটিং-এ উপস্থিত থাকিলে চলিতে পারে বটে, কিন্তু আমি ভাবিয়া দেখিলাম আমি বাড়ি গিয়া রজনীবাবুর মেয়েদের বিবাহের কিছুই বন্দোবস্ত করিতে পারিব না, আপনি ত জানেন, ও সকল কাজে আমার বিন্দুমাত্র অভিজ্ঞতা নাই, সুতরাং আমার এখানকার কাজ লইয়াই থাকা ভাল। বিবাহে আপনি যাহা সাহায্য করিতেছেন, তাহা বেশ হইয়াছে। বাড়ির মেয়েরা যেন বিবাহের দিন রজনীবাবুর বাড়িতে যান, নতুবা তিনি মনে করিবেন, গরিব বলিয়া উপেক্ষা করিয়া বাড়ির বৌ-ঝিরা তাঁহার বাড়িতে গেলেন না। দানের জিনিস পত্রগুলি আমি নিজে দেখিয়া কিনিয়াছি, আজ রাত্রে সেগুলি রেলওয়ে পার্শেলে রওনা করিব। ইতি—

সেবক শ্রীবিনয় কুমার মিত্র।

পুঃ—পোস্টমাস্টার বাবুকে আর পৃথক পত্র লিখিলাম না, আপনিই তাহাকে সকল কথা বলিবেন। আর একটা কথা, তিনি অবশিষ্ট তিনচারিশত টাকা কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন?

বিনয়

৭

প্রিয়তমে,

তোমার পত্র পাইলাম। তোমার চিঠি, তাহার উপর দাদার হুকুম। এক হুকুমেই রক্ষা নেই, তা আবার ডবল, নিজে বাজারে বাজারে ঘুরিয়া যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া তোমার বরাতি দানের জিনিসগুলি কিনিয়াছি, এখন তোমার পছন্দ হইলেই সকল পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব। তবে কিনা তোমার মন জিনিসটি বড় দুষ্প্রাপ্য, কিন্তু তাই বলিয়া ভরসা করি, এ পক্ষে সাধনার ত্রুটি নাই।

রহস্য পরিহাসের কথা এখন থাক। পোস্টমাস্টারের পরিবারের প্রতি তোমার দয়া দেখিয়া আমি বড়ই সুখী হইয়াছি; পোস্টমাস্টারের ন্যায় দরিদ্র পরিবার যথার্থই করুণার পাত্র। দুঃখী দরিদ্রের প্রতি তোমার যেমন দয়া আমি যেন তাহার অনুকরণ করিতে পারি, ঊষা ও নিশার জন্য কেমন সুন্দর কাপড় কিনিয়াছি দেখিও, দেখিয়া তোমার মুখ আনন্দে ভরিয়া উঠিবে। বড় দুঃখ যে তোমার মুখের সেই ভাবখানা দেখিতে পাইলাম না। কি করিব বল?

হঠাৎ এমন কাজ পড়িয়া গেল যে বিশেষ ইচ্ছা থাকিলেও কিছুতে বাড়ি যাইবার যো নাই। মানুষের সকল ইচ্ছা পূর্ণ হইলে আর দুঃখ ছিল কি?

উষা ও নিশার বিবাহ সম্বন্ধ করিতে গিয়া যে কষ্ট পাইয়াছি তাহা বলিবার নহে। ছেলে পাশ করিলে আর রক্ষা নাই, ছেলের মা বাপ অর্ধ রাজ্য ও এক রাজকন্যা চাহিয়া বসে, ছেলে খোঁজ করে মেয়েটি ডানাকাটা পরি কিনা, এবং সে লেখাপড়াতে কি রকম পরিপক্ক। তোমার ত একটি ছেলে হইয়াছে, তাহার বিবাহের সময় যেন তুমি সোনার ঘড়া, রূপার খাট চাহিয়া বসিওনা। গরিবের ঘর হইতে উষার মত একটি পরমা সুন্দরী কনে আনিয়া তোমার পুত্রবধূ করিয়া দিব, তথায় যেন তত্ত্বের জন্য বেয়ানকে গাল পাড়িওনা। পোস্টমাস্টারের অবস্থা দেখিয়া মনে যে কষ্ট হইয়াছে, তাহা যেন মনে থাকে।

আমি যাইতে পারিলাম না, তোমাকে একটা কাজের ভার দিতেছি। তোমাকে আমার একটিনি করিবে হইবে, পারিবে ত? আমি জানি তুমি অতি সুন্দর রূপে সকল কাজ করিতে পারিবে; কেবল আমার মত মুখে চুরুট গুঁজিয়া ধোঁয়া ছাড়িতে আর বাজে ইয়ারকি দিতে পারিবে না। যাহা হউক আসল কাজের তাহাতে কোন ক্ষতি হইবে না। তুমি সেদিন একা দশজনের কাজ করিও, সকলে যেন দেখিয়া অবাক হইয়া যায় যে, বড়মানুষের মেয়েতেও সংসারের সকল কাজ করিতে পারে। তাহাকে বুঝিতে দিও যে, অহঙ্কার করিয়া বসিয়া থাকা কি নাক তুলিয়া পরের নিন্দা করা পৃথিবীর সকল বড় মানুষের মেয়ের স্বভাব নয়। বিবাহ শেষ হইয়া গেলে আমাকে সংবাদ লিখিও, আর তুমি কেমন কাজ কর্ম করিয়াছ তাহা লিখিয়া জানাইও। অদ্য বলিতেছি, তোমার প্রশংসা শুনিতে পাইলে মনে বড় আনন্দ হয়। খোকাকে যেখানে সেখানে লইয়া যাইও না, কতকগুলো মিষ্টি খাইয়া অসুখ করিতে পারে। আমি ভাল আছি।

তোমার বিনয়

৮

প্রিয়তম বিনয়,

সর্বনাশ হইয়াছে! পোস্টমাস্টার গলায় দড়ি দিয়া মরিয়াছে! গতকল্য বেলা দুই প্রহরের সময় বর-কনে বিদায় হইয়া গিয়াছে, রাত্রে এই ঘটনা। এখনো পুলিশ আসিয়া উপস্থিত হয় নাই: ব্যাপার কি, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। সবিশেষ পরে লিখিতেছি। ইতি—

আশীর্বাদক বিজয়।

৯

ভাই বিনয়,

কাল যখন তুমি এই পত্র পাইবে তখন আর আমি এ জগতে থাকিব না; দরিদ্রের জীবন ধারণে ফল কি ভাই?

তোমাকে অনেক কথা বলিবার ছিল, সেই জন্যই তোমাকে অবশ্য অবশ্য আসিতে

লিখিয়াছিলাম। কিন্তু আমার প্রতি বিধাতা বিমুখ, তুমি ইহা সত্ত্বেও আসিতে পারিলে না। আমার সময় অতি অল্প, মন ঠিক অবস্থায় নাই, যে সকল কথা বলিব মনে করিয়াছিলাম, তাহা আর বলা হইল না, সকল কথা গুছাইয়া লিখিতে পারিব, সে আশাও নাই। কন্যার বিবাহ দিতে বসিয়া যে অন্যায়, বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছি, রাজদণ্ডে তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে কিনা, জানিনা। কিন্তু আমি আপনাকে ক্ষমা করিবারও যোগ্য নহি; যে মহাপাপ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি, তাহার আর ইহকাল, পরকালে প্রায়শ্চিত্ত নাই, চিরজীবন দারিদ্রের যন্ত্রণা ভোগ করিয়া আসিয়াছি; পরলোকেও অনন্ত নরকের যন্ত্রণার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি, ইহাই আমার অদৃষ্টে ছিল, ইহাই বিধিলিপি।

তোমরা আমার জন্য যাহা করিয়াছ, নিতান্ত প্রিয়তম আত্মীয়েও তাহা অপেক্ষা অধিক করিতে পারে না। তোমাদের সে ঋণ পরিশোধ করা আমার ক্ষুদ্র ক্ষমতার অতীত; প্রত্যুপকারের আশাতেও তোমরা এ হতভাগ্যের উপকার কর নাই। তোমাদের দেব হৃদয়, দরিদ্রের দুঃখে দয়ার্দ্র হৃদয় বিচলিত হইয়াছিল তাই আমার জন্য এতটা করিয়াছ, আমার কন্যার বিবাহের ব্যয় নির্বাহের জন্য পাঁচশত টাকা সাহায্য করিয়াছ, কিন্তু নয়শত টাকার কমে এ বিবাহকার্য সমাধা হয়না। গরিব কুড়ি টাকার কেরানি বাকি চারশত টাকা কোথায় পাইব, নিরূপায়? অবশেষে যে উপায় ছিল তাহাই অবলম্বন করিলাম। আমার হাতে যে সরকারি ক্যাশ ছিল, তাহা হইতেই চারিশত টাকা লইয়া কোন প্রকারে কাজ শেষ করিলাম, আজ আমি স্বাধীন, আজ কতকটা নিশ্চিন্ত মনে মরিতে পারিব। আর যাহারা রহিল, যাহাদের মায়ার বাঁধন এ অন্তিম মুহূর্তেও ছিঁড়িতে পারিতেছিনা, তাহাদের ভার তোমাদের দুই ভায়ের হাতেই দিয়া যাইতেছি, জানি তোমরা তাহাদের ভার গ্রহণে কাতরতা প্রকাশ করিবে না, তাই মরিতে আমার দুঃখ নাই। তুমি হয়ত বলিবে কেন মরিতেছি? তহবিল ভাঙিয়া ত কারাগারেও চিরজীবন রাজদণ্ড ভোগ করিতে হয়না, দুই চারি বৎসর পরে আবার ঘরে ফিরিয়া আসিতে পারিব, আবার স্ত্রী পুত্রের মুখ দেখিয়া শান্তি লাভ করিব। কিন্তু ভাই এ হীন কলঙ্কিত জীবন লইয়া কে পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিতে চায়? জীবনের প্রলোভন কি এতই বেশি? যদি সুনাম হারাইলাম, রাজদ্বারে বিশ্বাসঘাতক, চোর বলিয়া দণ্ডিত হইলাম, সমস্ত সাধু লোকের সহানুভূতি হইতে নির্বাসিত হইলাম, তবে আর জীবনে কাজ কি? ইহা অপেক্ষা মৃত্যু ভাল।

সেই জন্যই আজ মরিব স্থির করিয়াছি। চিরজীবন চোর বলিযা আমাকে ঘৃণা করিতে হয় করিও, কিন্তু ভাই, আমার অপরাধের জন্য আমার স্ত্রী-পুত্রকে পথে বসাইওনা। আমি আর তোমাদের একবিন্দুও অনুগ্রহের পাত্র নই, কিন্তু তোমাদের করুণা ভিন্ন আমার স্ত্রী-পুত্র অনাহারে মরিবে। তাহাদের তুমি যে স্নেহ করিয়া আসিতেছ, এই হতভাগ্যের অপরাধে তাহাদিগকে সে স্থান হইতে বঞ্চিত করিও না।

ইহার পূর্বে আমি একদিনও একটি পয়সা সরকারি তহবিল হইতে লইয়া খরচ করি নাই; কতদিন পেট ভরিয়া খাইতে পাই নাই তথাপি সরকারি তহবিলে হাত দিই নাই, স্বামী-স্ত্রীতে দারিদ্রের প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ করিয়া উপবাসে দিন কাটাইয়াছি; কিন্তু কন্যাদায় উদ্ধারের আর উপায় দেখিলাম না, নিজ হস্তে নিজের বুকে ছুরি দিলাম, সরকারি ক্যাশ ভাঙিলাম। মনে

মনে এই দুঃসঙ্কল্প স্থির করিয়াই ত সরকারি তহবিল ভাঙ্গিয়াছি, এ কয়দিন এই বিষ আমার হৃদয় মন জর্জরিত করিয়া ফেলিয়াছে, তথাপি আমি প্রকাশ্যভাবে হাসিয়াছি। কেহ কি বুঝিয়াছে, বুকের মধ্যে কি সমুদ্র লুকাইয়া আমি এ কয়দিন কিভাবে কাটাইয়াছি?

আবার বলিতেছি ভাই, রসিক, বিমল রহিল, দুঃখিনী স্ত্রী রহিল, হায় আমার মৃত্যুতে কি সে আর বাঁচিবে? তথাপি যে কদিন বাঁচে, সে কয়দিন তাহাদের মুখের দিকে চাহিও, তোমার হাতেই তাহাদের সমর্পণ করিয়া যাইতেছি। তুমি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ দেখাইয়াছ, তোমার মা, দাদা, স্ত্রী এতদিন ধরিয়া, আমাদের প্রতি যে দয়া করিয়া আসিয়াছেন, তাহাতে আমার বিশ্বাস, আমার স্ত্রী তোমাদের দাসীবৃত্তি করিয়া জীবন কাটাইতে পারিবে।

আমি চলিলাম, যে দেশে মেয়ের বিবাহ দিতে টাকা লাগেনা, সেই দেশে চলিলাম, নরক হইলেও, সে স্থান এই নরমাংস বিক্রয়ের স্থান হইতে অনেক ভাল। সেই স্থানই আমার প্রার্থনীয়। নরকে যমরাজের কাছে আমি ছেলে বিক্রয়কারীদের নামে নালিশ করিব; পৃথিবীতে গরিবের বিচার হইল না।

বিনয়, আমার আর একটা অনুরোধ, ছেলের বিবাহ দিয়া টাকা লইও না। গরিব লোক, যে পরিবার প্রতিপালন করিতে পারে না, সে যখন বিবাহ করিতে যাইবে, তখন তাহার হাতে ধরিয়া নিষেধ করিও। আমার পরিণাম দেখাইও।

মা, ঊষা, নিশা, বাবা রসিক, পুতলি রানি, প্রিয়তমে জনমদুঃখিনী কি বলিয়া আজ তোমাদের কাছে বিদায় লইব? একদিনও তোমাদের সুখী করিতে পারি নাই। সে আমার দুরদৃষ্ট, এ অক্ষমের সকল অপরাধ ক্ষমা করিও; জন্মের মত আজ চলিলাম, বিদায় দেও।

ভাই বিনয়, একটি অপদার্থ, অকিঞ্চিৎকর জীবন পৃথিবী হইতে অপসৃত হইল; আজ বিদায়, চিরবিদায়।

তোমার হতভাগ্য রজনী।

—দাসী ৫ম ভাগ, ১০ম সংখ্যা, অক্টোবর ১৮৯৬